গদ্যপরম্পরা

গদ্যপরম্পরা

ফাদার দ্যতিয়েন

গাঙচিল

GODYA PARAMPARA
Edited & Complied
by Father Detienne

প্রথম প্রকাশ
অনন্য প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১
ই-মেল gangchil.books@gmail.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস
শ্রীমন্ত করণ ৩৮ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া ৭১১ ১০৪

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফাদার দ্যতিয়েন-এর আলোকচিত্র
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

বিশ্বজ্যোতি দাশগুপ্ত পলাশ ভদ্র সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সোমজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিন্ময় গুহ

উৎসর্গ

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
স্মরণে

সঙ্কলয়িতার নিবেদন

'গদ্যপরম্পরা' গ্রন্থনার জন্ম সঙ্কলয়িতার এক ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধে। সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাস-পুস্তকগুলিতে লেখকদের আমরা যে-পরিচয় পাই (কোথায় জন্ম, কবে মৃত্যু, কার প্রভাব কার কোন্ গ্রন্থে পড়েছে...) সেটা কতক পরিমাণে বহিরঙ্গ ও খণ্ডিত। লেখকের রচনাতেই লেখকের প্রকৃত পরিচয়। সঙ্কলয়িতার মতে তাই 'গদ্যপরম্পরা'— তা সে উপস্থিত গ্রন্থই হোক কিংবা অন্যতর প্রকৃষ্টতর চয়নিকা— সাহিস্য-ইতিহাসের এক অপরিহার্য পরিপূরক।

গদ্যসঙ্কলনের— বাংলা গদ্যের উৎকৃষ্ট সঙ্কলনের— অভাব নেই: রম্যরচনার, ব্যঙ্গ রচনার, আলোচনাসাহিত্যের একাধিক সঙ্কলনে বাংলা গদ্যের বিশ্রুত মহাসারথিদের সর্বাঙ্গসুন্দর পরিচয় পাই; উপেক্ষিত সাংসদের কোনো হদিস কোথাও মেলে না। 'গদ্যপরম্পরার' উদ্দেশ্য অধিকতর সামগ্রিক আর— ফলত— অপেক্ষাকৃত সীমিতও: এতে সঙ্কলিত হয়েছে ৪৮৫-জন খ্যাত-অখ্যাত পরলোকগত লেখকের রচনাবলীর এক ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য বহু বৎসরের গবেষণা কিংবা অনেক বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত লেখকদের 'শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠা' (যেমন দেখি 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'...) নির্বাচনের কথা ভাবা-ই ধৃষ্টতা। এদিকে পাঠক প্রশ্ন করবেন: কোনো লেখকের 'সাহিত্য-মেজাজ' কি এমনিতর একটিমাত্র নমুনায় ধরা পড়ে? কারও কারও ক্ষেত্রে পড়ে বটে (দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, সুকুমার রায়...)। কারও কারও বেলায় আবার পড়েও না (বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ...): বহুমুখী প্রতিভাশালী লেখকদের উদ্ধৃতি-নির্বাচনে সঙ্কলয়িতার ব্যক্তিগত সাহিত্যবোধ— কিংবা বোধাভাব— বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

কৈফিয়তে আরও বলার আছে। অনেক লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা পাওয়া দুষ্কর: কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে গিয়ে শুনবেন, বইটি নাকি 'মিসিং' কিংবা 'নট্ ফাউণ্ড' কিংবা আদৌ কোনোদিনই ছিল না। আর শ্রেষ্ঠ রচনা পাওয়া গেলেও এক্কেকবার দেখবেন, সেই শ্রেষ্ঠ রচনার শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠাটি হয় ছিন্ন, নয় ভঙ্গুর, নয় বল্মীকদংশনে বিনষ্ট— যার ফলে সেই পৃষ্ঠাটি 'গদ্যপরম্পরায়' স্থান পায় নি। বেশ অনেকবার এমনও হয়েছে, শ্রেষ্ঠ রচনা পাওয়া গেলেও আর তার শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠা অক্ষুণ্ন থাকলেও সঙ্কলয়িতা নিজেই— ক্লান্ত কিংবা অন্যমনস্ক হওয়াতে— সেটাকে লক্ষ্য না ক'রে, কিংবা তার উৎকর্ষ উপলব্ধি না ক'রে, নিকৃষ্টতর উদ্ধৃতি সমুদ্ধার করেছেন। সুধী পাঠকের কাছে অনুরোধ: সেই আরো-ভালোর সন্ধানদানে তাঁরা যেন সঙ্কলয়িতার এই যথাসাধ্য-ভালো খসড়াটিকে পরিশোধনে পরিবর্জনে পরিবর্ধনে পরিমার্জিত করেন।

সম্পাদনকালে ড: সুকুমার সেনের প্রীতিপূর্ণ উৎসাহ ও পরামর্শদানে উপকৃত হয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীসুনীল দাস বহুকালসঞ্চিত ধূলার আস্তরণের তলা থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য রচনা উদ্ধার ও পরিবেশন করেছেন। একাধিক লেখকের তথা রচনার কালনির্দেশে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক অলোক রায়। শ্রীনির্মাল্য ভট্টাচার্য, সৈয়দ আব্দুর রহমান ফিরদৌসী এবং অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য অতিরিক্ত কয়েকজন লেখকের আহরণযোগ্য গ্রন্থ সন্ধান ও সংগ্রহ ক'রে দিয়ে সঙ্কলনটিকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছেন। শ্রীঅমলকান্তি ভট্টাচার্য সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছেন, প্রুফ্ সংশোধন করেছেন, নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলির উপযোগিতা-বিচারে মহামূল্য সহায়তা করেছেন; 'গদ্যপরম্পরা' নামটিও তাঁরই উদ্ভাবন। তাঁরা সকলেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

পরিশেষে বলি: একাধিক বন্ধুর অনুরোধ সত্ত্বেও উদ্ধৃতিগুলির রসবিচারে বিরত রইলাম: সাহসী হই নি, প্রবণতাও ছিল না, সুধী পাঠক মার্জনা করুন।

শান্তিসদন
৩৪/এ, তেলিপাড়া লেন
কলিকাতা-৪

ফাদার দ্যতিয়েন

গদ্যপরম্পরা

বহুদিনপূর্বে প্রকাশিত 'গদ্যপরম্পরা'র পুনর্মুদ্রণের উপলক্ষে ওর উৎপত্তি বিষয়ে কটি কথা স্মরণ করতে চাই।

একদিন আমার আস্তানায় চায়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে এক সাহিত্যিক ভদ্রলোক (চিরস্মরণীয় কলমবাজ না হলেও সাহিত্যিক তো বটে) আমাকে লক্ষ্য করে কুসুমসুলভ বাণ নিক্ষেপ করে সবিনয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, "আপনি যে-সমস্ত লেখা বার করেন, আমরা সেগুলো সাগ্রহে পাঠ করি, আপনি কিন্তু, মনে হয় আমাদের কোনো প্রকাশিত বই কেনেনও না, পড়েনও না।"

ভদ্রলোকের আক্ষেপ ভিত্তিহীন ছিল না; সে-সময়ে আমি পড়তাম অতি অল্প। স্থির করলাম, বাংলা গদ্যের আদিকাল থেকে অদ্যাবধি আবির্ভূত যাবতীয় পরলোকগত বাঙালী লেখকের গদ্যের সঙ্গে পরিচয় করব।

আমার আবাস বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের নিকটবর্তী ছিল। প্রতিদিন হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস, কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, কি বর্ষায় উক্ত পরিষদের গ্রন্থাগারে অপরাহ্ণ কাটাতে গিয়েছি। কর্মচারীদের সহৃদয় সহযোগিতায় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুরানো পুরানো গ্রন্থগুলো একে একে আনিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, ইতি-উতি চোখ বুলিয়ে দেখেছি... আর হঠাৎ সুলিখিত কোন এক পৃষ্ঠা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করলে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছি। কখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে, কখনও মায়াবশতঃ।

সেই সমস্ত নির্বাচিত উদ্ধৃতি 'গদ্যপরম্পরা'য় সঙ্কলিত হয়েছে।

গাঙচিল এই বই পুনর্মুদ্রণ করতে রাজি হওয়ায় আমি আনন্দিত। বিশ্বাস-দম্পতিকে ধন্যবাদ জানাই।

ব্রাসেলস্, বেলজিয়াম — ফাদার দ্যতিয়েন

গদ্যপরম্পরা

'গদ্যপরম্পরায়' সঙ্কলিত অধিকাংশ লেখক-লেখিকা ডঃ সুকুমার সেন রচিত "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের" দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন বিদেশী: মানোয়েল দা আস্‌সুম্প্‌সাওঁ, উইলিয়ম কেরী, জেম্‌স স্টিওয়ার্ট, উইলিয়ম ইয়েট্‌স, জান রাবিনসন, ফেলিক্স কেরী এবং হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স [২, ৮, ১৬, ১৭, ২৬, ১১, ২৫]; শেষ দুজন বঙ্গজ। ভারতীয় কিন্তু অবাঙ্গালী পূর্বপুরুষের বংশধর আছেন চারজন: বীরেশ্বর পাঁড়ে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, জগদানন্দ বাজপেয়ী [১২৯, ১৯৬, ২২৬, ৩২৯]। খ্রীষ্টান লেখক মুষ্টিমেয়; তাঁদের মধ্যে আছেন ধর্মপ্রচারক আন্তোনিও দো রোজারিও, দুজন প্রটেস্টাণ্ট পাদ্রি (লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যাঁর প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) [১, ৪৩, ৬০, ২০২]। সংখ্যায় ও গুরুত্বে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন ব্রাহ্মসমাজ। মুসলমান লেখক সঙ্কলিত হয়েছেন চৌত্রিশজন; তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা [৩২২, ৩৪৭, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭১]। সর্বসমেত এ-গ্রন্থে লেখিকা আছেন সাঁইত্রিশজন [৫৫, ৭৭, ৮৭, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৮, ১৪৯, ১৬২, ১৬৪... ৩৬৭, ৪২৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৬৬, ৪৭৩]। আর আছেন এমন কয়েকজন মনীষী যাঁরা গদ্যলেখক হিসাবে (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায়...), এমন কি সাহিত্যিক হিসাবেও (প্রশান্ত মহলানবিশ; দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর দুটিমাত্র গদ্যরচনার কথা জানা যায়) সাধারণ্যে পরিচিত নন।

লেখকদের কেউ কেউ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন: অ, আ, ই (প্রাণতোষ ঘটক), অমলা দেবী (ললিতানন্দ গুপ্ত), কাঙ্গাল হরিনাথ (হরিনাথ মজুমদার), চিরঞ্জীব শর্মা

(ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল), দিবাকর শর্মা (রবীন্দ্রনাথ মৈত্র), দীপক চৌধুরী (নীহার ঘোষাল), নীলকণ্ঠ (দীপ্তেন্দ্র সান্যাল), পরশুরাম (রাজশেখর বসু), ভাস্কর (জ্যোতির্ময় ঘোষ), রঞ্জন (নিরঞ্জন মজুমদার), শ্রীবাসব (রাসবিহারী মণ্ডল), শ্রী ম (মহেন্দ্র গুপ্ত), শ্রীমতী (রাসসুন্দরী দাসী), সম্বুদ (অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত)। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের প্রচলিত নাম 'পরিব্রাজক' কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

রচনাগুলির ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে সর্বপ্রথম প্রকাশের তারিখের ভিত্তিতে। সেই তারিখটি জানা না থাকলে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশের কালটাকেই গণ্য করা হয়েছে। সেটাও না জানতে পারলে সঙ্কলয়িতা আনুমানিক প্রকাশকাল অবলম্বন করেছে। ১৫৯ ও ২৫৭ পৃষ্ঠায় "মুদীর দোকান, সন্দেশ (১৮৯৭)" এবং "রঙ্গ ও ব্যঙ্গ (১৯১৫), নোলক" উদ্ধৃতি দুটির নির্দেশিকা তুলনা ক'রে দেখুন: 'মুদীর দোকান' বইটি ১৯০৯ সালে মুদ্রিত হলেও তার অন্তর্গত 'সন্দেশ' রচনাটি এর বারো বছর আগে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল; ১৯১৫ সালে মুদ্রিত 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' নামক পুস্তকে 'নোলক' রচনাটা পাওয়া যায়; তার আগে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল কি না, জানা যায় নি। কোনো রচনা লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়ে থাকলে লেখকের মৃত্যুবর্ষটিই হয়েছে রচনা-সংস্থাপনের নিশানা [১২, ৬৬, ১২২...]।

বেশ কিছু গ্রন্থে প্রকাশকাল উল্লিখিত হয়েছে বঙ্গাব্দে কিংবা শকাব্দে (৫৪, ১০৮...), এমন কি সম্বৎ-এ (৬৯...); সমতারক্ষার খাতিরে বছরখানেকের হেরফেরের ঝুঁকি নিয়েও সেগুলিকে খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত ক'রে দেওয়া হল।

অধিকাংশ রচনার উৎস প্রামাণিক সংস্করণ; কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে গবেষকের পক্ষে অপরিহার্য 'সাহিত্যসাধক চরিতমালার' দ্বারস্থ হতে হল [১৩, ১৮, ২১...]। পাঠকের সুবিধার্থে কোনো কোনো রচনায় যতি ও উদ্ধৃতিচিহ্নের সংযোজনা ছাড়াও প্রায়শ দুটি সংশ্লিষ্ট শব্দকে হাইফেন-চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছু কিছু অপ্রচলিত বানান পরিবর্তিত হয়েছে। সম্ভাব্য মুদ্রণপ্রমাদ কোথাও কোথাও সংশোধিত হলেও অন্যান্য স্থানে অর্থবিভ্রাটের ঝুঁকি নিয়েও হস্তক্ষেপে বিরত থাকতে হল। স্থানাভাব কিংবা দুর্বোধ্যতা প্রভৃতি কারণে উদ্ধৃতির মধ্যভাগ থেকে কোনো বাক্য খণ্ডিত বা বর্জিত হয়ে থাকলে তিনটি ফুটকির দ্বারা বর্জিতাংশ নির্দেশ করা হয়েছে।

'বর্ণানুক্রমিক সূচিতে' প্রদত্ত লেখকদের জন্ম ও মৃত্যুকাল— বিভিন্ন অভিধান বিশ্বকোষ প্রভৃতি পুস্তক থেকে সংগৃহীত হওয়াতে— সম্পূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ-নির্ভরযোগ্যও নয়। কোনো কোনো লেখক তরুণ বয়সে (সতীশচন্দ্র ২২; সোমেন চন্দ্র ২২...), কোনো কোনো লেখক পরিপক্ক বার্ধক্যে (যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ৯৭, বিধুভূষণ বসু ৯৮...) মৃত্যুবরণ করেছেন। সঙ্কলনের অন্ত্যভাগে [৪৮০, ৪৮১, ৪৮৫] সমুদ্ধৃত তিনজন শহীদ-লেখক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার এবং আনোয়ার পাশা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণোৎসর্গ করেছেন।

উদ্ধৃতিগুলির রচনাকালেও লেখদের বয়সবৈচিত্র্য অল্প নয়; সঙ্কলিত উদ্ধৃতির রচনাকালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনোয়ারা বেগমের বয়স ছিল যথাক্রমে পনেরো, সতেরো ও কুড়ি বছর [১১৯, ১১২, ৪২৪]; ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, শশিশেখর বসু ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর বয়স ছিল আটাত্তর, আশি ও সাতাশি বছর [৪৮৪, ৪৫৫, ৪৭৩]।

উমেশচন্দ্র, চণ্ডীচরণ, চারুচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, যদুনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ, সতীশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ ও হরিদাস নামে তিনজন ক'রে লেখক আছেন; উপেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ নামে চারজন; কালীপ্রসন্ন নামে পাঁচজন। পদবীক্ষেত্রে ভূয়িষ্ঠতায় আসীন যথাক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায়, বসু, ঘোষ, রায়, মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— এই তিন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সমনামী ও অভিন্নপদবী লেখক আছে একজন ক'রে; আর আছেন অবশ্য (এস) ওয়াজেদ আলী এবং (মহঃ) ওয়াজেদ আলী [৪০, ৪০৪; ১৬৭, ১৬০; ২৭০, ২৮৮, ৩৭৩, ৩৬৮]।

আছেন ভ্রাতৃদ্বয়: রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য; কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণবিহারী সেন; অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ; মহেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত; আশুতোষ ও প্রমথ চৌধুরী [২৮, ৩৮; ৫৮, ১৪০; ২১৭, ২৯০; ৩৬৩, ১৮০; ১২৪, ২৪৬]। ভ্রাতৃত্রয়: পূর্ণচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শশিশেখর, রাজশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর বসু [৮১, ৭২, ৯৭; ৪৫৫, ৩২৩, ৩৭০]। ভগ্নীযুগল: ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপা দেবী [২৯৮, ২৮৩]। ভ্রাতা ও ভগিনী: বিভূতিভূষণ ভট্ট ও নিরুপমা দেবী [৩২১, ২৪৭]। পিতা ও পুত্র: উইলিয়ম ও ফেলিক্স কেরী; কার্তিকেয়চন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; হীরেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; মণিলাল ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়; আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় [৮, ১১; ১২২, ১০৩; ১৪২, ৪০৩, ২৮৭, ৪৭৬; ২৬৮, ৪২৩]। পিতা ও কন্যা: শিবনাথ শাস্ত্রী ও হেমলতা দেবী, চণ্ডীচরণ সেন ও কামিনী রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সীতা দেবী [১৮৯, ৩০২; ১৫২, ৩১৮; ২৩৯, ৩০৩]। পতি ও পত্নী: প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবী [২৪৬, ৪৭৪; ২৩৩, ১৪৮; ৪৬৭, ৪৪৬]। আরও আছেন চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃত্রয়ের ভ্রাতুস্পুত্র শচীশচন্দ্র [২৯৬] এবং চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবী [২৮২]। রায় পরিবারে আছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, তাঁর পুত্র সুকুমার রায় এব কন্যাযুগল সুখলতা রাও ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী [২১১, ৩১৩, ২৪৪, ৪৬৬]।

ঠাকুরবাড়ির আটাশজন লেখক 'গদ্যপরম্পরায়' গ্রথিত হয়েছে: দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র (দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ) এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণকুমারী [৫০; ১০১, ২৩৩, ১৯৭, ৩০৬; ১৬৪];

দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ [১২৮], সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী [১৯৩, ৪৭৩]; দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের পুত্রত্রয় হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ [১১২, ৩২৬, ১৫৯]; দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ [১১৯]; স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যাযুগল হিরণ্ময়ী ও সরলা [৩৩৮, ৪২৫]; রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং কন্যাযুগল মাধুরীলতা ও মীরা [৪৬৭, ২১৫, ৪৭৯]; দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ (দীপেন্দ্রনাথের পুত্র) এবং সৌমেন্দ্রনাথ (সুধীন্দ্রনাথের পুত্র) [৩৭২, ৪৪১]। ঠাকুরপরিবারের এই শাখায় চারপুরুষ লেখক: দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ।

এছাড়া আছেন দেবেন্দ্রনাথের অনুজ গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ [৬২]; গণেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথের পুত্রদ্বয় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ [৩৪১, ১৫১], তাঁদের ভগিনী বিনয়িনীর কন্যা প্রতিমা দেবী [৪৪৬] এবং অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় [৪৭৬]। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের তিনজন বংশধরও লেখক: তাঁর পৌত্রের পৌত্র নটেন্দ্রনাথ [৯৪], তাঁর প্রপৌত্রের প্রপৌত্র প্রবোধেন্দু [৩৯৯] এবং রমেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা লীলা দেবী [৩১৬]।

'গদ্যপরম্পরায়' সঙ্কলিত যে-সমস্ত রচনা একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে (যেমন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এগারোটি উদ্ধৃতি), সেগুলো দৈর্ঘ্যের সমতা ছাড়া [৩১৬-৩১৭; ৩১৮-৩১৯] আর-কোনো বিশেষ ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয় নি। তবে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল সরকারের ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত দুটি বিদ্যাসাগর-চরিত [১৫৪-১৫৫], নবীনচন্দ্র সেন এবং গিরিশচন্দ্র সেনের ১৯০৭ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীর বাল্যস্মৃতি [২০৪-২০৫], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গোকুলচন্দ্র নাগেব ১৯২২ সালে প্রকাশিত সমধর্মী 'লিপিকা' ও 'রূপ-রেখার' কাব্যিক আমেজের শিল্পিত গদ্য [৩০৬-৩০৭]।

উদ্ধৃতিনির্বাচনে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি খুঁজতে গেলে নিরাশ হতে হবে। কোনো কোনো লেখা নির্বাচিত হয়েছে অতিপরিচিত ব'লে: ছাত্রপাঠ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'গগন-পটুয়া' কিংবা এস. ওয়াজেদ আলীর "ভারতবর্ষ", অবনীন্দ্রনাথের "শকুন্তলা" কিংবা সুকুমার রায়ের "হ য ব র ল" [১১৬, ৩৭৩; ১৫১, ৩১৩]... কোনো কোনো উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে যেন ব্যতিক্রম হিসেবে: এত লেখকের এত বঙ্কিমানুকৃতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতিটা [৭২] অবঙ্কিমীয় আটপৌরে মেজাজে ভরপুর; এদিকে "লিপিকার" 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' [৩০৬] বাক্‌শৈলীর গুণে কাব্যসঙ্কলনেও গৃহীত হয়েছে। "লঘু-গুরু" [৩২৩] অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কজ্জলী-গড্ডলিকার পরশুরাম তথা রামায়ণ-মহাভারতের রাজশেখর বসুর প্রতি পক্ষপাত-প্রদর্শনের আশঙ্কায়। কয়েকটি লেখার সাহিত্যগুণ নামমাত্র (কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ১৪; রামনাথ বিশ্বাস ৩৭৪...); গ্রহণের কারণ একমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য।

অন্যান্য বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর একটিমাত্র সুদীর্ঘ (তা-ও খণ্ডিত) বাক্যের উদ্ধৃতি [২৬৯]; রাসবিহারী মণ্ডল এবং মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় [৪৭৪, ৪৭৬] ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সরল বাক্যের ছড়াছড়ি এবং দাঁড়ি ব্যতিরেকে অন্যান্য যতিচিহ্নের প্রায় সমূহ বর্জন। ব্রজবল্লভ রায়ের বর্ণানুপ্রাসিক কাহিনীটি [২৩২] শব্দচাতুর্যে পাঠককে কৌতুক জোগাবে। অসিতকুমার হালদারের রূপকথার সাবলীল ভাষাস্রোতে বাহিত হতে হতে তিনি কি বুঝবেন, লেখাটায় একটিও যুক্তাক্ষর নেই?

চলতি ভাষায় শ-খানেক নিদর্শনের সিকিভাগই ১৯২৫ সালের আগে প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীতে চলিত ভাষায় লিখেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪০, ৫২, ৫৬, ৬৩, ৬৯, ১৪৮, ১৫১]। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রকাশিত 'চলিত' নমুনার রূপকারদের নাম: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুখলতা রাও, প্রমথ চৌধুরী, সরযূবালা দাসগুপ্তা, অনুরূপা দেবী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রকুমার বসু, সীতা দেবী, নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোকুলচন্দ্র নাগ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, সুভাষচন্দ্র বসু। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং দেবেন্দ্রনাথ দাসের রচনায় লক্ষিত হবে সাধু-চলিতের মিশ্রণ [১১৭. ২১৬]।

কথাসাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধুভাষায় রচিত সংলাপ বিংশ শতাব্দীতে বিরল [ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৮; শরৎকুমার রায় ২২৮]। উনিশ শতকের উপান্ত্য দশক থেকে কথোপথনে মিশ্র ভাষার ব্যবহার দেখা যায়: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমারী চৌধুরানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, যতীন্দ্রমোহন সিংহ... [৯৭, ১০৫, ১১৮, ১৩৯, ১৯৭ ২০৭, ২১৩]। সাধু ভাষায় রচিত গল্পোপন্যাসে বিশুদ্ধ চলিত কথাবার্তার প্রথম নিদর্শন এই পুস্তকে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে: যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [১৩৬]; তারপর আছেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, মাধুরীলতা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দুর্গাদাস লাহিড়ী... [১৯৩, ২০১, ২১৫, ২২৭, ২৩১]। সাধু কাঠামোয় চলিত সংলাপের সেরা দৃষ্টান্ত যাঁদের রচনায় পাওয়া যেতে পারত, তাঁদের অনেকেরই সংলাপহীন গদ্যাংশ এই সঙ্কলনের অন্তর্ভূত [শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মানিক, রাজশেখর বসু...]।

অনেক লেখকের শ্রেষ্ঠ গদ্যের নমুনা— আমাদের ক্ষেত্রে কমবেশি আড়াই শো শব্দের সুখপাঠ্য উদ্ধৃতি— তাঁদের শ্রেষ্ঠ পুস্তকে পাওয়া যায় না: একাধিক কথা-সাহিত্যিক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে নয়, হ্রস্বকায় ছোট গল্পেই স্বভাবত অধিকতর গদ্য সচেতন ব'লে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের অপেক্ষাকৃত-অপরিচিত গল্পাংশই উদ্ধারযোগ্য বিবেচিত হল।

উপন্যাসের অনেক উদ্ধৃতি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত হয়েছে। তার কারণ এই যে দীর্ঘ রচনার প্রথম পৃষ্ঠাগুলিতে অধিকাংশ লেখকের রচনাশৈলীর লাবণ্য ও সজীবতা উজ্জ্বলতর ভাবে ধরা পড়ে। এদিকে একাধিক রচনাকর্মের প্রথম পরিচ্ছেদ বর্ণনাত্মক ভূমিকামাত্র, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই ঘটনা-সংঘাতের শুরু। পূর্ণাঙ্গ লেখা অল্প হলেও [৫, ৮, ৩০৬, ৩০৭] স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্ধৃতির অভাব নেই [২, ৩, ৬, ৭, ১২, ৩৬৩]।

এই সঙ্কলনে একাধিক লেখকের শুধু নিজস্ব রচনা নয়, অন্যের রচিত তাঁরই জীবনী বা তৎসম্পর্কিত আলোচনা ও স্মৃতিচিত্রও স্থান পেয়েছে: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, অঘোরনাথ গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, মোহিতলাল মজুমদার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় [৫৮, ৯৪, ৯৬, ১৪৩, ১৬৭, ১৬৯, ২৮৬, ৩৯৭, ৪২২, ৪৬৩, ৪৭০]; বিদ্যাসাগর [১৫৪, ১৫৫], শিবনাথ শাস্ত্রী [৩০২, ৪২৬, ৪৬৬], দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [২৩৩, ৩১৭, ৪৬৭], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [২৩৯, ৩১৮, ৩৮২, ৪০৩, ৪৩৫, ৪৫০, ৪৭৩, ৪৭৯]।

অন্যান্য আলোচিত চরিত্রের মধ্যে আছেন রাম, অশোক, নানক, বুদ্ধ [৩১, ১৪০, ২২৮, ৪৬০]; বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ, ওমর খৈয়ম [১৪৫, ৩০, ৩১২]; হরিদাস, শিবাজি, সারদাদেবী [১৫৬, ৩৬২, ২৩৭]। এছাড়া সিদ্ধার্থ, শঙ্কর ও নিমাইয়ের গৃহত্যাগ [৯৫, ১৭২, ১৪৭]।

ব্যক্তিগত সাহিত্যের মধ্যে আছে প্রার্থনা [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০, বিপিনচন্দ্র পাল ২২৫]; স্বগতোক্তি (সরযূবালা দাসগুপ্তা ২৫০); পত্রালাপ (কেশবচন্দ্র সেন ৫৮, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১০৩, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২১০)। আত্মচরিত কিংবা স্মৃতিকথা লিখেছেন একাধিক লেখক [১২২, ২০৪, ২০৫, ২১৬, ৪৪১, ৪৫৪, ৪৭১...] ও লেখিকা [৮৭, ২৪০, ৩২৮, ৩৫৯, ৪৪৬...]। কারাবাসের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, অমলেন্দু দাশগুপ্ত [২১৭, ২৯০, ২২৯, ৪৩৩]। ভাই লিখেছেন "দাদার কথা" [৩৪৫]; কন্যা লিখেছেন পিতার কথা [৩০২, ৪৭৯]; ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী লিখেছেন পিতৃব্যের কথা [৪৬৭, ৪৭৩]। রামকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা লিখেছেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং হারীতকৃষ্ণ দেব [১৮৩, ৩১৭, ৩০৪, ৪৭২]।

ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন গবেষক প্রবোধ বাগচী ও পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস [৩৪৯, ৩৭৪]; বিলেত, আমেরিকা ও প্যারিসে লব্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কুমার সরকার [১০৬, ৩৪৩, ৩৭৯]।

তিনটি নাটক অন্তর্গত হয়েছে: রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনসর্বস্ব, দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপ-আদিত্য [৩৩, ৫৬, ১৮৭]।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অমৃতলাল বসুর নাটকেতর রচনা গৃহীত হয়েছে [১০৩, ১৮৩, ৩৪২]। অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী এবং অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যও সঙ্কলনে স্থান পেয়েছেন।

প্রবন্ধসাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে: সাহিত্যতত্ত্ব [১১৫, ১৯০, ২৫৬, ৩৫৫, ৩৬৬, ৩৭৫, ৩৮৩, ৪১৫] ও কাব্যালোচনা [৪২, ৫৯, ১২৪, ৪৫৬]; বাংলা ভাষা [১৮, ১৯, ২৪, ৮৮, ১৮০, ৪৮৪] ও বাংলা সাহিত্য [২৯, ২৪৬, ২৬৮, ৩৫১, ৪০২]; বাংলা নাটক ৩৯৬, রূপকথা ৪৩৪, বাউল ৪৬২, ময়মনসিংহগীতিকা ৪৪৩, চন্দ্রশেখর এবং নিমচাঁদের চরিত্র ১২৩, ১৭৪]; দর্শন [১৬০, ১৬১, ১৬৫, ২২৫, ৩৫০] ও ধর্ম [৬২, ২৫৮, ৪৪০, ৪৬৩]; সমাজতত্ত্ব [৬৭, ৮২, ১০২, ২৬৪, ৩৭৭, ৩৮৬, ৪৩০] ও সামাজিক সমস্যা [পৌত্তলিকতা ২১, ১৬৬; স্ত্রীশিক্ষা ১৩, ২২, ৫৫, ও নারীকল্যাণ ৬৫, ৯৯, ৩৮৭; সহমরণ ১০ ও বিধবাবিবাহ ৭৪]; বিজ্ঞান [১৭, ৫১, ৪২২, ৪৩৭, ৪৮৪]; জাতীয়তাবাদ [১৩৮, ২২৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৭৫, ৩০৫, ৩৩৫]।

সমাজচিত্র আছে একাধিক: ১৫৩, ১৯১, ৩২০, ৩৪২; দুর্গোৎসব ও বিবাহোৎসব [৬৩, ১০৫; ৩০৮]; জমিদার-বাড়ির বহির্বাটী ও অন্তঃপুর [৩৯, ৭২]; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, বর্ষা, প্লাবন, সাংসারিক অনটন, নদীতে ঝড় [১২০, ১২৬, ৪০৯, ১৩৪, ৩৪৮, ৪০৪, ১০৭]।

ব্রাহ্মসমাজ একাধিক রচনার উপজীব্য: ৫৭, ৩২৬, ৪২৬; বিবাহ-সমস্যা ৭১, ২৭৪; নেতৃত্ব-বিরোধ ৫৮, ১৬৯। মুসলমান ইতিহাস ও সংস্কৃতিও বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হতে দেখি: ১০৯, ১৫৭, ২৫২, ২৬২, ৩৬৪; মহম্মদের জীবনী ১২৮, ২০৩, ৩৫২, ৪২১; ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ১৭৩, ৪৮০; শাহ্জাহানের শোক ২৯৫; সিরাজের মৃত্যু ৪৫২; মুসলমান পারিবারিক চিত্র [৩১৯, ৩৫৯, ৩৭১]।

রম্যরচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুখ চেনা' জ্যোতির্ময় রায়ের 'শব্দক্ষুধা', সতীশচন্দ্র ঘটকের "অয়ি নাসাগ্রদোলক মৌক্তিক-বিন্দু!" সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার নাম বংশযষ্টি" [১৯৭, ৪১৭, ২৫৭, ২৮৫]।

হাস্যরস সর্বত্র পাওয়া যায়, প্রধানত সঙ্কলনের শেষাংশে: ৩৮, ৪৭, ১৮২, ২১২, ২৭৬, ৩৬১, ৩৬৮, ৪১৪, ৪১৬ ৪৩১, ৪৩৮, ৪৪৫, ৪৭৩... ব্যঙ্গরচনারও অভাব নেই [১৫, ১০১], বিশেষভাবে স্বর্গীয় প্রহসন-জাতের দেবদেবীর কাহিনী [৯৩, ২৬৩, ২৭১, ৩১১]।

সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'অবলাবন্ধু' এবং 'রসরাজ' পত্রিকার যথাক্রমে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সম্পাদকীয়; এছাড়া সাময়িক সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশের' একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে [৬৫, ৩৭, ৫৩]। উত্তমর্ণ অন্যান্য পত্রিকার নাম যথাস্থানে উল্লিখিত হয় নি, যেমন— সর্বশুভকরী পত্রিকা ২২, সংবাদ প্রভাকর ৩০,

মাসিক পত্রিকা ৩৪, বিবিধার্থ সংগ্রহ ৪২, বামাবোধিনী পত্রিকা ৫১, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৬২, আর্যদর্শন ১১২, দারোগার দপ্তর ১১৩, নব্যভারত ১১৫, নবজীবন ১১৬, ভারতী ও বালক ১২৪, সাহিত্য ১২২, ১৪২, ১৭০, প্রদীপ ১৬৭, সন্ধ্যা ২০২, ভারতী ২১৫, বসুধা ২৩২, প্রবাসী ২৩৯, ৩৮৩, প্রবাহিনী ২৫৩, মানসী ২৫৪, উত্তরা ৩৩১, শিশুসাথী ৩৩২, সাওগাত ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১, ৩৬৫, বিচিত্রা ৩৪৯, উপাসনা ৩৬৬, মাসিক বসুমতী ৩৭৮, ভারতবর্ষ ৩৮৫, বুলবুল ৩৮৬, গাঙ্গেয় ৪৬৩, দেশ ৪৭২, সবুজ পত্র ৪৮৬...

অনুবাদকর্ম থেকে উৎকলিত হয়েছে বাইশটি পৃষ্ঠা। অনেকগুলির মূল রচনা সংস্কৃত: গোলোকনাথ শর্মা, হিতোপদেশ ৩; হরপ্রসাদ রায়, পুরুষপরীক্ষা ৯; তারাশঙ্কর তর্করত্ন, কাদম্বরী ৩২; গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দশকুমার (পূর্বপীঠিকা) ৩৫; হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামায়ণ ৫৯; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমারসম্ভব ১৪২; প্রবোধেন্দু ঠাকুর, কাদম্বরী (চলিত ভাষায়) ৩৯৯; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাভারত ৪০০। পালি থেকে তর্জমা: জাতক (ঈশানচন্দ্র ঘোষ ২৬৫)। ফার্সি থেকে: চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইসিহাস' [৯] এবং দুটি আত্মজীবনী: আফগান আমির চরিত (আবু নাসের সইদুল্লা ২৩৭) এবং জাহানারার আত্ম-কাহিনী (মাখনলাল রায়চৌধুরী ৪৪২)। ইংরেজী থেকে অনূদিত হয়েছে ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট, তারিণীচরণ মিত্র ৫; রাবিন্‌সন ক্রুসো, জান রাবিন্‌সন ২৬; বেকনের সন্দর্ভ, রামকমল ভট্টাচার্য ২৮; সৈয়দ আমীর আলী রচিত 'আরবজাতির ইতিহাস', রেয়াউদ্দিন আহমদ ২৪৯। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিগুলির [৩৬, ৪১, ৪৫৭] মূল রচনা ফরাসি: বের্নার্দ্যদ্‌স্যাঁপিয়ের-এর পল এ ভির্জিনি; ফেনলোঁ-র তেলেমাক্, ভের্কর্-এর ল্য সিলাঁস্ দ্য লা মের (সমুদ্রমৌন)। শুভময় ঘোষ রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন ইভান ইয়েফ্রেমভের গল্প [৪৬৮]। প্রিয়রঞ্জন সেন গুজরাটি থেকে অনুবাদ করেছেন কাকাসাহেব কালেলকরের 'জীবনলীলা' [৪৭৭]। সুরেন্দ্রনাথের উদ্ধৃত গল্পাংশটি জাপানি [১৯৩]।

আন্তোনিও দো রোজারিও

—এ-অবতার যে কহিলা, শ্রীরাম কি-কারণ অবতার হইয়াছিলেন?

—রাবণবধের কারণ। সে সকল দেবতারে কষ্ট দিত, ধর্ম নষ্ট করিত।

—ভালো। সকল চরিত্র কহিবা রামের; তবে বুঝাইবা কেমতে পরমব্রহ্ম তিনি।

—রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা; আর দুই পুত্র লব আর কুশ; তাহান ভাই লক্ষ্মণ; রাজ্য অযোধ্যা। বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন। তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা। সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুর্ধ করিলেন। বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সুগ্রীবেরে দিলেন; সে বালির ভাই, তাহারে রাজখণ্ড দিলেন। বিস্তর রাক্ষস বধ করিলেন, কুম্ভকর্ণ বধিলেন, ইন্দ্রজিৎ বধিলেন, পশ্চাতে রাবণ বধিয়া সীতারে আনিলেন... তাহার পর সীতারে আনিয়া বিস্তর পরীক্ষা দিলেন যে, রাবণে নি এহারে পরশ করিয়াছে। তাহাতে পরীক্ষাতে সীতা সাঁচা হইলেন, তথাচ রামে তাহানে প্রত্যয় নহিলো। আর রামের দুই পুত্র লব আর কুশ সঙ্গে রামের বিস্তর যুর্ধ করিলেন পুত্র না চিনিয়া... পশ্চাতে সকল প্রত্যয় হইল। শেষ রাজখণ্ড অযোধ্যাতে করিলেন। পশ্চাতে তাহান পরলোক হইল, তাহার আত্মা পরমেশ্বরেতে মিশিল গিয়া... তুমি এ-সকল কথারে কি বল? ইনি পরমেশ্বর-অবতার নহেন?

—এমত মুনিষ্যেরে পরমেশ্বর কহে? কামাতুর, কুবুদ্ধি, অবিচারী, হিংসুক, অজ্ঞান, গৃহস্থ, বীর্যের শরীরনাশী ইত্যাদি আর যত! এমতশীল পরমেশ্বরের শরীর ধরিতে না থাকে। এহানে কহি রাজা অযোধ্যার, সূর্যদেশের, পরমব্রহ্মের সৃষ্টি। যেমত কত কুটি রাজা আর-আর জর্মিয়াছিলেন, তেমতে ইনিও এক রাজা। সেকালের লোকে বর্বর ছিল, রাজারে পরমেশ্বর কহে!...

—তবে কি যেমত আর-আর রাজা সকল, তেমত রাজা রাম?

—হ্যাঁ, ইহাতে সন্দেহ না করিবা, কেন গৃহস্থ করিয়াছেন যেমন তুমি আমি; যুর্ধ যেমত রাজা আর-আর সকলে করিয়াছে; কামাতুর যেমত আর-আর নরলোক; ভ্রম যেমত সকল পাপী মুনিষ্যের; ক্রোধ যেমত রাজা সকল করিয়াছে। এবং আর-আর সকলি তোমাতে জ্ঞাপন আছে: ঔষধের কারণ পর্বত আনিয়াছিলেন আপনার প্রাণ বাঁচাইতে! আর কত কহিব? শরীর ধ্বংস হইল, তাহাতে তুমি জান।

—ভালো; এ-সকল দোষ যাহার থাকে, সে পরমেশ্বর নহে।

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ

মানোয়েল দা আস্‌সুম্পসাওঁ

ফ্লান্দ্রিয়া দেশে এক সিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল। লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল, এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতামাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌঁছিল। তাহার এক বইন আছিল; তাহারে পন্থে লাগাল পাইল; ভাইয়ে বইনেরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল, "তুমি কি আমারে চিন?" "না, ঠাকুর," বইনে কহিল। সে কহিল, "আমি তোমার ভাই।" ভাইয়ের নাম শুনিয়া উনি বড় প্রীত হইল। ভাইয়ে ঘরের খবর লইল, জিজ্ঞাসা করিল, "আমারদিগের পিতামাতা কেমন আছেন?" বইন কহিল, "কুশল।" দুইজনে কথাবার্তা কহিল। পরে বইন আপনের ঘরে গেল, ভাইয়েও পিতামাতার ঘরে যাইতে লাগিল। তাহার পিতা লাগাল পাইয়া, পুত্র অচিনা হইয়া পিতার কাছে বাসা চাহিয়া কহিল, "ঠাকুর, তুমি কি এহি রাত্রে আমারে বাসা দিবা? যে-খরচ হয়, তোমারে দিবাম।" পিতায় অচিনা পুত্রেরে বাসা দিল; তাহার ধন দেখিয়া ধনের লালসে তাহারে রাত্রে বধিল, এবং তাহারে মাটি দিল, ধন লুকাইয়া রাখিল। আর-দিন বড় প্রাতঃকালে পিতামাতার বাড়িতে বইনে গেল। পিতার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ভাইয়ে কোথায় গেল?" পিতায় উত্তর দিল, "তোর ভাই আসিল না, আমরা দেখিলাম না তাহারে।" ঝিয়ে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, "তবে কোথায় গেল? আমি কইল্ল রাত্রে তাহারে দেখিলাম হাঁটিয়া যাইতে; তাহার লাগাল পাইলাম, আমার লগে কথাবার্তা কহিল।" এহা শুনিয়া পিতা কান্দিতে লাগিল; মাগেরে কহিল, "কি করিয়াছি আমরা?" আমারগো পুত্র বধিলাম; অভাগিয়া হইয়াছি পৃথিবীর মধ্যে!" এমত ধরাণ কান্দিতে কান্দিতে দুইজনে মাগ-ভাতার অভরসা হইল। অভরসা হইয়া যেন পাতকে আর-পাতক জর্মে: পিতা আপনে আপনেরে গলায় ফাঁসি দিয়া মরিল; মাতায় ছুরি দিয়া আপনে মরিল, এবং দুইজনে নরকে গেল।"

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (১৭৪৩), পুথি ১, তাজেল ৩

গোলোকনাথ শর্মা

মন্দার নাম পর্বতে দুর্দান্ত নামেতে এক সিংহ থাকে। সেই সিংহ সর্বদা অন্য পশুরদিগকে বধ করে। তারপর এক দিবস সকল পশু মিলিয়া সিংহের কাছে নিবেদন করিল: "হে মৃগেন্দ্র, কি-কারণ আপনি সমুদায় পশুকে এককালে বধ করেন? যদি আপনি সদয় হয়েন, তবে আপনি মহাপ্রসাদ আমারদিগকে দেউন, আমরা প্রত্যহ মহাশয়কে এক এক পশু আনিয়া দিব।" তাহা শ্রবণ করিয়া সিংহ বলিলেন, "আচ্ছা, যদি ইহাতে তোমাদের ভাল হয়, তবে তাহা কর।" সে-দিবস হইতে এক এক পশু প্রত্যহ তাহার কাছে যায়; তিনি সুন্দর ভোজন করেন। এমতে কতক দিবস গত হয়। কদাচিত এক বৃদ্ধ শশক তাহার বার উপস্থিত হইলে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ত্রাণহেতু বিনয় করে জীবনের নিমিত্ত; যদি আমি মরিব, তবে সিংহের বিনয়তে আমার কি করিবে?" ইহা বলিয়া সে অল্প অল্প গমন করিতে লাগিলেন; "ভাল, দেখি কি করিতে পারি আর ক্রোধ করিয়া কি করিতে পারে? এমনেও মরিব, অমনেও মরিব, তবে কি-কারণ সকালে যাব?" এই বিবেচনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল; সিংহ ক্ষুধায় বড় পীড়িত হইয়াছে, দেখে যে, শশক আসিতেছে। উহাকে দেখে জ্বলে গেল; বলিতেছে, "হাঁ রে বেটা, দেখ দিখি; এক বেলা হইল, এখন দেখা নহে! তুই বড় অল্পে অল্পে আসিতেছিস! তখন সকল বেটানি একযোগ হইয়া করার করিয়া গেল; এখন দেখ, কোন বেটা আর আসিতে চাহে না! থাক, আজি সমস্তকে বিনাশ করিব! এদিকে আয়, ঠেটা বেটা! কেন মরণের বড় ভয় হইয়াছে? আর ভয় করিলে কি হবে?" সে বলিতেছে: "মহাশয়, আমার কিছু অপরাধ নাহি; আর-এক সিংহ পথে বলে ধরিয়াছিল; আমি তাহার কাছে কিরা করিয়া আসিয়াছি যে, 'আমি পুর্নবার তোমার কাছে আসিব'। ইহা বলিয়া স্বামীকে নিবেদন করিতে আসিলাম; এখন তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা কর।" সিংহ কোপেতে কহিতেছেন, "শীঘ্র চল, আমাকে দেখাইয়া দেগা কোথায় আছে সে-দুরাত্মা।" তারপর শশক তাহাকে এক গভীর কূপের কাছে লইয়া গিয়া বলিতেছে, "মহাশয়, এই দেখ।" তাহার কথাক্রমে সিংহ আপনার ছায়া দেখে অত্যন্ত মত্ত হইয়া ডাক ডোক ছাড়িয়া তাহার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলে মরিয়া গেল। অতএব আমি বলি· বুদ্ধি যাহার, বল তাহার এই।

হিতোপদেশ (১৮০২), সুহৃদ্‌ভেদ

রামরাম বসু

এক সময় ভৃগু মহামুনির যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ হইলে সমস্ত দেবগণের আগমন। দক্ষ প্রজাপতি ইত্যাদি সমস্তই সভাস্থ। এই কালে মহাদেবের আগমনে সকলেই উত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করিলে প্রজাপতি দক্ষ অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া মহাদেবের প্রণাম না করাতে উত্থান করিলেন না, এবং আলাপও না করিয়া অন্য লোকের সহিত শিবনিন্দায় প্রবর্ত্ত। সেই হইতে দক্ষের দ্বেষ-বিদ্বেষ এবং শিবনিন্দা সদা। পরে দক্ষ মহাকোপে নিজালয় যাইয়া আপনি যজ্ঞারম্ভ করিলেন। বিবেচনা এই যে, আমার যজ্ঞে মহাদেবের নিমন্ত্রণ করিব না, ইহাতেই তাহার অপমান হইবেক। এই মতে যজ্ঞারম্ভ করিয়া সমস্ত আহ্বান করিলেন, মহাদেব তাহার যামাতা, তাহার কন্যা মহাশক্তি সতী শিবের ঘরনী, তথাচ তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া রোষযুক্ত সমস্তই বিস্মৃত: কন্যা কি যামাতা কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলেন না।

এইমতে দক্ষের যজ্ঞ হইতেছে— ইতিমধ্যে সতী পিতৃগৃহে উৎসব শুনিয়া উৎকণ্ঠচিত্ত হইয়া অত্যন্ত কাতরা। সতী নিবেদন করিতেছেন, "মহাদেব প্রভো, পিতৃগৃহে মহোৎসব, আমার চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। পিতৃগৃহে যাইতে ইচ্ছা; দেখ প্রাণনাথ, চিরকাল গত হইল মঙ্গলসূত্র করে তোমার ঘরে আসিয়াছি, পরে কখন পিতৃগৃহে যাই নাই এবং মাতাপিতাকে দেখি নাই। আমি আমার মাতার কন্যা, মাতা আমাকে বড় ভালবাসেন, আমিও সেইমত। আমার ইচ্ছা পিতৃগৃহে যাইতে তুমি আজ্ঞা কর। চরণে ধরিয়া সাধি, আজ্ঞা কর, গুণনিধিঃ পিতৃগৃহে যাই, প্রাণনাথ। পিতার সম্মান পাব, ভগ্নিগণে সম্ভাষিব, মায়ের রন্ধনে খাব ভাত।"

এ-কথা কহিয়া মহাদেবের চরণে ধরিয়া সাধনা করিলে মহাদেব বিমর্ষ চিত্তে কহিতেছেন, "শুন, তোমার পিতা পাষণ্ড, আমাকে মানে না। দেখ, সে আমাকে অমান্য করিবার নিমিত্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিল না। বিনা নিমন্ত্রণে তুমি গেলে সম্মান পাবা না, এবং আমার নিন্দাতে তোমার দুখ হইবেক, পশ্চাৎ তাহার বারণ হইবেক না। অতএব অনিমন্ত্রিত স্থানে যাওয়া উচিত নহে।" সতী কহিতেছেন, "প্রাণনাথ, আপনার মাতাপিতার নিমন্ত্রণ-অনিমন্ত্রণে কি হয়? তাহারদের কাছে পুত্রকন্যার সম্মান-অসম্মান কি? আমার পিতা আমাকে বড়ই ভালবাসেন; আমি বুঝি, আমার অসম্মান করিবেন না।"

লিপিমালা (১৮০২)

তারিণীচরণ মিত্র

খেঁকশিয়ালী যদ্যপি কৌতুকাপেক্ষে প্রায় চাতুরিতে অধিক রত, তত্রাপি একবার দৃঢ় মনস্থ করিলেক যে, তাহার প্রতিবাসি মাণিকজোড়ের সহিত পরিহাস করে। অতএব তাহাকে বড় যত্ন করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেক। মাণিকজোড় ভোজনস্থানে আসিয়া দেখিলেক, সম্যক নানাপ্রকার ঝোল চওড়া চেপটা পাত্রে রাখিয়াছে, যাহাতে সে কেবল আপন ঠোঁটের আগামাত্র ডুবাইতে পারে, কিন্তু কৃতসাধ্য ক্ষুধা নিবর্ত করিতে পারে না। খেঁকশিয়ালী অতি শীঘ্র চপর চপর করিয়া খাইতে লাগিল, আর ক্ষণে ক্ষণে আপন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিল, "আমার এ পুক্তিভোজন তোমাকে কেমন লাগে? আমি এই চাহি যে, সকল দ্রব্য তোমার মনের মত সুস্বাদু হয়; কিন্তু তুমি রাখিয়া রাখিয়া খাইতেছ দেখিয়া বড় ক্ষোভিত হই।" মাণিকজোড় বুঝিলেক যে, খেঁকশিয়ালী রহস্য করিতেছে; তাহার কথায় কিছু মনোযোগ করিলেক না, বরং কহিলেক, "তোমার সমস্ত খাদ্য আমাকে বড়ই ভাল লাগিল।" এবং বিদায়কালিন খেঁকশিয়ালীকে মাণিকজোড় আপন বাটী যাইবার জন্যে এমন ধরিলেক যে, সে শীলতাক্রমে 'না' বলিতে পারিলেক না। যখন সেই নিয়মিত দিন পৌঁছিল, খেঁকশিয়ালী আপন কথাক্রমে তাহার বাটী গেল। কিন্তু যখন অন্ন উপস্থিত হইল, খেঁকশিযালী আপন বড় লাঘবতায় দেখিলেক, ছোট মুখের লম্বা লম্বা ঘটে কুটি কুটি মাংস ভরা রাখিয়াছে। সেই সকল খাদ্য— যাহার স্বাদ লওনের যোত্র তাহার ছিল না— দেখিয়া কেবল লুব্ধ হইয়া রহিল। মাণিকজোড় আপন লম্বা ঠোঁট তাহার মধ্যে ফেলিয়া আপন উদর যথেষ্ট পরিপূর্ণ করিলেক। পরে খেঁকশিয়ালীর দিগে— যে এক ঘড়ার উপর-পীঠ, যাহাতে কিছু ঝোল পড়িয়াছিল, তাহা বড়ই ইচ্ছাপূর্বক চাটিতেছিল— ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক, "আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম যে, তোমার ক্ষুধা বিলক্ষণ আছে। আমার বাসনা এই: যেমন আমি সে-দিবস তোমার নিমন্ত্রণ খাইয়াছি, তুমিও প্রসন্ন হইয়া খাও।" খেঁকশিয়ালী এই কথায় মাথা হেঁট করিলেক, এবং বড় নিরানন্দ দৃষ্ট হইল। মাণিকজোড় কহিলেক, "না, না, এ-বিষয়ে বিরক্ত হইও না: যাহারা রহস্য সহিতে না পারে, তাহারদিগের উচিত নহে যে কাহারো সহিত পরিহাস করে।"

ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩), সপ্তম কথা, খেঁকশিয়ালী ও মাণিজোড়ার

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্মী সর্বদা স্থিরা হইয়া হরি হোড়ের নিবাসে বসতি করেন। বহুকাল এইরূপে গত হইল, হরি হোড়ের পরিবার অতি বিস্তর, সর্বদা বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত: বাটীর মধ্যে হাটের কোলাহলের ন্যায়। লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন, "এই বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল না!... অতএব আমার পরম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদার, তাহার বাটীতে গমন করি।" ইহাই স্থির করিয়া হরি হোড়ের বাটী হইতে ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে চলিলেন। পথের মধ্যে স্মরণ হইল, নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে সে আমার অনেক তপস্যা করিয়াছে, তাহাকে সাক্ষাৎ দিয়া বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে যাইব। এই চিন্তা করিয়া পরম সুন্দরী এক কন্যা হইলেন, কুক্ষিদেশে একটি ঝাঁপি লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন, "ঈশ্বরী পাটনী, আমাকে পার করিয়া দেহ।" ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক, "মা, তুমি কে আগে আমাকে কহ, পশ্চাৎ পার করিব।" ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরী, আমি ভবানন্দ মজুদারের কন্যা, শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম, সেখানে বিবাদের জ্বালাতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না, এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি।" ইহা শুনিয়া ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক, "মা তুমি মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নহ, তাহার কন্যা হইলে এই বেশে একাকিনী কেন যাইবা? কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে, তুমি লক্ষ্মী; মজুমদারকে কৃতার্থ করিতে গমন করিয়াছ। আমি অতি দুঃখিনী, আমাকে আত্মপরিচয় দিউন।" তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন। ঈশ্বরী পাটনী পরম আহ্লাদে নৌকা শীঘ্র আনিয়া কহিলেক, "মা, নৌকায় বৈশ।" লক্ষ্মী নৌকায় বসিয়া দুইখানি পদ জলে রাখিলেন। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক, "মা গো, জলে নানা হিংস্রক জন্তু আছে!... পা দুইখানি তুলিয়া বৈশ।" তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন, "পদ কোথায় রাখিব?" ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক, "পা দুইখানি জলসেচনির উপরে রাখ।" বিশ্বমাতা ইহা শুনিয়া জলসেচনিতে পদ রাখিলেন। জলসেচনিতে পদ স্পর্শ হইতেই সেচনি স্বর্ণ হইল। ঈশ্বরী পাটনী দেখে, সেচনি সোনা হইল। তখন অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেক, "ইনি সামান্যা নন, জগৎজননী, ছল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন।" ঈশ্বরী পাটনী লক্ষ্মীর পদে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বহুবিধ স্তব করিলেক। তখন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরী পাটনী, তুমি আমার অনেক তপস্যা করিয়াছ; আমি বড় বাধ্য আছি, বর যাঞ্চা কর।" ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক "মা গো, তোমার কৃপায় আমার সকল পূর্ণ হইল। যদি বর দিবেন, তবে এই বর দেওন যে, আমার সন্তান যাবৎ থাকিবেক, কেহ দুঃখ না পায় এবং দুগ্ধ ভাত খাউক।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)

চণ্ডীচরণ মুনশী

এক দিবস সেই দোকানির স্ত্রী অট্টালিকার উপরে বসিয়াছেন, ইতিমধ্যে এক যুবা পুরুষ সেই স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইল। সেই স্ত্রী তাহা বুঝিয়া যুবা ব্যক্তিকে সঙ্কেতে কহিলেক যে, "তুমি অর্ধরাত্রিতে আমার বাটীতে ঐ বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিবা; পরে আমিও সেই স্থানে যাইয়া দুইজনে প্রেমালাপ করিব।" অনন্তর সেই পুরুষ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রের সময় সেই স্ত্রীর কথানুসারে সেই বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিল। তারপর সেই স্ত্রী সে-পুরুষের নিকট পঁহুছিয়া দুইজনে এক শয্যাতে শয়ন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছিল, এই সময় সেই দোকানির পিতা কোন কার্যের কারণ বাটীর বাহির যাইতেছিল, ইতিমধ্যে আপন পুত্রবধূ অন্য পুরুষের সহিত এক শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, ইহাই দেখিয়া সেই স্ত্রীর এক পায়ের নূপুর খুলিয়া লইয়া আপন স্থানে রাখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, কল্য পুত্রবধূকে সাজাই দেয়াবা। পরে সে-স্ত্রী যুব পুরুষকে বিদায় করিয়া আপন স্বামির নিকট যাইয়া তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া কহিলেক যে, "এ-গৃহে বড় গ্রীষ্ম, অতএব চল, দুইজনে ঐ বৃক্ষের তলে নিদ্রা যাই। পরে সে-স্ত্রী স্বামিকে সঙ্গে লইয়া যে-স্থানে যুবা পুরুষের সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া দুই স্ত্রী-পুরুষ শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় স্বামিকে জাগাইয়া বলিলেক যে, "তোমার পিতা এইক্ষণে এখানে আসিয়া আমার এক পদের নূপুর খুলিয়া লইয়া গেলেন। একে বৃদ্ধ তাহাতে পিতাতুল্য, এ কেমন রীতি যে, আমি স্বামির সহিত শয়ন করিয়া রহিয়াছি, এমত সময় নির্লজ্জ হইয়া কোন বিবেচনায় আমার পদের নূপুর লইয়া গেলেন?" দোকানি ইহা শুনিয়া পিতার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিল। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে সেই বৃদ্ধ পুরুষ আপন পুত্রকে কহিলেন যে, "গত রাত্রিতে আমি কোন কর্মার্থে বাহিরে যাইতেছিলাম, তাহাকে দেখিলাম যে, পুত্রবধু উপপতির সহিত একত্র শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, অতএব তাহার প্রমাণার্থে বধূর নূপুর লইয়া রাখিয়াছি।" পুত্র ইহা শুনিয়া পিতাকে বিস্তর মন্দ কহিয়া বলিতে লাগিল যে, "গ্রীষ্মের কারণ আমি স্ত্রীর সহিত বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই সময় তুমি যাইয়া আমার স্ত্রীর পা হইতে নূপুর লইবামাত্র স্ত্রী আমাকে চেতন করিয়া এই সম্বাদ জ্ঞাত করাইলেক।" ইহা শুনিয়া পিতা লজ্জিত হইলেন।

তোতা ইতিহাস (১৮০৫), নবম ইতিহাস

উইলিয়ম কেরী

এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর মন্ত্রীর সঙ্গে আত্যন্তিকী প্রীতি ছিল। এক দিবস রাণীকে কহিল, "হে রাণি, আমারদের গোপনভাবে এ-প্রীতি রাজা জ্ঞাত হইলে, প্রাণে বধিবেন। অতএব চল, এ-স্থান হইতে দেশান্তরে যাই। অদ্য নিশাভাগে এই নগরের অন্তে পুষ্করিণীর তটে বৃক্ষের মূলে আমি বসিয়া থাকিব; তুমি কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া আমার নিকটে যাইবা। পরে দুইজনে একত্রে হইয়া সুখে গমন করিব।" এই সঙ্কেত করিয়া মন্ত্রী আপন ঘরে গেল। রাত্রি হইলে মন্ত্রী সেই বৃক্ষের মূলে বসিবামাত্র সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। পরে রাণী নিশাশেষে রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া সেই স্থানে গিয়া দেখিল যে উপপতি মরিয়াছে। তাহাতে উদ্বিগ্না হইয়া দেশান্তরে যাইয়া বেশ্যাধর্ম আশ্রয় করিল। তাহার পর রাজার মরণান্তর পাত্র-সভাসদ প্রভৃতিরা বিচার করিয়া রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে রাজপুত্র যুবাবস্থাপ্রাপ্ত হইল ও মহামত্ত হইয়া বেশ্যাগমন করিতে লাগিল, ও দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া যেখানে ভাল বেশ্যা পায়, সেই স্থানে যায়। ইতিমধ্যে যে-স্থানে তারা মাতা বেশ্যা হইয়াছে, সে-স্থানে গিয়া তাহার সঙ্গে অভিগমন করিল। কিন্তু রাণী আপন পুত্র বলিয়া জানিল। তারপর সে-পুত্র মরিলে তাহাকে দাহ করিবার সময় রাণী চিতা প্রবেশ করিতে গেল, তাহাতে ভয়ানক অগ্নি দেখিয়া পলাইয়া এক গোপ-গৃহে যাইয়া রহিল। রাজরাণী ছিল; বেশ্যাধর্ম করিল; দুঃখ জানে না। গোপ-গৃহে কত দিন বসিয়া খাইবে? এক দিবস গোপ কহিল, "বসিয়া কি করিতেছিস? ঘোল বিক্রয় করিতে যা!" ইহা কহিয়া ঘোলের হাঁড়ি মাথায় তুলিয়া দিল। রাজরাণী মাথায় ঘোলের হাঁড়ি লইয়া দুই তিন পাদ গমন করিবামাত্র মস্তক হইতে ঘোলের হাঁড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। রাণী হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। সকলে দেখিয়া কহিল, "তোর লজ্জা নাই? ঘোলের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাসিতেছিস?" তখন রাণী কহিল, "আমি রাজাকে মারিয়াছি, উপপতিকে সর্পাঘাত হইল, তাহা দেখিয়া বেশ্যাধর্ম করিলাম, তাহাতে পুত্রেতে রত হইয়া চিতা প্রবেশ করিতে গেলাম, সেখান হইতে পলাইয়া গোপগৃহিণী হইলাম— আজি কিঞ্চিৎ ঘোল নষ্ট হইল, এ-জন্যে শোক করিব?"

ইতিহাসমালা (১৮১২), দ্বাত্রিংশত্তম কথা

হরপ্রসাদ রায়

পূর্বকালে পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক সময়ে সুলোচনা নামে নিজ প্রেয়সীর সহিত মৃগয়ার কৌতুক দেখিতে রথারোহণ করিয়া ও চতুরঙ্গিনী সেনাতে বেষ্টিত হইয়া নগরের বাহিরে গেলেন। পশ্চাৎ এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলে সৈন্যেরা মৃগের অনুসন্ধান করিতে নানা দিকে গেল। রাজা রাণীর সহিত এক রথে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করত সদ্যোজাত এবং বস্ত্রখণ্ডোপরি শায়িত এক সুন্দর শিশুকে দেখিয়া রাণীকে কহিলেন, "প্রিয়ে, আশ্চর্য দেখ: সিংহ ও ব্যাঘ্রেতে ব্যাপ্ত এই বন, ইহার মধ্যে কি-প্রকারে মনুষ্যশিশুর সঞ্চার হইল!" রাজপত্নী কহিলেন, "এই বালক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিপ্রিয়; ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় করুণার্দ্র হইতেছে। হে নাথ, যদি তোমার আজ্ঞা হয়, তবে এই বালককে লইয়া গৃহে গিয়া পুত্রস্নেহেতে প্রতিপালন করি।" রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আঃ পাপীয়সি, তুমি ঘৃণারহিতা এবং অতি সাহসিকা! কি নিমিত্তে অজ্ঞাতজননীজনক এবং চণ্ডালাশঙ্কাস্পদ এই যে বালক, ইহাকে তুমি অকারণ কোলে করিবা?" রাজমহিষী কহিলেন, "হে রাজন, পণ্ডিতেরা কহিতেছেন যে, পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হয় না, দুর্দশা নিন্দনীয়া হয়। বরং পুত্রের গুণেতে জননী রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা হন; এবং কাহার ললাটে বিধাতার কি প্রকার লিখন আছে, তাহাও জানিতে পারা যায় না। আর প্রশংসিত কুল ব্যতিরেকে সামান্য বংশজাত বালকের এ-প্রকার সৌন্দর্য হয় না; অতএব করুণাপ্রযুক্ত ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।" অনন্তর রাজা মহিষীকে পুনঃপুনঃ বারণ করিলেন, তথাপি রাণী বালকগ্রহণোদ্যত হইয়া ভূপাল কর্তৃক তিরস্কৃতা হইলেন! ভূপালেরা স্বভাবত আজ্ঞাভঙ্গাসহিষ্ণু হন এবং রাজপত্নীরাও সৌভাগ্যমদগর্বিতা হন; এই প্রযুক্ত পরস্পর কলহ করিয়া রাজা রাণীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন এবং রাণীকে রথ হইতে অবরোহণ করাইয়া দিলেন। পরে রাজা সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন: "যে-কেহ এই যে নীচানুরাগিণী দুর্ভাগা স্ত্রী, ইহার সহিত গমন করিবে, আমি শত্রুর ন্যায় তাহার মস্তক ছেদন করিব..." পশ্চাৎ রাজা সকল সেনার সহিত নিজ নগরে গেলেন। রাজপত্নী সেই নির্জন বনমধ্যে অতিশয় ভীতা হইয়া এই চিন্তা করিলেন যে, নিষ্ঠুর পুরুষের পত্নীর পরিণামে এইরূপ দশা হয়।

পুরুষ-পরীক্ষা (১৮১৫), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, অথ সপ্রতিভ কথা

রামমোহন রায়

তোমরা এ বড় অযোগ্য কহিতেছ যে, সহমরণ ও অনুমরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়। এ-বিষয়ে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের বচন শুনঃ স্বামী মরিলে পরে যে-স্ত্রী এ-পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে, সে, অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী, তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে-স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোকে গমন করে, যে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে— যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি— তত বৎসর স্বর্গে বাস করে। আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয়, তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে। আর যে-স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোকে গমন করে, সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে... আর পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করেন, কিম্বা কৃতঘ্ন, কিম্বা মিত্রহত্যা করেন, তথাপি ঐ পতিকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করে, ইহা অঙ্গিরামুনি বলিয়াছেন। স্বামী মরিলে সাধ্বী স্ত্রী-সকলের অগ্নিপ্রবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম নাই।... হারীতের বচন শুনঃ পতি মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্যন্ত অগ্নিতে আত্মাকে দাহ না করে, তাবৎ স্ত্রীযোনি হইতে কোনরূপে মুক্ত হয় না। এবং বিষ্ণু ঋষির বচন শুনঃ পতি মরিলে পত্নী ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিবেন কিম্বা পতির চিতাতে আরোহণ করিবেন।

এখন অনুমরণ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণের বচন শুনঃ অন্যদেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর স্বাধ্বী স্ত্রী স্নান-আচমনপূর্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক। এইরূপ অগ্নিপ্রবেশ করিলে ঐ স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয় না (যেহেতু ঋক্‌বেদের বাক্য আছে), কিন্তু তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়; সেই অশৌচ অতীত হইলে পুত্রেরা যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেন। মৃত পতির অনুমরণ ব্রাহ্মণী করিবেন না, যেহেতু বেদের শাসন আছে; আর ইতর বর্ণের যে-স্ত্রী, তাহাদের অনুমরণকে 'পরম তপস্যা' করিয়া কহেন। ব্রাহ্মণী জীবদ্দশায় থাকিয়া পতির হিত কর্ম করিবেন। আর ব্রাহ্মণ জাতির যে-স্ত্রী পতি মরিলে অনুমরণ করে, সে আত্মঘাত জন্য পাপের দ্বারা আপনাকে ও পতিকে স্বর্গে লইতে পারে না।

এইরূপ নানা স্মৃতিবচনের দ্বারা সিদ্ধ যে সহমরণ ও অনুমরণ, তাহাকে কিরূপে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কহ?

সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮)

ফেলিক্স কেরী

যেমত অন্য অন্য দেশে মনুষ্যজাতি দুই প্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী, তদ্রুপ এতদ্দেশেতেও আছে। মূর্খেরা সর্বদা পশুবৎ, তাহারদিগের মধ্যে কেহ জ্ঞানাভিলাষী নয়। কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে-ব্যক্তি, তিনি তদ্রুপ নন, তাঁর চিত্ত অন্যপ্রকার: কোন এক বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোন এক সময় কোন শিল্পকর্ম দেখিলে, যাবৎ সে-বিষয়ের হেতু কিম্বা সে-বিদ্যার আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাত না হন, তাবৎ তাহার মনে কোন সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না, যেহেতুক বিদ্বানেরদিগের মন সর্বদা বর্ধিষ্ণু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন, কিন্তু সর্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করেন।

পুনশ্চ ঐ বিদ্বানেরদিগের মধ্যে দুই প্রকার লোক আছেন: প্রথমতঃ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসকরণে আরম্ভমাত্র করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে প্রাজ্ঞ হইয়া অন্য অন্য দেশীয় বিদ্যাবিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাঙ্ক্ষী। এই দুই প্রকার লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসকরণে কেবল আরম্ভমাত্র করিয়াছেন, তাঁহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অন্য অন্য স্থানে সাহেবানেরা এবং অন্য অন্য ভাগ্যবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিদ্যাবাহুল্যের জন্যে অনেক অনেক আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আরো হউক, কেননা বিদ্যা সমুদ্রের ন্যায়: তাহার অন্ত পাওয়া অতিদুঃসাধ্য।

যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সাহেবান এবং এতদ্দেশীয় অন্য অন্য ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নানা বিদ্যার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন; এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানেতে বর্ধিত হইলে অবশ্য তদ্‌গ্রন্থের সমস্ত মূল গ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন, অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্ধিত হয়, এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের গ্রাহ্য তাবদায়ুর্বেদ-শিল্পবিদ্যাদি-গ্রন্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপজাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতিচমৎকৃত হইয়া সে-সকল জ্ঞান এবং সে-সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই, এমত স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনান্তর অন্য অন্য ইউরোপজাতীয়-বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি দেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্বেদশিল্পবিদ্যাদি-বর্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ-জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জমা হইয়া ছাপা হইবে।

বিদ্যাহারাবলী (১৮১৯), মেং ফিলিক্স কেরি সাহেবের পত্রমিদং

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

দশ জন একত্র হইয়া কোন দেশে যাইতেছি। পথিমধ্যে এক নদী ছিল। তাহা পার হইয়া পরপারে বসিয়া সকলে কহিল, "আমরা দশ জনা পার হইয়াছি কিংবা দশ জনের মধ্যে কেহ পার হয় নাই, ইহা জানা ভাল।" এই পরামর্শেতে প্রথমতঃ একজন অন্য নয় লোককে গণিয়া আপনাকে না গণিয়া কহিল যে, "ওরে ভাইরা, নয় জন যে হয়! আর একজন কম্‌নে গেল!" ইহা শুনিয়া অন্যজন কহিল, "এমন হবে না; থাক, আমি গণিয়া দেখি।" এরূপ কহিয়া সেই স্বভিন্ন নয় লোককে সংখ্যা করিয়া সশঙ্ক হইয়া কহিল যে, "বটে ত, নয় জনই যে হয়! দশম কি হইল?" এরূপ দশ জন একে একে আত্মবিস্মরণে বাহ্যমাত্রাভিনিবিষ্টচিত্ততাতে কেবল বাহ্য গণনা করিয়া "দশম নাই" এই নিশ্চয় করিল। অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল: "ওহে দশম, কোথা আছ? শীঘ্র আইস। আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি। তোমাকে পাইলেই সুখী হই। অতএব যেথা থাক, শীঘ্র আইস।" এইরূপ পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পুনরায় সকলে যুক্তি করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিল যে, "বুঝি আমারদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল, সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি। শ্যালা বড় দুষ্ট! যদি পাই, তাহার বাপের বিয়া দেখাইব! আমারদিগের বড় দুঃখ দিতেছে! ভাল, বুঝিব।" ইহা কহিয়া সকলেই কণ্টকিত নানা জাতীয় লতা-বেষ্টিত নিবিড় বিপিনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে সেই অরণ্যে গাছের আড়ে কুঞ্জমধ্যে পর্বতে উপত্যকাতে অধিত্যকাতে কন্দরে গুহাতে সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও কিছু তত্ত্ব না পাইয়া পুনর্বার সকলেই ঐ নদীতীরে আসিয়া মন্ত্রণা করিল যে, "বুঝি নদী পার হইতে হইতে ডুবিয়া মরেছে; আইস দেখি, খুজি।" ইহা মনে করিয়া নদীর মাঝে খুজিয়া কোথাও কিছু টের না পাইয়া পাঁক-কাদা-শেওলা-মাখা গায়ে নদীর পাড়ে বসিয়া আর্তস্বরে রোদন ও গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কাকুতি বিলাপ করিয়া কেহ বা বুক চাপড়ায়, কেহ বা মাথা খুড়ে, কেহ বা ধূলাতে গড়াগড়ি পাড়ে, কেহ বা আছাড় খাইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আত্মদর্শী নামে একজন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহারদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত করুণান্বিত হইয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা এ দুর্দশাগ্রস্ত কি কারণে হইয়াছ, তাহা আমাকে কহ।" ইহা শুনিয়া তাহারা আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত কহিল। তদনন্তর আত্মদর্শী বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত।

প্রবোধ-চন্দ্রিকা, প্রথম স্তবক, পঞ্চম কুসুম

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার

যদি বল 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প, এ-কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতামাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্যোগ করেন না," এ-কথা অতি অনুপযুক্ত, যেহেতু নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয়গুণ কহিয়াছেন। এবং এ-দেশের স্ত্রীলোকেদের পড়াশুনার বিষয়ে বুদ্ধি-পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্রবিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগকে নির্বোধ কহা উচিত হয়। এ-দেশের লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না, বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে, তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরবমাত্র-সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করেন। স্ত্রী-সকল গৃহকর্মের কিছু অবকাশ পাইয়া বিনা উপদেশে কেবল আপন বুদ্ধিতে শ্রীনির্মাণ আলিপনা সিন্দূর চুবড়ী গাঁথা, ফোঁটা কাটা, বুটা তোলা ও নানা প্রকার মিঠাই পাক করা, খএরের গাছ কৌটা ইত্যাদি দ্রব্যের আকার গড়ন ও চুল বান্ধা— যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না— এই সকল অনায়াসে করেন। তবে কি তাঁহারা বালককাল অবধি বিদ্যা শিখিতে অশক্ত হন? এমত নহে।

যদি স্ত্রীলোকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহারা স্বামীর ও শ্বশুরের সেবা কি-রূপে করিতে হয়, ও স্বামীর সেবাতে ও স্বামীর বাক্য পালন করাতে কি ফল, তাহা জানিয়া শাস্ত্রের মত স্বামীর সেবা করিতেন, এবং স্বামীর আজ্ঞানুসারিণী হইতেন। এখনকার স্ত্রীলোক প্রায় অজ্ঞান, এই নিমিত্ত তাহাদের নানা দোষ ঘটিতেছে। তাঁহাদের লেখাপড়া-জ্ঞান যদি থাকিত, তবে আপন আপন ঘরের কর্ম ও পতির সেবার অবকাশে পুস্তকাদি পড়িয়া সুস্থির মনের ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত।

স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক (১৮২২)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

কলির জ্ঞানী মহাশয়েরা বিষয় ব্যাপারে আসক্ত কি অনাসক্ত, এই দুয়ের অনুভবের সম্ভাবনা কি, প্রথম পক্ষেরি বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে। দুর্জনেরা সজ্জনকে চিরকালই দুর্জন কহিয়া থাকে, তাহাতে কি দুর্জনের দুর্জনত্ব ও সজ্জনের সজ্জনত্ব দূর হয়? উভয়ভ্রষ্ট মহাশয়েরাই চিরকাল সজ্জননিন্দক, যেমন যবনেরাই ব্রাহ্মণাদির নিন্দক। ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়ের কি দুর্বুদ্ধি! জনকাদির বৈষয়িক ব্যাপারে নিজমনঃকল্পিত নিন্দকের উল্লেখ করিয়া আপনারদিগেরো জ্ঞানিত্ব সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন— যেমন, সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দৃষ্টান্ত দিয়া পরদারগমনেও দোষাভাব সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ভাল, জিজ্ঞাসা করি: কোনো গুণসাগর উত্তমের দৃষ্টান্তে কোনো দোষসাগর অধমের কি দোষরাশি খণ্ডন হয়? এবং রত্নাকর সমুদ্রের সহিত ও সুধাকর চন্দ্রের সহিত কি কূপের ও জ্যোতিরিঙ্গনের কোনো অংশে দৃষ্টান্ত হয়? আর ইদানীন্তন জ্ঞানীদিগের বিষয়ে জনকাদির দৃষ্টান্তের এ-তাৎপর্য নহে যে, ইঁহারা তাঁহারদিগের তুল্য। এই বাক্যের দ্বারা শিষ্টাচরণে এইরূপ বোধ হয় কি না যে, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগের মনে মনে এইরূপ অভিমান আছে যে, সকল লোক আমারদিগকে জনকাদির তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন? এ-প্রকার ভ্রান্ত কে আছে যে, ভাক্তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়দিগকে জনকাদির তুল্য জ্ঞান করে? যদ্যপি অশ্বলোম অতি নির্মল এবং শূকর কুশমূলাহারীও হয়, তথাপি মলিন শ্বেতচামরের এবং অভক্ষ্যভক্ষক গো-র কোনো অংশে কি কখনও তুল্য হইতে পারে? এবং যথার্থজ্ঞানীর বিপক্ষ কে আছে? ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর বিপক্ষ সর্বকালেই আছে, কিন্তু অন্য যুগের ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজা হইলে দুর্বল বিপক্ষ কি প্রবল বিপক্ষ, তাহা বিলক্ষণরূপেই বোধ করিতেন, এবং সুজন ও দুর্জন সর্বকালেই আছে, সে সত্য; কিন্তু যে মহাশয়েরা নারদকে দাসীপুত্র, ব্যাসদেবকে ধীবরকন্যাজাত, পঞ্চপাণ্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী, মহাভারতকে উপন্যাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা, এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুজন কি দুর্জন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। এবং কোন্ দুর্জন দুগ্ধকে তক্র, শর্করাকে বালুকা, শ্বেতচামরকে অশ্বলোম, সুবর্ণকে পিত্তল, পদ্মপুষ্পকে তগর, সিংহকে কুক্কুর ও অশ্বকে গর্দভ বলিয়া নিন্দা করে? এবং কোন্ সুজনই বা তক্রকে দুগ্ধ, বালুকাকে শর্করা, অশ্বলোমকে শ্বেতচামর, পিত্তলকে স্বর্ণ, তগরপুষ্পকে পদ্ম, কুক্কুরকে সিংহ ও গর্দভকে অশ্ব বলিয়া প্রশংসা করে?

পাষণ্ডপীড়ন (১৮২৩)

পরদিবস বাবুর পিতা কর্তা মহাশয় নোটের বেবাক টাকা ও খরচা দিয়া বাবুকে খালাস করিলেন; তৎপরে বাবু বাজারে যাহার যাহার দেনা ছিলেন, তাহারাও বাবুর নামে নালিশ করিয়া কর্তার স্থানে বেবাক টাকা পাইলেক। বাবু বড় জেহেলে ও ছোট জেহেলে মাসেক দুই মাস কয়েদ ছিলেন, ইহার মধ্যে প্রিয়তমা বারবিলাসিনীর নিকট গমন করিতে পারেন নাই। খালাস হইয়া আসিবামাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রিয়তমার নিকট গমন করিলেন। সে কহিলেক, "আলাপ করা দূরে থাকুক, আর তোমার মুখাবলোকন করিব না: তুমি মাসেক দুই মাস জেহেলে স্বচ্ছন্দে বসিয়া ছিলে, আমার এখানে কি-প্রকারে চলে, তাহার তত্ত্ব একবার করিলে না; অতএব আমি এমত লোকের মুখ দেখি না। কল্য যদি আমার দুই মাহার বেবাক টাকা আনিতে পার, তবে ঘরে আসিতে দিব, নতুবা জুতা মারিয়া দূর করিব। তুই কেমন বড়মানুষের বেটা এবং ভালমানুষ, তাহা আমি জানিয়াছি। আর জাঁকে কাজ নাই; তোর কাছে পাঁচ বৎসর অবধি আমার হাড়ির হাল হইল। কেবল টাকা হাজার দুয়ের গহনা আর এই বাড়িটুকু (ইহার দাম বড় জোর চারি পাঁচ হাজার টাকা হইবেক)! তো-হইতে এইমাত্র পাইয়াছি। আর কোন কালে কিছু দিয়াছিস? দেখ দেখি অমুকের অমুক আপন স্ত্রীর ও মায়ের গায়ের অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া আনিয়া দিয়াছে! তুমি আমায় কি দিয়াছ, বল দেখি।... তোর মনে দয়া নাই! যদি দয়া থাকিত, তবে এই দুই মাসের মধ্যে কোন লোকের দ্বারাতেও আমরা তল্লাস ও খরচ পাঠাইতি।" এই প্রকার ভৎর্সনা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেক, অন্য বাবুর সহিত গান-বাজনা আরম্ভ করিলেক। পরদিবস ছোট আদালতে দুই মাসের মাহিয়ানার দুই শত টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া বাবুকে কাঠারায় কয়েদ করাইলেক। পরে তাহার পিতা শ্রবণ করিয়া সে-টাকাও দিয়া বাবুকে খালাস করিয়া আনিলেন।

নববাবুবিলাস (১৮২৩), চতুর্থ খণ্ড: ফল

জেমস স্টিওয়ার্ট

খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেচনা করা— এ-সকল অতি মূর্খের কথা। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ: গয়লার ঘরে অপবিত্র স্থানে স্থিত, এবং সর্বদা অশুচি যে তাহার স্ত্রীপুত্র, তাহাদের স্পর্শেতে দুষ্ট ও অপবিত্র যে-ভাণ্ড, তাহা হইতে দুগ্ধ লইয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া ব্রাহ্মণ-সকল দুগ্ধ খায়; সেই আপন পাত্র যদি অন্য কেহ স্পর্শ করে, তবে ব্রাহ্মণের জাতি যায়! এবং ময়রা ও দোকানিরা দুগ্ধাদির দ্বারা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করে; ব্রাহ্মণ-সকল তাহা ভোজন করে, ইহাতে কিছু জাতির ক্ষতি হয় না! আর দেশান্তর হইতে নৌকার উপর তণ্ডুলাদি আনে, তাহার উপর নাবিকেরা পাক করিয়া খায়, তাহাতে উৎকৃষ্ট মৎস্যাদি থাকে, তাহা ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলে দোষী হয়েন না! অন্য এক প্রমাণ দেখ: জাহাজের উপর অনেক অনেক বস্তু অর্থাৎ মরিচ ও এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল প্রভৃতি আইসে; তাহা স্বচ্ছন্দে সকলে খায়, কিন্তু সেই জাহাজে আনীত অন্য অন্য বস্তু অর্থাৎ পিপরমেণ্ট প্রভৃতিকে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট বলিয়া খায় না, কেননা ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট ভোজন করিলে জাতি নষ্ট হয়।...

বাঙ্গালিদের বিবাহের বিষয় দেখ দেখি। বড় বড় কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেক অনেক বিবাহ করেন; পরে তাহারা যে-স্ত্রীর নিকট লাভের বিষয় অতিশয় বুঝেন, তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন, অন্য অন্য দুঃখিনী স্ত্রী-সকল মনঃপীড়াতে দগ্ধ হইয়া কালযাপন করে আর তাহার মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধর্মবিপর্যয় কর্ম করে। এবং ঐ কুলীনেরা ব্যয়কুণ্ঠ প্রযুক্ত খরচ করিতে না পারিয়া আপন কন্যা কিম্বা ভগিনীদের বিবাহ দেন না, বলেন যে, "বর মেলে না!" আর কোন কোন ধনলোভী অনেক ধন পাইবার আশাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে অধিক বয়স্কা অর্থাৎ যুবতীপ্রায় করিয়া রাখে; পরে জাত্যাদি বিবেচনা না করিয়া এমত বরের চেষ্টা করেন যে, তাহাতে বরের একচিহ্নও পাওয়া যায় না। তাহাতে ঐ পরাধীনা কন্যার বৃদ্ধাদি পতিতে মনঃসন্তোষ না হওয়াতে কুকর্মে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ বিবাহ হওয়াতে দুঃখী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ কন্যা না পাইয়া অব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্টাদির কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করেন; পরে অন্য অন্য প্রধান ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বেরদিগকে বউভাতে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বধূর হস্তে সপাত্র অন্ন দিয়া বধূর পরিবেশন দ্বারা ভোজন করান, তাহাতে গৃহস্থ নির্দোষী হয়! হিন্দুদিগের প্রধান যে-ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অন্য অন্য জাতির কথা কি কহিব?

তমোনাশক (১৮২৮), ভূমিকা

শিষ্য। পৃথিবী যদি ভ্রমণ করে, তবে কিরূপে সম্ভবে যে, যে-স্থান হইতে পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হয়, পুনর্বার সেই স্থানেই পড়ে? যেহেতুক পৃথিবী অতি বহতীপ্রযুক্ত, যদি প্রতি চতুর্বিংশতি ঘটিকাতে একবার ভ্রমণ করে, তবে অবশ্য অতি শীঘ্র চলে। এবং পৃথিবী যদি ভ্রমণ করে, তাহার গমন পূর্বাভিমুখ অবশ্য হয়, যেহেতু আমরা দেখিতেছি যে, সূর্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে, এইক্ষণে আমি অনুমান করি যে, পাষাণ কোন স্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইলে পৃথিবী পূর্বদিকে যতদূর গমন করে, সেই স্থান হইতে তাহা ততদূরে পশ্চিমে পড়ে।

গুরু। তোমার এ-কথা জ্ঞানির ন্যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিতে হয় যে, কোন বস্তু চালিত হইলে যাবৎ বাধা না পায়, তাবৎ সে সেইরূপ চলে। পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্বে পৃথিবীর গমনানুসারে চলে, ও যে-লোক সেই পাষাণ উত্তোলন করে, সেও সেইরূপ চলে, অর্থাৎ পাষাণ ও পাষাণগ্রাহী উভয়ই পৃথিবীর সহিত চলে। অতএব পৃথিবী পূর্বদিকে যত শীঘ্র গমন করে, তত শীঘ্র পাষাণও শূন্যে চলে, এই কারণে যে-স্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানেই পুনর্বার পড়ে। যদ্যপি দর্শকদিগের বোধ হয় যে, পাষাণ উৎক্ষিপ্ত হইলে সমসূত্রপতরূপে উঠে এবং পড়ে, তথাপি তাহার যথার্থ গমন বক্র, এবং আকাশে— যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি যায় না, সেখান হইতে— দৃষ্টি করিলে, উৎক্ষিপ্ত পাষাণের বক্র গমন দৃষ্টিকর্তার প্রতক্ষ্য হইত। যদি এক বৃহন্নৌকা তীরের নিকট দিয়া চলে ও নৌকাস্থ দুই লোক ক্রীড়ার নিমিত্তে পরস্পরাভিমুখে ঐ নৌকার উপরিভাগ দিয়া ভাঁটা নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা বুঝিবে, ঐ ভাঁটা সমসূত্রপাতরূপে চলিতেছে; কিন্তু সে বাস্তব নয়, যেহেতুক যতদূরে নৌকা যাইতেছে। ততদূরে ভাঁটাও চলিতেছে; যদি এমত না হইত, তবে অন্যদিকস্থ লোক সেই ভাঁটা ধরিতে পারিত না। যদ্যপি নৌকাস্থ লোকেরা বোধ করে যে, ভাঁটা সমসূত্রপাতরূপে একদিক হইতে অন্যদিকে যাইতেছে, তথাপি তীরস্থ দর্শকেরা— যাহাদিগের নৌকার গতি আক্রমণ করে না, তাহারা দেখিতে পায় যে, সেই ভাঁটা বক্রভাবে চলিতেছে ও সমসূত্রপাতরূপে এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকটে কদাচ যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩০), প্রথম কথোপকথন: পৃথিবীর গতি

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

এই ভারতবর্ষে প্রায় নয় শত বৎসর হইল যবন-সঞ্চার হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে যাবনিক ভাষা অর্থাৎ পারসী ও আরবী ভাষা এই পুণ্যভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে। অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারতবর্ষাধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমন রাজকীয় ভাষাবোধে সর্বত্র সমাদর হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত বৃদ্ধি হইল যে, অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর করিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বিষয়কর্মে, বিশেষত বিচারস্থানে, অন্য ভাষার সম্পর্কও রাখিল না। তবে যে-কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায়, সে কেবল নামমাত্র। সুতরাং আমারদের বঙ্গভাষার তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে। যদ্যপি তাহার উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য, তথাপি আমি বহু পরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সঙ্কলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষা-স্থলে স্বদেশীয় সাধুভাষা পুনঃসংস্থাপন করিবার কারণ এই পারসীক অভিধান সংগ্রহ করিলাম। ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে, স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িত হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন-পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন, এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে-লজ্জা ও গ্লানি, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়া স্ব দেশ-ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে-রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে. তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পারসীক অভিধান (১৮৩৮), ভূমিকা

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

এতদ্দেশীয় ভাষার অল্পতা বিষয়ে কোন আপত্তি সম্ভবে না, কারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা উৎপন্ন হয়, এবং যে-কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় চলিত আছে, তাহা গৌড়ীয় ভাষায় অনায়াসে ব্যবহার্য হইতে পারে। অতএব ইহার বৃদ্ধি হওনের অধিক সম্ভাবনা। এবং এই রীত্যনুসারে গ্রীক এবং লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে আহরণ করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষার বৃদ্ধি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার অতিপ্রাচীনতা-বাহুল্যপ্রযুক্ত তৎসহকারে গৌড়ীয় ভাষায় সকল অভিপ্রায় প্রকাশ হইতে পারে। ঐ সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য ও প্রাচীনতার প্রমাণ কেবল অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র নহে, কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়েরা স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে উক্ত ভাষারবাহুল্য এবং উৎকৃষ্টতা লিখিয়াছেন। অতএব এতাদৃশ সংস্কৃতভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষাসংগ্রহের দ্বারা যদ্যপি বিদ্যাবিশেষের তাৎপর্য প্রকাশ না হয়, তবে দেশান্তরীয় ভাষা দ্বারা প্রয়োজনানুসারে গৌড়ীয় ভাষার বৃদ্ধিকরণে কোন প্রতিবন্ধক নাই; অতএব ভাষার অল্পতার বিষয়ে আপত্তি কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না।

অপর, ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তাদিগের গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, খ্রাইষ্টশকের নয় শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ এক্ষণে প্রায় তিন হাজার বৎসর হইল সংস্কৃত ভাষার অবস্থিতি ছিল। অতএব ইহা দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে, তৎকালে সংস্কৃতমূলক ভাষাবলম্বি লোকেরা অধিক বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ প্রয়োজনানুসারে ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব ঐ ভাষার বাহুল্য দেখিয়া তাৎকালিক লোকদিগের বহুতর প্রয়োজন সপ্রমাণ হইতেছে; সুতরাং সভ্যতাব্যতিরেকে এতাদৃশ প্রয়োজনের আধিক্য সম্ভবে না। অতএব এইক্ষণে লোকদিগের বিদ্যোপার্জন হইলে প্রাচীন সভ্যতার উদ্ধার এবং বৃদ্ধি হয়...

সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয় ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওনের প্রয়োজন এই যে, সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিক ভাষা নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষা এবং অতিশয় কঠিন ও তদুপার্জন বহুকাল ও বহুপরিশ্রমসাধ্য। অতএব দেশান্তরীয় ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা-উপার্জন যেরূপ ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দোষ, তাহা-সকল সংস্কৃত-ভাষার অবলম্বনে বর্তিবার সম্ভাবনা। এ-কারণ দেশস্থ সাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না। এইহেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয় ভাষা দ্বারা বিদ্যোপার্জন করান যাইবেক, অর্থাৎ যে-ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালনপালন দ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা (১৮৪০)

গোবিন্দচন্দ্র সেন

তৎকালে সুজা জগতীয় ঘৃণাস্পদ হওয়াকে মক্কা-তীর্থে গিয়া যাবজ্জীব ভজনায় যাপন করিতে স্থির করিলেন। চত্বারিংশৎ জন তাঁহার নিজ পরিবার ও অবশিষ্ট সম্পত্তি হস্তির উপরে লইয়া ত্রিপুরা দেশ হইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি দেখিলেন যে, মক্কায় গমনোদ্যত কোনো নৌকা নাই এবং অতি ভয়ানক সময় প্রযুক্ত সমুদ্রে নৌকা থাকিতে পারে না। অথচ শত্রুরা তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতেছে। অতএব আরাকানে পলায়ন ব্যতিরিক্ত অন্য কোন উপায় ছিল না। এই প্রযুক্ত তথাকার রাজার নিকটে আপনার আগমনের সম্বাদ জানাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ রাজা তাঁহাকে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবেন, এই উত্তর পাঠাইলেন। তিনি সপরিবারে সুখপূর্বক আরাকান নগরে রহিলেন এবং তথাকার লোকেরা প্রথমত তাঁহার প্রতি দয়ালুরূপে ব্যবহার করিয়াছিল। অল্পদিন পরে রাজা তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করাতে সুজা অতি ক্রোধপূর্বক উত্তর করিলেন। তাহার তাৎপর্য এই যে, তিনি নাস্তিকের সহিত বিবাহ দ্বারা তিমর-বংশের অপমান করিবেন না। ইহাতে রাজা ঐ হতভাগ্য রাজাকে আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সুজা জীবনের শেষ পর্যন্ত অতিশয় সাহসপূর্বক আত্মরক্ষা করিলেন। তাঁহার পারিষদ লোকের অধিকাংশ নষ্ট হইলে পরে তিনি এক গুরুতর ক্ষিপ্ত পাষাণ দ্বারা আহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নিরস্ত্র করিয়া বন্ধন করিল; অনন্তর এক ক্ষুদ্র ডোঙায় আরোপণ করিয়া নদীমধ্য দিয়া বাহিয়া চলিল এবং তথায় ঐ নাবিক ডোঙার ছিপি খোলাতে সুজা ও ডোঙা মগ্ন হইল। অন্য নৌকা দ্বারা নাবিক লোকেরা গৃহীত হইল। পরে প্যারীবানু নাম্নী সুজার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজা যাওয়াতে ঐ সাধ্বী কুলনিন্দা-নিবারণার্থে আপন উদরে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার দুই কন্যা নিজ হস্ত দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু কণিষ্ঠ কন্যাকে রাজা বলপূর্বক বিবাহ করিলেন। তাহাতে ঐ স্ত্রী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া মরিলেন। এবং রাজা সুজার দুই পুত্রকে জলে নিমগ্ন করিয়া মারিলেন। এইরূপে হতভাগ্য সুজা সমূল সশাখ নষ্ট হইলেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪০), চতুর্থ অধ্যায়, সুলতান সাসুজা

প্রাজ্ঞ— চেতনরহিত, স্পন্দনরহিত, বাক্যরহিত এরূপ যে-অত্যন্ত জড় পুত্তলিকা, তাহাকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাবৎ প্রাজ্ঞ লোকের নিকট কেন আপনাকে হাস্যাস্পদ কর? আর বিজাতীয় মুখবাদ্য, কক্ষবাদ্য, অঙ্গুলিধ্বনি ও ভূমিতে-পদাঘাত আর করতালি এবং অত্যন্ত নিন্দিত ও অশ্রাব্য গীত আর নানা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীকে পরমার্থ-সাধন জানিয়া তাবৎ মনুষ্যের ব্যঙ্গবিদ্রূপের আলয় কেন হইতেছ?...

পৌত্তলিক— আমরা পুত্তলিকার আরাধনা করি না, কিন্তু এ-সকল পুত্তলিকা বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতিমূর্তি হয়েন; ঐ সকল দেবতা জন্মমরণরহিত, নিত্য সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম হয়েন, ইহার দ্বারা দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকি।

প্রাজ্ঞ— জিজ্ঞাসা করি: ঐ বিশেষ বিশেষ দেবতারা সকলেই পরব্রহ্ম হয়েন কি তাঁহারদিগের মধ্যে একজনকে পরব্রহ্ম বল? ইহার উভয়ই অসম্ভব হয়, যেহেতু সকলকে পৃথক পৃথক পরব্রহ্ম মানিলে বেদবাক্য অপ্রমাণ হয়, কেননা বেদে সর্বত্র এক ব্রহ্ম কহেন; এবং অনেক স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কহিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু ঐ পাঁচজন কি দশজন স্বতন্ত্র ব্রহ্ম যদি হয়েন, তবে সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি এবং অন্য সর্ব শক্তি তাঁহাদের মানিতে হইবেক, কেননা যাহার সর্ব শক্তি নাই, তাহাকে ব্রহ্ম বলা যায় না; এরূপে এক সর্বশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে যদি সৃষ্টি প্রভৃতি জগতের তাবৎ কার্যনির্বাহ হইল, তবে অন্য সকল ব্রহ্ম সম্যক প্রকারে অপ্রয়োজন হইলেন; অতএব প্রত্যেক ঐ সকল দেবতাকে স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম কহিতে পারিবে না। আর তাঁহারদিগের মধ্যে কেবল এককেও ব্রহ্ম কহা শাস্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু যেমন ঐ একেকে কল্পনা করিয়া পুরাণাদিতে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, সেইরূপ অন্য-অন্যকেও স্থানান্তরে কল্পনা করিয়া ব্রহ্ম কহেন; অতএব কল্পনাকে একস্থানে সত্য জ্ঞান করা, অন্য স্থানে সত্য জ্ঞান না করা, এ সর্বথা অসিদ্ধ হয়।

পৌত্তলিক— তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক নহেন, বস্তুত এক, কিন্তু পৃথক পৃথক শরীরে দৃষ্ট হয়েন।

পৌত্তলিক প্রবোধ (১৮৪৬)

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তর প্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের সহিত বৈধব্যঘটনার কিরূপে কার্যকারণ-ভাব ঘটিতে পারে? পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়। এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসরূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে একজনের মাদক দ্রব্য-সেবন অন্যজনের মত্ততা, অন্যজনের চক্ষুলৌহিত্য, অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতরের বাক্যস্খলন সর্বদাই সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ বিদ্যার এমত মারাত্মক শক্তিও এ-পর্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, কেহই আপন পরিবারের সংহারক হন নাই এবং হইবেনও না। আর বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য-দুঃখভাগিনী হয়— ইহা আরও হাসিবার কথা। কারণ যাঁহারা বিদ্যাধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সংসারে যথার্থ সৌভাগ্যশালী ও যথার্থ ধনবান, তদ্ভিন্নেরা কেবল এই বিশ্বম্ভরার ভারস্বরূপ, জীবন্মৃত, একান্ত হতভাগ্য ও নিতান্ত দরিদ্র। বিদ্যারূপ ধনশালী ব্যক্তিরা আপনার অবিনশ্বর নির্মল সনাতন বিদ্যার প্রভাবে যে কিরূপ অনির্বচনীয় দুঃখাসম্ভিন্ন সুখাস্বাদ করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। ইতর ধনবানের সেরূপ সুখভোগ হওয়া সুদূরে পরাহত মনেরও বিষয় নয়। অতএব স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে বিধবা অথবা সৌভাগ্যবতী হইবে, এই কথার উত্তর না দেওয়াই সমুচিত উত্তর।

যাহারা কহেন, বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখর, দুশ্চরিত্র ও অহঙ্কারী হইবে, তাহাদিগকে উত্তর প্রদান-সময়ে কিছু হিত উপদেশ দান করা বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী, সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে, ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান মনুষ্যেরা যে-দেশে বসতি করেন কিম্বা যে-সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বৈর আলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই সেই দেশ ও তত্তৎসমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই। বিদ্যাবান মনুষ্যেব চরিত দর্শন করা দূরে থাকুক, কখন শ্রবণও করেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষা (১৮৫০)

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা দুর্যোধন মহাক্রোধী, অর্থলোভী, মানী, কদাচারী, নির্দয়, সুহৃৎ-শত্রু, মহাপাপকারী; তাঁহার কুমতি দ্বারা ও তাঁহার আত্মমন্ত্রী অরিষ্ট দুষ্টধী শকুনির শঠতা দ্বারা ক্ষমাবন্ত পুণ্যবন্ত দয়াবন্ত মহান্ত পাণ্ডুসন্তানেরা রাজ্যাদি বিবর্জিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ পরিমাণে অরণ্যে শরণ লইলেন। তদ্ধেতুক প্রজাবৃন্দ চতুর্দিকে রাজ্যত্যাগানন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইলেন এবং যে-স্থানে মন্ত্রী শকুনি ও রাজা দুর্যোধন, তথায় সাধু সজ্জন কদাপি বাস করিতে পারেন না। বিশেষতঃ পাপিষ্ঠ রাজা হইতে প্রজার সুখ ও আত্মকুলধর্ম-পুণ্যকর্মাদি সামুদায়িক নষ্ট হয়, সুতরাং প্রজাবর্গ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অরণ্যগমনকালীন খেদপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন, অস্মদাদিকে পরিত্যাগপূর্বক যে-স্থানে যাইবেন, আমরাও তথায় যাইব। যেহেতুক কৌরব ছলনা দ্বারা সর্বস্বজয়ী হইল, তৎপ্রযুক্তই সমূহ দুঃখগ্রস্ত হইয়া তব সন্নিধানে আগত হইলাম। যাহার দর্শনে, আসনে, শয়নে পাপস্পর্শ ব্যতীত ধর্মসঞ্চার হয় না, ও যাহার রাজত্বে প্রজানিস্পীড়ন ও পরসর্বস্ব-হরণ, ও যাহার কিল্বিষ-স্বরূপ তপনের প্রখরতর করপ্রসারণ দ্বারা রাজ্যস্থ সমস্ত ব্যক্তিই উত্তাপিত হইতে লাগিল, তাহার রাজ্যাধিকারে সুখসম্পদ-সম্ভোগ ও ধর্মাচার-পরিরক্ষণে কেহই শক্ত হইবেক না। কেননা পাপির সংসর্গে পাপেরই বৃদ্ধি হয় ও পুণ্যবানের সংহতি জন্য অবশ্যই পুণ্যোপার্জন হইয়া থাকে— এবং রাজার পাপ হইলে প্রজার কখনই অব্যাহতি হয় না— অতএব সকল সদ্‌গুণাশ্রয় যে-আপনি, এক্ষণে আপনারই শরণাগত হইলাম; যথাযোগ্য বিধানে এ-অধীনদিগকে সর্বাপদ হইতে মুক্ত করুন।" ইত্যাদি করুণারসাভিষিক্ত বচনোক্তিতে রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাসমূহ সম্বোধনে পীযূষসদৃশ বাগমৃত বিতরণ করিতে লাগিলেন, "হে প্রজাগণ, তোমারদিগের প্রিয় বাক্য শ্রবণান্তে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম... সম্প্রতি পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, মাতা কুন্তীদেবী— ইঁহারা আমারদিগের জন্য সর্বদা শোকমোহে পরিতাপিত আছেন, অতএব স্বরাজ্যে অবস্থান পুরঃসর তাঁহারদিগকে পরম যত্নে সংরক্ষণ কর।"

সারাবলি (১৮৫১), যুধিষ্ঠির সমীপে প্রজাবর্গের খেদ

শ্যামাচরণ শর্ম সরকার

অনেকে বিবেচনা করেন, বাঙ্গলা ভাষা এমত সমৃদ্ধ নয় যে, তাহাতে নানা দেশীয় শাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করা যাইতে পারে। এ তাঁহাদের ভ্রম। কিন্তু যদ্যপি বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র বলিয়াই মানা যায়, তথাপি কি ইহা প্রবৃদ্ধা হইতে পারে না? যৎকালে ইংরাজদের ভাষা অতি ক্ষুদ্র ও অনেক বিষয়ে অকর্মণ্য ছিল, তখন যদি তাঁহারা এইরূপ বিবেচনায় ভরসাহীন হইতেন, তবে কি তাঁহাদের ভাষা এমত প্রবৃদ্ধা ও তাহাতে লক্ষাতীত গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিত? না তাহাতে নানাদেশীয় এত শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার হইয়া তদ্দেশে এত বিদ্যাবুদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইত? কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহারা যেমত অকর্মণ্য বোধ করেন, তাহা তেমন নয়, এবং ইংরাজদের আদি ভাষাবৎ ক্ষুদ্রও নয়। ইহাতে যে-কোন অভিপ্রায় যথাযোগ্যরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; দুই বা অধিক পদ যেমন সংস্কৃতে তেমনি বাঙ্গলাতে সন্ধি-সমাস দ্বারা সংযুক্ত করা যাইতে পারে, এবং যেকোন শাস্ত্রীয় পদ-বিশেষ যথার্থতঃ অনুবাদ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার ন্যায় রচনাসুগমতা ইউরোপীয় অতি অল্প ভাষায় আছে। অধিকন্তু, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক ও সমুচ্চয়ার্থকাদি শব্দ বাঙ্গলায় বিস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় তাবতই চলিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বহুকাল পর্যন্ত এদেশে মুসলমানদের অধীন থাকাতে আর অধুনা ইহা ইংরাজ-রাজ্য ও ইহাতে নানা-দেশীয় লোকের আগমন হওয়াতে তত্তদ্ভাষার অনেক কথা বাঙ্গলায় চলিত হইয়া বঙ্গভাষা আরো অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে। এতাবতা, আমাদের ভাষা ক্ষুদ্র নয়, কেবল ইহাতে পুস্তক অল্প, বিশেষতঃ শাস্ত্রবোধক হিতোপদেশক গ্রন্থ অতি অল্প, কিন্তু সে-দোষ আমাদের, আমাদের ভাষার নয়। অতএব এক্ষণে আমাদের যে-অবস্থা, তাহাতে পূর্বাবস্থ ইংরাজদের মত বিবিধ উপকারক শাস্ত্রবোধক ও বুদ্ধিবর্ধক গ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রস্তুত করিয়া তদুপদেশ দ্বারা সাধারণের মনকে বিজ্ঞানরূপ কিরণে প্রদীপ্ত ও অবিদ্যা-জন্য-দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা-ই শ্রেয়ঃ কর্ম। কিন্তু বাঙ্গলা উত্তমরূপে ও শুদ্ধরূপে না জানিলে কিরূপে তৎকর্ম সম্পন্ন হইতে পারে? এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণ না জানিলেই বা কিরূপে শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা জানা যাইতে পারে? এতাবতা অগ্রে একখান ব্যাকরণ রচনা অত্যাবশ্যক। কারণ ব্যাকরণ সকলের মূল; ব্যাকরণ-জ্ঞান বিনা যিনি যাহা লিখুন, সে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ (১৮৫২), ভূমিকা

এই কথাতে করুণা কিছু ভয় পাইল; পরে সে কহিল, "মেমসাহেব, আজি সে কিঞ্চিৎ ভাল আছে; এজন্যে আমি তাহাকে অনেকবার বারণ করিলেও সে বাহিরে খেলা করিতে গিয়াছে। মেমসাহেব, সে বড় চঞ্চল বালক, কাহারো কথা মানে না।"

আমি বলিলাম, "কল্য যে অতিশয় পীড়িত ছিল, আজি খেলা করিতে বাহিরে গিয়াছে— এই কথাতে আমার বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছে। হায়, করুণা! বোধ হয় তুমি এই বিষয়ে আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে সত্য কথা কহ নাই।"

করুণা লজ্জিতা হইয়া উত্তর করিল, "মেমসাহেব, গত মাসে তাহার কেমন শক্ত ব্যামোহ হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানে; কিন্তু এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সে কিঞ্চিৎ ভাল আছে বটে।" করুণা এই কথা কহিতেছে, এমন সময়ে একটি ছোট বালক গৃহের ভিতরে দৌড়িয়া আইল। তাহার বর্ণ অতিশয় কাল; এবং ধুলা ও কাদাতে খেলা করিয়া আসিয়াছিল, এইজন্যে তাহাকে আরও মলিন বোধ হইল। সে প্রায় উলঙ্গ, কেবল তাহার কোমরে একখানি ছেঁড়া কানি বাঁধা ছিল। ঐ ছেল্যাকে দেখিয়া তাহার মা তাহাকে হঠাৎ বলিল, "নবীন, এখানে আসিয়া মেমসাহেবকে সেলাম কর। এই মেমসাহেব অতিশয় দয়ালু; ইনি কল্য তোমাকে রুটী ও মিসরী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" কিন্তু নবীন আপন মাতাকে উত্তর করিল, "আমি মেমসাহেবকে কেন সেলাম করিব? তুমি তো তাঁহার রুটী ও মিসরী আমাকে খাইতে দিলা না!"

তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কেমন কথা! তবে সে-রুটী কি হইল?" নবীন তাড়াতাড়ি করিয়া কহিল, "মেমসাহেব, আমার নিকটে শুন; আমি তোমাকে বলি। বকুল নামে একজন স্ত্রী এই পাড়াতে থাকে; তাহার মেয়ার ব্যামোহ হইয়াছে, এইজন্যে সে দুই পয়সা দিয়া মায়ের নিকটে ঐ রুটী কিনিয়া লইল; এবং মা সেই পয়সাতে তখনই তামাক কিনিয়া আনিল। ও মেমসাহেব, তুমি যদি তাহার তামাক-খাওয়া দেখ, তবে আশ্চর্য জ্ঞান করিবা! সমস্ত দিন তাহার আর কোন কর্ম নাই, এবং রাত্রির মধ্যে সে আমাকে একশতবার জাগাইয়া বলে 'তামাক সাজ্, তামাক সাজ্'। এই কারণে পিতার নিকটে কতবার মার খাইয়াছে, তবু তাহার জ্ঞান হয় না।"

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২), তৃতীয় অধ্যায়

জান রাবিন্‌সন

আমার নাম রাবিন্‌সন্‌ ক্রুসো। কনিষ্ঠ হওয়া প্রযুক্ত কোন প্রকার ব্যবসায় আমার শিক্ষা করা হইল না, অতএব যৌবনকালাবধি বিদেশে গমন করিতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইল। বালকেরা পাঠশালায় না গিয়া বাড়িতে যে-প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে, সেই প্রকার শিক্ষা পিতা আমাকে নিজ গৃহে দেওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে আমি উকীল হই; কিন্তু আমার বাসনা কোন জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া বিদেশে যাই। পিতামাতা জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেই অতি স্নেহের বাক্যে আমায় নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু বিদেশে গমনের উৎকট বাসনাতে সকলের বাক্যই আমি তুচ্ছ করিলাম। অদৃষ্টক্রমে আমার সে অনুরাগ অতি প্রবল হওয়াতে পরে অত্যন্ত বিপত্তি ঘটিল।

পিতা গম্ভীর, বুদ্ধিমান; আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তিনি আমায় নানা গুরুতর সৎপরামর্শ দিলেন। বিশেষতঃ তিনি বাতরোগে গতিশক্তি-রহিত হইলে একদিন আমাকে ডাকিয়া পূর্বোক্ত কথার উপলক্ষে অত্যন্ত ব্যগ্রতাপূর্বক কহিলেন, "বৎস, পিতামাতা ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কেন তুমি বিদেশ যাইতে বাসনা করিতেছ? কেবল ভ্রমণকরণ-অভিপ্রায় বিনা অন্য কোন কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না। স্বদেশে থাকিলে অনেক ভদ্রলোক সাহায্য করিয়া তোমার মঙ্গল করিতে পারেন। তুমি মনোযোগপূর্বক পরিশ্রম করিলে অর্থও পাইতে পার, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সুখে কালযাপন করিবা। দুই প্রকার লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশগমন করে: এক, যাহারদের কোন প্রকারে দিনপাত চলে না; দ্বিতীয়, অনেক সম্পত্তি থাকা প্রযুক্ত যাহারা সাধারণ লোকদের অজ্ঞাত, অথচ অতি সাহস্রিক কর্ম করিয়া প্রসিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুমি তাহাদের মত দরিদ্রও নহ, ধনবানও নহ, কেবল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। আমি বহুকাল অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছি মধ্যবিত্তদেরই অবস্থা উত্তম, তাহাতেই বিলক্ষণ সুখভোগ হয়। যেহেতুক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মকারকদের মত তাহাদিগকে অনেক ক্লেশ ও পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ ধনবানদের ন্যায় তাহাদের অহঙ্কার, সুখাভিলাষ, লোভ, ঈর্ষাদি নাই. অতএব বৎস, এই অবস্থা-ই ভাল। প্রমাণও বটে, যেহেতু সর্বজাতীয় লোকেই এমত অবস্থার বাসনা করে। রাজকুমারেরা আজন্মকাল উত্তম উত্তম বস্তুভোগ করত যদি কখন কিঞ্চিৎ দুঃখ পান, তবে ক্ষুব্ধ হইয়া কোন কোন সময়ে কহিয়া থাকেন, 'হায়! আমি মধ্যবিত্ত হইলে ভাল হইতাম।' একজন পণ্ডিতও পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'দরিদ্রও না হই, ধনবানও না হই!' "

রাবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর জীবনচরিত (১৮৫২)

নীলমণি বসাক

পূর্বকালে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, সাবিত্রী তাঁহার কুমারী। ঐ রাজা সন্তানাদি-অভাবে সতত নিরানন্দ থাকিতেন। পরে অনেক দেবারাধনা করিয়া অবশেষে এই কন্যা হইয়াছিল। তাহাতে ঐ কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং বহু যত্নপূর্বক তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন। এই কন্যা জ্ঞানশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা হইয়াছিলেন এবং শিল্পকর্মও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, সাবিত্রী পরম সুন্দরী ছিলেন...

ইদানীন্তন নারীগণকে অন্তঃপুর-স্বরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখার যে-কুরীতি হইয়াছে, পূর্বকালে এ-রীতি ছিল না। সাবিত্রী যথা-তথা যাইতেন, এবং রাজা তাঁহার সেবার জন্য এক শত সমবয়স্কা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এই সকলপরিচালিকা সমভিব্যাহারে সাবিত্রী এক দিবস তপোবনে মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও শাস্ত্রালাপ করিতে গিয়াছিলেন। তপোবন হইতে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, অরণ্যমধ্যে এক কুটীরে এক অন্ধ, এক বৃদ্ধা নারী ও এক যুবা পুরুষ আছেন। তত্রস্থ লোকদিগকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, দমসেন নামে অবন্তীর রাজা শেষ অবস্থায় অন্ধ হইয়াছিলেন এবং সত্যবান নামে তাঁহার পুত্র অতি শিশু ছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে হীনবল দেখিয়া তদীয় শত্রুগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে। রাজা দমসেন পুত্র ও ভার্যাকে লইয়া মুনিগণের আশ্রয়ে আসিয়া তপোবনে বাস করিতেছেন। সাবিত্রী সত্যবানের মনোহর রূপ অবলোকন এবং তাঁহার পরিচয় শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন এবং তাঁহার এতদ্রূপ দশা দেখিয়া ও সত্যবানকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিয়া, পিতামাতার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

অনন্তর সাবিত্রী স্বালয়ে প্রত্যাগতা হইয়া জননীকে আনুপূর্বিক তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তাঁহার গর্ভধারিণী দুহিতার এবম্ভূত বিবাহের কথায় চমৎকৃতা হইয়া রাজাকে তাবৎ বিবরণ জানাইলেন। রাজা স্বাভিমতের বিরুদ্ধ কার্যের সঙ্ঘটন হেতু, যাহাকে সাবিত্রী বিবাহ করিবেন, সে সদ্বংশোদ্ভব কি না এবং সুপাত্র কি কুপাত্র, এই সকল ভাবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

নরনারী (১৮৫২), সাবিত্রী

রামকমল ভট্টাচার্য

অনেকে উচ্চপদ কামনা করেন, কিন্তু উচ্চপদে অসুখ বিস্তর। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন-রক্ষা ও মনের ভয়ের নিমিত্ত সর্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়; শরীর, সময় ও কর্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না; কার্যচিন্তা দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্মে সময় ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক-প্রকার মূঢ়ের কর্ম। কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজস্বী বা নিতান্ত ধার্মিকের কর্ম নয়। পদপ্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্টতরে পড়ে এবং কত অবমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়! উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদান-পরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী প্রমাদ বা স্খলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের চোখ পড়ে এবং তাহারা তিল-প্রমাণ দোষকে তাল-প্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণস্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়; ঝটিতি পরিত্যাগ করাও সহজ নয়; উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সম্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান-সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্যরূপে থাকিতে ভালবাসে না। সকলে বড় পদ স্পৃহণীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশমাত্র নাই। তাহারা পরের মুখে অন্ন চাকে এবং আপনাদিগের অন্তরে অনুসন্ধান করিলে দুঃখ বই সুখের হেতু কিছুই দেখিতে পায় না। আপনারা যে দুঃখের ভাগী, শীঘ্রই বুঝিতে পারে; কিন্তু আপনারা যে দোষের ভাগী, তত শীঘ্র বোধ করিতে পারে না। তাহাদিগের চিত্ত কার্যচিন্তায় এত কবলিত ও ব্যাসক্ত থাকে যে, আত্মানুসন্ধান করিবার অবকাশ থাকে না। সকলের কাছে পরিচিত থাকিয়া আপনার কাছে অপরিচিত থাকা এক-প্রকার বিপদ সন্দেহ নাই।

বেকনের সন্দর্ভ (১৮৫২)

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত 'বাবুবিলাস' 'বিবিবিলাস' 'দূতীবিলাস' গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্‌ড্‌ বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখাও প্রাচীন হইয়া পড়িল, যেহেতু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতার ভাব-পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে, 'ধর্মসভার' গয়া-গঙ্গা লাভ হইয়াছে, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পথ পরিমুক্ত হইয়া আসিতেছে, এই ক্ষণে আর গোবর-ভক্ষণ, হুঁকা-বারণ, বিষ্ণু-স্মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রথা প্রসিদ্ধ নহে, হিন্দু সন্তানগণ এবং স্বধর্মত্যাগী খ্রীষ্টানেরা একাসনে উপবেশনপূর্বক দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। অতএব কি আহ্লাদ! এরূপ কাহার মনে ছিল যে, কলিকাতার স্বদেশীয়-বিদেশীয় বিদ্বান লোকেরা একত্রে বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব, সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা–হার যাহাতে সভ্যকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন! উর্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক; অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন, দ্বেষ প্রভৃতি জাঙ্গল কণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়। যদি বলেন, "বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে-সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে-সকল কবিতা হয় নাই?" উত্তর: হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনাকল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকিঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেইরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকিঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্তী হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্যমান্য বাঙালি কবি হইতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে কত বড় আস্পর্ধার বিষয় হইত!

বাঙালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৫২)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন। ইনি কতকালের পুরাতন মনুষ্য ও কতকাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তথাচ ইঁহার কৃত একটিও পদ অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতনভাবে পরিচিত হইতেছে: যখনি যাহা শুনা যায়, তখনই তাহা নূতন বোধ হয়...

কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, কস্মিনকালে দৎকলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত, তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থ-পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাহারই বর্ণনা করিতেন। এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্নচিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিল না, বিষয়-বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের উত্তমতা বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, অতি জঘন্য দ্রব্য আহার করিয়া ও অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অবস্থার উন্নতিকল্পে মনোযোগ না থাকাতে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তিনি যদ্রূপ অদ্বিতীয় কবি ছিলেন ও তাঁহার জীবিত সময়ে কবিতার যদ্রূপ সমাদর ছিল এবং তৎকালে এই দেশ যদ্রূপ ধনিলোকে মণ্ডিত ছিল, ইহাতে বিষয়বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বাসনাবিশিষ্ট হইলে অক্লেশে বিপুল বিত্ত সংগ্রহপূর্বক পুত্রপৌত্রাদিকে সমূহ সুখে সুখী করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন, তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালী-নাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করেন, অতি কুৎসিত যৎসামান্য রূপাসোনার উপাসনা তাঁহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে?

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (১৮৫৩)

রাখালদাস হালদার

শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্যসম্পন্ন নাম এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত আছে, তদীয় পবিত্র চরিত্র কীর্তনপূর্বক কত কত কবি অমর কীর্তি লাভ করিয়াছেন। কি এক দেবোচিত অসাধারণ কার্য দ্বারা তিনি আমারদের উপকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নাম ও চরিত্রকে ভুলিতে পারা যায় না! কোন স্বর্গোপযুক্ত-পদার্থপূর্ণ অক্ষয়শীল ভাণ্ডাগার সহ তাঁহার চরিতের তুলনা দেওয়া অত্যুক্তি নহে। ক্রমাগত চারি সহস্র বৎসর লোকে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছে; তাঁহার চরিত্রের বারম্বার পর্যালোচনা করিয়াছে; তথাপি এখনও তাহা আনন্দকর নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামচন্দ্র যথার্থই এক সর্বলোকপ্রিয় রাজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সহিত আততায়িরূপে যুদ্ধ করিয়া যবন-নৃপতি সিকন্দর যদি একজন প্রশংসনীয় যোদ্ধা হয়েন, নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়-সময়ে ইউরোপীয় লোকদিগকে যথাকথঞ্চিদ্রূপে সাহায্য করিয়া মস্কো-অধিপতি আলেকজাণ্ডার যদি 'ইউরোপের পরিত্রাতা' উপাধির যোগ্য হয়েন, তবে আমাদের রামচন্দ্র, যিনি স্বদেশের— এই বৃহৎ ভারত রাজ্যের— অতীব অধমাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার সৌভাগ্যসুখ সমানয়ন করেন, যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের এক আশ্চর্য অতুলপ্রায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে এতদ্দেশের স্বভাবতঃ অত্যুক্তিপ্রিয় পণ্ডিতেরা যে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কোনমতেই বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রে মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিবার যদি কুত্রাপি কোন প্রকার বিধি থাকে, তবে রামচন্দ্র অবশ্যই সেই উপাধির উপযুক্ত। তাঁহার গুণের তুলনাস্থল কি দুর্লভ! তিনি গৃহমধ্যে থাকিয়া স্বকীয় অপার ঔদার্যগুণ এবং বদান্য স্বভাব বশতঃ যদ্রূপ পিতা মাতা ভ্রাতা ভার্যা সুহৃৎ এবং দীনদরিদ্র জনগণের পরমপ্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন, সিংহাসনস্থ হইয়া অপক্ষপাতসম্পন্ন সুবিচার দ্বারা প্রজাবর্গ হইতে তদ্রূপ ধন্যবাদ উপার্জন করিতেন এবং অমিততে জঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আততায়ি শত্রুদল নিপাতপূর্বক সেইরূপ যশোভাজন হইতেন। সিকন্দর, বোনাপার্তি এবং সুইদেনের দ্বাদশ চার্লসের ন্যায় তিনি যদি দেশজয়মাত্রকে আপনার অভিসন্ধি করিতেন, তবে এক্ষণে তাঁহার নামোচ্চারণমাত্রে আমাদের অন্তঃকরণে যে এক অপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহা কদাপি হইত না।

শ্রীরামচরিত (১৮৫৪)

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

সেই মহীরুহের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাতা বাস করিতেন। কালক্রমে মাতা গর্ভবতী হইলেন এবং আমাকে প্রসব করিয়া সূতিকাপীড়ায় অভিভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তমা জায়ার বিয়োগশোকে অতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিতচিত্ত হইলেন; তথাপি স্নেহবশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না, তথাপি আস্তে আস্তে সেই আবাসতরুতলে নামিয়া পক্ষিকুলায়ভ্রষ্ট যে-যৎকিঞ্চিৎ আহারদ্রব্য পাইতেন, আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত আপনি ভোজন করিয়া যথাকথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেন।

একদা (...) আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছে, এমন সময় ভয়াবহ মৃগয়া-কোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ সকল গম্ভীর স্বরে গর্জন করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, সাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশু সকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তু সকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, সিংহের গর্জনে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও ভয়ে কাঁপিত লাগিল। আমি সেই কোলাহলশ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া পিতার জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম...

মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে-দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমূর্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্তী কালান্তকের স্মরণ হয়।

কাদম্বরী (১৮৫৪), প্রথম পরিচ্ছেদ

রামনারায়ণ তর্করত্ন

এই যে বেলা অবসন্না হইয়াছে। এক্ষণ ভগবান মরীচিমালী বিশ্বসংসারব্যাপিনী কিরণমালাকে সংহরণপূর্বক অপূর্ব শান্তমূর্তি ধারণ করিয়াছেন; সূর্যদেব জলধি-বলয়িত বসুন্ধরামণ্ডল বেষ্টন করিয়া পথশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আতিথ্যাভিলাষে কি পশ্চিমাচলচূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন? এ কি আশ্বর্য! যে সহস্রাংশুমণ্ডল দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথাতীত ছিল, তাহা এমন সুদৃশ্যভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুশোভিত করিতেছে। এই যে সূর্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্তবর্ণ হইল, এই কমলিনীনায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে-অনুরাগরাশি অপ্রকাশিতরূপে স্বকীয় মানস-মন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভাবী বিয়োগ-ভাবনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইবাতে ঐ সঞ্চিত অনুরাগরাশি গলিত হইয়া প্রকাশ পাইল; তাহাতেই কি আদিত্যমণ্ডল আরক্ত হইতেছে? এই যে রবিমণ্ডল পশ্চিমসিন্ধুসলিলে পতিত হইল!... অতি বেগে সূর্যমণ্ডল সুদূর গগনতল হইতে সমুদ্রজল মধ্যে পতিত হইলে তাহার অভিঘাত জন্য সমুত্থিত জলবিন্দু-সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে?... জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ তাপসমূহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং সুশীতল হইল? অহহ! বিরহিজন-সন্তাপে কাহারো সঙ্কোচ নাই!...

হে অন্তঃকরণ, তুমি সেই রম্ভোরু-সম্ভোগে সদা সম্ভোগী রহিয়াছ, কিন্তু এই সহভব, সহবর্ধমান, পরমপ্রেমাস্পদ এবং তোমার বিরহে অহরহ ম্রিয়মাণ যে এই শরীর, ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই অচির-পরিচিত চারুলোচনার অনুগমনে তুমি কি নিতান্ত নিন্দনীয় হইতেছ না?

সেই ইন্দীবরাক্ষীর অপ্রত্যক্ষ নয়নযুগলে জলধারা গলিত হইতেছে, তাহার পীযূষসদৃশ মধুরালাপ-শ্রবণাভাবে কর্ণকুহর ক্লেশ পাইতেছে, এবং তাহার পরীরম্ভ-সম্ভোগ না থাকায় কায়যষ্টি সাতিশয় শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু মন! তুমি সে রঙ্গিনীর সততসঙ্গী হইয়াও যে-প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিতেছ, তাহা আশ্চর্য! বিশেষতঃ সঙ্গমাবস্থা অপেক্ষা বিয়োগাবস্থাতেই তুমি সুখী! সকল ইন্দ্রিয়কে বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে তাহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য নিরীক্ষণ, মধুরালাপ-লহরী শ্রবণ, অধর-সুধাস্বাদন, সুগন্ধি-নিশ্বাস সমীরণাঘ্রাণ এবং সেই অনন্যাদৃশ সুশীতল শরীর-স্পর্শ— ইহা সমস্তই তুমি অনুভব করিতেছ, তবে তোমার ক্লেশ কি? অথবা তুমি নিতান্ত লঘুপ্রকৃতি! অনুযোগযোগ্য নও!

কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), ষষ্ঠ অঙ্ক

মনমোহিনী আরো মনে করেন, দশ বৎসর হইল ভোলানাথের কাল হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমি শোকে অত্যন্ত কাতর হই, মনে করি স্বামী বিনা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, কিন্তু সময়ক্রমে সে-শোকে অল্প অল্প করিয়া প্রাণ ঘুচিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ভোলানাথের নাম শুনিলে মনে অল্প দুঃখ হয় এইমাত্র, কিন্তু সে-দুঃখ বিস্তর ক্ষণ থাকে না, যেমন হয় তেমনি পড়িয়া যায়। আরো তিন চারি বৎসর হইল, আমি কেমন একপ্রকার উদাসমনা হইয়া পড়িতেছি, সর্বদা ভাবি, আমি যেন একাকিনী, একজন আত্মীয় বন্ধু থাকিলে কত সুখী হইতাম, তাঁহাকে মনের সকল কথা বলিতাম, তিনি আমাকে সৎপরামর্শ দিতেন, দুঃখকালে সান্ত্বনা করিতেন, পীড়ার সময় যত্ন করিতেন, আমিও প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতাম। এমন বন্ধু পাইবার আশা করা বৃথা, ইহা আমি বেশ জানি, জানিয়াও আশান্বিত হইয়া থাকি, আশান্বিত হইয়া ভাবিলেও মন তুষ্ট থাকে। বোধ করি আমারও যেমন দশা, অন্য অন্য বিধবারও তেমনি দশা, পরমেশ্বর জানেন, আমার কপালে কি আছে।

যদি বিধবাবিবাহে দোষ না থাকিত, তবে আমি ব্রজনাথকে বিবাহ করিতাম, সন্দেহ নাই। ব্রজনাথ বড় সৎলোক, তাঁহার সঙ্গে আজকালের আলাপ নয়, তিনি পাড়াপ্রতিবাসী; তাঁহার সহিত জন্মাবধি আলাপ আছে, বলিতে হইবেক...

এই প্রকারে ব্রজনাথবাবুর সকল সদ্গুণ ভাবিতে ভাবিতে মনমোহিনীর মন ক্রমে ক্রমে নরম হইয়া বিবাহে রত হয়। পরে অকস্মাৎ তাঁহার অন্তঃকরণে একটি ভাব উদয় হয়, মনমোহিনী কাঁদিতে লাগিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে মনে করেন, আমি কি বিষম বিপদে পড়িলাম, বিবাহে মতি হইতেছে কেন? বিবাহ্ করিলে স্ত্রীলোকের যে-সতীত্ব ধর্ম, তাহা তো অধঃপাতে যাইবে, আরো পরকালে ভোলানাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে কি জবাব দিব? তাঁহাকে কোন্ মুখে বলিব, আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়াছিলাম? না না, প্রাণ যায় স্বীকার করিব, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহে কখন সম্মত হইব না।

ব্রজনাথবাবুর চিঠি (১৮৫৫)

রাজকুমারী রাজকুমারকে পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ কেবল রাজকুমার-চিন্তায় মগ্ন হইল। বিরহবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া কৃষ্ণপক্ষ-চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। আহার-বিহার পরিহার করিয়া কেবল রহস্যমন্দিরে সুশীতল পল্লব-শয়নে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। সখীগণ রাজকুমারীকে বিরহানলে নিতান্ত তাপিত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইল। তাঁহার সন্তাপ-শান্তির জন্য শীতল জল, চন্দন, মৃণাল ও পদ্মপত্রের ব্যজন প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু আহরণ করিল। কিন্তু ইহাতে তাপ-নিবৃত্তি না হইয়া বরং তপ্ত তৈলে জলসেকের ন্যায় দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বালচন্দ্রিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সখি, কামদেবকে কুসুমায়ুধ ও পঞ্চবাণ বলিয়া থাকে, এ-কথা মিথ্যা! কাম আমাকে বজ্রসম অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করিতেছেন! সখি, এই সুশীতল পল্লব-শয্যা অগ্নিশিখার ন্যায় সন্তাপ দিতেছে, সুশীতল চন্দনলেপ গরল-লেপের ন্যায় জ্বালা বিধান করিতেছে। সখি, তোমরা কেন বৃথা আয়াস পাইতেছ? সেই হৃদয়বল্লভ রাজকুমার ব্যতিরেকে আমার এ-ব্যাধি উপশমের অন্য ঔষধ নাই।"

বালচন্দ্রিকা প্রিয়সখী অবন্তিসুন্দরীর এইরূপ বিলাপ-বচন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল; মনে মনে বিবেচনা করিল, রাজনন্দিনীর যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, রাজবাহনকে সত্বর আনয়ন না করিলে ইঁহার প্রাণ রক্ষা ভার হইয়া উঠিবেক। এই চিন্তা করিয়া বালচন্দ্রিকা আর-আর সহচরীকে রাজকুমারীর পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়া রাজবাহনের ভবনে উপস্থিত হইল। দেখিল, তিনিও মদন-বেদনায় অধিকতর কাতর হইয়াছেন। প্রিয়বন্ধু পুষ্পোদ্ভবের সহিত সেই প্রাণেশ্বরীর কথা লইয়াই কালক্ষেপ করিতেছেন। রাজবাহন প্রিয়তমার প্রিয় সহচরী বালচন্দ্রিকাকে দেখিয়া পরম সন্তোষে সমাদর করিলেন এবং প্রিয়তমার বিবরণ জিজ্ঞাসিলেন। বালচন্দ্রিকা রাজবালিকার প্রেরিত পত্রিকা প্রদান করিয়া বলিল, "দেব, যেদিন ক্রীড়াকাননে রাজনন্দিনী তোমাকে দেখিয়াছেন, তদবধি তাঁহার হৃদয় মদনানলে দগ্ধ হইতেছে, পল্লব-শয়নেও সন্তাপ-শান্তি হইতেছে না। মনোবেদনা গোপন করিতে না পারিয়া তোমার অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই পত্র লিখিয়াছেন।"

দশকুমার (১৮৫৬), পূর্বপীঠিকা, পঞ্চম উচ্ছ্বাসঃ অবন্তিসুন্দরীর পরিণয়

তাঁহার সে-প্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ হইল। ইহাতে আমি সবিনয় সম্বোধনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলাম, "ধর্মপিতঃ! এই যে সম্মুখে ভগ্নাবশেষ ঘর দুখানি পতিত রহিয়াছে, ইতিপূর্বে ইহাতে কাহাদের বাস ছিল, অবগত হইতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি; যদি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার এ-প্রার্থনা পূর্ণ করেন, চরিতার্থ হই।" মহাপুরুষ আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া করুণবচনে উত্তর করিলেন, "বৎস, এই যে ভগ্নাবশিষ্ট গৃহ দুখানি ও সম্মুখ-পতিত ভূমিখণ্ড দেখিতেছ, বিংশতি বৎসর পূর্বে এ-সমস্ত দুই জন গৃহস্থের অধীনে ছিল। তাহারা এ-স্থলে থাকিয়া বহু বর্ষ পরমসুখে যাপন করিয়া গিয়াছে। আহা, তাহাদের ইতিহাস বড়ই দুঃখজনক। শ্রবণ করিলে চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠে। তুমি তাহাদের কথা জিজ্ঞাসিতেছ বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার কোন ফল নাই; কারণ তোমাকে পথিক দেখিতেছি, কার্যবশতঃ ভারতবর্ষে যাত্রা করিতেছ, তোমার এই উপদ্বীপ-স্পর্শ কেবল ইচ্ছাক্রমে ঘটিয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি এখানে বাস করিত, তাহাদিগকে উদাসীন বলিলেও বলা যায়। তাহারা সংসারের কোন বিষয়ই অবগত ছিল না। অতএব তাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সুখ-সৌভাগ্যাদির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তোমার কিছুই সন্তোষ হইবেক না। এই পৃথিবীমণ্ডলে যাহারা মহামহিম হইয়া উঠেন, তাহাদের কে কেমন চরিত্রে, কে কেমন সুখসম্ভোগে কাল হরণ করিয়া যান, তাহাদের নিষ্ফল ইতিহাস শুনিতেই সকলের ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য প্রকাশ দেখা যায়; যাহারা দীনহীন হইয়া সুখসম্ভোগ করে, তাহাদের কথা কাহার শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে?"

বৃদ্ধের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে আমি যাহার পর নাই ব্যগ্রতাপূর্বক তাঁহার সমীপে নিবেদন করিতে লাগিলাম: "ধর্মপিতঃ, আপনার আকার প্রকার দেখিয়া ও গূঢ়ার্থ বাক্য শুনিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি যৎপরোনাস্তি বহুদর্শী, অতএব প্রার্থনা করি, যদি আপনার অবকাশ অধিক থাকে, তবে এই বিজন দেশের পূর্বতন নিবাসীদের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক। সাধুদিগের চরিত্র শুনিলে বিষয়ী লোকেরাও সাতিশয় সুখী হইয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া সেই পুরষপ্রবর আমার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং করার্পিত বদনে যেন যথার্থই কোন বিষয়ের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে লাগিলেন; এমনি ভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাদের ইতিহাস কহিতে আরম্ভ করিলেন।

পাল ও বর্জিনিয়া (১৮৫৬), উপক্রমণিকা

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

আমরা এতকাল 'আমরা আমরা' বলিতাম, এইক্ষণে আর 'আমরা আমরা' বলিতে পারিতেছি না। যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা আনিয়া 'আমরা আমরা' লিখিয়াছি, যাঁহারা সঙ্কটসময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধপথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যেখানে চলিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন— এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্বপ্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা 'আমরা' ছিলাম, তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন, তবে আর আমরা 'আমরা' কৈ? একাকী 'আমি' হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধুবিচ্ছেদশোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে!... যদি কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য এবং দেবরাজরাজ্যও পাই, তথাচ এ-শোকনাশের সদুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্‌গুণগণ পরিগণনা-কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে, এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব-গরিষ্ঠ হইয়াছেন, এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দানমানাদি সর্বগুণে মান্যগণ্যধন্য লাভ করিয়াছেন, ২৮শে অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। বাস্তবিক আমি তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ্য করি নাই, তথাচ বন্ধুবিচ্ছেদশোকে আমার ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে। বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব? তবে শোকসম্বরণের এইমাত্র উপায় দেখিতেছি: রসরাজ বিদায়। রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে, অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম। ইহাতেও কি নির্মলকুল সাধুস্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা-প্রদানে কৃপণ হইবেন? না, নীতিশাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে: "সাধুগণের স্নেহসূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণসূত্র স্নেহপাত্রকে পরিত্যাগ করে না, মৃণাল-সকল ভঙ্গ হইলেও তন্তুসূত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে।"

শোকাপনোদন ও রসরাজ-বিদায় (১৮৫৭)

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

বিংশতিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত দ্বারা আঘাত করিলে আমি স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া খ্রীষ্টের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম। তৎকালে আশা ছিল যে, কত বিবি আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্যে মোহিত হইয়া প্রাণনাথ করিতে ব্যস্ত হইবে, কত ইংরাজ আপন প্রার্থিত প্রিয়তমার অলাভে হতাশ হইয়া অশ্রুপাত ও আমায় শাপদান করিবে— এই সকল অদম্য মনোরথে সমাকৃষ্ট হইয়াই আমার খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয়। যদি শ্রদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা কর, শ্রদ্ধা আমার অন্য ধর্মে যেমন, খ্রীষ্টধর্মেও সেইরূপ, অর্থাৎ কিছুই নহে। আমি মাতার চরিত্র উচ্চারণ করিয়া শপথ করিতে পারি, যদি পৃথিবীর কোন ধর্মে আমার বিশ্বাস থাকে। আমি ধর্মকে ঐহিক মোহবাসনা-পূরণের উপায় চিরকাল মনে করিতাম, কিন্তু আমার অদ্যাপি স্থির নিশ্চয় আছে যে, খ্রীষ্টধর্ম পৃথিবীর প্রচলিত আর সমুদয় ধর্ম অপেক্ষা অল্প অনুপকারী। এই ধর্মের অবলম্বী জাতিরা এক্ষণে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাদিগেরই অধিষ্ঠান এখন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয়নিকেতন হইয়াছে। কিন্তু যাহারা ইহাকেই খ্রীষ্টধর্মের ঐশ্বরিকতার যুক্তি বলিয়া নির্দেশ করে, আমি তাহাদিগকে মনের সহিত ঘৃণা করি।

আমি খ্রীষ্টান হইয়া যে-সকল আশা সিদ্ধ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার একটিও সফল হইল না। কোন বিবিই প্রণয়িভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বাঙ্গালি বলিয়া ইংরাজেরা ঘৃণা, এবং ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া স্বজাতীয়েরা পরিহার করিতে লাগলেন। তথাপি আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ হইল না। প্রমোদরত মানস ও স্ফূর্তিযুক্ত শরীরের সাহায্যে আমার প্রফুল্লতার কোন হানি হয় নাই। মিশনারিরা যে-অত্যল্পমাত্র বৃত্তি দিতেন, তাহাতে আবশ্যক ব্যয়ও নির্বাহিত হইত না। অতএব বাঙ্গালা ভাষার একজন লেখক হইয়া বসিলাম।

দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ (১৮৫৮)

প্যারীচাঁদ মিত্র

বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। একপাশে দুই-একজন ভট্টাচার্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন— আজ লাউ খেতে আছে, কাল বেগুন খেতে নাই, লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয়— ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচকচি করিতেছেন। একপাশে কয়েকজন শতরঞ্চ খেলিতেছে। তাহার মধ্যে একজন খেলওয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে, তাহার সর্বনাশ উপস্থিত, উঠসার কিস্তিতেই মাত। একপাশে দুই-একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে, তানপুরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। একপাশে মহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে, সম্মুখে কর্জ্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে, অনেকের দেনাপাওনা ডিগ্রি ডিসমিস হইতেছে, বৈঠকখানা লোকে থই থই করিতেছে। মহাজনেরা কেহ কেহ বলিতেছে— মহাশয় কাহার তিন বৎসর, কাহার চার বৎসর হইল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াছি, কিন্তু টাকা না পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে, আমরা অনেক হাঁটাহাঁটি করিলাম, আমাদের কাজকর্ম সব গেল। খুচুরা খুচুরা মহাজনেরা— যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা— তাহারাও কেঁদে কোকিয়ে কহিতেছে: "মহাশয় আমরা মারা গেলাম, আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ, এমন করিলে আমরা কেমন করে বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, আমাদের দোকান-পাট সব বন্ধ হইল, মাগ-ছেলেও শুকিয়ে মরিল।" দেওয়ানজী এক-একবার উত্তর করিতেছে: "তোরা আজ যা; টাকা পাবি বইকি! এত বকিস কেন?" তাহার উপর যে চোড়ে কথা কহিতেছে, অমনি বাবুরামবাবু চোখ-মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে গালি-গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালি বড়মানুষ বাবুরা দেশশুদ্ধ লোকের জিনিস ধারে লেন— টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে, বাক্সের ভিতর টাকা থাকে, কিন্তু টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না। গরিব দুঃখী মহাজন বাঁচিলো কি মরিলো তাহাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু এরূপ বড়মানুষি করিলে বাপ-পিতামহের নাম বজায় থাকে।

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), ৫

বসুপালিত অত্যন্ত মনোযোগ ও বিবেচনাপূর্বক গৃহীত রাজ্যকার্য সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু রাজ্ঞী ও তাঁহার শ্বুষার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কর্ম করিতেন না। যদিও নরপতির আদেশানুসারে রাজ্ঞী ও রাজতনয়-মহিলা তাঁহার অধীনস্থ ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত মান্য করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। বসুপালিত অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসরের অধিক হয় নাই। তাঁহার প্রকৃতি উত্তম ছিল ও তিনি সকলের মনোরঞ্জক ছিলেন। তৎকালে তাঁহার মত ভদ্রলোক পাওয়া অতি দুষ্কর ছিল।

যে-সময়ে কলিঙ্গরাজ ও তাঁহার তনয় সংগ্রামে ব্যাসক্ত ছিলেন, সেই সময়ে বসুপালিতের গৃহিণী একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। বসুপালিত প্রায় রাজকার্য বিষয়ে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞী ও তাঁহার পুত্রবধুর নিকট সর্বদাই যাইতেন। রাজতনয়-মহিলা তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ে কুসুমশর-জনিত বিবিধ বিকারের আবির্ভাব হইতে লাগিল। তিনি নিজ যৌবন সম্পত্তি ও তাঁহার বনিতা-বিয়োগ দেখিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার মনোরথ অচিরাৎ চরিতার্থ হইবেক। কিন্তু কেবল লজ্জাভয়ে তিনি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে লজ্জাকে অতিক্রম করিলেন। এক দিবস নৃপতনয়-ললনা একাকিনী বিজনে বসিয়া ও উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া কোন কার্য ব্যপদেশে রাজ্যধুরন্ধর বসুপালিতকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। বসুপালিত তাঁহার অভিসন্ধির কিঞ্চিন্মাত্র মর্ম অবগত না হইয়া অবিলম্বে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং মহার্হমণিখচিত পর্যঙ্কোপবিষ্ট রাজনন্দন-বধূর আদেশানুসারে তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কি-নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিলেন। নৃপনন্দন-বনিতা তাঁহার বারম্বার প্রার্থনায় কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। পরিশেষে কম্পমানা ব্রীড়াবনতমুখী ও সজল-নয়না রাজকুমার-প্রেয়সী বিষমবাণজনিতানুরাগ দ্বারা উত্তেজিতা হইয়া গদ্‌গদ্ স্বরে এই প্রকারে বলিতে লাগিলেন: "হে প্রিয়তম! হৃদয়-বান্ধব? প্রভো! বোধ হয় স্ত্রীজাতির চিত্তলঘুতা আপনকার অতিসূক্ষ্ম ধীশক্তির অগোচর নহে..."

বসুপালিতোপাখ্যান (১৮৫৮)

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-পর্যন্ত কালিপ্সো নিস্পন্দভাবে টেলিমেকসের বর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, এক্ষণে কহিলেন, "টেলিমেকস, তোমার বিস্তর পরিশ্রম হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম কর। এই দ্বীপে তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; এখানে তুমি যে-অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবে; অতএব চিন্তা দূর কর, অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় হইতে দাও, এবং দেবতারা তোমার নিমিত্ত যে-অশেষবিধ সুখসম্ভোগের পথ প্রকাশ করিতেছেন, তদনুবর্তী হও। কল্য যখন অরুণের আলোহিতকর-স্পর্শে পূর্বদিকের স্বর্ণময় কপাট উদ্‌ঘাটিত হইবে, এবং সূর্যের অশ্বগণ সৌর কর দ্বারা নভোমণ্ডল হইতে নক্ষত্রগণকে নিষ্কাশিত করত সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতে থাকিবে, সেই সময়ে তুমি পুনরায় আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণন আরম্ভ করিবে। জ্ঞানে, সাহসে ও বিক্রমে তুমি তোমার পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ। একিলিস হেক্টরকে পরাজিত করেন, থিসিউস নরক হইতে প্রত্যাগমন করেন, মহাবীর হিরাক্লিস বসুন্ধরাকে বহুসংখ্যক দুর্দান্ত দানবের হস্ত হইতে মুক্ত করেন; ইহারা কেহই শৌর্যে ও ধর্মচর্যায় তোমার তুল্য হইতে পারেন নাই। আমি প্রার্থনা করিতেছি যেন অবিচ্ছিন্ন সুখনিদ্রায় তোমার নিশাবসান হয়। কিন্তু হায়, ত্রিযামা আমার পক্ষে কি-দীর্ঘযামা ও ক্লেশদায়িনী হইবে! পুনর্বার সাক্ষাৎ করিয়া তোমার অপূর্ব স্বরমাধুরী শ্রবণ করিব, বর্ণিত বৃত্তান্ত পুনরায় বর্ণন করিতে কহিব, এবং যাহা এ-পর্যন্ত বর্ণিত হয় নাই, তাহাও সবিস্তর শ্রবণ করিব বলিয়া যে, আমি কত উৎসুক রহিলাম, তাহা তোমাকে বলিয়া জানাইতে পারি না। অতএব প্রিয়সুহৃৎ টেলিমেকস, দেবতারা কৃপা করিয়া পুনরায় তোমায় যে মিত্ররত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে লইয়া যাও; যে-বাসগৃহ তোমাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, তথা গমন করিয়া বিশ্রামসুখে যামিনী যাপন কর।" এই বলিয়া দেবী টেলিমেকসকে নিরূপিত বাসগৃহে লইয়া গেলেন। ঐ গৃহ দেবীর আবাসগৃহ অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। উহার এক পার্শ্বে একটী প্রস্রবণ স্থাপিত ছিল; তদীয় ঝর্ঝরনিনাদ-শ্রবণমাত্র পরিশ্রান্ত জীবের নিদ্রাকর্ষণ হইত; অপর পার্শ্বে অতিকোমল পরমরমণীয় দুইটী শয্যা প্রস্তুত ছিল: একটী টেলিমেকসের অপরটী তাঁহার সহচরের নিমিত্ত অভিপ্রেত।

টেলিমেকস (১৮৫৮); চতুর্থ সর্গ

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করেন; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্যসকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবদ্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাতে নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ, ভাষা ও পাঠকদিগের রুচিভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর-করণার্থে ছন্দের বর্ণ, মাত্রা ও যতির পরিবর্তন করা হয়; সুতরাং বর্ণ, যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলঙ্কারস্বরূপ কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুলপিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবারমাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, তাহা কোন মতে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্তব্য বটে যে, বঙ্গভাষায় অদ্যাপি যে-সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাসবিশিষ্ট; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার সাব্যস্ত হইতে পারে না, যেহেতু বাঙালীর ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে, তাহার সম্পূরণার্থে সর্বদা নূতন ছন্দঃ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দঃ সকল গ্রহণ করা হইতেছে। অতএব দত্তবাবু বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে, পরন্তু সে-ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর, অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বর অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না; যাহারা গদ্য রচনা অত্যল্পমাত্র বুঝিতে পারে, তাহাদিগের পক্ষেও অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগতভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন সকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে, পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৫৯)

চন্দ্রপুর সপ্তগ্রাম হইতে তিন দিবসের পথ। ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বকীয় আত্মজের পরিণয়ের চারি দিন পূর্বে বরযাত্রী ও বাদ্যকরণ ও কএকজন দাস এবং উক্ত সুরসিক ও সুচতুর প্রামাণিক সমভিব্যাহারে ঐ পল্লীতে যাত্রা করিলেন। তাহাতে ছয়খানি শিবিকা, এক চতুর্দোলা এবং এক ডুলী সঙ্গে লইলেন। ঐ শিবিকাসমূহে বরকর্তা ও তাঁহার জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতৃব্য ও মাতুল এবং গুরু ও পুরোহিত আরোহণ করিলেন। চতুর্দোলায় হেমচন্দ্র সুসজ্জিত হইয়া উঠিলেন; ডুলী খালি চলিল।

এখানে মুলুকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধ্যানুসারে স্বীয় ভবন সাজাইয়া এবং প্রচুর খাদ্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া বরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিলেন। পরে বিবাহের শুভদিন উপস্থিত হইলে চন্দ্রমুখীর সমবয়স্কা বালিকাগণ আসিয়া তাহার বেশভূষা করিয়া দিতে নিযুক্তা হইল। হরিদ্রাতে দধি মিশ্রিত করত তাহার গাত্র মার্জন করিয়া দিলেন ও কেশ বিনাইয়া এক অপূর্ব খোঁপা বান্ধিলেন। নাপিত-পত্নী তাহার পদদ্বয়ে অলক্ত অর্থাৎ আলতা লেপন করিলেন; এবং তিনি উত্তম রক্তবর্ণ পটাম্বর পরিধান করত, ও স্বর্ণ-রৌপ্য আভরণে বিভূষিতা হওত, শশধরসদৃশ সুদৃশ্যা হইলেন। পরে ভানু যখন পশ্চিম গগনে রক্তবর্ণ হইয়া অস্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে দূর হইতে বাদ্যোদ্যম ও কোলাহলের শব্দ শ্রুত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় বাহুদ্বয় উত্তোলিত করত আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, এবং বিধাতার নিকটে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্থ বামাগণ অস্থিরা এবং চন্দ্রমুখী হর্ষযুক্তা হইতে লাগিলেন।

অবিলম্বে বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সমাদর পূর্বক বরযাত্রিদিগকে আহ্বান করিলেন; পরে তাহাদিগকে বসিবার স্থান দেখাইয়া দিলেন। ঐ শুভ যামিনীতে ঐ ভদ্র সন্তানের বাটীতে মহাসমারোহ হইয়াছিল। সর্বমধ্যস্থলে হেমচন্দ্র দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় বসিলেন; তাহার উভয় পার্শ্বে ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া বর ও কন্যাযাত্রী মহাশয়েরা বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে নানা প্রকার গল্প উপস্থিত করিলেন। পারিজাতপুর-নিবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চন্দ্রপুরের শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাঠককে জিজ্ঞাসা করিলেন: "পাঠকমহাশয় কি কখন ইংরাজ লোকের বিবাহ দেখেছেন?"

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান (১৮৫৯), সপ্তম অধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্ত

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে কৌতুহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্যটন পূর্বক এখন মথুরাসন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্বক সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার-সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্যলাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিতরণ পূর্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশু পক্ষী সকল নীরব ও নিষ্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্মাধর্ম সমুদায় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জলকল্লোলের কল কল ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সুমদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিলেক। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন-দুর্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী ও নির্ঝর তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতুহলরূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া, যত দূর দৃষ্টি হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্যটন করিতে লাগিলাম।

চারুপাঠ (১৮৫৯), তৃতীয় ভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বপ্নদর্শন— বিদ্যাবিষয়ক

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রকুমারের মতানুসারে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা লাঠী হাতে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন অপরাহ্নে মনোহর দাস-বণিক মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। বণিক তৎকালে গৃহে ছিলেন না, হীরালাল ও মতিলালও বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অন্যান্য একপাঠী বন্ধুদিগের সহিত খেলাইতে গিয়াছিল। বেহাইকে দেখিয়া বণিকভার্যা বড়ই উদ্বিগ্না হইলেন; বাটীতে কেহ নাই, কেমন করিয়া বেহাইয়ের অভ্যর্থনা করিব— বারংবার তিনি এই কথা কহিতে লাগিলেন। সুশীলা রন্ধনশালায় রাত্রিকালে প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে করিতে সেসকল কথা শুনিয়া একেবারে বাহিরে আসিল, এবং বিনীতভাবে নিজ মাতাকে কহিল, "জননি, উৎকণ্ঠিতা হইবেন না, পিতা আর শ্বশুর প্রায় সমতুল্য গুরু; স্ত্রীলোকের পক্ষে ইঁহারা উভয়েই সমান মান্য, এবং সমান পূজনীয়; যে-বিষয়ে আমরা পিতার নিকট লজ্জা না করি, সে-বিষয়ে শ্বশুরকে কি লজ্জা করা উচিত? বেলা গেল, আপনি রন্ধনশালায় রন্ধন করিতে যাউন; আমি যাইয়া শ্বশুরমহাশয়ের অভ্যর্থনা করিতেছি।"

বণিকভার্যা তৎক্ষণাৎ রন্ধনশালায় রন্ধন করিতে গেলেন। সুশীলা প্রথমে আপনাদের বড় ঘরের দাবায় একখানি মাদুর পাতিয়া বাহিরে আগমন করত বিনীতভাবে শ্বশুরমহাশয়কে প্রণিপাত করিল, আর কহিল: "পিতঃ, জনকমহাশয় এখনও বাটীতে আসেন নাই, এখনই আসিবেন; আপনি বাটীর ভিতরে আসিয়া বসুন।" পুত্রবধূর এইরূপ আশ্চর্য সম্ভাষণে বৃদ্ধ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন, এবং তাহার সমভিব্যাহারে ভিতর-বাটীতে যাইয়া বড় ঘরের দাবাস্থিত সেই ক্ষুদ্র মাদুর-খানির উপর বসিলেন। সুশীলা আপন পিতার হুকাতে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া নম্রভাবে শ্বশুরমহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল। বৃদ্ধ তামাকু খাইতে লাগিলেন। সুশীলা এক গাড়ু জল এবং একখানি গামোছা তাঁহার সম্মুখ-ভাগে রাখিল; পরে পিঁড়্যা পাতিয়া বসিবার স্থান করিয়া একখানি সুপরিষ্কৃত রেকাবে কিছু মিষ্টান্ন সামগ্রী এবং এক ঘটী পানীয় জল আনিয়া কহিল, "পিতঃ, অনেকটা পথ আসিতে না জানি আপনার কত ক্লেশ হইয়াছে; অতএব পদপ্রক্ষালন পূর্বক জলযোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করুন।" চন্দ্রকুমারের পিতা পুত্রবধুর সুশীল ব্যবহার এবং মিষ্ট কথাতে সাতিশয় আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, "মাতঃ, এখানে আসিতে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় নাই; আমি তোমাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবার কথা বলিতে আসিয়াছি। তোমাকে লক্ষ্মীরূপা দেখিতেছি; তুমি আমার গৃহে গেলেই আমার গৃহ উজ্জ্বল হইবে।"

সুশীলার উপাখ্যান, প্রথম ভাগ (১৮৫৯), তৃতীয় অধ্যায়

লক্ষ্মণ নিস্ক্রান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কুচিতভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইল। তখন রাম বলিলেন, "প্রিয়ে! যদি ক্লান্তিবোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পিত করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।" সীতা কোমল বাহুবল্লী দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে, তিনি অনির্বচনীয় স্পর্শসুখের অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! তোমার বাহুলতার স্পর্শে আমার সর্ব শরীরে যেন অমৃতধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ, উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" সীতা, রামমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "নাথ, আপনি চিরানুকূল ও স্থিরপ্রসাদ। যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে? প্রার্থনা এই, যেন চিরদিন এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে।"

সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার কথা শুনিলে, শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃকরণের সজীবতা সম্পাদিত হয়।" সীতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "নাথ, এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্রিয়ংবদ বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভাগিনীর যে এত সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর।" এই বলিয়া সীতা শয়নের নিমিত্ত উৎসুক হইলে রাম বলিলেন, "প্রিয়ে, এখানে অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি নাই; অতএব, যে অনন্যসাধারণ রামবাহু বিবাহসময় অবধি, কি গৃহে, কি বনে কি শৈশবে, কি যৌবনে— উপাধানস্থানীয় হইয়া আসিয়াছে, আজও সেই তোমার উপাধানকার্য সম্পন্ন করুক।" এই বলিয়া রাম বাহু প্রসারিত করিলেন; সীতা তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইলেন।

সীতার বনবাস (১৮৬০), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভূপতি অধিক পত্নী পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি একমাত্র ধর্ম্মমহিষী ব্যতিরেকে পরকলত্রমাত্রেরই প্রতি দুহিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। মহিষীর সন্তান হইবে না বলিয়া সম্পূর্ণই সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরসমীপে প্রজাগণের নিরন্তর প্রার্থনা ও দৈবের অনুগ্রহবশতঃ প্রৌঢ়তার শেষাবস্থায় রাজপত্নী অন্তর্বর্ত্তী হইলেন। এই ব্যাপার ঘটনায় মহারাজ যেরূপ আনন্দিত হইলেন, প্রজাগণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে আনন্দলাভ করিল। কারণ পুত্র জন্মিলে রাজ্য ও বংশ রক্ষা হইবে, রাজার এই একমাত্র আনন্দ; কিন্তু প্রজাগণের সেই এক আহ্লাদ এবং তাদৃশ প্রজাবৎসল নরপতির হৃদয় হইতে অনপত্যতা-দুঃখ দূরীভূত হইবে এই আর-এক আহ্লাদ— উভয়বিধ আহ্লাদে তাহারা একবারে নিমগ্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, যেরূপ চিরপ্রোষিত পুত্রের গৃহ্যাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্ত্তী প্রিয় সুহৃদের সংবাদ-প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদিত মেঘমালার প্রতি অবগ্রহ-ক্লেশিত কৃষক এবং সুদীর্ঘকাল অনাবৃত রবিবিম্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে— সেইরূপ প্রজাগণ মহিষীর প্রসবদিনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা তাবৎ লোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। বামাগণ শঙ্খহস্ত হইয়া সূতিকাগারের প্রাঙ্গণভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল; বাদ্যকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য গ্রহণপূর্বক বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল; নর্তকেরা রঙ্গদর্শনোপযোগী মনোহর বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্যশালায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, কুব্জ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিদায় প্রাপ্ত্যভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও রথ্যা সম্বাধ করিয়া তুলিল; অমাত্যগণ রাজার পুত্রমুখ দর্শনোৎসব-সময়ের প্রদেয় দ্রব্য-সকলের নির্ধারণ করিতে বসিলেন এবং কর্মকরেরা সেই সেই দ্রব্যের আহরণ নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। ফলতঃ রাজবাটী যেন একটী উৎসবভূমির ন্যায় কেবল কোলাহলময় হইয়া উঠিল। এমত সময়ে সূতিকাগারের মধ্য হইতে "হায়! কন্যা হইল! কন্যা হইল!" এই আর্তস্বর বিনির্গত হইল।

রোমাবতী (১৮৬১)

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ির সামনের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটি শিবের মন্দির, একটি শান-বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। ক্রিয়েকর্মে চক্রবর্তীকে মাছের জন্যে ভাবতে হ্ত না! এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, চাষের জন্যে পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচজন রাখাল চাকর, জোড়া বলদ নিয়ত নিযুক্ত ছিল...। গ্রামস্থ ভদ্রলোকমাত্রেই চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র; সহরের ব্রকভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় বর-কনের বয়স ১০/১১ বছরের বেশী ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া কি মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ ছিল। কেবল পালপার্বণে পিঠে-সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ত্ব তাবাস চলতো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেজ ছাড়লেন; এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হলো। সুতরাং চক্রবর্তী জামাই নে যাওয়ার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রকভান বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রকভানু বাবু চক্রবর্তীকে কয়দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখলেন; শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরির সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন...।

গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো; চক্রবর্তীর সহুরে জামাই এসেছে! গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখতে এলো। ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দ্যাখে নি, সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বসলো; চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কর্ত্তে লাগলো। একদিকে আশ-পাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে; একপাশে কতকগুলো গোডিমওয়ালা ছেলে ন্যাংটো দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাই বাবুকে জলযোগ করবার জন্য বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েছে; পিঁড়ির নীচে চারদিকে চারিটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিল; জামাইবাবু যেমন পিঁড়েয়ে পা দিয়ে বসতে যাবেন, অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গ্যালো, জামাই বাবু ধুপ করে পড়ে গেলেন। শালী শেলাজ মহলে গররা পড়লো। জলযোগের সকল জিনিষগুলিই ঠাট্টাপোরা: মাটির কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাটের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মাকোর্সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে এলেন।

হুতোম পেঁচার নকশা (১৮৬২) কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।

হরিনাথ ন্যায়রত্ন

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বেই রাক্ষস একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ কদাকার অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসনে বসিয়া আছেন; দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনাকে এখানে কে আনিয়াছে?" চাণক্য কহিলেন, "আমাকে শকটার মন্ত্রী নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছেন।" রাক্ষস এই কথা শুনিয়া আপনার আনীত ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা শ্রাদ্ধীয় সভায় আসিতেছিলেন, রাক্ষস সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "মহারাজ, আমি আপনকার আদেশে ইঁহাকে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছি; কিন্তু শকটার একজন উদাসীন ব্রাহ্মণকে আনিয়া সেই আসনে বসাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বরণীয় হইতে পারেন না। কৃষ্ণবর্ণ শ্যাবদন্ত আরক্তনেত্র ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। অতএব এক্ষণে মহারাজের যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।" মহানন্দ একতঃ অব্যবস্থিতচিত্ত ও শকটারের প্রতি তাঁহার চিরবিদ্বেষ ছিল; তাহাতে তিনি বিনা আদেশে একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণকে বসাইয়া স্বয়ং প্রস্থান করিয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া দ্রুতগতি শ্রাদ্ধীয় সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং চাণক্যের তথাবিধ কুৎসিতাকার দর্শনে তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই একবারে শিখাকর্ষণ পূর্বক আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। সভামধ্যে ঈদৃশ অপমান কেহই সহ্য করিতে পারে না। চাণ্যক অত্যন্ত তেজস্বি-স্বভাব, রাজা তাঁহাকে যেমন উঠাইয়া দিলেন, অমনি তদীয় আরক্ত নয়ন ক্রোধে দ্বিগুণিত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, শিখা আলুলায়িত হইল। তখন তিনি ভূতলে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, "অরে দুরাত্মা মহানন্দ! তুই আমাকে যেমন নিরাপরাধে অপমান করিলি, তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইতে হইবে। অহে সভ্যগণ, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিলে, আমার নাম চাণক্য শর্মা, রাজা তোমাদিগের সমক্ষে নিরাপরাধে আমার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিলেন, এই শিখা নন্দবংশের কালভূজঙ্গীস্বরূপ জানিবে; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে না পারিব, ততদিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল।" চাণক্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সভ্যগণ রাজার ঈদৃশ গর্হিত ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কিছু না বলিতে পারিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন।

মুদ্রারাক্ষস (১৮৬২)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে পরমাত্মন! তুমি আমারদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা বিষয়-বিভবের নিমিত্তে তোমার নিকট কি-প্রার্থনা করিব? সমস্ত দিবস, সমস্ত রজনী, তোমার করুণা তো আমারদের শরীর ও মন পোষণ করিতেছে। সম্পত্তি বিপত্তি, সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কার তোমার হস্ত হইতেই প্রেরিত হইয়া আমারদের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতেছে। যে-অবধি জীবন ধারণ করিয়াছি, সেই অবধিই তোমার করুণা তুমি মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ; অতএব তোমার নিকট কি-প্রার্থনা করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা-ই মঙ্গল ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক। আমারদের কিসে কল্যাণ, কিসে বিপর্যয় হয়, আমরা তাহা কিছুই জানি না, তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার প্রসাদে এই সত্যটী জানিয়াছি যে, তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমারদের সকল মঙ্গল ও সকল সম্পত্তি লাভ হয়। যদি সমুদয় বিষয় বিভব, মান সম্ভ্রম, প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই পাওয়া যায়, তবে তাহা—ই মঙ্গল; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি সমুদয় পৃথিবীর রাজাও হই, তবে তাহা হতে আর অমঙ্গল কিছুই নাই। তুমি হৃদয়ে আইলে আমারদের সকল মঙ্গল লাভ হয়। অতএব তোমার নিকটে আমরা এই বর চাই: তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। তুমি হৃদয়ে থাক, হৃদয়ের প্রভু হইয়া থাক, তুমি আমারদিগকে গ্রহণ কর। আমরা ভূলোকও দেখিতেছি না, দ্যুলোকও দেখিতেছি না, তোমাকেই দেখিতেছি, মন ব্যাকুল হইতেছে। তুমি আমারদের ভগ্ন হৃদয়ে আসিয়া বাস কর, এই শরীরকুটীরে অবতীর্ণ হও। আমারদের আপনার উপরে কোন আশা নাই, আমাবদের আপনার কোন বল নাই, আমরা তোমার জন্য যে অধিক কিছু করিতে পারিব, এমনো নহে। তোমার প্রসন্নতা আমারদের সর্বস্ব, তুমি-ই আমারদের সর্বস্ব। তোমার আলিঙ্গন-পাশে আমারদিগকে বদ্ধ কর, তোমার চরণের ছায়াতে রক্ষা কর, তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া আমারদের সকল দুঃখ তাপ দূর কর।

মহর্ষিদেবের প্রার্থনা (২০)

উমেশচন্দ্র দত্ত

অনেকে মানুষ-বহুরূপী দেখেছে: তারা কখন বুড়ো, কখন সাহেব, কখন মোহন্ত নানা সাজে সাজে। কিন্তু জল যে কত রকম সাজ সাজিতে পারে, তাহা অনেকে দেখে না। এই জল কখন ধোঁয়া হইয়া আকাশে উঠে, কখন মেঘ হইয়া নানা রং পরে— আবার বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়; কখন শিশির হইয়া ঘাসের উপর মুক্তাগুলির ন্যায় দেখায়; কখন কুয়াসা হইয়া দিক-সকল অন্ধকার করিয়া রাখে; কখন শিল হইয়া পাথরের নুড়ীর মত ঝড় ঝড় করিয়া পড়ে; কখন বা বরফ হইয়া জলের উপর এমন জমাট হয় যে. তাহার উপর দিয়া মানুষ হাতী অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে...

আমরা ছেলেবেলা অবধি শুনিয়া আসি যে, ছয় মেঘ ও ছত্রিশ মেঘিনী আছে: মাঝে মাঝে তাহারা শালপাতা খাইতে আইসে, এবং তাহাদের মুখের লাল পড়িয়া অভ্র হয়; ইন্দ্রের ঐরাবত সমুদ্র হইতে জল শুষিয়া যখন তাহাদের পিঠে চড়াইয়া দেয়, তাহারা চারিদিকে চালনা করিয়া বৃষ্টি করে। এ-সকল কথা সত্য নয়, গল্পকথা মাত্র।

মেঘ আর কিছুই নয়, জলের এক রকম আকার মাত্র। জল ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া হইতে মেঘ হয়। মেঘ গলিয়া বৃষ্টি হয়। এক হাঁড়ী জল যখন গরম করা যায়, তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতে থাকে। এই ধোঁয়ার উপর যদি খানিকক্ষণ ধরিয়া হাত রাখা যায়, তাহা হইলে সেই হাত ভিজিয়া যায়— জল টস্ টস্ করিয়া পড়ে। এখানে ধোঁয়া জমিয়া জল হইয়া গেল। এই ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মেঘ হয়। আকাশে যে এত মেঘ হয়, তাহার কারণ এই: সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল গরম হয়; তাহাতে খুব হালকা এক রকম ধোঁয়া উঠে, কিন্তু সকল সময় চোখে দেখা যায় না— ইহাকে বাষ্প বলে। এই বাষ্প অনেক পরিমাণে আকাশে উঠিয়া যখন জমিতে থাকে, তখন মেঘ হয়। সূর্যের কিরণ পড়িলে মেঘে নানা রকম রঙ হয়। এই মেঘ সকল বড় অধিক দূরে থাকে না। উঁচু পাহাড়ে উঠিলে দেখা যায়, ধোঁয়া বা কুয়াসার মত নীচে দিয়া চলিয়া যায়। এই মেঘ সকল শীতল বাতাসে জমিয়া যখন ভারি হইয়া যায়, তখন আর উপরে থাকিতে পারে না, বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে থাকে। বাতাসে মেঘ সকল চলিয়া বেড়ায়, তাহাতেই অনেক দূর অবধি বৃষ্টি ছড়াইয়া পড়ে। এখানে দেখ: জল বহুরূপী— ধোঁয়া হইল, বাষ্প হইল, মেঘ হইল, আবার বৃষ্টি হইয়া যে-জল সেই জল হইয়া গেল।

বিজ্ঞান: জল বহুরূপী, ১৮৬৩

স্ত্রীর আবার গুণের শেষ নাই! তিনি কোথাও নেমন্তন্নে গিয়ে, কিংবা অন্য কোথাও যদি অন্যের কোন গয়নাখানা ভাল দেখলেন, তো অমনি খুচোতে আরম্ভ কোল্লেন। একে ঋণের দায়ে এবং সংসারের জ্বালায় জ্বালাতন হয়েছি, তার জ্বালায় আর এক দণ্ড ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। ভাই! স্ত্রীটীর গুণের কথা বোলতে গেলে আর কিছু থাকে না: ঘরে সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করে, মাকে যাইচ্ছে-তাই বলে, গালাগালি-মন্দও দেয়, ইতর লোকের ঘরের চেয়েও সে এক কাটি বাড়িয়েছে। ভগ্নী, ভাগনে ও ভাগনীগুলি ঘরে আছে, সর্বদাই তাদের সঙ্গে লাগে; তারা যে একমুটো ভাত খাচ্ছে, তা আর তার দিতে ইচ্ছা নাই। আমাকে স্পষ্ট বলে যে, "তুমি পাঁচটা পরকে পুষে আমার মাথা খাচ্চো!" ভাই! পৈতৃক বিষয় নাই, তাতে আয় কম, তার উপর আবার ছোট ঘরের মেয়েটাকে বিয়ে কোরেই সারা হলেম। মা বোন ভাগনে ভাগনীদের কোথা বার কোরে দিব? আর সে কি মানুষের কাজ? মা বোন যদি পর হয়, তার হোলে পরকালে আর আপনার কে হবে? মাতা দশমাস দশদিন গর্ভে স্থান প্রদান করে অসহ্য প্রসব-বেদনা সয়ে বিশ্বকারুর এই সুচারু সৃষ্টি দেখালেন; মেগের বশ হয়ে যদি জননীর ভরণ-পোষণে অশক্ত হওয়া হয়, তাহা হলে পরকালে আর কি-গতি হবে? ভাষা-কথায় বলে "কলির বৌ কুলের ধ্বজা" এবং "কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানী"। এ-কথা অযথার্থ নহে। আমি দেখেচি, কত কত কলির বৌ কত কত লোকের সুখের সংসার ছারখার কোরে দিয়েচে: "ভেয়ে ভেয়ে মুখ দেখাদেখি নাই" "খুড়ো ভাইপোয়ে আদায় কাঁচকলা" "মা বোন ভাই ভাইপো কুপোষ্য"; কেবল মাগ ভাতার ও আপনাদের ছেলে নিয়ে সুখে থাকা-ই সুখ জেনেচেন! এদিকে যাঁরা পিতামাতাকে কষ্ট দিয়ে ভাই ভাইপো ভাজ ও ভাগনেকে ঠকিয়ে সুখে থাকবেন, ওদিকে তাঁদের জন্যই নরককুণ্ডটা ভাল কোরে সাজান হোচ্চে। আজকাল রৌরবের গৌরব ভারী; দেখবার জন্য অনেকেই সাজচেন। জেনে শুনে কি মেগের কথায় মাকে কষ্ট দিয়ে আমিও সেই সাজ পোরে পরকালের মুক্তিপথে কাঁটা দিব? আমি এই বুঝেচি: ভগ্নী ভাগনে ও ভাগনী প্রভৃতিদের নিয়ে এক মুটো ভাত ডাল-ভাতে দিয়ে খাবো, সেও ভাল; মেগের কথায় মাগমুখোদিগের মত মাকে বাপের পরিবার কিংবা কুপোষ্য বোলবো না।

আপনার মুখ আপনি দেখ (১৮৬৩)

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

পাঠকগণ, আপনারা কি নূতন সম্বাদ শ্রবণোৎসুক হইয়া সোমপ্রকাশের পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন? সোমপ্রকাশ প্রতি সপ্তাহে যথাশক্তি নূতন সম্বাদ দিয়া আপনাদিগের কৌতূহল পূর্ণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আজি যে-একটী অত্যদ্ভুত নূতন সম্বাদ দিতে চলিয়াছি, ঈদৃশ সমাচার কখন আপনাদিগের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে নাই; শ্রবণ করা দূরে থাকুক, এমন আশ্চর্য সম্বাদ কখন যে আপনাদিগের শ্রবণপথের অতিথি হইবে, আপনারা এরূপ কখন মনেও করেন নাই। সে সম্বাদ এই: ডেনিস হিলি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে! গত বুধবারের সায়ংকালে এই সমাচার যখন নগরময় হইল, নগর বিস্ময়, রোষ, ক্ষোভ ও ভয়ের একান্ত পরাধীন হইয়া রূপান্তর ধারণ করিয়াছিল। যাঁহারা স্বকর্ণে আজ্ঞাদান শ্রবণ না করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে ইহাতে বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহাদিগের অবিশ্বাস হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। হিলির দুরাচারতার বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না; তাহাকে বরাখালির অরাজক কাণ্ডের কর্তা বলিয়া তাঁহাদিগের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহার অপরাধও বহুতর সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে; অথচ সেই দুরাত্মা অব্যাহতি পাইল! এ-সম্বাদ শুনিলে সত্য বলিয়া তাহাতে কাহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে? যাহা হউক, ঐ বুধবার সদ্বিচার, আইন, ঈশ্বরের নিয়ম ও ভারতবর্ষের স্বত্ব— এ-সমুদায় পাপের নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। সামান্য মুটিয়া অবধি ধনবান বণিক পর্যন্ত সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা অপরাধ করিলে দণ্ড হয় না বলিয়া এদেশীয়দিগের যে-সংস্কার ছিল, গত বুধবার তাহা লোকের হৃদয়ে দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে...

মনুষ্য ক্রোধ লোভ স্বার্থপরতা ও বৈরনির্যাতন-নিষ্ঠতাদি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে-সমস্ত কুক্রিয়া করিয়া থাকে, সে-সমুদায় এক হিলির দ্বারা এক পদে সম্পাদিত হইয়াছে। হিলি গৃহদাহ গৃহবিলুণ্ঠন হত্যা বলাৎকার ভ্রূণহত্যাদি কোন পাপক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতে বাকি রাখে নাই। ভয়ানক যুদ্ধের পরও জয়শীল সেনাগণ শত্রুদলের মৃত ব্যক্তিদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে দেয়, নিতান্ত দুরাত্মা হিলি রহিমউল্লাকে এ-সম্মানও প্রদান করে নাই। কি-প্রমাণ ও কি-যুক্তি অবলম্বন করিয়া জুরিরা হিলিকে মুক্ত করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা আমাদিগের বুদ্ধিপথের অতীত হইতেছে।

সোমপ্রকাশ (১৮৬৩), কি কারণে হিলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল...

গোপীমোহন ঘোষ

তখন বিশারদ স্কন্ধস্থিত জাল ভূমিতে রাখিয়া নদীগর্ভে অবতরণ করিল, এবং পূর্বরাত্রিতে যেখানে জাল পাতিয়াছিল, সেই দিকে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎ দূর যাইয়া বিশারদ দেখিল, কন্দলীস্তম্ভনির্মিত একটি ক্ষুদ্র ভেলা জালবন্ধের দারুতে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই ভেলার উপরিভাগে একটি অল্পবয়স্ক বালকের মৃত দেহ স্থাপিত আছে। বিশারদ এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বৈসারিণীকে ডাকিয়া কহিল, "প্রিয়ে, এদিকে আইস; দেখ, কে একটি মৃত শিশুকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছে।" বৈসারিণী কৌতূহলের বশবর্তিনী হইয়া সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

অনন্তর উভয়ে সন্নিহিত হইয়া দেখিল, বালকটিব বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরের অধিক হইবেক না, অঙ্গসৌষ্ঠব অতি উত্তম; কিন্তু আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ সাতিশয় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিশারদ সেই মৃত বালকের এইরূপ আকার দেখিয়া বৈসারিণীকে কহিল, "প্রিয়ে, বোধ হয় বালকটির দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে কালসর্পে দংশন করিয়াছে এবং দারুণ হলাহল ইহার কোমল কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বোধকরি, এখন পর্যন্ত ইহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই; প্রাণবিয়োগ হইলে ইহার সর্বাঙ্গই সর্বতোভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক, তুমি এই বালকটিকে ভেলা হইতে তুলিয়া লইয়া আইস; ইত্যবসরে আমি ঔষধ লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া বিশারদ দ্রুতপদে ঔষধ আনিবার জন্য প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিশারদ ঔষধ লইয়া প্রত্যাগমন করিল, এবং বালকের আপাদমস্তক সমস্ত পরীক্ষা করিয়া উহাকে ঔষধ সেবন করাইল। ক্ষণকাল পরে বালকের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত ও নয়নদ্বয় ক্রমে ক্রমে উন্মীলিত হইল। ইহা দেখিয়া বৈসারিণী সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্বক বিশারদকে কহিল, "এই বালকটির আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোনও ধনাঢ্য লোকেব সন্তান হইবেক। অতএব ইহার পিতামাতার নিকট হইতে আজ আমরা যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি; অতঃপর আমাদিগকে আর এরূপ কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবেক না।"

বিজয়বল্লভ (১৮৬৩), প্রথম পরিচ্ছেদ

কৈলাসবাসিনী দেবী

পিতা কন্যাগণকে শিক্ষা দেন না, সুতরাং তাহারা কেবল নানাবিধ অলীক আমোদ ও বৃথা খেলায় রত থাকে। তাহারা ভাণ্ড, পুত্তলিকা, ছিন্ন বস্ত্র ও ধূলিমৃত্তিকা, লতাপল্লবাদি লইয়াই প্রায় সমুদায় বাল্যকাল শেষ করে। আহা! কি আক্ষেপের বিষয়, জনক-জননী ও সহোদর প্রভৃতি বন্ধুগণই ঐ কোমলহৃদয়া বালিকাগণকে বিদ্যারসে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহারা কি একবার ভ্রমেও ভাবেন না যে, ইহাদের ভবিষ্যতে কি হইবে, এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়াই বা ইহারা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিবে। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া ভর্তৃকুল-কামিনীগণ এবং শ্বশুর ভাসুর দেবর ও স্বামী প্রভৃতির সহিত যে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, আর তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি হইলে কি-প্রকারেই বা তাহাদিগকে লালন-পালন করিতে হইবে এবং কি-প্রকারেই বা তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক কোন সদুপদেশ প্রদান করেন না। সুতরাং ঐ কন্যাগণ সকল বিষয়েই অতি অজ্ঞ থাকে ও অতিশয় কষ্ট ভোগ করে। হায়! নারীগণ যদি বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং পিতামাতা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের আর এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। হা মাতঃ বঙ্গভূমি! কত দিনে তোমার এই দুঃখিনী কন্যাগণ বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইবে, কত দিনে এই দীন ভাবের অভাব হইয়া তাহাদিগের জ্ঞানভাবের আবির্ভাব হইবে, এবং সেই জ্ঞানপ্রভায় তোমাকে প্রভান্বিত করিবে। আহা! আমাদিগের মাতা যদি বিদ্যাবতী হইতেন, তাহা হইলে আর আমাদিগের এরূপ দুর্দশা ঘটিত না। হায়! সেই অশিক্ষিত মাতৃগণ আপনারা যাহা উপদেশ পাইয়াছেন, কন্যাগণকেও তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন: তাঁহারা কন্যাগণকে নানা প্রকার ব্রত করান, এবং সেই সকল ব্রত করিলে কি কি ফল লাভ হয়, তাহার উপদেশ দেন; কন্যাগণও তাহাই ব্রহ্মবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং সেই উপদেশ মতেই চিরকাল চলে।

হা ভ্রম! কত দিনে তুমি এই বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিবে? হা মাতঃ! কত দিনে তুমি এই বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বদোষশূন্যা হইয়া অতি পবিত্র ভাব ধারণ করিবে? কত দিনে তোমার এই কুমারীগণ মোহান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানালোক-সংযোগে সুখী হইবে?

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা (১৮৬৩)

রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্মলজ্জামানমর্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন ক'রে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ! তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত; যত দূর অধঃপাতে যেতে হয়, তা গিয়েছ।

হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্লে? যে-পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে-পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন। যে-জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ-চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী ব'লে কপালে করাঘাত করে, যে-শ্বশুর আমাকে জামাতা ক'রে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি একন আমাকে দেখলে ফির্য়ে বসেন। শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন। শালী-শালাজ আমায় দেখলে হাসেন— দাঁতে মিসি মধুর হাসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?— আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই! কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ়বাক্যও বলেন নাই। আমার জন্য প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় ব'লে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করছে; কুরঙ্গনয়নী কার্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজনস্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা-প্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায়ে মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে; কেহ আসছে কি না, এক একবার মুখ ফির্য়ে দেখছেন। মদ কি ছাড়ব? আমি ছাড়তে পারি, বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেত, এখন মদে পায়— ডাক্ ওজা, ডাক্ ওজা, ঝাড়ুয়ে আমার মদ ছাড়ুয়ে দিক! আমি সুরধনীসভায় নাম লেখাবো, কারো কথা শুনব না।

সধবার একাদশী (১৮৬৬), তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

এই সর্বাঙ্গসুন্দর ব্রাহ্মধর্মই অদ্যকার উৎসবভূমি নির্মাণ করিল, উৎসবদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বানপূর্বক এখানে সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিল— অতএব ব্রাহ্মধর্মেরই জয় ঘোষণা কর, ব্রাহ্মধর্মের গুণগরিমা গান কর, মহোৎসবের আনন্দ যত পার, উপভোগ কর। কেবল ব্রাহ্মদের জন্য নয়, কেবল ভারতের জন্য নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্যই এই উৎসবদ্বার উদ্‌ঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বাহ্য সৌন্দর্য এ-উৎসবে কিছুই নাই; তবে এখানকার এই সামান্য বাহ্য সৌষ্ঠব যদি কোন দীনহীনের নয়ন-মন আকৃষ্ট করে, করুক; কিন্তু ইহার যে-স্থান হইতে আকর্ষণ-শক্তি বিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যাঁহারা ধন চান, রত্নগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন; মান-সম্ভ্রম চান, রাজপ্রাসাদে গমন করুন; কেবল প্রবৃত্তি-সকলকে চরিতার্থ করিতে চান, স্বেচ্ছাচারের সহস্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত আছে, তথায় প্রস্থান করুন; প্রভুত্ব চান, আপনার দাসদাসীর নিকটেই অবস্থান করুন! যদি ধর্মবল চান, প্রেমবল চান, আরাম চান, শান্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। এখানে ধনের অনুরোধ নাই, সম্ভ্রমের অনুরোধ নাই, প্রভুত্বের অনুরোধ নাই, পদের অনুরোধ নাই; এখানে ঈশ্বরের অনুরোধ, প্রেমের অনুরোধ, ধর্মের অনুরোধ, কর্তব্যের অনুরোধ। সংসারে যাহা লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা নাই; এখানে যিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্তী, তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এখানে সকলই বিপরীত: যিনি এখানকার আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই চান না, তিনিই এখানকার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি এখানকার কোন কার্যের প্রভুত্ব করিতে চান না, তিনিই সকল কার্যের প্রভু। যিনি যশের বিন্দুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার প্রধান যশস্বী। যিনি এখানকার মান-সম্ভ্রম চান না, এখানে তাঁহারই মান-সম্ভ্রম অধিক। যিনি আপনার সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এখানকার সর্বাপেক্ষা ধনবান। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাঁহার জন্য থাকে।

মাঘোৎসব (১৮৬৬)

আপনি এক স্থলে লিখিয়াছেন আমার মনে মনে এত ছিল তাহা আপনি জানিতেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যদি পূর্বাবধি ভাল করিয়া আমার পরিচয় লইতেন, তাহা হইলে এখন যাহা যাহা ঘটিতেছে, তৎসমুদায় আপনি পূর্ব হইতে দেখিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেন ও তদনুরূপ কার্য করিতেন। আমার এইরূপ সংস্কার ছিল যে, আপনি দূরদৃষ্টির সহিত সকল দিক দেখিয়া আমার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এখন বুঝিতেছি যে তাহা যথার্থ নহে। হয় ত এখন আমার মনে কি আছে তাহাও আপনি জানেন না, এবং যখন তাহার প্রকাশ হইবার সময় হইবে, তখন হয়ত আপনি এখন অপেক্ষা সহস্র গুণে বিস্ময়াপন্ন ও বিরক্ত হইবেন। এইজন্য এখনও বলিতেছি, আমার মনে যাহা আছে তাহা আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহকারে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করুন এবং আমার সহিত, ব্রাহ্মসমাজের সহিত, স্বদেশের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করুন। আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি না। এই মাত্র বলিতেছি: আমার যথার্থ মতগুলি, আমার হৃদয়ের ভাব, এবং আমি যে-যে কার্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা আপনি অবগত হইয়া আপনার কার্য করুন। আমাকে আপনি বুঝিতে না পারাতেই তত্ত্ববোধিনী সভার মত, অক্ষয়কুমার দত্তের মত আমাকে বিঘ্ন জ্ঞান করত আমাকে বিদায় করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন করিবেন এরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই আপনি আমাকে বলপূর্বক বা কৌশলপূর্বক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই আপনার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ট্রাস্ট-ক্ষমতা প্রকাশ করিলে আপনি নির্বিঘ্নে আপনার মত রক্ষা ও প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যদি আপনার এরূপ সংস্কার থাকে যে আমার কার্য হইতে "কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে" তবে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমি কাল সর্পের ন্যায় সমুদয় ব্রাহ্মসমাজকে বেষ্টন করিয়া আছি, আমায় দূর করিবার যতই চেষ্টা হইবে, ততই আমার দংশনে সকল লোক গরলাভিষিক্ত হইবে। বাস্তবিক অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় আমিও ব্রাহ্ম-সমাজের এক অঙ্গ, যতদিন সমাজে আমার কার্য থাকিবে, ততদিন কাহারও সাধ্য নাই আমাকে বল বা কৌশলে বিদায় করিয়া দেন। গরল উদ্‌গীরণ করা হউক বা "অমৃত বর্ষণ" করা হউক, আমার যাহা যথার্থ কার্য তাহা করিতেই হইবে।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, ১৮৬৬)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যরচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন? অমিত্রছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে, এ-কথা কাহার মনে ছিল? কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃপ্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল, কতই নিন্দা করিয়াছিল! অমিত্রছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য! বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন! পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত! এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং যাঁহারা পূর্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্রছন্দ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন...।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির লক্ষ্য পদচিহ্ন করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে-গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীর এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমুহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে, যে-গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল, বর্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়। যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়, যে-গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে-গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গ বাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি।

মেঘনাদবধ-কাব্যের ভূমিকা (১৮৬৭)

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যকাম, সকলি ভাল, তবে বলিব কি, একটী বিষয়ে আমার মহা খেদ; তোমাকে মনে করিলেই যেন হৃৎপিণ্ড বিষাদশঙ্কু-নিখাত হয়। যদি বল "কেন?" ভাই, মনে কর, গুরুকুলে বাস করিয়া আমরা কেমন শ্রদ্ধা পূর্বক আচার্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহা! আচার্যেরও কি পর্যন্ত শিষ্যবাৎসল্য! কেমন আনন্দচিত্তে কহিতেন; "সত্যকামের যেন দৈব বিদ্যা; শীঘ্রই সমীচীনা ব্যুৎপত্তি হইয়াছে।" এই বলিয়া ভাবিতেন যে, তোমার দ্বারা তাঁহার নাম রক্ষা হইবে। এখন কি পরিতাপ! তুমি সে-সমস্ত আশালতার মুলোচ্ছেদ করিয়া ম্লেচ্ছধর্মাশ্রিত হইলা! ভাবিয়া দেখ, বংশধর পুত্রের মুখ সন্দর্শনে পিতার ঋণোদ্ধার প্রযুক্ত কেমন হর্ষপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু অস্মদীয় আচার্য মহাশয় বেদাদি শাস্ত্রানুশীলনে আমাদের বুৎপত্তি দেখিয়া চির-নিঃসন্তানের সন্তান-লাভ অপেক্ষাও অধিক সন্তোষ লাভ করিতেন!... তাঁহার পরিশ্রমের কি এই ফল যে তুমি তাঁহার ছাত্র হইয়া বেদ-নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলা এবং ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া ভগবান বাসুদেবের স্বকীয় বচন প্রমাণ যাহা তোমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ তাহা পরিহার পূর্বক যাহা ভয়াবহ তাহাই গ্রাহ্য করিলা। তুমি আচার্যের নামে এমত কলঙ্ক স্পর্শ করাইবা, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। তৎকালে কে ভাবিতে পারিত যে, আচার্য মহাশয় তোমাকে উপদেশ করিয়া শরণপ্রার্থিনী বেদবিদ্যাকে শত্রুহস্তগতা করিলেন? রাধামাধব! তুমি কি করিলে হে ভাই! বলিতে কি বেদতস্কর দুরাচার যবন ফৈজি জলধি-মথিত-সুধাচোর-দানবোপম হইলেও তোমার ন্যায় অত্যাচারী হয় নাই। কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করিলেই বা কি হইবে? অদৃষ্টের খণ্ডন কখনই হইতে পারে না— অদৃষ্টের দোষ!

ষড়্দর্শন সংবাদ (১৮৬৭), প্রথম সংবাদ

মধুরানাথ তর্করত্ন

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কহিলেন, "আমি রঘুনাথপুরের মুখোপাধ্যায়দিগকে বিশেষ জানি। তাঁহাদের মান, সম্ভ্রম ও ধনের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, যথার্থ; স্কুলেও প্রধান, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্মোহন লেখাপড়ায় কিরূপ? ধর্ম বিষয়ে বা কতদূর অধিকার আছে, তাহা বিশেষ আমি জানি না।" কুলাচার্য ইহা শুনিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনার কন্যা যে বিশেষ গুণবতী, তাহা প্রায় সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। কিন্তু কুলীনের ছেলে প্রায় বিশেষ লেখাপড়া শিখিয়াছে কি না এবং উত্তম রূপবান কি না, তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। মন্মোহনবাবু নিতান্ত মুর্খ নয়, তবে নিতান্ত বিচক্ষণ হইয়া উঠেন নাই। আর ধর্ম বিষয়ে যে কিরূপ, তাহা এত অল্প বয়সে কি-প্রকারে জানা যাইবেক? বয়সাধিক্য ব্যতিরেকে ধার্মিক হওয়া সুকঠিন। ফলতঃ অল্প বয়সে ধর্মপরায়ণ হইতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।"

সরলার পিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "পরিণয়কার্য প্রজাপতির নির্বন্ধ! জগদীশ্বর যাহার সহিত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। আমি আমার ধর্মপত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া, যদি কর্তব্য হয়, মহাশয়কে পত্র লিখিব। আপনি কহিলেন, 'অল্প বয়সে ধর্মজ্ঞান হয় না'; কিন্তু আমার সরলা ত বালিকা, সে যদ্রূপ ধর্মোপদেশ দ্বারা ধর্মপরায়ণা হইয়াছে, তদ্রূপ পাত্র ব্যতিরিক্ত কি-প্রকারে সম্প্রদান করিতে সক্ষম হই?" কুলাচার্য সরলার ধর্মোপদেশ শুনিয়া বিস্মিত লোচনে কহিলেন, "কি আশ্চর্য! এত অল্পবয়স্কা কামিনী ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছে? এ-বাক্যটী নিতান্ত বিশ্বস্ত হইতেছে না।" ইহা শুনিয়া ভবদেব স্বীয়াত্মজা সরলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মাতা সরলা, এই কুলাচার্য তোমাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন; ইঁহার নিকট যথাকথঞ্চিৎ ধর্মোপদেশ যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহার কিয়ংদশ পরীক্ষা দেও!" সরলা ঈষৎ হাস্য ও নম্রমুখী হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "পণ্ডিতমহাশয় গদ্য-পদ্য উভয় প্রকারে ধর্মোপদেশ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার কোন্ প্রকার পরীক্ষা দিব, অনুমতি দিন।"

সরলা চরিত (১৮৬৮), তৃতীয় অধ্যায়

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্বকালে গ্রীস, রোম ও ইজিপ্ট দেশে পৌত্তলিকতার প্রভাবই সর্বতোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন কালে কি-জন্য যে এইরূপ পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়, তৎপ্রতি বিশেষরূপ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, প্রাচীন কালের লোকেরা আপনাদের জ্ঞানান্ধ আত্মাতে নিরাকার জগদীশ্বরের ভাবের ধ্যান-ধারণা করিতে সমর্থ হইত না। যদিও মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা নিরাকার পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা জন্য উপদেশ দিয়া, ঈশ্বরজ্ঞান-বিষয়ক মহা সত্য-সকল জ্বলন্ত অক্ষরে বিকীর্ণ করিয়া, মনুষ্যগণের নিকট তাহার প্রভা প্রতিভাত করিয়াছিলেন, তথাপি তাহা কোনরূপেই তাহাদিগকে চিরকালের জন্য অধিকার করিতে পারে নাই। বাস্তবিক পুরাবৃত্তের অন্ধতম প্রদেশ-সকল যতই অন্বেষণ করা যায়, ততই জড় বস্তুতে ঐশী শক্তির বিশ্বাস দৃষ্টিগোচর হয়। এবং এইরূপই যে হইবে, তাহা বড় আশ্চর্যের বিষয় নহে, কেননা নিরাকার পরমেশ্বরের চিন্তা, তাঁহার উপাসনা, যদিও ধর্মের প্রধান উপদেশ, তথাপি জ্ঞানযোগ ভিন্ন ইহা মনে ধারণা করা অতীব কঠিন ব্যাপার। জড় বস্তুকে ধ্যান করা, জড় বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া মানসিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা এত সহজ ব্যাপার যে, অসভ্য জাতিরা প্রথমেই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। প্রস্তরের কাঠিন্য, বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়া, পর্বতসমূহের উন্নত শিখর, নদীপ্রবাহের ভয়ানক তরঙ্গ দেখিয়া প্রথমেই ইহাদিগকে, এই জড়বস্তুদিগকে, মনুষ্য হইতে সমধিক প্রতাপশালী মনে হইয়া উপাস্য বোধ হয়। আবার মধ্যে মধ্যে যে-সকল প্রস্তরকে স্বাভাবিক নিয়মে আকাশ হইতে পতিত হইতে দেখে, তাহাকে যে ঐশী শক্তি-বিশিষ্ট বলিবে, ইহাও বড় আশ্চর্যের বিষয় নহে। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন ঐ সকল জড় বস্তুতে আপনাদের প্রতিকৃতি নিক্ষেপ করে এবং সেই সকল প্রতিকৃতিতে অমানুষ শক্তি কিম্বা অমানুষ গুণ যোগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐশী শক্তি কিম্বা ঐশী গুণ-যুক্ত বলিয়া নির্দেশ করে। পৌত্তলিকতার এইটুকু প্রমার্জনও জ্ঞানের কার্য। জ্ঞান দ্বারা জড়-প্রকৃতির উপর যতটুকু প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, মনুষ্য ততই জড়-বস্তুর প্রতি ভক্তি করিতে বিরত হয়।

জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য (১৮৬৮)

রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ

পাঠকগণ, সময়ের হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই; কালও যেমন গেছে আজও তেমনি যাচ্চে, কালও তেমনি যাবে। সময় ভালও নয়, মন্দও নয়, অল্পও নয়, অধিকও নয়; চিরকালই সমভাবে চলে আসচে। তবে লোকে ভ্রমবশতই বলে থাকে: সুখের সময় শিগ্‌গির যায়, দুঃখের সময়ের অবধি নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজীবনে এরূপ ভ্রম হয়েই থাকে। সুতরাং এই আমোদে আজকের রাতটি যেন এক মুহূর্তের মত কেটে গেল। ইয়ারকির আমোদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশানাথ অস্ত গেলেন, কুমুদিনীনাথের দুর্দশা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্ধকার স্থিরভাবে এতক্ষণ বাবুদের খেমটা নাচ দেখছিলেন ও "পিরিত চিনেছ ভাল কোলা বেঙ" গান শুনছিলেন, কিন্তু যেই "মলিন বদন কেন রে তোর হেরি রে বাপ যাদুমণি" শুনেছেন, অমনি আর সামনে থাকতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে জলের জালা আর পুজোবাড়ির ভাঁড়ার ঘরে লুকুলেন। কমলিনী ঘোমটা খুলে মুচকে হেসে হাতছানি দিয়ে প্রাণনাথকে ডেকে তামাশা দেখাতে লাগলেন, সূর্যদেবও বাবুদের বাঁদরামো দেখে রেগেই যেন রাঙা হয়ে উঠলেন, পাখিগুলো "যেমন কর্ম তেমনি ফল" বলতে বলতে চলে গেল, আমাদের বাবুর বাড়িরও নবপত্রিকা-স্নানের সময় হয়ে এলো। সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠলো, নহবতে রকমারি বোল বাজতে লাগলো, ছোট ছোট ছেলেরা ঘুম থেকে উঠে নেংটা হয়েই পুজোবাড়ির উঠোনে জমতে লাগলো, তাদের আর কাপড় পরবার অবকাশ হলো না। পুরুতঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে কলাগাছ, হলুদগাছ প্রভৃতি একত্রে বেঁধে, জোড়া বেলের পীনপয়োধর করে, নবপত্রিকা ঘাড়ে নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে, গঙ্গায় স্নান করাতে চল্লেন। ছেলেরা শাঁখ ঘণ্টা কাঁসি নিয়ে পেছনে পেছনে বাজাতে বাজাতে চল্লো। ক্রমে গঙ্গাতীরে লোকারণ্য। ঘোষেদের বোসেদের মুখুয্যেদেরও নবপত্রিকা এসে জুটলো, ঢাকঢোলের বাদ্দি, ছোঁড়াদের চীৎকার আর কাঁসি-ঘণ্টার শব্দে একেবারে নভঃস্থল যেন বিদীর্ণ হয়ে উঠলো ও গঙ্গার ওপার থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে যেন 'বাহবা' দিতে লাগলো। ক্রমে সহস্র কলসী ও সর্বৌষধি মহৌষধির জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে সাড়ি পরিয়ে তাঁকে 'কলাবৌ' করে দুর্গাপ্রতিমের গণেশের পাশে বেঁধে দেওয়া হলো।

পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব (১৮৬৮)

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী

রশিনারার আগমনের পূর্বেই গিরিদুর্গের একটি গৃহ সুসজ্জিত এবং পরিচর্যার্থ দাসীগণ সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থান করিতেছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে পরিচারিকাদিগের মধ্য হইতে একজন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিল, "স্বামিনি, আপনি এখানে পরম সুখে বাস করুন; যখন যাহা অভিলাষ হয়, আমাদিগকে বলিবেন, যথাসাধ্য আমরা আপনার সেবা করিব, আমরা আপনার দাসী।"

"স্বামিনি"— এই সম্বোধনে রশিনারার মনে মহাক্রোধ জন্মিল। একে আপনার বিপন্ন অবস্থায় যৎপরোনাস্তি পরিতাপযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে দাসীর মুখে এই অবমাননাসূচক সম্বোধনে মহা ক্রোধান্বিতা হইলেন। রশিনারা কেবল বসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা তাঁহাকে "স্বামিনি" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল শুনিয়া আর বসিতে পারিলেন না। নাসিকার ক্ষুদ্র রন্ধ্র সঘন প্রশ্বাস সহকারে স্ফীত ও কম্পিত হইতে লাগিল, কুপিত ভুজঙ্গীর ন্যায় নাসাগর্জন ধ্বনিত হইতে লাগিল, সুকোমল কমল-মুখ ঈষদারক্ত হইয়া উঠিল, বিশাল লোচন গোলাকৃতি হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, সুপ্রশস্ত ললাটতলে শিরা প্রকাশ পাইতে লাগিল, বিচিত্র ভ্রূযুগলও ঈষৎ বিকম্পিত হইতে লাগিল, গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র হইল; এইরূপে ক্রোধাবেশে রশিনারা কাহাকে কিছু না বলিয়া বেণী হইতে পুষ্প উন্মোচন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং দশনদ্বারা অধর দংশন করিতে লাগিলেন।

সেই সক্রোধ ভীষণ মূর্তি দর্শন করিয়া দাসীগণ ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল। একটিমাত্র পরিচারিকা পলায়ন করিল না, সে অনিমেষ নয়নে রশিনারার প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন যদি তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা থাকিত, তবে জানিতে পারিতেন যে, পরিচারিকাটি কিরূপ বুদ্ধিমতী। অধর-পল্লবে এবং নয়ন-প্রান্তে বুদ্ধির প্রভাব বিরাজ করিতেছিল। চতুরা দাসী ঈষৎ বিকশিত মুখে ব্যঙ্গের সহিত কহিল: "শাহাজাদি, একের অপরাধে অন্যের দণ্ড করেন কেন? ভাল, আমরাই যেন অপরাধ করিলাম! সুমধুর ওষ্ঠাধর, সুদীর্ঘ মনোহর বেণী— যুবজন-স্পৃহনীয় বস্তু; ইহাদের দোষ কি?"

রশিনারা এ-কথার কোন উত্তর করিলেন না।

রশিনারা (১৮৬৯), প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ব্যথিতান্তরে

এ-স্থলে ইহা বলাও অসঙ্গত নহে, আমরা যে-সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে উপস্থিত হইতেছি, সেই স্ত্রীসমাজের সহিত বাল্যকাল হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ আপ্যায়িততা আছে। আত্মীয়তা-ধর্মে তাঁহারা আমাদিগের নিকট অনেক মনোগত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কোন্ বিষয়ে কিরূপ রুচি, আমরা অভিনিবেশ চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিযাছি, বামাকুলের অনেক গুণ-দোষ আমাদিগের নিকট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে। সুতরাং অবলাবান্ধব তাঁহাদিগের নিতান্ত অযোগ্য প্রতিনিধি হইবে না ভরসা হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের বাক্য পাঠকসমাজে কত দূর আদৃত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। জনসাধারণে আমাদিগের পরামর্শ অধিক পরিমাণে আশু গ্রহণ করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না; স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি; কতকগুলা লোকের প্রকৃতি এত তীব্র যে, নারীদিগের মঙ্গলার্থ একটি বাক্য শুনিলেও নিতান্ত বিরক্ত হন। যিনি ওরূপ কথা উত্থাপন করেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ ও অপমান করিতে ত্রুটি করেন না। মেয়ে-মানুষের পক্ষ সমর্থন করেন বিধায় তাঁহাদিগকে 'মেগে' বলিয়া উপহাস করেন। এ-সকল লোকের নিকট অবলাবান্ধবের কত আদর হইবে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গবাসিনী কামিনীদিগের মঙ্গল কামনায় ও পক্ষরক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহারা ঐ বিদ্রূপাত্মক উপাধি হয়ত আমাদিগকেও প্রদান করিবেন। কিন্তু আমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইব না; বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ সম্মানাত্মক উপাধি হইতেও উহাকে অধিক আদর ও গৌরবের চিহ্ন মনে করিব।

এক্ষণে যে-যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ রাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্তব্যবিধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে-সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল।

অবলাবন্ধু, ২২ মে ১৮৬৯

যদুনাথ সর্বাধিকারী

সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাহাতে আমার অম্বলের ব্যামোহ হইয়া শূল উপস্থিত হইল; শূলব্যাধির যেমত যাতনা তাহার কিছু ন্যূন ছিল না। এক-এক দিবস যাতনাতে এমত মনে হইত যে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। ভগবৎস্বেচ্ছায় নিবারণ হইত। ক্রমে ক্রমে শরীর অতিশয় দুর্বল এবং আহাররহিত হইল। এক ঘরে শয়নে ছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া বেদনার সূত্র হইতে, উঠিয়া এক গেলাস জল পান করিলাম, তাহাতে নিবৃত্তি না পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় যাতনা হইতে লাগিল। সে-যাতনার কথা যখন মনে হয়, তখনি প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। হে ভগবান! তেমন যাতনা যেন কাহার না হয়। সেই যাতনাতে অত্যন্ত দুর্বল এবং ব্যাকুল হই। গৃহমধ্যে আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রগণ লইয়া শয্যান্তরে শয়নে ছিল। আমি তিন চারি বার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না; তাহাতে রোগযন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়া অত্যন্ত রাগের বৃদ্ধি হইয়া আর কাহাকে কিছু না কহিয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলি বৃথা, 'সম্বন্ধ জীবনাবধি' এই মনে স্থির করিয়া চণ্ডালগ্রস্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ প্রধানকল্প বিবেচনা করিয়া ঘর হইতে বাহির হই। বাহির-বাটীতে আসিয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রী ঁরাধাকান্তদেব ঠাকুরের শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিলাম। ক্ষণেক কাল বসিয়া থাকিতে বেদনার কিছু শান্তিবোধ হইয়া তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তৎকালে রাত্র তৃতীয় প্রহরাগত, নিদ্রাবেশে হস্ত মস্তকে দিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়ন করিয়া মনে উদয় হইতে লাগিল যে, মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারকূপনরকে ডুবিয়া কেবল আমার আমার করিয়া সৃজনকর্তা জগদীশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া এত ক্লেশ পাইতে হইতেছে। হে জগদীশ্বর! আমার শরীরে কিছু বল হইলে আমি স্ত্রীপুত্রের মায়া ছেদ করিয়া তোমার দর্শনাশে দেশভ্রমণ করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাকর্ষণ হইল।

তীর্থ-ভ্রমণ, তীর্থযাত্রার পূর্ব ঘটনা

বিবাহ অপ্রতিহার্যরূপে আবশ্যক, যেহেতু একত্র সহবাস না করিলে উভয়ের উভয়ের নিকট যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহা পায় না। বিশেষ নবযৌবনের প্রারম্ভে স্ত্রী-পুরুষের সর্বদা একত্র অবস্থিতি ব্যতীত কখন তৎকাল-সুলভ-বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হয় না। এবং এই কারণবশতঃ অধুনাতন অনেক বঙ্গীয় যুবক সুনীতি অতিক্রম করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত আসঙ্গলিপ্সা-বৃদ্ধি স্বাভাবিক এবং মনুষ্যের সর্বকার্যের নেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইত্যাকার কারণপরম্পরায় কালক্রমে স্বেচ্ছাবিহার-প্রণালী নিবারিত হইয়া বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল।

কল্পনা কর, যখন মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিল অথচ বিবাহ-প্রণালী আরম্ভ হয় নাই, তখন অবশ্যই লোকে কাম-প্রপীড়িত হইয়া পরস্পরের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। মনে কর, এক বামা একেবারে দুইজন সমকক্ষ বীরের অনুরাগ-ভাগিনী হইলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন মনোরথ চরিতার্থ হেতু প্রয়াস পাইতে লাগিল। সর্বস্বান্ত কেন, প্রাণান্ত না হইলে কেহই দারুণ দুর্দমনীয় কামের হস্ত হইতে নিস্তার পায় না। আমরা তাহাদিগকে এ-বিষয় সম্বন্ধে দোষী বিবেচনা করিতে পারি না, যেহেতু প্রকৃতিই শিক্ষক, উত্তেজক ও নেতা। এরূপ অবস্থাতে সমাজ কত বিশৃঙ্খল হয়? মানবসমাজ ক্রমে উন্নত হইয়া যখন বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, তখনও যে এইরূপ কত অত্যাচার চলিত এবং বর্তমান সময়ে এ-বিষয় সম্বন্ধে কত দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা মনে করিলে একেবারে হৃৎকম্প হয়। কত দেশ, কত রাজ্য, কত নগর, কত শত শত লোক এইজন্য প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় সভ্য সময়ে ধর্মভয়, রাজভয়, লোকভয় প্রভৃতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যখন ঈদৃক্ আচরণ দেখিতেছি, তখন পূর্বে যে কিরূপ হইত, তাহা কল্পনা দ্বারাও মনে ধারণা করিতে পারা যায় না।

এইরূপে এই সকল অসুবিধা-পরম্পরা হইতে সাময়িক দাম্পত্যভাব এবং তাহা হইতে কালে চিরদাম্পত্যভাব উপস্থিত হইয়াছে। বিবাহ একপুরুষ বা একশত বৎসরের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই, কিন্তু বহু কাল ও ক্লেশের ফল।

সভ্যতার ইতিহাস, দুইজন পুরুষ এক স্ত্রীতে আসক্ত

অনতিদূরে অরিন্দম (হেক্‌টর) চিরানন্দ ভার্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সন্তানটীকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাহ্লাদে সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অস্রমোকী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদ্‌গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হায় প্রাণনাথ, আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্যই তোমার কাল হইবে। রণমদে উন্মত্ত হইলে! এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটী, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণপথে স্থান পাই না?... হে নাথ, তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে? তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর, আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর, সকলেই এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। হে নাথ, তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথা কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার জীবনসর্বস্ব, তুমি আমার প্রেমাকর, অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি যে, তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটীকে পিতৃহীন আর এ অভাগিনীকে ভর্তৃহীনা করিও না। রিপুদলের সহিত নগরতোরণ সম্মুখে যুদ্ধ কর; তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে।" ভাস্বর-কিরীটী মহাবাহু হেক্‌টর উত্তরিলেন, "প্রাণেশ্বরি, তুমি কি ভাব যে, এ-সকল দুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিকীর্ণ হয় না? কিন্তু কি করি; যদি আমি কোন ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদলের আর আস্পর্ধার সীমা থাকিবে না..." এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণপূর্বক শিশু-সন্তানটীকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতি উজ্জ্বলতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্য বদনে মস্তক হইতে কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "হে জগদীশ, এ-শিশুটীকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্যবত্তর কর।" এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুটাকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে, কিন্তু মুহুর্মুহু পশ্চাৎভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদিনীকে অশ্রুবারিধারায় আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

হেক্‌টর বধ (১৮৭১), তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বেলা দশটা অতীত। আর আমি বিলম্ব কোত্তে না পেরে বিদায় হলেম। বাসায় গিয়ে স্নান-আহারের পর একটু বিশ্রাম কোরে উপরের ঘরে একাকী বোসে আছি, এমন সময় পাশের বাড়ীতে দুজন লোকের কথোপকথন শুন্তে পেলেম। যে-বাড়ীতে আমার বাসা, সেই বাড়ীর পাশে দু হাত আড়াই হাত ওসারের একটা গলি পার আর-একটা বাড়ী। গলির দিকে দু-বাড়ীর দু-তিনটী জানালা। আমার ঘরের জানালার খড়খড়ি বন্ধ ছিল, সুতরাং কথাগুলি স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল না। শোনবার তত আবশ্যকও ছিল না, কিন্তু অল্প অল্প আওয়াজ পেয়েছি, দু-তিন বার আমার নাম হয়েছে। আমার নাম কেন হয়, এই ভেবে তখন ধীরে ধীরে খড়খড়ির দুটী পাকি খুলে দেখলেম, সে-বাড়ীর একটা জানালা খোলা, জানালার ধারে একখানি কৌচের উপর একটী স্ত্রীলোক বোসে একজন লোকের সঙ্গে গল্প কোচ্চে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। নিরীক্ষণ কোরে দেখলেম, স্ত্রীলোকটীকে ভাল দেখতে পেলেম না, কিন্তু দাঁড়ানো লোক সেই ঘটক ঠাকুর। সে বোলচে, "তুমি কি তারে চেন?" স্ত্রীলোক উত্তর কোল্লে, "নামে তো বোধ হোচ্চে চিনি; চেহারাখানা কেমন, বল দেখি।" ঘটক উত্তর কোল্লেন, "দেখলে না, তুমি যখন সকালবেলা মেয়ে দেখাতে যাও, তখন সেই ছোঁড়াটা তোমার কাছেই যে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই যে সুন্দরপানা, গোল গোল গড়ন, নাকটা টিকোলো, চোক দুটো বড় বড়, চুলগুলো লতানো, কপালটা ছোট, উজ্জ্বল দৃষ্টি আর বাঁ গালে একটা জড়ুল।"

স্ত্রীলোকটী এই কথা শুনে বোল্লে, "তবে ত ঠিক হয়েছে, সেই হরিদাসই ত বটে! আ মলো! গয়ার পাপ আবার এখানে এসে জুটেছে! তবেই ত গোল বাধালে! কি হবে, ঘটক ঠাকুর?"

ঘটক ঠাকুর বোল্লে, "হবে আর কি? তারে এত ভয়ই বা কি? সে কি তোমারে দেখেছে, না চেনে? তার জন্যে আবার ভাবনা কি?"

স্ত্রীলোক বোল্লে, "দেখেছে বই কি। চেনে বই কি। আমাদের—"

এই পর্যন্ত বোলে এত আস্তে আস্তে কথা কইলে যে, কিছুই শুন্তে পেলেম না।

আমার গুপ্ত কথা, তৃতীয় পর্ব (১৮৭২)

হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন দুঃখিনী স্বধর্মরক্ষণার্থে অন্যত্র পলায়নপরতা-ই শ্রেয়ঃসাধিনী জ্ঞানে তদুপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় কিছুদিন যাপন করিয়া পরিশেষে তমোময়ী-তমস্বিনীসহায়িনী হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। একাকিনী অজ্ঞাত অদৃষ্টপূর্ব পথে গমন করিতে সমধিক ভীতা হইলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, বিধাতা আজ অবধিই বুঝি আমার পরমায়ুর শেষ করিয়াছেন, অথবা ধর্মপথে নানাবিধ বিঘ্ন দেখিতে হয়। যাহা হউক, এ-সময়ে ভীত হইলে সকল দিক নষ্ট হইবেক, কিন্তু কোথাইবা যাই? কাহারইবা শরণাগত হই, একালে এমন সজ্জনইবা কে কোথায় আছে যে আমাকে অকারণ স্থান দিয়া আমার প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা করিবেক? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একটী সামান্য বনে প্রবেশ করিলেন, এবং তন্মধ্যগত অনতিপরিসর পথ অবলম্বনে যথাশক্তি দ্রুতগামিনী হইলেন। কিয়দ্দুর গমন করিলে সেই আয়তন-সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্বস্থিত কণ্টকাকীর্ণ ভূমিতে তাঁহার পদদ্বয় বিক্ষিপ্ত হইয়া উভয় পদেই দৃঢ় কণ্টক-সকল বিদ্ধ হইল। আহা! একে কোমলাঙ্গী, প্রাণভয়ে ব্যাকুলা; আবার বিদ্ধ কণ্টকের অসহ্য বেদনানুভবে একেবারে চলৎশক্তিরহিত হইয়া উঠিলেন; অগত্যা এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রোদন করিতে করিতে পদবিদ্ধ কণ্টক-সকল নিষ্কাশিত করিতেছিলেন, এমত সময় "ওরে! কে কাঁদে? সেই না?" এই কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র সচকিত হইলেন এবং বিশ্বনাথের অনুচরগণ তাঁহারই অনুসন্ধানে আসিতেছে, ইহা মনে করিয়া সেই ব্যথিত পদদ্বয় বেগে ও নিঃশব্দে সঞ্চালন দ্বারা সেই বন উত্তীর্ণ হইয়া এক গৃহস্থের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও গৃহপতিকে বারম্বার আহ্বান করিয়া কাতরতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "এই দুঃখিনী ও অনাথিনীকে ত্বরায় গৃহমধ্যে স্থানদান করিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করুন!" গৃহপতি নিশীথসময়ে অভাবনীয় মহিলাসুলভ কাতরোক্তি-শ্রবণে কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে দ্বারদেশে আগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে দুঃখিনী স্বীয় পশ্চাদ্ভাগে দ্রুতগামী মনুষ্যের পদ-সঞ্চারোচিত শব্দ শুনিয়া মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

নটনন্দিনী (১৮৭২), তৃতীয় অধ্যায়: পলায়ন

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই মূল। ইহা হইতেই অধিকারিভেদে নানা প্রকারে হিন্দুধর্ম শাখাপল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বহুকালের শেষে আসিয়া পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য অপৌত্তলিক ব্রাহ্মগণ যেমন উপাসনায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ গৃহকর্ম অনুষ্ঠান করিবার সময়েও অপৌত্তলিকতা রক্ষা করিবার নিমিত্তে ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান-পদ্ধতির স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত করিয়া তাহা হইতেই অপৌত্তলিক ভাব গ্রহণপূর্বক হিন্দু প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠানকার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী কতকগুলিন চঞ্চলস্বভাব লোক, সম্প্রতি আপনারদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকৃত হইয়া, হিন্দু পদ্ধতি পরিত্যাগপূর্বক হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি নানা জাতীয় কিছু কিছু প্রণালী লইয়া বিবাহাদির এক নূতন প্রণালী গঠনপূর্বক বিবাহ-ক্রিয়া প্রচলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারদিগের সেই বিবাহপ্রণালী কোন প্রকারেই ধর্মশাস্ত্রসিদ্ধ নহে; সুতরাং, তাঁহারদিগের রাজনিয়ম দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিবার আবশ্যক হওয়াতে, তাঁহারা আপনারদিগের ঐ বিবাহ রাজনিয়ম দ্বারা বিধিবদ্ধ হইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে আবেদন করেন। কিন্তু ঐ আবেদনপত্রে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া উল্লেখ থাকাতে আদি ব্রাহ্মসমাজস্থ হিন্দু ব্রাহ্মেরা উহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া রাজবিধিতে উল্লেখ করিতে আপত্তি করেন। তাহাতে আধুনিক ব্রাহ্মেরা ভাবিলেন: যদি আদিব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে কোন কৌশলে অসিদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই ইঁহারদিগের আর আপত্তি থাকিবে না। এই বিবেচনায় আধুনিক ব্রাহ্মেরা আদিব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিপক্ষতাচরণপূর্বক কুশণ্ডিকাদি ব্যতীত বিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয় কি না, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কাশীস্থ ধমশাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থাপত্র প্রার্থনা করেন; কিন্তু তথা হইতে তাঁহারা যে-ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ঐ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। যদিও অধ্যাপকেরা তাঁহারদিগকে যে-ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারদিগের বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে এবং আদিব্রাহ্মদিগের বিবাহপদ্ধতি ধর্মশাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি আদিব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মেরা নানা সমাজ হইতে তদ্বিষয়ে যে-ব্যবস্থাপত্র আনয়ন করিয়াছেন এবং ধর্মশাস্ত্রালোচনায় তাহাতে আরও যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তৎসমুদায় সংগ্রহপূর্বক আমি ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম।

ব্রাহ্মবিবাহ ধর্মশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না? (১৮৭৩), বিজ্ঞাপন

এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রিদিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য-পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন", "কাপড় দে" "ভাত রাঁধলে না", "ছেলে খায় নাই", "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বালনা দিয়া পা গোট করিয়া প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেননা তপ্ত তৈল ছিটকাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। কেহ বা স্নানকালে বহুতৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমান্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন— যেন রাখাল পাঁচনীহস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা লাউ, কুমড়া, বার্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে; তাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে; মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্পবয়সে বিধবা হইল, চাঁদির স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি হইয়াছে (সে দারোগার মুহুরী). গোপালে উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গালায় নাই, ইংরেজেরা নাকি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ভট্টচার্যিদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস— এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচনা হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্যঃপ্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই-একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), সপ্তম পরিচ্ছেদ: পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূমণ্ডলে যে-সকল লোকে প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া যাইতে পারে। একদল পুরাতন জ্ঞান ও কার্যপ্রণালীতে পরিণত, অপরদল নূতন পথদর্শী। একদল অন্য-নির্দিষ্ট বর্ত্মে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, অপরদল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গড়িতে বা অভিনব প্রকার সৃষ্টি বা আবিষ্কার করিতে পারেন। প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী, এবং শেষোক্তদিগকে প্রতিভাশালী বলা যায়।

কেহ কেহ অন্য-নির্মিত কল দেখিয়া তদনুরূপ গড়িতে পাবেন, অন্যাবিষ্কৃত তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে পারেন, বা অন্যোদ্ভাবিত ভাবে অলঙ্কৃত হইতে পারেন; কিন্তু নূতন কল নির্মাণ, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার, বা নূতন ভাবের উদ্ভাবন তাঁহাদিগের শক্তিসাধ্য নহে। এরূপ লোকে কার্যক্ষম, বিজ্ঞানবিৎ বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী বলা যাইবে, কিন্তু প্রতিভাশালী বলা যাইবে না। তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আদ্যন্ত রামায়ণ যাঁহার মুখস্থ এবং কথাবার্তায় ও লিখনপঠনে যিনি রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন, তিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন হউন না, তাঁহার ঈদৃশ দক্ষতা আদিকবি বাল্মীকির নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন!

পূর্বকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইতেন। তখন লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্তশক্তি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে অন্ধকারময় অতীতকাল ভেদ করিতে দিয়া রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দুরাচার জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার বরে ভাবরত্নাকর বাল্মীকি; এই বিশ্বাসের বলেই জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন যে শকুন্তলাপ্রণেতা কালিদাস প্রথমে মহামূর্খ ছিলেন, পরে বিদ্যাবতী রমণীর পদাঘাতে অভিমানে কানন প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সর্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণি হইয়া গৃহ-প্রত্যাগমন করেন। কেবল ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য দেশেও ঈদৃশ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে...। যদিও ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ-প্রকার আকস্মিক দৈবশক্তির আবির্ভাব অপ্রামাণ্য ও অনৈসর্গিক, তথাপি প্রতিভা যে দেবদত্তশক্তি, এ-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

নানা প্রবন্ধ, প্রতিভা (১৮৭৩)

মনোমোহন বসু

শাস্ত্র ও যুক্তিপথ ত্যাগ করিয়া যদি দয়াবৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা হইলে নির্দোষী নবোঢ়া বালার কমনীয় কোমল মূর্তি চিত্তফলকে উদিত হইয়া ঘোর চাঞ্চল্য উৎপন্ন ও অপার শোকসিন্ধুনীরে মগ্ন করিয়া ফেলে; তখন আর কি শাস্ত্র কি যুক্তি কাহারো কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না। যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যজন্মের কিছুই জানিল না, কোনো সাধ-আহ্লাদের আস্বাদ-গ্রহণে সমর্থা হইল না, জীবিতা থাকিয়া জীবিতা কি মৃতা অনুভব করিতে পারিল না. পাঁচ সখীর সহিত সকল বিষয় সখ্যতা, সকল বিষয়ে সাম্যতা স্বত্ত্বেও জীবনের সারভোগে সদৃশা হইতে পারিল না: আপনার প্রাণাধিক সহোদরের শুভবিবাহে ও বাটীর কোনো শুভকর্মে হাত দিতে পাইল না, ভ্রাতার আনীত নব বধূকে বরণ করিয়া কোলে লইয়া ঘরে যাইতে— আহা! স্পর্শ করিতেও— পাইল না, এ-দুঃখে কি হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? সকল থাকিতে কিছুই নাই! দুঃখের জীবন, মর্মান্তিক যাতনা-ভারবাহী জীবন কি কচি বয়সে কেবল একাদশী করিতেই রহিল? যিনি শাস্ত্রের পরম ভক্ত, যিনি পুরাতনের পরম ভক্ত, যিনি প্রথার চিরক্রীত দাস, তিনিও এ-যন্ত্রণা দেখিয়া— দেখার মতন দেখিয়া, অন্তরে ধ্যান করিয়া দেখিয়া— নেত্রনীর নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারেন না, এবং তিনিও স্বশ্রেণীস্থ লোককে আমার সহিত যোগ দিয়া এই প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইতে পারেন যে, হে সামাজিক জ্ঞানবৃদ্ধ শাস্ত্ররক্ষক মহাশয়গণ! এ-দুঃখ আর দেখা যায় না। এতকাল তো এ-কথা উঠে নাই, কেহ সেই অচলাগণকে বলে নাই, তাহারও লেখাপড়া শিখে নাই, অন্য পথ যে হইতে পারে, তাহা তখন অণুমাত্রও জানিতে পারে নাই, সুতরাং তখন তাহাতে কোনো হানি ছিল না। এখন চতুর্দিকে এই প্রসঙ্গের তরঙ্গ উঠিতেছে, তোমরা বাহিরে বসিয়া কিছুই শুনিতে, কিছুই পড়িতে পাইতেছ না, কিন্তু দেখ গিয়া তোমাদের অন্তঃপুরমধ্যে, যেখানে পূর্বে জ্ঞানপবনের গতিরোধ ছিল: এখন সেই অন্তঃপুরে সেই সব তত্ত্ব, সেই সব জ্ঞান, সেই সব সংবাদ পঠিত, শ্রুত, আলোচিত হইতেছে।... অতএব দয়ার্দ্র হও, দয়ার্দ্র হও, উত্থান কর, চেষ্টা কর! অন্ততঃ যদি কোনো মাঝামাঝি-রূপ উপায় থাকে, দয়া করিয়া না হয় তাহাই করিয়া দেও! পুত্রবতী প্রৌঢ়ার ভাগ্যে যাহা হউক, নবপ্রসূনবৎ নবোঢ়ার মুক্তি জন্য কোনো উপায় কি হয় না? শাস্ত্র, যুক্তি, দয়া— তিনের ঐক্য করিয়া কি কোনো পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে না?

হিন্দু আচার-ব্যবহার (১৮৭৩), প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, বিধবাবিবাহ

নবরাজ্ঞী বলিলেন, "আমার মত লোকের আর সপত্নীর ভয় কি? কথায় কথায় সপত্নীর খেলা, পদে পদে সপত্নীর জ্বালা, যাদের নূতন সপত্নী ঘটে তাহাদিগের ও-বিষয় চিন্তার বিষয়। আমার সপত্নীসংখ্যা করা ভার; এরূপ অবস্থায় আমার মন বিরক্ত হইবে কেন?'

দ্বারে আঘাত, পুনঃপুনঃ দ্বারে আঘাত। সম্রাট ইঙ্গিত করিবামাত্র এক পরিচারিকা কর্তৃক দ্বার মুক্ত হইল। অমনি একটী প্রৌঢ়া স্ত্রী এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটী যুবতী সমাগমন করিয়া সম্রাটের নিকটে দণ্ডায়মান হইল। বেশভূষা ও ভাবভঙ্গি দ্বারা প্রৌঢ়াকে স্বামিনী ও অপর দুইটীকে পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইল। প্রৌঢ়া সম্রাটের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল; দেখিলেই বোধ হয় যেন কোনরূপ হৃদয়গত কোমল সম্বন্ধ না থাকিলে সম্রাটের নিকট এরূপ সাহস ও ধৃষ্টতা জন্মিবার নহে। কেশ আলুলায়িত, ভূষণপরিচ্ছদ অযত্ন-বিন্যস্ত, লোচনদ্বয় লোহিত, অশ্রুপূর্ণ, নিশ্বাস কিঞ্চিৎ প্রমাণাধিক দীর্ঘ, বাষ্পবিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল:

"প্রাণনাথ, এ-অভাগিনীকে জন্মের মত এককালে ত্যাগ করিয়াছ। তুমি রাজাধিরাজ; যাহা কর, তাহাই শোভা পায়। আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকে জানি না; বৎসরাবধি তোমার অন্বেষণ করিতেছি; কোন নিশিতে যে কোথায় বিহার কর, নিশ্চয় জানিতে পারি নাই। আমার সৌভাগ্যক্রমে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি, তুমি এখানে শুভ রাত্রি যাপন করিতেছ। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইলাম। মাসে দুই দিবস আমার আলয়ে যাইবার নিয়ম ছিল; এই হিসাবে তোমার নিকট বিংশতি রাত্রির অধিক প্রায় প্রাপ্য হইয়াছে। তোমায় একতিল এখানে অবস্থিতি করিতে দিব না। তুমি দিগ্বিজয়ী হও আর যা-ই হও, আমার নিকট সেই সব বিক্রম কিছুই কার্যে লাগিবেক না। আমি বাদিনী, তুমি প্রতিবাদী; তোমার নামে বিচারপতি কামদেবের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছি; বসন্তকালে প্রথম কোকিল, পরে ভ্রমরগণ শমন জারি করিয়া গিয়াছে; তুমি শমন অমান্য করিয়াছ, সেই কারণ তোমায় ধরিয়া নেওয়ার জন্য পঞ্চবাণ প্রেরিত হইয়াছে; আজি তোমার পরিচয় করিবার নিমিত্ত সঙ্গে আসিয়াছি। আমার আলয়ে বিচারস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। চল, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

সমরশায়িনী (১৮৭৩), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিনাথ মজুমদার

ধৌম্য ঋষিবর কহিলেন: "মহারাজ, সর্বদা শোকে মগ্ন থাকিলে নৃপতিরা সুচারুরূপে রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে পারেন না; সুতরাং রাজ্যমধ্যে অবিচার হইয়া উঠে। অনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের সুস্থতা বিনাশ করিয়া মনুষ্যকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে; অতএব এরূপ চিন্তা পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু মনুষ্য বিষয়কর্মাদি হইতে অপসৃত হইয়া একাকী থাকিলে চিন্তা স্বভাবতই সহচরী হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল প্রিয়তমা সহধর্মিণীই মধুর বাক্যালাপে চিত্ততোষণ করিয়া চিন্তা দূর করিতে সমর্থ! সহধর্মিণীর সহিত সতত বাস করিলে পুরুষ কখনই ব্যভিচার আশ্রয় করে না। অতএব এক্ষণে এই অনুরোধ: পুনর্বার পাণিগ্রহণ করুন...। সংসারাশ্রমে নারী শ্রেষ্ঠতরা। শ্রীহীন গৃহ শ্মশানতুল্য; স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা বিবেচনা করিলে স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। পুরুষ নিজ পুণ্যবলে যদি সাধ্বী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণামে বিপন্ন হন না। অগ্রে পতির মৃত্যু হইলে সতী তাঁহার অনুগামিনী হইয়া অভয় প্রদান করেন। পতি অতিঘোর কলুষে কলুষিত হইলে সতী স্বকৃতপুণ্যার্ধপ্রদানে পতিত পতিকে পাপপঙ্ক হইতে পরিত্রাণ করেন। বিশেষতঃ মৃতদার ব্যক্তির সাংসারিক কোন ক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই।

"হে সার্বভৌম, সতীর গুণে কত শত মহাপরাক্রমশালী মহাত্মারাও আত্মরক্ষা করিয়াছেন। মহাবীর্য সত্যবান নরেন্দ্র বিজন বনে প্রাণত্যাগ করিয়াও কেবল পতিপ্রাণা সতীসাবিত্রীর গুণেই পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। ভগবান রামচন্দ্র সীতা-সতীর অসামান্য শক্তিসাহায্যে দুর্জয় দশস্কন্ধ রাবণকে পরাজয় করেন। মহাধনুর্ধর পার্থ কেবল বলভদ্রের অনুজা সুভদ্রার শকটপরিচালন কৌশলে সমুদ্রসদৃশ যাদবসৈন্যদলে জয়ী হইয়াছিলেন। পুরুষ মহারোগাক্রান্ত হইলে বন্ধু প্রতারণাপূর্বক দূরে পলায়ন করেন, পুত্র নিকটে আসিতে বিরক্ত হন, কন্যা দূরে থাকিয়াই ক্রন্দন করিতে থাকেন, কিন্তু পতিপ্রাণা সতী প্রাণকে পরিত্যাগ করেন তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি পতির জীর্ণদেহ ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের শ্রী, বিপদের আশ্রয় এবং আর্তজনের জননীস্বরূপা। মহারাজ, এমন স্ত্রী গ্রহণে আপনি কখন অসম্মত হইবেন না।"

পুরোহিতের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে রাজা দারপরিগ্রহে সম্মত হইলেন।

বিজয়বসন্ত (১৮৭৩), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেমাঙ্গিনী

ব্রাহ্মণ প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর ধর্মপত্নীর সহিত উদ্যানে গিয়া রামসীতা দর্শন করিতেন এবং কতকক্ষণ রামগুণগান করিয়া উভয়ে বৃক্ষ ও লতার তলে ভ্রমণ করিতেন; বৃক্ষগুলি ফলভারে অবনত এবং লতা-সকল ঊর্ধ্বগামিনী হইয়া বৃক্ষকে আশ্রয় করিতেছে দেখিয়া উভয়ে প্রণয়সংক্রান্ত নানা কথা কহিয়া অনির্বচনীয় সুখানুভব করিতেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণী একাকিনী উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্বকথা স্মরণ করিলে শোকানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; পাগলিনীর ন্যায় নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন: "হায়, এই সন্ধ্যা আগতপ্রায়; এ-সময় প্রাণনাথের সহিত এই উদ্যানে কতই সুখানুভব করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে সেই সকলি রহিয়াছে, কেবল আমার হৃদয়বল্লভ-অভাবে এ-উদ্যান শ্মশান-সমান বোধ হইতেছে!..." বহুবিধ বিলাপ করিয়া আপন আত্মীয়বর্গকে কহিলেন, "দেখ, যে-পর্যন্ত আমার দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত না হয়, তদবধি এই উদ্যানেই বাস করিব; তোমাদের সকলকে বিনয় করিয়া বলিতেছি: পুরুষমাত্র যেন এ-উদ্যানে না আসে। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, পুরুষের মুখাবলোকন করিব না।" এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি উদ্যানস্থিত রামসীতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, রামসীতার মূর্তি দর্শন করিয়াই তাঁহার শোকানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কিয়ৎক্ষণ চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন মুখ হইতে একটিও কথা নির্গত হইল না; তৎপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তৎপরে উদ্যানে যে-একটি সামান্য গৃহ ছিল, সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন; দিনান্তে একবার সকল বৃক্ষের তলায় বেড়াইতেন, এবং যে-কোন বৃক্ষতলে যে-কোন ফল পড়িয়া থাকিত তাহাই লইয়া ভোজন করিতেন এবং কূপের জল তুলিয়া পান করিতেন। তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া সর্বদা অনন্যমনে পতির চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন; মধ্যে মধ্যে কন্যাটিকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে সন্ধ্যার পর তাহাকে উদ্যানে আনাইয়া ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন।

মনোরম (১৮৭৪), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঠাকরুণদিদির রূপগুণের পরিচয় দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহার বর্ণটি জবাফুলের মত নয়, গোলাপফুলের মত নয়, বেলফুলের মত নয়, মল্লিকাফুলের মত নয়, আয়েশার মত নয়, আশমানির মত নয়, প্রদীপের আলোকের মত নয়, মোমবাতির মত নয়। এ-সমস্ত মিশ্রিত করিলে যেমন হয়, তাহার মতও নয়। কেমন, পাঠকবর্গ! বুঝেছেন তো এখন ঠাকরুণদিদির বর্ণটি কেমন? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে পুস্তকখানি এইখানেই বন্ধ করুন। 'নভেল' পড়া আপনার কাজ নয়। গ্রন্থকারদিগের ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করিবার নিয়ম নাই। আর যদিও ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয়ের বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি? আপনাদেরই বুদ্ধির স্থূলত্ব প্রকাশ পায়। অতএব যদি আপনরা 'অল্পবুদ্ধি' এই গালটি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন, তবে আমি কেবলমাত্র বর্ণ কেন, ঠাকরুণদিদির সম্বন্ধে যাহা কিছু, আমি সমুদয়ের বর্ণনা করিতে পারি।

ঠাকরুণদিদির বর্ণ কোন্ কোন্ জিনিসের মত নয়, তাহা বলা হইয়াছে; কোন্ কোন্ জিনিসের মত, তাহা এক্ষণে বলা কর্তব্য। অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তার কালি, রান্নাঘরের ঝুল, আলকাতারা ইত্যাদির ন্যায়। ঠাকরুণদিদি বেঁটে স্থূলকলেবরা; মস্তকটি প্রায় কেশশূন্য, দাঁতগুলি মাঘ মাসের মূলার মতন, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, পদদ্বয় স্তম্ভাকার, পায়ের অঙ্গুলিগুলি এখানে একটি, ওখানে একটি, যেন পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়াছে। ঠাকরুণদিদি তাঁহার পিতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন, এজন্য দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁহাকে ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই লইয়া যাইতেন। ঠাকরুণদিদিকে না চিনিত, এমন লোকই ছিল না; ঠাকরুণদিদিও সকলকেই চিনিতেন। আপাততঃ তাঁহার প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। জন্মাবধি বিধবা বলিলেই হয়! বিবাহ হইয়া অত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বামীর পরলোক প্রাপ্তি হয় যে, তিনি কদিন সধবা ছিলেন, বলা বড় দুঃসাধ্য। ঠাকরুণদিদি বৈধব্যাবস্থায় একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন। তিন চারি দিবসের মধ্যেই কলহ বিবাদ করিয়া তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার পিতার কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহাতে জীবিকা নির্বাহ হয়।

স্বর্ণলতা (১৮৭৪), ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ঠাকরুণদিদি

আপনার কথা বিস্মৃত হইয়া, আপনার তত্ত্ব বিচার না করিয়া, আপনার কল্যাণের পথ ভুলিয়া গিয়া যে ব্যক্তি অন্য নানা বিষয়ের পর্যালোচনা করে, বিবিধ বিচিত্র বিষয়ের গবেষণায় তৎপর হয়, এবং অন্যের কথা লইয়া কাল কাটায়, তাহার জন্ম-জীবন অনর্থক ব্যয়িত হইয়া যায়। তবে আপনার জন্য যে অন্যের বিষয় সমালোচনা করে, সে কতক পরিমাণে অবশ্যই কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যত্র অন্বেষণ না করিয়া নিজ নিকেতনেই যাহার সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন আছে কি? তাহার পর-পদ-পরিসেবনে লাভ কি? যে আপনার গৃহে বসিয়া জীবনের অভীষ্ট-সাধনের সমস্ত উপাদান, সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে? যে-ভারতের উত্তরভাগে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া, হৃদয়কন্দরে অমূল্য রত্নমালা ধারণ করিয়া, নির্মল নীরপ্রবাহে নদনদী নিঃসারিত করিয়া হিমাচল অটলভাবে দণ্ডায়মান; যে-ভারতের পূর্ব-পশ্চিমে মহারোল-কল্লোলতরঙ্গ-ভঙ্গ মালায় আস্ফালন পূর্বক পার্ষদরূপে উপসাগরদ্বয় বিরাজমান; রত্নাকর মহাসাগর যে-ভারতের নামে স্বয়ং নাম ধারণ করিয়াছে ও দক্ষিণভাগে উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে যে-ভারতের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে; স্বাভাবিক 'শৃঙ্গারমালা' যে-ভারতকে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ-পর্যন্ত লোকচিত্ত-বিনোদ-বিহারভূমি করিয়া রাখিয়াছে; শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা যে-ভারতের মুখমণ্ডলকে প্রথম উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়াছে, শক্তি ও সামর্থ্য বলে যে-ভারত জগদ্‌গুরু বলিয়া ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে— আজ সেই ভারত-বাসী আপনার তত্ত্ব ভুলিয়া, আপনার দেশ, আপনার জাতীয়তা, আপনার কুল-মান-মর্যাদা কে তাচ্ছিল্য করিয়া, আপনার শিক্ষা ও দীক্ষা, আপনার অভ্যুদয় ও মহত্ত্ব, আপনার অতুল ঐশ্বর্য, আপনার অতুল বলবীর্য, আপনার স্বর্গীয় ধৈর্য ও শৌর্য, আপনার তপোবীর্য-সম্ভূত জ্ঞানগাম্ভীর্য বিস্তৃত হইয়া, পরের কথায় আপনাকে কাঙ্গাল জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে সর্বাপেক্ষা হীনবীর্য জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে অমানুষ বোধ করিয়া, পরের কথায় আপনাকে অসভ্য ও অশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া, পরের কথায় আপনাকে ধর্মহীন, কর্মহীন, বনের পশু অপেক্ষাও জ্ঞানহীন বিশ্বাস করিয়া, নিজ উন্নতির জন্য সমুদ্রপারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে! আপনাকে না জানিয়া হতভাগ্য ভারত আজ দুঃখের পরাকাষ্ঠার পদসেবা করিতেছে। নিজের ঘর থাকিতে বাবুই পক্ষীর ন্যায় বর্ষার ধারায় ভিজিয়া মরিতেছে। না জানি, বিধাতার কোন্ বজ্রতাড়নায় হতচেতন হইয়া ভারত এই বিভীষিকা দেখিতেছে।

পরিব্রাজকের বক্তৃতা, ভারতের মূর্ছাভঙ্গ (১৮৭৫)

লালমোহন বিদ্যানিধি

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানীতে যে-বেশে আসিয়াছিলেন, দ্বারবানমুখে সেই বেশ ও চরণে চর্মপাদুকা-ধারণপূর্বক তাম্বুল-চর্বণ করিবার কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজাধিরাজ আদিশূর অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন, এবং অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিতে লাগিলেন: "আমি এ-দেশের ব্রাহ্মণগণকে আচারভ্রষ্ট ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অপরাগ বলিয়া দূরদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম; কিন্তু অনুমান হয়, তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিতান্ত সদাচারী নন; সুতরাং আমাকে স্বদেশীয়দিগের নিকট লজ্জিত, অপ্রতিভ এবং পুত্রেষ্টিযোগসিদ্ধির ফল বিষয়ে অকৃতকার্য হইতে হইবে।" এইরূপ অনুতাপ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে মনের ক্ষোভ মনেই মিটাইলেন। পশ্চাৎ দৌবারিক-নিকটে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়দিগকে কহ যে, মহারাজ এক্ষণে কার্যান্তরে নিতান্ত ব্যাপৃত আছেন, আপাততঃ সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ নাই; আপনারা ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করুন, তিনি অবসর পাইবামাত্র এখানে আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন!"

ইঁহারা বিবেচনা করিলেন, রাজা যখন তাঁহাদিগের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়াও অভ্যুদ্গমন অথবা তৎক্ষণাৎ সংবর্ধনা করিলেন না, বরঞ্চ অবসর পাইলে আসিবেন বলিয়া উপেক্ষার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর এরূপে প্রতীক্ষা করা উচিত নহে, প্রভাব দেখান কর্তব্য, এই মনে করিয়াই রাজার শুভানুষ্ঠান জন্য গৃহীত অর্ঘ্যবারি সম্মুখস্থ মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা এমনি বাক্‌সিদ্ধ ও প্রভাবশালী ছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সরস হইয়া ফল-পুষ্পে পরিশোভিত হইল।

এই অসামান্য অদ্ভুত ব্যাপার যখন অন্তঃপুরে ভূপতির কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বহির্ভবনে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহাদিগের চরণ-ধারণপূর্বক নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদারপ্রকৃতি বিপ্রগণ ভূপতির স্তবে অনায়াসে পরিতুষ্ট হইয়া "মহারাজের স্বস্তি হউক!" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ ও নিরুদ্বেগ করিলেন।

সম্বন্ধনির্ণয় (১৮৭৫), সামান্য কাণ্ড

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হেমাভ রৌদ্র ভাগীরথীর তীরস্থিত বৃক্ষ-সকলের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিতেছিল; মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে নদীর হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইতেছিল; নদীর উভয় পার্শ্বে মনুষ্য বা মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন অথবা অন্য কোন শব্দ ছিল না, কেবলমাত্র সমীরণ-সঞ্চালিত নদীতীরস্থ বৃহৎ বৃক্ষদিগের শন্ শন্ শব্দ, আর অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথীর অনন্ত-সাগরসম্ভাষণে গমনের কল কল রব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জলযান কোন বৃহৎ শ্বেত-পক্ষীর ন্যায় শ্বেত-পক্ষ বিস্তৃত করিয়া নাচিতে নাচিতে ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে বিচরণ করিতেছিল। জলোচ্ছ্বাসে যেমন ভাগীরথীর বারিরাশি উছলিতেছিল, জনকজননী-সম্ভাষণাকাঙ্ক্ষা-জনিত সুখ রজনীকান্তের হৃদয়ে তেমনি উছলিতেছিল। অনেক দিবসের পর রজনী বাড়ী যাইতেছিলেন; রজনী একাগ্র মনে তাঁহার জননীর মুখমণ্ডল ভাবিতেছিলেন। তিনি বাটী পৌঁছিবামাত্র, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কখন কখন তাঁহার বয়স্যবর্গ, কখন বাল্যক্রীড়ার স্থান স্মরণ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের গ্রামপ্রান্তে সেই নিবিড় ঘনান্ধকার আম্রকানন, তন্মধ্যস্থিত 'পদ্মপুকুর' নামে সরোবর, যাহাতে গ্রাম্য কুলকামিনীগণ অনুক্ষণ আগ্রীবনিমগ্না হইয়া পদ্মবনে পদ্মপুষ্পের ন্যায় মিশিয়া থাকে এবং যে-পুকুরে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আপনি ডুবিয়াছিলেন— তাহা স্মরণ করিতেছিলেন। আবার কখন কখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার বিবাহ হইবে। কাহার সহিত বিবাহ হইবে? শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃকন্যার সহিত। কুমুদিনী? সে ত বাল্যকালে বিধবা হইয়াছে এবং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে না পারায় কুমুদিনীর পিতা হরিনাথ উদাসীন হইয়াছেন। সুবর্ণপুরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করে কাহার সাধ্য? ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমুদিনীর কি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে? বোধ হয় আছে— নহিলে কাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইতেছে? ভাবিতে ভাবিতে অনন্যমনে নদীর পূর্বতীর দৃষ্টি করিতেছিলেন, হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

শৈশব-সহচরী (১৮৭৫), প্রথম পরিচ্ছেদ: বিপদে আরম্ভ

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শূদ্র কাহারা? আদিতে তাহারা কি ছিল— এই সিদ্ধান্তে কেহ কেহ ঢেঁকি, কুলা, ধুচনি শব্দ লইয়া প্রমাণ করেন যে, উহা আর্যভাষা নহে, উহা পাহাড়ী জঙ্গলাজাতির ভাষা; ঐ ভাষা যাহাদের ছিল, তাহারাই কালক্রমে শূদ্র নাম লইয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তজ্জন্যই তাহাদের আদি ভাষার ঐ সকল শব্দ হিন্দুভাষায় মিশ্রিত এবং লক্ষিত হয়। কি ভ্রান্তি! এই সামান্য উপকরণে এই মহদ্বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে আমি প্রস্তুত নহি। ভাষার আকৃতি এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ভিন্ন শব্দগত সাদৃশ্য অগ্রাহ্য। ভাষা নিরন্তর পরিবর্তনশীল, বিশেষতঃ যাহা অলিখিত এবং অসভ্য জাতির ভাষা, তাহা দুই-তিন পুরুষে পরিবর্তনবশে নূতনশব্দময়ী হয় এবং তাহার অনেক প্রাচীন শব্দের লোপ হয়।... দ্বিতীয়তঃ জাতিদ্বয়ের সম্মিলন ব্যতীতও অন্যপ্রকারে উভয়ের ভাষার কোন শব্দ এক হইতে অপরে নীত হাওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র অসম্ভবতা নাই। বস্তুতঃ তাহা আমরা চক্ষের উপরেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহেন যে, ইহারাই এক সময়ে শূদ্রের আদিপুরুষ ছিল। ইহার সারবত্তা স্থাপিত হইতে পারে যদি এমন কোন প্রমাণ দিতে পারা যায় যে, ইহারা ভারতীয় আদিম অধিবাসীর বংশাবলী। কিন্তু সে-প্রমাণ প্রদান সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অতঃপর আমাদের দ্রষ্টব্য যে শূদ্র কাহারা। যদি ইহারা আর্যবংশের এক শাখা হইত, তবে গোত্রস্থ নহে কেন? প্রবর উচ্চারণপূর্বক অগ্নি-আহ্বান এবং পৈতা-ধারণ তিন জাতির পক্ষে নিধানিত হইয়াছে, ইহাদের হয় নাই কেন? আর্যগোত্র এবং তাহার প্রবরমালা আর্যবংশোদ্ভব বা তৎসংস্রবে উৎপন্ন ব্যতীত অন্যের থাকিতে পারে না। ঋগ্বেদের দশমণ্ডল-স্থ পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত আর -সর্বত্রে আর্য এবং অনার্য দস্যু বা দাস এই দ্বিবিধজাতীয় লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যগণ পূর্বাপর শূদ্রগণকে অনার্য বলিয়া থাকেন। সে যাহা হউক. এই যে দ্বিবিধমাত্র জাতির উল্লেখ পাওয়া গেল, ইহার একভাগ অর্থাৎ আর্যনামধারীদিগকে আমরা জানি, কিন্তু দাস বা দস্যু কাহারা? এই দাসবর্গ ঋগ্বেদ অনুসারে কৃষ্ণবর্ণ ছিল। আর্যগণ পূর্বাবধি হিমপ্রধান দেশে বাস-হেতু পরিচ্ছন্নবর্ণ-বিশিষ্ট, ভারতে আগমনমাত্রেই যে তাঁহাদের বর্ণ কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নহে। আজি পর্যন্ত তৈলঙ্গভূমে সাধারণজাতি কৃষ্ণকায়, কদাকার; কিন্তু আর্যবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণেরা প্রায় সর্বদাই সুশ্রী ও সুপুরুষ। বিশেষতঃ আর্যদিগের দ্বারাই বর্ণপার্থক্যের উল্লেখ হওয়ায় তাঁহাদের নিজের বর্ণ যে কৃষ্ণতা হইতে পৃথক, তাহা জ্ঞাপিত হইতেছে।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত (১৮৭৬), চতুর্থ অধ্যায়: নিকৃষ্টবর্গ

কুরুক্ষেত্র কি রমণীয় স্থান! চতুর্দিকে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, আরক্ত বালুকাময় মরুভূমি ধূধূ করিতেছে। স্থানে স্থানে পলাশ বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন সমস্ত দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যভাগে সুগভীর বারিপূর্ণ তড়াগে হংসগণ জলকেলি করত পদ্মবন আন্দোলিত, তড়াগবারি আলোড়িত এবং সুমধুর কলস্বরে বায়ুপ্রবাহ স্বনিত করিতেছে।

কুরুক্ষেত্র কি ভয়ানক স্থান! ইহার সমুদায় মৃত্তিকা শোণিতবিলিপ্ত, পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষ সমস্ত রুধিরপরিষিক্ত, হ্রদগুলি ভৃগুবংশসন্তর্পণ ক্ষত্রিয়হৃদয়লোহিত দ্বারা প্রপূরিত। এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও নিহত, মহারাষ্ট্র-সেনা বিনষ্ট, এবং হিন্দুজাতির উদয়োন্মুখ আশা বহুকালের নিমিত্ত অস্তমিত।

কুরুক্ষেত্র কি শান্তরসাস্পদ স্থান! এখানে কুরুপাণ্ডব, হিন্দু মুসলমান, শত্রু মিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা বৈরিতার নামগন্ধও নাই। ভয় বিদ্বেষ ঈর্ষাদি ভাব একেবারে বিসর্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শান্তিনিকেতন। ঐ যে অরবিন্দনিচয় একই দিবাকরের করস্পর্শে হাস্য করিতেছে, উহারা পুরাতন বীরপুরুষদিগের হৃদয়পদ্ম; ঐ যে কলহংসমণ্ডলী, উহারা প্রাচীন কবিকুল— একতানস্বরে বীরগণের গুণগরিমা গান করিতেছে।

কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরস্বতীনদীকূলে একটি সুপ্রশস্ত বটবৃক্ষতলে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম। মুনিবর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে ভগবান বেদব্যাস তাঁহার পার্শ্ববর্তী হইলেন।

মুনিরাজ সম্মুখবর্তিনী নির্ঝরিণীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "ঐ যে জীর্ণা সঙ্কীর্ণা তটিনী তোমার পাদমূলে পতিতা রহিয়াছে দেখিতেছ, আমি স্বচক্ষে ইঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও জরা দর্শন করিলাম। কোন সময়ে এই সমস্ত প্রদেশ ইঁহারই গর্ভস্থ ছিল। অনন্তর সত্যযুগে কুরুক্ষেত্রভূমির উৎপত্তি হইল এবং সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ এই ভূমিতে আবাস প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষীণা, মলিনা স্রোতস্বতী তৎকালে অতীব প্রবলা ছিলেন। তখন সরিৎপতি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করেন নাই। তখন সমুদ্র সমুদায় প্রাচ্যভূমি অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়া সরস্বতীর পাণিগ্রহণার্থে এ-পর্যন্ত আপনার কর প্রসারিত করিয়াছিলেন। আহা! সে দিন যেন কল্য মাত্র হইয়া গিয়াছে। এই স্রোতস্বতী কি আবার বেগবতী হইবে? ইঁহার উভয় কূল কি আবার ব্রহ্মগুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে? ইনি অন্যের করপ্রদা না হইয়া আবার কি সরিৎপতির সংসর্গলিপ্সায় স্বয়ংবাসকসজ্জা হইবেন?

পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬) প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরুক্ষেত্র-দর্শন

হারাণচন্দ্র রাহা

সেনাপতি গম্ভীর স্বরে রাণীর প্রতি বলিলেন, "উপেন্দ্রনারায়ণের পত্নি, তোমার কোন ভয় নাই, কেননা স্ত্রীজাতি ও বালক আমাদের অবধ্য। তুমি এক্ষণে কি চাহ, আমাকে বল।"

রাণী কোন কথা কহিলেন না; বালকের মুখ হইতেও কোন বাক্য-স্ফূরণ হইল না, কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি অধিকতর রক্তবর্ণ হইল।

শিয়ার শা আবার বলিলেন, "তোমার স্বামী যুদ্ধে হত হইয়াছেন; এক্ষণে এ-রাজ্য বঙ্গেশ্বরের। কিন্তু উপেন্দ্রনারায়ণের পত্নীর ও পুত্রের ভরণপোষণের জন্য আমি কোন বন্দোবস্ত করিতে পারি।"

রাণী মন্দাকিনী এবার উত্তর করিলেন— বর্ষাকালে জলধর যে-গম্ভীর রবে ডাকে, সেই রবে উত্তর করিলেন— বলিলেন, "আমি আপনার নিকট কোন প্রকার অনুগ্রহ চাহি না। আমাকে ও আমার এই পুত্রকে বধ করা যদি আপনার বীরধর্মের বিরুদ্ধ হয়, তবে আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে দিউন।"

সেনাপতি বলিলেন, "আমি বীরধর্মা; যাহা বলি তাহার অন্যথা করি না। তুমি ও তোমার এই বালক আমার অবধ্য। যদি আমার দ্বারা উপকৃত হইতে ইচ্ছা না থাকে, তবে যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার; কেহ বাধা দিবে না।"

রাণী মন্দাকিনী এই কথা শুনিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় বিষম রক্তবর্ণ করিয়া, অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, অকূল সাগরে কাণ্ডারীবিহীন তরি যেরূপ ভাসে, সেইরূপ ভাসিয়া চলিলাম; রাজরাণী ছিলাম, এক্ষণে ভিখারিণী হইয়া চলিলাম, কিন্তু আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলিয়া যাইব, শুন, যবন: যদি আমি কায়মনে পতিব্রতাধর্ম প্রতিপালন করিয়া থাকি, যদি আমি কায়মনে দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, যদি দেবসেবা ও ব্রাহ্মণ-সেবার কোন ফল থাকে, যদি ব্রত ও উপবাসের কোন ফল থাকে, তবে অদ্য হইতে ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে হিন্দুর তরবারির আঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে।" অনন্তর রাণী চলিয়া গেলেন।

ভয়ানক মেঘগর্জন স্থগিত হইলে জগৎ যেমন কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধ বোধ হয়, সভাস্থল তদ্রূপ হইল।

রণচণ্ডী (১৮৭৬), ১ অধ্যায়

রামদাস সেন

বৈদিক ধর্ম আর্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম। বেদ হিন্দুগণের বিশ্বাসের মূলভিত্তি; এবং ইঁহাদের সংসারযাত্রা-নির্বাহক সমস্ত কার্যকলাপ বৈদিক ধর্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহারও অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেননা বেদ ঈশ্বরের বাক্য— মানবীয় বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই; সুতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন, তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড, সমাজশত্রু। বৈদিক আচার-ব্যবহারে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য পশুর প্রাণবধ হইতে লাগিল। সোমরস-পান এবং পশুবধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য। এ-সকল না করিলে বৈদিক ধর্ম-অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। আর্যগণ ধর্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এ-সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক; বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দুষ্পরাহত। সাধারণে ধর্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় বটে; কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ-সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এ-সময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতি দুর্লভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্যকলাপ-অনুষ্ঠানে আর্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র নেতা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পরিবর্তনশীল, সুতরাং ভারত-সমাজের পরিবর্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারণার্থ সমাজের পরিত্রাতারূপ শাক্যসিংহ উদিত হইলেন।

ঐতিহাসিক রহস্য (১৮৭৬), বৌদ্ধ ধর্ম

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ

ঘোর অন্ধকার রজনী, অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদালোক, অন্ধতম কুটিরে, চালের নিম্নভাগ, ঝাঁপের চতুঃপার্শ্ব ও বেড়ার ছিদ্র দিয়া আসিতেছে। ইটের পাঁজায় আগুন লাগিলে ফাটল দিয়া অগ্নি যেমন দৃষ্ট হয়, কুটিরের অভ্যন্তরনিবাসীরা তদ্রূপ আলোক দেখিতেছে। কুটিরের অভ্যন্তরে দুই-তিন প্রকোষ্ঠ ছিল; আচ্ছাদক বেড়ার মধ্য দিয়া প্রকোষ্ঠাধিবাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিলেন। এতক্ষণ অন্ধকারে আলাপ চলিতেছে, কেহ কাহারও মুখ দেখে নাই। পাঠকগণও এইবার দেখিয়া লউন: প্রায় কুড়ি পঁচিশটি ছিন্নমলিনবস্ত্রা বিকটবদনা শ্বেতচর্মাবৃতা অস্থিসার স্ত্রীমূর্তি রহিয়াছে। যেন শ্রাদ্ধের যৎকিঞ্চিৎ দান লোভে কাঙ্গালীরা আবদ্ধ আছে। তাহারা যে পরস্পর আপনাপন দুঃখের কথা কহিতেছে ও সকলেই যে সিপাহীগণের বন্দী, তাহার আর পরিচয় দিতে হয় না। রাত্রি প্রায় তিন প্রহর গত, রক্ষক সিপাহীগণ বহির্ভাগে নিদ্রিত আছে— নহিলে বৃষ্টির কলরবে সকল কথা শুনিতেছে না— বোধে বন্দীরা কথঞ্চিৎ স্বাধীনতার সহিত আপনাপন দুঃখের কথা কহিয়া মনের ভার লাঘব করিতেছে। ইত্যবসরে সর্বোত্তম প্রকোষ্ঠের বেড়াতে শব্দ হইতে লাগিল— যেন কুকুর কি বিড়াল রন্ধনশালার মৎস্যলোভে সিঁদ দিতেছে। অধিবাসীরা নিঃশব্দ হইয়া কান পাতিল, ধারাপাতের শব্দে কিছু বুঝা গেল না। কেহ কহিল, "ইন্দুর আপন পথান্বেষণ করিতেছে; ভয় নাই।" আবার অধিকতর শব্দ হইল, সমস্ত বেড়া নড়িল; নিকটস্থ বন্দীরা সরিয়া গিয়া দূরে দাঁড়াইল। আর শব্দ নাই, কিয়ৎক্ষণ সকলে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা বিদ্যুদালোকে একটি প্রকাণ্ড ছিদ্র বেড়াতে দেখা গেল; তাহার মধ্য দিয়া একটি মনুষ্যাকৃতি প্রবেশ করিতেছে, দেখা গেল। অন্ধকার রজনীতে, সহসা চোর দেখিলে যে-ভয় জন্মে, তাহা সুদ্ধ সম্পত্তিনাশাশঙ্কা প্রযুক্ত নহে, শরীর রক্ষার্থও নহে, একপ্রকার স্বাভাবিক ভীতি। নচেৎ গৃহাধিবাসী বন্দীরা কোন সম্পত্তিনাশ বা আপনাদের অত্যাহিতও ভয় করে নাই, তত্রাপি সহজ সংস্কার প্রযুক্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। যদি তৎক্ষণাৎ বজ্রধ্বনি নিনাদিত না হইত, সিপাহীরা জাগরিত হইত, ও অপর প্রকোষ্ঠের লোকও গোলমাল করিয়া উঠিত। ইতিমধ্যে চোর গৃহপ্রবেশ করিয়া ইংরাজীতে কিঞ্চিৎ চুপিচুপি কহিল, "ভয় নাই। তোমাদের উদ্ধারার্থ আসিয়াছি: গোল করিও না, সিপাহীরা উঠিলে বিপদ হইবে।"

চিত্তবিনোদিনী (১৮৭৬), পঞ্চদশ অধ্যায়

ঐ বার বৎসরে আমার বিবাহ হয়। এ-বিষয়ে আমি পূর্বে কিছুই জানিতাম না। এক দিবস আমি খিড়কির ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি, সে-সময়ে ঘাটে অনেক লোক আছে। ইতিমধ্যে আমাকে দেখিয়া একজন লোক বলিল, "এ-মেয়েটিকে যে পাইবে, সে কৃতার্থ হইবে!"... আর-একজন বলিল, "উহাকে লইবার জন্য কতজন আসিয়াছে; দিলে এক্ষণেই লইয়া যায়, উহার মা দেয় না।" আর-একজন বলিল, "না দিলেও তো হইবে না; একজনকে দিতেই তো হইবে, মেয়েছেলে হওয়া মিছা।"

ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার মনে ভারি কষ্ট হইতে লাগিল, আমি একবারে অবাক হইয়া থাকিলাম। পরে আমি বাটীতে গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, আমাকে যদি কেহ চাহে, তবে কি তুমি আমাকে দিবে?" মা বলিলেন, "ষাট! তোমাকে কাহাকে দিব, এ-কথা তোমাকে কে বলিয়াছে? কোথা শুনিলে? তোমাকে কেমন করিয়াই বা দিব?" এই বলিয়া আমার মা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ঘরের মধ্যে গেলেন। আমি দেখিলাম, আমার মা কাঁদিতেছেন। অমনি আমার প্রাণ উড়িয়া গেল; তখন আমি নিশ্চয়ই জানিলাম, আমাকে একজনকে দিবেন। তখন আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি হইল, আমার মা আমাকে কোথা রাখিবেন।

ঐ কথা আমার মনের মধ্যে এত যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে, আমার মন একেবারে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িল; আর কিছুই ভাল লাগে না, আমি কাহারও সঙ্গে কথা কহি না, আর কোন কাজও করি না, আমার খাইতেও ইচ্ছা হয় না, দিবারাত্রি আমার কেবল কান্না আইসে। আমি ঐ কথা মনে ভাবিয়া সর্বদা মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। আর সকল সময়ই আমার চক্ষে জল পড়িত। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীর এককালে শুকাইয়া গেল। এ-সকল কথা আমার মনের মধ্যে থাকিত, ইহা আর কেহ জানিত না, কেবল পরমেশ্বর জানিতেন। আমি ইতিপূর্বেও শুনিয়াছিলাম, সকল লোকই বলিত যে সকলেরই বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; বিবাহ হয় এইমাত্র জানি। তখন সকল লোক আমাকে বলিতে লাগিল, তোমার বিবাহ হইবে। আমাকে যত্ন করিতে কেহ কখন ত্রুটি করেন নাই, তথাপি বিবাহ হইবে বলিয়া আরো যত্ন এবং স্নেহ করিতে লাগিলেন।

আমার জীবন (১৮৭৬), তৃতীয় রচনা

রাজনারায়ণ বসু

বাঙ্গালা ভাষার ভাবী অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এক্ষণে ঠিক বলা যায় না। পুরুষের ভাগ্য যেরূপ নিরূপণ করা যায় না, ভাষার ভাগ্যও সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না। যখন রমুলস চোর-বাটপাড় লইয়া রোম-নগরের পত্তন করেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই কতিপয় চোর-বাটপাড়ের ভাষা একসময়ে সমস্ত ইউরোপ-খণ্ডের বিদ্বানদিগের ভাষা হইবে এবং সহস্র বৎসর পর্যন্ত ঐ প্রকার ভাষা হইয়া থাকিবে? যখন মহম্মদ মুসলমান ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, মরুভূমি-নিবাসী কতকগুলি দস্যুর ভাষা একসময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বানদিগের ভাষা হইবে? যখন শাক্যমুনির প্রথম শিষ্যেরা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের ভাষা পালি ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই পালি ভাষা সমস্ত পূর্ব আসিয়ার ধর্মগ্রন্থের ভাষা হইবে? বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন; হয়ত ভবিষ্যতে উহা ঐ প্রকার সম্পদাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ-প্রকার বাহ্যসম্পদ আকস্মিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর-একপ্রকার সম্পদ আছে, তাহা মনুষ্যের যত্নের প্রতি নির্ভর করে। সে-সম্পদ আভ্যন্তরীণ; সে-সম্পদ সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ দ্বারা ভূষিত হওয়া-রূপ সম্পদ। অদ্য আটাইশ বৎসর হইল, মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম, যথার্থ বলিতে কি, হোমার, প্লেটো ও সফক্লিজ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরসপানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্রবর্ণনা- নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক সেক্‌সপিয়রের অমরণ-ধর্ম-প্রাপ্ত নাটক-সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনা-শক্তিসম্পন্ন গেটী ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অপূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে: সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জনপূজ্য বিশালখ্যাতিগ্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে-তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃতরস পান করিবার তৃষ্ণা! হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সে-আশা কবে পূর্ণ করিবে? সে-তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষা-রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮)

যদুনাথ ভট্টাচার্য

জগৎ পরিবর্তনশীল। দিবসযামিনী, শীতগ্রীষ্ম— সকলেরই পরিবর্তন হইতেছে। সুগভীর সমুদ্র শুষ্ক হইয়া প্রবীণ মরুভূমি হইতেছে। তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ অগাধ সমুদ্রজলে লুক্কায়িত রহিতেছে। ভীষণ বনাকীর্ণ স্থান প্রবীণ নগর হইতেছে। জগৎ-বিখ্যাত সুন্দর নগর ভয়ানক শ্মশান হইতেছে। মনুষ্যের ভাগ্য কি এ-সাধারণ-নিয়মাধীন নহে?

শুক্লযামিনী দ্বিপ্রহর; জগতের সমস্ত প্রাণী গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত: শিশু পরমানন্দে জননীস্তন্য পান করিতে করিতে তাঁহার বক্ষের মধ্যে সমস্ত অঙ্গ লুক্কায়িত রাখিয়া সুষুপ্তাবস্থায় আছে; প্রসূতি হৃষ্টচিত্তে বক্ষের ধন তনয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া গভীর সম্বেশে নিমগ্না আছেন; যুবক পরম হর্ষে প্রাণাধিকা স্মিতমুখী কুরঙ্গনয়না যুবতী রমণীকে হস্তদ্বয় দ্বারা নিজ বক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া অত্যন্ত নিশুতি হইয়াছেন; যুবতী পরমার্চনীয় হৃদয়কান্তের স্কন্ধদেশে বাহুবল্লী দ্বারা বেষ্টন করিয়া পরম হর্ষে নিদ্রা যাইতেছেন! এই সময়ে কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক, কি যুবতী, কি প্রৌঢ়, কি প্রৌঢ়া, কি বৃদ্ধ, কি বৃদ্ধা, কেহই জাগরিত নাই। তুরঙ্গম, গো, মেষ, মহিষাদি পশুসমূহও নিস্তব্ধ আছে। বিহঙ্গমকুলও আর পক্ষ ব্যজন করিতে করিতে গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছে না। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ: বৃক্ষপত্র-স্খলিত শিশিরবিন্দুর পতন-শব্দ, বৃক্ষস্খলিত বৃক্ষপত্রের পতন-ধ্বনি, মৃদু বায়ুর সন্ সন্ স্বন, কুক্কুর-কুক্কুরীগণের ঘেউ ঘেউ ডাক, শার্দূলকুলের ভীষণ নিনাদ, তস্করগণের সভয় সতর্ক পদধ্বনি, তটিনীর জলপ্রবাহের সুমধুর কুলকুল রব, এবং প্রহর-প্রহরান্তে শিব-শিবাগণের ঐকস্বান ব্যতীত প্রকাণ্ড বিশ্বে গোল নাই।

এ-সময়েও কি মানবভাগ্য স্থির নাই? এখনও কি মানবভাগ্য চক্রবৎ ঘুরিতেছে? জগতে প্রবেশ করুন, মানব-ভবনে গমন করুন; দেখিবেন, মনুষ্যের কি ঘটিতেছে। কাহার সর্বস্বান্ত হইতেছে, কেহ নূতন রাজ্যের অধীশ্বর হইতেছেন। কাহার সুন্দর সর্বসুখাধার হৃদয়রত্ন একমাত্র পুত্র করাল-কাল-কবলে পতিত হইতেছে, কাহার শশধর-নিন্দিত তনয় জন্মগ্রহণ করিতেছে। কেহ রূপবান গুণবান বাসনা-উচিত মনোহর পতি লাভ করিতেছেন, কেহ পতিবিচ্ছেদে চিরমুমূর্ষু অবস্থায় পড়িতেছেন।

ঐ দেখুন তটিনীকুলস্থ অরণ্য। ঐ দেখুন মৃত্তিকাশয্যায় নিদ্রিতা ষোড়শী সুন্দরী রমণী: এ-কামিনী কি ভাগ্য-পরিবর্তন ব্যতীত এ-স্থলে আসিয়াছেন?

সুখ-চক্র, প্রথম পরিচ্ছেদ

সে-স্থলটি অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের সূর্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি যেন একটি সুবর্ণরেখার ন্যায় ভূমি পর্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, নবদূর্বাদল সেই শ্যামল সুস্নিগ্ধ ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবায় নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। এরূপ নিস্তব্ধ যে, বৃক্ষ হইতে দুই একটি শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটি বনবিহঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে এবং অদূরে একটি নির্ঝরিণীর সুন্দর সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে। শ্রান্ত যোদ্ধাগণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল যেন, কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসারস্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধাগণ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সেই শ্যামল দূর্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক শ্রম দূর করিয়া নির্ঝরের জলে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিছু ফলমূলের আয়োজন করা হইয়াছিল, দুর্গেশ্বর ও তাঁহার যোদ্ধগণ আনন্দে তাহা আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সহসা যোদ্ধাদিগকে 'দোনা' অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইলেন, তাঁহারাও এই সম্মানচিহ্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হাস্যধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল; পূর্বঘটনার, পূর্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধগণ দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল। এবার মেওয়ার-প্রদেশের বহু শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতেছেন... কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাওয়ৎকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণদান করিবে, চন্দাওয়ৎকুল পলায়ন জানে না। দুর্জয়সিংহ এ-কথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯), প্রথম পরিচ্ছেদ: আহেরিয়া

রাজকৃষ্ণ রায়

...ফল কথা, একজন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে যে-সকল গুণ ও লক্ষণ থাকা চাই, তত্তাবৎ রামজয় বিদ্যানিধি পণ্ডিত মহাশয়ে বর্তিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ তাঁহাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

পাঠগৃহের মধ্যস্থলে বিদ্যানিধির সম্মুখে বসিয়া কিরণময়ী আপনার পুরাতন পাঠ আলোচনা করিতেছে, আর বিদ্যানিধি মহাশয় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতেছেন। কিন্তু মনুষ্য নানা চিন্তার চিরকিঙ্কর। যেদিন হইতে মনের সৃষ্টি, সেই দিন হইতেই চিন্তা তাহার জীবন, সুতরাং যেখানে মন, সেইখানেই চিন্তা: চিন্তা-মনের কখনই বিরহ ঘটে না...। বিদ্যানিধি মহাশয় মন দিয়া কিরণের পুরাতন পাঠ শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কি জানি কিসের চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনকে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছিল। কাজেই তিনি থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি বলিলে, মা? আবার বল!"

কিরণময়ীও চিন্তার নূতন সহচরী। সেও পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইতেছিল। তাহার তৎকালে অন্যমনস্কতার কারণ হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে বসিয়া একটি কাষ্ঠ-পুত্তলিকা লইয়া খেলা করিতেছিল, আর কিরণময়ীর উচ্চারিত এক-একটি বর্ণ ও বাক্য এক-একবার সমধুর কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে প্রতিধ্বনিত করিয়া পুতুলটিকে আপন মনে তালে তালে মৃত্তিকার উপর ঠুকিতেছিল। পণ্ডিতমহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন দেখিয়া কিরণময়ী নিঃশঙ্ক চিত্তে হিরণ্ময়ীর পাঠাভ্যাস শুনিতেছিল এবং তাহার পৌত্তলিকা-ক্রীড়া দেখিতেছিল। কিরণের মুখ পাঠ-অধ্যয়ন করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন চিন্তার সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া হিরণকে আলিঙ্গন করিতেছিল। এমন সময় চিন্তার পুরাতন সহচর নেত্র উন্মীলন করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিলে, মা? আবার বল!" অমনি চিন্তার নবসহচরী কিরণময়ী চমকাইয়া উঠিয়া আবার অধীত পাঠের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এইরূপে গুরুশিষ্যার পাঠকার্য চলিতেছে, এমন সময়ে ধীরেন্দ্রকে লইয়া জগদীশপ্রসাদ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রামজয় বিদ্যানিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বালকটি কে?"

হিরণ্ময়ী, প্রথম খণ্ড (১৮৮০), চতুর্থ পরিচ্ছেদ: পাঠগৃহে

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী

হিমাচল। রজনী দুই দণ্ড। দেবাদিদেব ভগবান বৈদ্যনাথের মন্দিরের কিঞ্চিৎ দূরে নবোদিত চন্দ্রকিরণে হাস্যময়ী এক বিজন উপত্যকা...। নির্মল সুশীতল সন্ধ্যা-বায়ু সঞ্চারিত। শৈলপৃষ্ঠে লম্বিত মেঘাবলি সুখে শয়ান। এবম্বিধ জনহীন পবিত্র স্থানে পঞ্চবিংশ-বর্ষীয় পরমসুন্দর তেজস্বী এক তপোধন একাকী বসিয়া মুদিত নয়নে ভক্তিভাবে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের হেতুর হেতু আদ্যন্তহীন, পরম, অব্যয় পুরুষের স্তুতিপাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা পার্শ্বে এক ভীষণ শব্দ হইল। শব্দের কিঞ্চিৎ বিলম্বে সপ্তদশবর্ষীয়া একটি কুমারী শশব্যস্তে রোদনোন্মুখ স্বরে "কি হইল, কি হইল! তপোধন, রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তপোধন সেই ভীষণ শব্দে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, মুদ্রিত নয়ন উন্মীলন করেন নাই; কিন্তু বিপদে আতুর শরণাপন্ন-জনের কাতর বাক্যে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, একটি নিরুপম-রূপবতী কুমারী ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ ও কম্পিত হইয়া দণ্ডায়মানা আছেন। তখন তিনি অতি মৃদু আশ্বাস-বচনে কহিলেন, "শুভে, ভীতা হইও না!" কুমারী পূর্ব্ববৎ শঙ্কিতভাবে কহিলেন, "তপোধন, আমার পিতা, আমার মাতা... হায়! কি হইল, বৈদ্যনাথ, কি হইল!" ঋষিকুমার কুমারীর পিতামাতার কোন দৈব দুর্ঘটনা হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কুমারীর নিকটবর্তী হইয়া আশ্বস্তবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, বলুন।" কুমারী কহিলেন, "ভগবন্, আমরা ইতিপূর্বে বৈদ্যনাথের আরতি দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ চন্দ্রমা মেঘে আবৃত হইল, বায়ু শন্ শন্ শব্দে বাহিতে লাগিল, এবং বজ্রনাদস্বরূপ এক ভীষণ শব্দ হওয়াতে ভয়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গিয়াছেন, জানি না; পিতামাতা জীবিত আছেন কি না, তাহাও জানি না।" ঋষিকুমার কহিলেন, "আপনি ভীতা হইবেন না... আপনার পিতামাতার কোন অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা নাই, বোধ হয় তাঁহাদিগের সহিত শীঘ্রই সম্মিলন হইবে।"

মুরলা (১৮৮০), প্রথম পরিচ্ছেদ: কা ত্বং, শুভে?

দুর্গাচরণ রায়

কয়েক বৎসর গত হইল, পৌষ মাসে একদিন শচীপতি ইন্দ্র নিজ বৈঠকখানায় বরুণসহ উপবিষ্ট ছিলেন। শীতকালে পৃথিবীতে জলের তাদৃশ প্রয়োজন নাই বলিয়া হউক, কিংবা অপর কোন কারণে, তখন জলাধিপতি কিছুদিনের ছুটী লইয়া বাটী আসিয়াছিলেন। বহুদিনের পর প্রবাস হইতে বাটী আসিয়া বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকাও বড় কষ্টকর, এজন্য তিনি প্রত্যহ দেবরাজের নিকট আসিয়া দাবা খেলিতেন। অদ্য খেলা বন্ধ করিয়া পরস্পরে অনেক প্রকার গল্প হইতেছিল এবং ঘন ঘন পান-তামাক চলিতেছিল। কথায় কথায় ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগ গত হইয়াছে, এক্ষণে কলিও যায় যায়; পূর্বকালের রাজারা অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে আমাদিগকে আহ্বান করিতেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে আমাদের মর্ত্যভূমি-দর্শন ঘটিত; কিন্তু সম্প্রতি সে-সমস্ত যাগযজ্ঞ নাই, আমাদেরও যাওয়াটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে। এখন লোকে সামান্য কর্ম উপলক্ষে "ওঁ প্রজাপতে, ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ" বলিয়া স্মরণ করে বটে, কিন্তু যাইয়া পাছে সন্তোষকর আহারাদি না পাই, তা-ই ভাবিয়া যাইতে নিরস্ত হইয়াছি। তুমি সর্বক্ষণ পৃথিবীতে থাক, কারণ তোমাকে তথায় সর্বদেশে সর্বস্থানে সর্বজনকে যথাসময়ে জল যোগাইতে হয়। অতএব বল দেখি, এক্ষণে মর্ত্যের রাজা কে?" বরুণ কহিলেন, "ইংলণ্ড-নামক-দ্বীপবাসী ইংরাজ নামে এক জাতি আছে; সম্প্রতি তাহারা ভারতে আসিয়া একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এ-প্রকার বুদ্ধিমান ও প্রতাপশালী রাজা আমি কখন কোন যুগে চক্ষে দেখি নাই। পৃথিবীব মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে ইহাদের রাজ্য নাই। স্বর্গে ইংরাজাধিকৃত স্থান নাই বটে, কিন্তু সত্বরই বোধ করি স্বর্গরাজ্যও ইংরাজদের করতল-গত হইবে।"

ইন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বরুণ, তুমি নিতান্ত বালকের ন্যায় কথা কহিতেছ। স্বর্গে ইংরাজের আসিবার পথ কই?"

বরুণ: "পথ না জানাতেই এতদিন ইংরাজেরা এখানে আসিতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা যে-প্রকার ফিকিরবাজ ও নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে যে, শীঘ্র পথটা না জানিয়া তাহারা আর ছাড়িবে না। তাহারা স্বর্গীয় পথের আবিষ্কার জন্য 'ব্যোমযান' নামক শূন্যে উঠিবার একপ্রকার রথ তো বহুদিন পূর্বেই প্রস্তুত করিয়াছে, আবার ইদানীং একপ্রকার 'ব্যোম-জাহাজ' তৈয়ারি করিবার চেষ্টায় আছে। তাহাদের মনের ভাব, কোন রকমে একবার পথটী চিনিতে পারিলেই একদিন সদলে আসিয়া স্বর্গ অধিকার করিবে।"

দেবগণের মর্ত্যে আগমন, অমরাবতী (১৮৮০)

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতভূমি রত্নপ্রবসিনী। তিনি অনেক পুরুষরত্নের জননী। স্বাধীন হিন্দুরাজত্বকালের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; যে-সময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ গম্ভীর বেদগানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেন, যে-সময়ে ব্যাস ও বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতি, বিধাতা-প্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বীণাধ্বনিতে ইন্দ্রজালের ন্যায় ভুবন বিমোহিত করিতেন, যে-সময়ে কপিল ও গৌতম দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বসকল ভেদ করিয়া মানববুদ্ধির আশ্চর্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে সময়ে আর্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য প্রাকৃতিক তত্ত্বের জ্ঞান-পিপাসু হইয়া গগনমণ্ডল পর্যটন করিতেন, যে-সময়ে অতুলপ্রতিভ পুরুষসিংহ শাক্য-সিংহের সুগভীর গর্জনে বৈদিক ধর্ম একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়ছিল এবং যে-সময়ে সেই মহাপুরুষ মনুষ্যশক্তির অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ পৃথিবীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে-সময়ের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে-সময়ে ভারতের গৌরবরবি অস্তগত হইল, যে-সময়ে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যবনসম্রাট অধিষ্ঠিত হইলেন, যে-সময়ে যবনের প্রতাপে সমগ্র ভারত বিকম্পিত, তখনও বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগণ এবং নানক ও গুরু গোবিন্দ, দাদু ও কবির, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক ও সমাজসংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার যখন মুসলমানের প্রতাপসূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল, যখন ইংরেজের বিজয়-নিশান সুদুরপ্রসারিত ভারতক্ষেত্রে উড্ডীন হইতে লাগিল, যখন বৃটিসসিংহের ভীষণ কবলে হিন্দু ও মুসলমানের প্রভাব পরাভব মানিল, সেই বৃটিসাধিকার-কালেও ভারতমাতা পুরুষরত্ন-স্বরূপ পুত্ররত্ন লাভে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু এই শেষোল্লিখিত মহাত্মাদিগের মধ্যে নিঃসংশয়ে সর্বোচ্চস্থানীয় কে? যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের নাম এই প্রবন্ধের শিরোভূষণ হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অগ্রণী। তিনি বৃটিসাধিকার-কালে ভারতাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (১৮৮১), উপক্রমণিকা

অঘোরনাথ গুপ্ত

নৃপতি শুদ্ধোদন মহিষীর খেদোক্তি শুনিয়া মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া চীৎকার-রবে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা বৎস! হা চন্দ্রানন! হা নয়নরঞ্জন! হা হৃদয়বিনোদ! তুমি যে আমার একমাত্র পুত্র, আমার ত আর কেহই নাই! এ-রাজ্য কে ভোগ করিবে, এ-গৃহ কে উজ্জ্বল করিবে? হায়, তোমা বিহনে যে আমার সব অন্ধকারময়, সংসার অরণ্যময়, গৃহ শ্মশানসম! বৎস, তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? কাল বিদায়কালে ত আমার এত ক্লেশ হয় নাই, আজ কি-জন্য হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল? আমি যে বড় সাধ করিয়া তোমার নাম সিদ্ধার্থ রাখিয়াছিলাম, হায়! তোমা বিনা আমার উদ্যান-ভূমি যে-শূন্য, অন্তঃপুর ঘনবিষাদপূর্ণ। হা বিধাতঃ! বৃদ্ধ বয়সে আমার এক পুত্ররত্ন দিয়াছিলে, তাহাকেও তুমি আবার ঘরে রাখিলে না। আর আমার জীবনধারণে সুখ কি?" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে রাজার অজস্র অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রাজার অশ্রুপাতে সকলেই কাঁদিতে লাগিল। পরে শাক্যগণ আসিয়া মুখে জলসিঞ্চন করিয়া কোনরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। গোপা শয়নাগারে এতক্ষণ ভূমিতলে নিস্তব্ধভাবে শয়ান ছিলেন; কিন্তু রাজার হৃদয়বিদারক পরিবেদন শ্রবণ-মাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মস্তকের সুচারু চিকুর-কেশপাশ ছেদন করিলেন, অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল খুলিয়া ফেলিলেন। বিরহযন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে হৃদয় হইতে দুঃখসাগর উথলিত হইয়া পড়িল। উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া এই খেদোক্তি বাহির হইতে লাগিল, "হায়, আজ আমার শয়নাগার নাথভ্রষ্ট। হায়, প্রিয়তমের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল। হে সুরূপ, দ্যুলোক-ভূলোকের পূজনীয়, আমার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? আর আমি গুণাধারের দর্শন না পাইলে পানীয় পান করিব না, উপাদেয় দ্রব্যও ভোজন করিব না, ভূমিতে শয়ন করিব, জটাজুট ধারণ করিব, স্নানাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রত ও তপস্যাচরণ করিব। উদ্যান সকল, তোমরা কেন আজ ফল-পুষ্পহীন? হায়! তোমরা যে ধূলায় ধূসরিত। হা গৃহ, নরপুঙ্গবের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়াতে তুমি নিবিড় অরণ্য; হা সুমধুর-মঞ্জুঘোষ গীত-বাদ্য! হা ভূষণবিহীন স্ত্রীগৃহ, হে হেমযান, প্রিয়তম-বিরহে আর পুনরায় তোমাদিগকে ভোগ করিব না!"

শাক্যমুনিচরিত্র ও নির্বাণতত্ত্ব, (৭) বিলাপ

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

উনবিংশ শতাব্দীর বিলাস-সভ্যতার মধ্যে ভাই অঘোরনাথের সাধুজীবন একটি অমূল্য স্বর্গীয় পদার্থ, সন্দেহ নাই। বিচিত্রকর্মা বিধাতাপুরুষ নববিধানের রঙ্গভূমিতে এই যোগী যুবার জীবন প্রদর্শন করিয়া ধর্মজগৎকে বিশ্বাসী হইবার একটি অবসর এক্ষণে প্রদান করিলেন। ইহা অধ্যয়ন করিলে জীবন পবিত্র হয়। পার্থিব দেহপিঞ্জর হইতে যোগবিহঙ্গ নিষ্ক্রান্ত হইল, মৃত্যু জীবন আনিয়া দিল; অঘোরনাথ ভাগবতী তনু লাভ করিয়া স্বর্গধামে অমরদলে নিশিলেন। তাঁহার যোগজীবনের শীতল ছায়া ইহলোকবাসী সাধকদিগকে চিরদিন শান্তি এবং শীতলতা বিতরণ করিবে। সাধু অঘোর ইহপরলোকে অমরত্বের স্রোত প্রবাহিত করিয়া উভয় লোকে সত্যের সাক্ষী হইয়া রহিলেন। কেবল সাক্ষী কেন, নিজ জীবনের সাধুতা দ্বারা তিনি এক্ষণে আমাদিগের চরিত্র বিচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহত্যাগ তাঁহার জীবনকে পৃথিবীর সম্মুখে আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করিল। অসাধু অযোগী ব্যক্তিরা জীবদ্দশাতেই মৃতবৎ অবস্থিতি করে; সাধু মরিয়াও নবজীবনের আলোকে স্বর্গ এবং পৃথিবীকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখেন। এই মহাত্মার জীবনচরিতে ভগবানের জীবন্ত লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং বর্তমান সময়ের চতুর্দিকের ধর্মহীন অবস্থার মধ্যে ইহার সৌন্দর্য গুপ্তভাবে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের চিত্তকে হরণ করিয়াছে। কল্পনা নহে, কবিত্বরস-উদ্দীপক অত্যুক্তি নহে, কিন্তু একটি সারবান সাধুজীবন। ইহা সর্বজন-উপকারী, এবং ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষণীয় সাধুচরিত বলিয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিল। শোকের অন্ধকার ভেদ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে সবলে আঘাত করিয়া, সাধু অঘোরনাথের অমর চরিত্র মধ্যাহ্ন-সূর্যের ন্যায় আমাদিগের চিত্তাকাশে ক্রমে ক্রমে সমুদিত হইতেছে। বাহিরের আবরণ উন্মুক্ত হইল, মর্ত্য জীবনের জড়তা দৃষ্টিপথ হইতে চলিয়া গেল, এখন যোগিবরের আধ্যাত্মিক প্রেমচ্ছবি পৃথিবী চিরকাল দর্শন করুক!

সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত (১৮৮২)

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল; নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মা-র প্রতি একবার চাহিল। মা-র চক্ষে জল আসিল। নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল। উঠানের এখানে সেখানে পূর্বরাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল। কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন। এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা! নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটী দুর্বলা কুক্কুরী— নবপ্রসূতি— পেটের জ্বালায় শুষ্ক পত্রে ভগ্ন পাত্রে আহার খুঁজিতেছে। নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরী-ভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন। নববধূ আর পূর্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর কুক্কুর-ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে, অদ্য আবার এ কেন, মা?" নববধূ কথা কহিল না। কহিলে হয় ত বলিত, "এই কুক্কুরী সংসারী।"

পূর্বে বলিয়াছি, নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল; আর দুই তিন দিন পূর্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি-সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা, লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন, মা, আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা, তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর; কখন কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা করে লও না! আজ কেন, মা, চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হলে? আমায় পর ভাবিলে?" বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল, "না, মা। বলি, বুঝি কার জন্য রেখেছ।" নববধূ হয় ত মনে করিল: পূর্বে আমায় 'তুই' বলিতে; আজ কেন তবে আমায় 'তুমি' বলিয়া কথা কহিতেছ?

পালামৌ (১৮৮২), পঞ্চম প্রবন্ধ

নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এক বৎসর হইল কুসুমিকা আমার নিকট পড়া বন্ধ করিয়াছে— তাহার মায়ের আজ্ঞায়। এক্ষণে কুসুমিকার বয়স তের বৎসর। আজিকালি সে প্রায়ই আমার নিকট আসে না। আমাকে দেখিলে কখন কখন দূর হইতে আধ লজ্জায়, আধ আহ্লাদে ধীর অথচ তীক্ষ্ণ কটাক্ষশর নিক্ষেপ করে। এক্ষণে সেই আয়ত, প্রশান্ত লোচনে কটাক্ষ দেখা দিয়াছে; সে-কটাক্ষ তীব্র নয়, মর্ম্মভেদী নয়, কোমল ধীর অথচ সুতীক্ষ্ণ। কুসুমিকার এক্ষণকার এই সলজ্জভাবটি অতি মধুর। যৌবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যে একটু লজ্জার আবির্ভাব, সেটি অতি মনোহর, অতি পবিত্র। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী বসন্তই রমনীয়, যৌবন নিদাঘে সকলই অগ্নিময় করিয়া তুলে। হরকুমার! এই বসন্তলাবণ্যময়ী কুসুমিকা আমার জীবনের আনন্দ, পৃথিবীর স্বর্গ, ভবিষ্যতের আশা। আমার সেই জীবনের আনন্দ, পৃথিবীর স্বর্গ, ভবিষ্যতের আশা আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। কুসুমিকার মাতা এক সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাহার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিবাহ শীঘ্রই হইবে। আমার সেই বালসঙ্গিনী, জীবনের আনন্দদায়িনী, লাবণ্যময়ী কুসুমিকা পরের হইবে, ইহার চিন্তামাত্রেই আমার হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভূত হয়। হরকুমার! আমার আর পৃথিবীর সুখ ভাল লাগে না। তোমার জীবন সুখপূর্ণ, তুমি সুখ ভোগ কর, পৃথিবী আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে, প্রাণের ভিতর সর্বদাই কে যেন কাঁদে! কি ভাবি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। তুমি আমার এই দৌর্বল্য দেখিয়া হাসিলে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করিঃ ইহা কি কেবলই দৌর্বল্য? ইহার ভিতর কি আর কিছুই নাই? যাহা হউক, এক্ষণে যে কি কষ্টে দিন কাটিতেছে, তাহা তোমাকে আর কি লিখিব? সন্ধ্যা অবধি সকাল পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করি, আবার সকাল অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহাকে দেখিবার জন্য অধীর হই। গ্রহ কদাচিৎ প্রসন্ন হয়। অনেকদিন হইল কুসুম একটি ফুল দিয়াছিল, সেটি শুকাইয়া গিয়াছে। তাই আর একটি চাহিয়াছিলাম; অনেক ইতস্ততঃ করিয়া একটি স্ফুটনোন্মুখ গোলাব দিয়াছে। অদ্য তিন দিবস হইল তাহা আমার ফুলদানীতে রহিয়াছে, পাপড়িগুলিন শুকাইয়া গিয়াছে, মুখটি মলিন হইয়াছে; কিন্তু অন্তর তেমনি সুরভি, তেমনি রক্তিম, তেমনি কোমল! তিন দিনের ফুল এত জীবন্ত দেখি নাই। আর অধিক কি লিখিব? তোমার কুশল সংবাদ দিও। ইতি। তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী বসন্ত।

বসন্তকুমারের পত্র (১৮৮২), হরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি (প্রথম) পত্র

পূর্ণচন্দ্র বসু

কুক্ষণে বঙ্গবামা জন্ম পরিগ্রহ করে। পুত্রসন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিলে সকল পুরজনেই প্রফুল্লিত হয়েন, কিন্তু কন্যা জন্মিলে সকলেরই মুখ মলিন হয়। প্রসূতিও বিষণ্ণা হয়েন, জনকেরও মুখ ম্লান হইয়া যায়। কন্যার জন্মের সঙ্গে পিতার মনে শত ভাবনা উপস্থিত হয়। বঙ্গকামিনীর সমস্ত দুর্দশা যেন তাঁহার হৃদয়াকাশে একদা চিত্রিত হয়। তিনি নিজ কন্যার পক্ষে সকলই সম্ভাবিত জ্ঞান করেন। তাঁহার মস্তকোপরি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়। পৌরজন বলিয়া উঠে "একটা মেয়ে হয়েছে!" আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান। বর্ষীয়সীগণ তামাসা করিয়া জনককে বলিতে থাকে, "টাকার সম্বল কর!" জনক সে-কথায় হয় ত হাসিয়া উঠেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। জননী পূর্বে স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার কখন কন্যা হইবে না; কন্যা হইলে তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব।" এখন তিনি সেই কন্যা প্রসব করিলেন। স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ এবং লোকলজ্জা-ভয়ে তিনি কিছু করিতে বা বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহার অনাদর জন্মিল। মাসকলায়ে পোকা ধরে না বলিয়া তিনি সূতিকাগৃহেই শিশুসন্ততির প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতির হস্তে যতদূর হয়, শিশুকন্যার পুষ্টিসাধন হইলে লাগিল। যাহার প্রতি জনক-জননীর অনাদর, তাহাকে অন্য কে যত্ন করিবে?

...অতি শৈশবাবস্থা হইতেই আমরা নারীগণকে পুরুষজাতির অধীনতা শিক্ষা দিই। জনক-জননী তাহাদিগকে এরূপ লালন-পালন করেন যেন তাহারা শ্বশুরালয়ে সকলের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে পারে। শিশুকালেই তাহাদিগের সাহস, বিক্রম ও তেজঃ খর্বীকৃত করা হয়। বাস্তবিক সর্ব বিধায়ে যাহাতে তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া শ্বশুরালয়ে আবদ্ধ থাকিবার উপযোগিনী হয়, এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সহোদরের নিকট সহোদরা অতি দুর্বলা। জনক-জননী তাহাদিগকে দুর্বলা করিয়া তুলেন। পুত্রসন্তান অধিকতর প্রশ্রয় পায়। কন্যাগণ অধিকতর সংযমিত হইতে থাকে। শুদ্ধ ইহাই নহে; অতি অল্প বয়স হইতেই ইহারা কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতি অল্প বয়স হইতেই বালকগণের সঙ্গ হইতে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্না করা হয়। বালিকারা একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠিত করে। গৃহিণী অথবা বয়স্কা স্ত্রীগণ ইহাদিগের আদর্শস্বরূপ হয়। এই সময় হইতেই ইহাদিগের চরিত্র কলঙ্কিত হইতে থাকে।

সমাজ-চিন্তা (১৮৮২), ষষ্ঠ চিন্তা: বঙ্গবামা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

দুইটি ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে। একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর! এরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর!

আবার দুইটি পাখী-- সুন্দর, সুরস, সুকণ্ঠ, সুপুষ্ট ও সুহৃষ্ট— যখন মদভরে খেলা করে, তখন উহারা কেমন সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পড়িতেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে বন পুরিয়া ডাকিতেছে; আবার দেখা হইলেই ঠোকরাইতেছে— কেমন? এমন দুটি পাখীর মিল কেমন সুন্দর!

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে; কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি? সুন্দর, সুস্থ, সবল, সতেজ, সুশিক্ষিত, সুবংশজাত, কলাকোবিদ দুটি মানুষের যদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড় লোভনীয় হয়। তাহার উপর আবার যদি তাহাদের দুইটি হৃদয়ের মিল হয়, যদি সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিল হইয়া যায়, তবে দেবতারাও তাহা স্বর্গ হইতে দেখেন।

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমডোরে বাঁধা, দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়, দেখিয়াছ কি? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয়, দেখিয়াছ কি? দেখিলে বাক্শক্তি থাকে না, দেখিয়াছ কি? না দেখিলে সব অন্ধকার হয়, দেখিয়াছ কি?...

দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দেবদুর্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে? পৃথিবীতে অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশি কদাচ কখন মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে, কিন্তু কাজে মিলে না।

একবার মিলিয়িছিল। দু হাজার বৎসর আগে পাটলীপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদকাননে, এইরূপ দুইটি হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।

কাঞ্চনমালা (রচনাকাল ১৮৮৩), প্রথম পরিচ্ছেদ, এক

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভেক ও সারসের ইতিহাস কাহারো অবিদিত নাই। একদল ভেক সারস-পক্ষীর সমীপে গিয়া তাহাকে জোড়করে নিবেদন করিল যে, "হে উচ্চাপদারূঢ় শুভ্রবর্ণ শুভ্রান্তঃকরণ সারসপক্ষী, আমাদের রাজা এই একটা নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড বই না; ইহার রাজত্বে আমাদের কোনো শুভ নাই। তুমি যদি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের রাজসিংহাসন অধিকার কর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া যাবজ্জীবন তোমার জয়জয়কার করিব। তা শুধু না— বক্রমতি বক্রগতি নৃশংস সর্পেরা ঝোপঝাপের আড়ালে মাথা গুঁজিয়া যেখানে সুনির্ভয়ে বাস করে, সেই সকল গহন বনে প্রতিদিন দলবল সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিবে।" ভেকদিগের এরূপ শাঁসালো এবং রসালো আহ্বানে সারসের কর্ণ কখনও বধির থাকিতে পারে না; তিনি আড়চক্ষে ভেকরাজ্যের চতুঃসীমায় একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই সিংহাসনের উপর ধীরে ধীরে এক চরণের পর আর এক চরণ বাড়াইলেন আর, দুই চরণ যখন সেই ভিত্তিমূলের উপর দৃঢ়রূপে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি প্রজাগণের ক্রন্দন জন্মের মতো ঘুচাইবার জন্য টুপটাপ করিয়া রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই প্রজাদিগের আনন্দের গগনভেদী উচ্ছ্বাস শোকাশ্রুধারায় পরিণত হইতে লাগিল ও ঘরে ঘরে মড়াকান্না পড়িয়া গেল। আমাদের দেশের বকবককারী ভেকের দল চাহেন যে, শুভ্র সারসবৃন্দ একবার কৃপাকটাক্ষে দেখুন যে আমাদের নিজের জাতি নাই, গৌরব নাই, পরিচ্ছদ নাই, আমরা অতিই অসভ্য, অতিই বর্বর— তাঁহাদের কৃপা-ই আমাদের অকূলের কূল। আইস, আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, আমরা যখন এত উদার হইতে পারিলাম যে, আমাদের জাতিকুলমান সমস্তই আমরা তোমাদের সভ্যতাসলিলে ধৌত করিয়া ফেলিতে একটুও কুণ্ঠিত, লজ্জিত বা সন্তপ্ত নহি, তখন তোমরা কি আমাদের প্রতি এটুকুও উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিবে না যে, তোমাদের বাম চরণের সুমার্জিত উপানতের অর্থাৎ বুটের সোনার কাটি ছোঁয়াইয়া কাঙ্গালী বাঙ্গালীজনের মৃতশরীরে জীবনসঞ্চার করিবে! বাবু উপাধি আর তো আমাদের সহ্য হয় না! ধুতি চাদর আমাদের গাত্রে রাইসোর্শের বেলেস্তারা ঠ্যাকে! জঘন্য বাঙ্গালী নাম, বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দু নাম, হিন্দু ভাষা আমাদের কর্ণকুহরে বিষবর্ষণ করে! অতএব হে শুভ্রবর্ণ শুভ্রহৃদয় সারসপক্ষী সকল, তোমরা এ-অধীন ভেকমণ্ডলীকে সমূহ দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর!"

সোনার কাঠি রূপার কাটি (১৮৮৩)

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী

ক্ষুধা হইলে আহার করিতে ইচ্ছা হয়, ক্লান্তি বোধ হইলে নিদ্রা যাইতে হয়, এগুলি শরীরের নিত্য ধর্ম। স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইলে দেহ কুঞ্চিত বা স্ফারিত হয়, দৌড়িতে হয় বা নৃত্য করিতে হয়— এগুলিও নিত্য। গাত্র লেহন বা চুম্বন, হাস্য বা ক্রন্দন অনেক সময়ে স্নায়ুকণ্ডুয়নে জন্মে। সকল সময়ে সে-কার্যগুলি সহানুভূতিসূচক নহে। দুইটি জীব স্ত্রীপুরুষ সমেত যত্নে সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে, ইহাকেও জীবের নিত্য ধর্ম বলি। যখন পরস্পরের স্বেচ্ছাচার ন্যূন করিয়া সমেত যত্নে সাধারণের স্বার্থসাধনে অনেক মিলিয়া কার্য কবে, তখন সামাজিকতার আরম্ভ। একটি মহিষকে আক্রমণ করিলে আর-একটি মহিষ যদি আততায়ীকে আক্রমণ করে, তাহাও নিত্য ধর্ম হইতে পারে। স্নায়ুর উত্তেজনায় সেরূপ কার্য অনেক সময়ে ঘটে। কিন্তু যখন কয়েকটিকে প্রহরী রাখিয়া আর কয়েকটিকে আবশ্যক কর্ম সাধন করিতে দেখি, মণ্ডলীর সমস্ত কার্য বিভাগ করিয়া, এক এক দলকে এক এক প্রকার কার্য করিতে লক্ষ্য করি, তখন বলি. ইহারা সামাজিক জীব! নিত্য ধর্ম সম্পাদন করিতে করিতে ক্রমোন্নতির সহিত জীব সামাজিক ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং কোথায় একটির অন্ত, অন্যটির আরম্ভ ঠিক বলা যায় না। কিন্তু যখন দেখি, একজনের সাধ্যাতীত কর্ম অনেকে সমেত যত্নে সাধন করিতেছে, তখন তাহাকে সামাজিক ক্রিয়া বলিয়া সহজে নির্ধারণ করিতে পারি।

মৌমাছি,বোলতা ও পিপীলিকা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। দেহের উন্নতির সহিত জীবের মনের উন্নতি হয়, এবং মনের উন্নতির সহিত সামাজিক প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে। দেহের উন্নতি অনুসারে পিপীলিকাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিম্নতম শ্রেণীর পিপীলিকাদের সামাজিক ভাবের লেশমাত্র নাই। প্রত্যেক স্ব স্ব প্রধান হইয়া বাস করে। কিন্তু ঐ জাতীয় জীবের উচ্চতম শ্রেণীতে সামাজিকতার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কার্যবিভাগ, গৃহনির্মাণ, ভিন্ন কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্মাণ, দাস রক্ষা বা গার্হস্থ্য জীবন পালন দেখা যায়। ইহারা বিপদে পরস্পরের সাহায্য করে, পীড়িতের শুশ্রূষা করে; এবং ভবিষ্যতের আয়োজন করিয়া রাখে। ইহাকেও প্রকৃত সামাজিকতা বলা যায় না; পারিবারিকতা বলা যাইতে পারে কারণ ইহারা সকলে এক মায়ের সন্তান— এক পরিবার। জ্ঞাতি বা জাতীয় জীব সকলে একত্র মিলিয়া যখন কোন কর্ম করে, তখন তাহাকেই সামাজিকতা বলা যায়।

মানবপ্রকৃতি (১৮৮৩), পঞ্চম পল্লব: সমাজ-সৃষ্টি ও একতা-বন্ধনের সূত্রপাত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

...অনেকক্ষণ ঐ কয়টি ছত্রের মর্ম ভাবিলাম। ভাবিলাম, এ-সংসারে আমরা কয় দিনের জন্য? আর এই কয় দিনের জন্য সংসারে আসিয়া কেন বিবাহ-বিসম্বাদ করি! ভাবিলাম, সংসারের নির্যাতন কখন আমাকে সহিতে হয় নাই। দেবঘরে প্রথমবার মানুষের নিষ্ঠুর অন্যায় আচরণ সহিতে হইয়াছে। প্রথমবারই ক্রোধান্ধ হইয়া মানুষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ভাবিলাম, আমার অতি অন্যায় কাজ হইয়াছে, এবং আমার দেবঘরের লোকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাই আপনার নিকট এই আবেদন যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেবঘরের লোকগণের নিকট আমার বিনীতভাবে পূর্ণান্তঃকরণে সরল-হৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা জানাইবেন। অপাপবিদ্ধচরিত্র নহি, আমি জানি। আমি কত মিথা কথা কহি, কত জনের প্রতি অন্যায় বিচার করি, কত কর্তব্য করি না, ইহা আমি জানি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে কি-গর্হিত, নীচতম, হেয়তম পাপ আমার উপর আরোপিত হইয়াছিল। ঈশ্বর জানেন যে, জীবনে এই প্রথমবার কি-ঘোর অন্যায় পীড়ন আমাকে সহিতে হইয়াছিল। ইহার বিচার যেন ঈশ্বর করেন! আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সামান্য জীব; যতদূর সাধ্য, সংসারের দূষিত বায়ুতে স্বীয় চরিত্র অকলঙ্কিত রাখিব; তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইব, এই বাসনা। আমাব চরিত্রের অন্যে কিরূপ পরিমাণ করে, তাহা আমার চিন্তার বিষয় নহে। আমি শৈশব হইতেই সমাজের আজ্ঞাকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। এখনও বিবেকের নিকট সমাজের আজ্ঞা তুচ্ছ করি, ও আশা করি চিরকাল করিতে পারিব; আমি যাহা বিবেকানুমোদিত মনে করি, তাহতে সমাজের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করি না ও বোধ হয় কখন করিব না। ইহার জন্য হয় ত আমাকে অনেক অন্যায় অত্যাচার সহিতে হইবে। তাহা ধীরতার সহিত সহিব, মনে করিয়াছি। সেলি-র ঐ কয়েক ছত্র আমার জীবনের অন্ততঃ কিছুও পরিবর্তন করিবে, আশা করি। কিন্তু যাহা করিয়াছি, তাহার উপায় নাই। তাই তাহার জন্য ক্ষমা চাহি। আপনি তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কহিবেন যে, তাঁহারা যেন বালকের কৃত অপরাধ বলিয়া আমার তাঁহাদিগের সহিত আচরণ মার্জনা করেন। হয়ত তাঁহাদিগের সহিত জীবনে কখন দেখা হইবে না। আমি কোথায় থাকিব, তাঁহারা কোথায় থাকিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। তাই বলি, তাঁহারা সে-সকল যেন ভুলিয়া যান। ক্ষমা করিতে কেহ অস্বীকৃত হইবেন না, আশা করি। পৃথিবীতে কাহাকেও যদি সুখী করিতে না পারি, কাহাকেও যেন অসুখী না করি, ইহাই যেন ঈশ্বর করেন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

(রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র, ১৮৮৩)

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যে-স্থানে ভাগীরথী রঙ্গে মহানন্দার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিতেছে, সেই সঙ্গমস্থলে, উপকূলে বসিয়া একটি নারীমূর্তি। রমণীর বামপার্শ্বে নবপরিমলপূর্ণ প্রফুল্ল ফুলরাজি-শোভিত সাজি। ঊষাসমাগমে সেই নির্জন বেলাভূমিতে একাকিনী উপবিষ্টা সেই অনন্যমনা রমণীর আকর্ণ বিস্ফারিত স্থির নেত্রদ্বয় এক-একবার সেই মৃদুনিনাদিনী নদীর লীলা, জলের খেলা দর্শনে বিনিবিষ্ট, এক-একবার পশ্চাদ্ভাগে নিদ্রিত অসংখ্য সৌধমঠমন্দির-পূর্ণ কোলাহল-শূন্য গৌড়ের প্রতি সমর্পিত। এক-একবার পাপিয়া ঊষার হাস্যতরঙ্গপ্রভাসিত গগনপ্রাঙ্গণে সঙ্গীতসুধা ঢালিয়া দিতেছে, রমণীর মহানন্দার ন্যায় ঢলঢলে সরল নয়নযুগল তদনুসরণে শূন্য-পথে স্বকীয় শক্তি সঞ্চালন করিতেছে।

রমণীর জীবন ইহজগতে ষোড়শটি বর্ষচক্র অতিবাহিত করিয়াছে; রমণী যুবতী। পরিধান মলিন জীর্ণবসন, কোমলাঙ্গে অলঙ্কারের লেশমাত্রও নাই; কিন্তু রমণী স্বভাবসুন্দরী।... যুবতীর জীবনের বর্তমান কার্য কি? নীরব রজনী রমণীর প্রধানা সঙ্গিনী; কুঞ্জে কুঞ্জে, কাননে কাননে একাকিনী যথেষ্ট পরিভ্রমণে যামিনীযাপন যুবতীর নৈশকার্য। কখনও শর্বরীসঙ্গমে সরসীবক্ষে ক্ষুদ্রপদদ্বয় মগ্ন করিয়া নৈশ ধীর সমীরবক্ষে অঞ্চল-সঞ্চালনে চঞ্চল হিল্লোলের সহিত সাধের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; কখনও সেই স্বচ্ছসরোবরহৃদয়ে শত শত পূর্ণচন্দ্র আব নীল নৈশকালে একটিমাত্র চন্দ্র দেখিয়া মনে কত-কি কল্পনার আল্পনা অঙ্কিতে করিতে নিযুক্ত হয়; কখনও সেই চাঁদের সরল হাসির অনুকরণ করিতে যায়; কখনও ললিত-লতাচ্ছাদিত কুঞ্জকুটীর-দ্বারে বসিয়া একাকিনী সেই নিদ্রিত নিশীথে গগন-মণ্ডলের অনন্ত নক্ষত্র গণনারম্ভ করিয়া গণিতে গণিতে সংখ্যা ভুলিয়া যায়, আবার গণনায় মনোনিবেশ করে; কখনও প্রাবৃট-নিশীথে হাস্যমুখী সৌদামিনীকে ধরিবার জন্য বজ্রের প্রতীক্ষায় কোমল বক্ষ বিস্তারিত করিয়া দেয়; কখনও-বা মর্মরবেদিকায় অঙ্গ ঢালিয়া আপন মনে উদারপ্রাণে সপ্তম তানে গান গাহিতে গাহিতে নিদ্রাকে আলিঙ্গনদানে বাধ্য হইয়া পড়ে, শেষ ঊষার ধীর-স্নিগ্ধ সমীরে বা নীহারে শরীর শীতল হইলেই ধীরে ধীরে আকর্ণবিস্ফারিত লোচনোন্মীলনে মধুর অধরে ঊষার হাসির সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে করিতে সাজি হস্তে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রফুল্ল প্রসূনচয়নে ফুলদাম এবং ফুলগুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া প্রভাতী তপনোদয়ের পূর্বক্ষণেই গৌড়ের প্রধান রাজপথে দেখা দেয়। মালাবিক্রয় যুবতীর প্রভাতী কার্য।

বীরবরণ (১৮৮৩), প্রথম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখর বন্দোপাধ্যায়

বিসর্জনান্তে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ! আশুতোষবাবুর বৃহৎ অট্টালিকা এখন উৎসবরব-শূন্য। বাদ্যের সুরও আর এক রকম, চিরপ্রথানুসারে সন্ধ্যার পরে চণ্ডীবেদির কাষ্ঠনির্মিত চৌকির এককোণে একটিমাত্র ক্ষীণ দীপ জ্বলিতেছে।... সন্ধ্যা উত্তীর্ণ পরে বিসর্জনের বাজনা থামিয়াছে, আশুতোষ রায় স্বজন-সমভিব্যাহারে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর বেদি লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন, পরে অধিষ্ঠাতা-গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন, তর্কালঙ্কারকে নমস্কার করিয়া কোলাকুলি আরম্ভ করিলেন। অশীতি-বর্ষীয় গ্রামের ভট্টাচার্যমহাশয় অস্থির মস্তক নড় নড় করিতে করিতে অসিতেছেন, পলিতকেশ সিদ্ধান্তমহাশয় একটিমাত্র জীর্ণ দন্তে হাসি প্রকাশ করিয়া বাহু প্রসার করিতেছেন, এই বৃদ্ধ হইতে নৃত্যশালী গিরিধারী, গোপাল, ভূপাল বালকগণকে আশুতোষবাবু সমসমাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন— গঙ্গাধরও একবার বড়লোকের অঙ্গস্পর্শনে আপনাকে বড়লোক জ্ঞান করিলেন। আবার আশুতোষবাবু কাহারও দাড়ি চুম্বন করিতেছেন, কাহারও মস্তকে করপল্লব প্রদানে আশীর্বাদ করিতেছেন, যেন আত্মীয়-স্বজন, ভৃত্যশ্রেণী, গ্রামস্থ, দেশস্থ অধীন প্রজাপুঞ্জকে তাবৎ দেশ তাবৎ পৃথিবীকেই প্রণয়পাশে পরিবদ্ধ করিতেছেন! সৌহার্দ্যস্রোত চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। শক্তিপূজান্তে এই প্রথাটি কেমন প্রীতিকর! সভ্যতার প্রভাবে এটিও কি পরিত্যক্ত হইবে? এই প্রথায় আমোদ আছে, কিন্তু এই আমোদের বেলাভূমে যেন শোক-ঊর্মি স্মৃতিবায়ুতে উত্থিত হইয়া এক-একবার প্রতিঘাত হইতেছে! আশুবাবু এক-একবার কহিয়া উঠিতেছেন, "আজ ঈশান কৈ? থাকিলে কত হাসি হাসাইত! গুরুদাস থাকিলে দশ গণ্ডা মিঠাই উঠাইত! কৈলাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমোদ উঠিয়া গিয়াছে!" সিদ্ধান্ত কহিতেছেন, "তপস্যার ফল! সব অল্পভোগীরা জন্মগ্রহণ করিয়ছিল!" আবার কেহ কহিতেছে, "আমাদের এই কোলাকুলিই শেষ— আর-বৎসর এ-দিন দেখতে কি আর মহামায়া রাখবেন?" অমনি সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, আবার এই সময়ে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কোন হতভাগ্যের জননীর ক্রন্দনধ্বনি হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে: "সবাই নেচে খেলে বেড়াচ্ছে! কেবল আমার সে-ই নাই!" কেহ অধীরা হইয়া জগজ্জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তোমাকে কে দয়াময়ী বলে?"

গঙ্গাধর-শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা (১৮৮৩), চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গিরিশচন্দ্র বসু

সকল সমাজেরই দোষ-গুণ আছে, তবে দোষ অগ্রে চক্ষে পতিত হয়। যদি কোন দোষের কথা লিখি, তাহা হইতে মনে করিও না যে প্রশংসার কিছু নাই। ইঁহাদের সমাজ অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। আমি জানি, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, এদেশী মাতা তত ভালবাসিতে জানেন না, এদেশী ভগ্নী ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে তত তৎপর নহেন, এদেশী ভাই ভগ্নীর প্রিয় নন, এদেশী পুত্রের সহিত পিতামাতার তত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বা ভালবাসা-মাখান ভাব নাই। এইরূপ সংস্কার কোথা হইতে হইল, বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ ভূল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এখানকার মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র ভালবাসা ও সহৃদয়তাতে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হউন, কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। তবে প্রভেদ এই: আমাদের পারিবারিক স্নেহ ও সহৃদয়তা মুখে প্রকাশ করি না, অথবা প্রকাশ করিতে জানি না। আমার ভগ্নী আমাকে ভালবাসে, ভালবাসা মনেই রহিল; আবশ্যক হইলে কার্যে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এ-দেশের পারিবারিক স্নেহ প্রকাশের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হয়। প্রাতঃকালে প্রথম দেখা হইবার সময় পিতামাতা, পুত্র-কন্যা, ভগ্নীর পরস্পর-করমর্দন বা স্নেহচুম্বনপ্রথা কেমন বোধ হয়? রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময়ও এই প্রথা। যদি ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট হইতে কোন একটা জিনিষ চাহিয়া পাঠাইলেন. প্রাপ্তিস্বীকার-স্বরূপ ধন্যবাদ না দিলে মহা অসভ্যতা হইল। ইহাকে কৃত্রিমতা না বলিয়া কি বলিব? ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে যখন এরূপ, তখন দূরসম্পর্ক বা নবপরিচিতের মধ্যে কত অধিক আড়ম্বর, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার। তোমার সঙ্গে কোন লোকের আলাপ করিতে হইলে একজনের ত প্রথমে পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে উভয়েই পরস্পর করমর্দন করিতে হইবে, এবং সেই সময়ে উভয়েই বলেন "হা ডি ডু"; ইহার অর্থ "তুমি কেমন আছ?" কিন্তু এ-স্থলে ইহার কোন অর্থ নাই, ইহার উত্তর দিবার আবশ্যকও নাই, তবে সমাজের পদ্ধতিমত না চলিলে লোকের উপলব্ধি হইবে, সভ্য সমাজের রীতি-নীতি এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে এই সম্বোধন করিয়া হস্তকর্ষণ করিতে হয়।

বিলাতের পত্র, প্রথম ভাগ (১৮৮৩), সামাজিক কৃত্রিমতা

"বামের লগি সামাল! গলুইয়ে কে আছ, দড়ি টানিয়া বাঁধ! কূপকের খীলে দড়ি দাও!"... সোঁ সোঁ করিয়া মরুদ্গণ গম্ভীরস্বরে ডাকিতেছে, ফর ফর করিয়া নৌকার চালের খড় উড়িতেছে। মড় মড় করিয়া ছাপ্পরের বাঁকারী সব কাঁদিতেছে। কোঁ কোঁ করিয়া বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ। হু হু করিয়া বায়ুবেগ পালে লাগিয়া নৌকার কূপক ঝুঁকিয়া পড়িল। সামাল সামাল শব্দ চারিদিকে রটিল। নৌকা কাত হইয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। জলের উচ্চ ঊর্মি যেন ছুরি দিয়া কাটিল; যেন নব উত্থিত চড়ার উপর প্রকাণ্ড ফালের লাঙ্গল বায়ুবেগে চলিল। জল কল কল শব্দে কাটিতে লাগিল; মাঝে মাঝে চটাশ চটাশ শব্দে নৌকার গলুই আছাড় খাইতেছে। দণ্ডধারক উঠিয়া দাঁড়াইল। আর দণ্ডে জল পায় না। আরও নৌকা ব্যস্ত হইল, কর্ণধার দণ্ড ধরিতে হুঙ্কারিয়া আদেশিল। দণ্ডধারকেরা পুনঃ বসিয়া কটিদেশ বাঁকাইয়া পদদ্বয় দীর্ঘ করিয়া মাথা নোয়াইয়া বলে দণ্ডক্ষেপণ করিল, কিন্তু নৌকার উন্মত্ত নৃত্যে ক্ষেপণীর অগ্রভাগও জল স্পর্শ করিল না। ভীমবেগে একটা বায়ুর দমকে নৌকার চালের খড় ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল, কেবল বাঁকারীর বাতাগুলি রহিল। সেই দমকেই মড় মড় করিয়া কূপক ভাঙ্গিয়া গেল। পাল জলে গিয়া পড়িল। নৌকা একেবারে মুখ ফিরাইয়া তীরের দিকে ভাসিল...। বায়ুর গোঁগ্রানিতে কিছুই শোনা যায় না। বৃষ্টির ঝাপটে কিছুই দেখা যায় না। মচাৎ করিয়া নৌকার হালসি ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ণধার ভগ্ন কর্ণখণ্ড হস্তে করিয়া জলে পড়িয়া গেল— বেগ-সম্বরণে অক্ষম। নৌকা ঘুরিতে লাগিল। গতিক দেখিয়া দণ্ডধারকেরা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, জীবহীন মাংসপিণ্ডের ন্যায় নৌকায় বসিয়া রহিল। সূর্যকুমার মল্লকচ্ছ পরিয়া অনাবৃত দেহে নৌকার উপর পদদ্বয় বিস্তারিয়া দাঁড়াইল... নৌকার প্রতি তক্তাফলক ঊর্মিবেগে জর্জরিত, প্রতি কাঁটা শিথিল, রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন। বায়ুর গর্জন, জলের কলরব, নৌকার অঙ্গনিকরের মচমচানি। বায়ুবেগে ঊর্ধ্বদেশ দিয়া শাখা সপল্লব উড়িয়া যাইতেছে ও জলে পড়িলে প্রায় চতুর্দিক উৎফুল্ল-জলকণায় আবৃত হইতেছে। সূর্যকুমার বলিলেন, "এ ত বড় ভীষণ দুর্যোগ! কর্ণধার কোথায়?"

বঙ্গাধিপ-পরাজয়, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৪), সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রজনাথ ভট্টাচার্য

মা বিশ্বজননি!... আপনিই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব এবং শিবের শিবত্ব; আপনিই যোগিগণের যোগশক্তি, কবিগণের চিন্তাশক্তি, দাতাগণের দানশক্তি এবং বীরগণের গতিমুক্তি। এই অনন্ত বিশ্বে এমন পদার্থ দেখিতে পাই না, যেখানে আপনার মহতী শক্তি অনুক্ষণ প্রকাশ না পাইতেছে: কি স্থলে, কি জলে, কি শূন্যে, কি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদিতে, কি উদ্ভিদনিচয়ে, কি প্রাণিবর্গে, কি অতি অদৃশ্য সূক্ষ্ম স্থানে, কি বলিব, মা, কোথাও আপনার মহাশক্তির অভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। মা, আপনার বলেই কালিদাস সুললিত মহাকাব্যের স্রষ্টা, আপনার বলেই ব্যাস-বাল্মীকি কবিগুরু, আপনার বলেই বীরগণের মহাগৌরব; আপনার বলেই দেশোন্নতি, সমাজোন্নতি, এবং আপনার বলেই জীবের ধন, মান, পদ, গৌরব, স্বাধীনতা।... জননি, একদিন এই ভারতে আপনার যথার্থ পূজা হইত; একদিন মহামহোপাধ্যায় ভারতসন্তানগণ আপনি কি-পদার্থ তাহা চিনিতেন; একদিন স্বয়ংব্রহ্ম রামচন্দ্র ভক্তিভাবে আপনার পূজা করিয়া গিয়াছেন; একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার শ্রীচরণানুগ্রহেই গোবর্ধনধারণা করিয়া স্বকীয় ঐশী শক্তি সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন; একদিন চৈতন্যদেব আপনার বলেই ভারতসন্তানগণকে মাতাইয়া গিয়াছেন।... মা, এক্ষণে আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়ের দিন গত হইয়া গিয়াছে। ভারত আর ভারত নাই। এখানে আর প্রচণ্ডমার্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ প্রকাশ পায় না; এখানে আর বিমল শশধরের বিমল কিরণ পতিত হয় না; এখানে আর সেই স্বর্গীয় সুখবায়ু প্রবাহিত হয় না। যেদিন আপনি অপরিণামদর্শী নরাধম ভারতসন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেইদিন হইতেই ভারত ঘোর অন্ধকারে আবৃত, দাসত্বনরক-গন্ধে পরিপূর্ণ, কাপুরুষদিগের কু-ব্যবহারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মা, আপনার অভাবে আমাদিগের জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানশক্তি নাই; তাহা না হইলে আজি আমরা আপনাকে ব্যঙ্গ করিব কেন? স্থানে স্থানে আপনার মহাশক্তিমূর্তি স্থাপন করিয়া ব্যঙ্গের সহিত পূজা করিব কেন?... এক সময় আপনি বীরাগ্রগণ্য রাবণারি রামের সীতা-উদ্ধারকারিণী ছিলেন; এক্ষণে সেই-আপনি আমাদের হস্তে পড়িয়া (...) বারাণসী-ঢাকাই-শান্তিপুরে-সাটীসঞ্চয়িনী, চুড়ি-মিশি-আতর-গোলাপ-বাহিনী, স্বর্ণরৌপ্য-হীরক জড়িত ভূষণাকাঙ্খিণী দশহস্তধারিণী দুর্গা নাম্নী প্রতিমা হইয়াছেন!

তরুণ-তাপসী (১৮৮৪), শক্তিস্তোত্র

শশধর তর্কচূড়ামণি

কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি জ্বলন্ত তারাগুলির অস্তকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের উন্নতির আভ্যন্তরিক অবস্থার পর্যালোচনা করিলে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, আজকাল ভারতবর্ষ স্থূল-জড়তত্ত্ব-জ্ঞানবিষয়িণী উন্নতির দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে। সহস্রাধিক বৎসরের পর ভারতবর্ষে এরূপ জ্ঞানচর্চার পুনরভ্যুদয়, অনাবৃষ্টি-পরিশুষ্ক দেশে নববর্ষণের ন্যায়, নিতান্ত আহ্লাদজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, যে-পরিমাণে আমাদের স্থূলজড়পদার্থের জ্ঞান উন্নত হইতেছে, সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান সেই পরিমাণে ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিতেছে, স্থূল জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সূক্ষ্মদর্শন-শক্তির হ্রাস হইয়া যাইতেছে; জ্ঞান স্থূলভাব ধারণ করিতেছে। এখন চিন্তাশক্তির গতি স্থূলাভিমুখী: স্থূলভাব-কে অবলম্বন করিয়াই চিন্তা পর্যবসিত হইতেছে; স্থূলই মনের বিশ্রামগৃহ, মন এখন স্থূল বিষয় ব্যতীত আর কিছুই জানিতে চায় না, কোন সূক্ষ্মবিষয় চিন্তা করিতে গেলেই যেন মস্তিষ্ক ও মন নিতান্ত কাতর ও ম্লান হইয়া পড়ে; সুতরাং সূক্ষ্মচিন্তা বিরক্তিজনক ও পরিহার্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব এ-উন্নতি আমাদের প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণসাধক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইহা পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় মনের একার্ধ ক্ষীণ ও ক্রিয়াশক্তি-বিহীন করিয়া অপরার্ধের পুষ্টি সাধন করিতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্থূল এবং সূক্ষ্ম— এতদুভয়বিধ চিন্তাই মনের অঙ্গদ্বয়। এই উভয় চিন্তার বিষয়ও বিভিন্ন প্রকার। স্থূল চিন্তার বিষয় ভৌতিক জগৎ, আবার উভয় চিন্তার ফলও পৃথকবিধ। ভৌতিক চিন্তার ফল ভৌতিক জগতে, অধ্যাত্ম চিন্তার ফল অধ্যাত্ম জগতে। অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনই অধ্যাত্ম চিন্তার মুখ্য ফল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সমাজ সেই অধ্যাত্ম চিন্তায়ই সম্পূর্ণ উদাসীন! যাহার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত যে-আত্মার সন্তোষ উপহারের নিমিত্ত জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত এক আয়াস, এত পরিশ্রম, এত অপমান, এত গ্লানিস্বীকার, সেই আত্মার বিষয় চিন্তা, সেই অধ্যাত্ম জগতের চিন্তাই সমাজের উপেক্ষিত বিষয় হইয়াছে। এই নিমিত্তই সমাজের ঈদৃশ দুরবস্থা, নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি দ্বারা সমাজ প্রপীড়িত; সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা সমাজ হইতে বিলুপ্তপ্রায়— ভারতসমাজ হাহাকারে পরিপূর্ণ!

ধর্মব্যাখ্যা, প্রথম খণ্ড (১৮৮৪), ধর্মের প্রয়োজন, দুঃখের কথা

মীর মোশার্‌রফ হোসেন

এখন এজিদের মুখে কথা ফুটিল, বাক্‌শক্তির জড়তা ঘুচিল। পিতৃবাক্যবিরোধী হইয়া তিনি বলিতে অগ্রসর হইলেন: "আমি দামাস্কের রাজপুত্র! আমার রাজকোষ সর্বদা ধনে পরিপূর্ণ; আমি সৈন্য-সামন্ত সর্ববলে বলীয়ান; আমার সুরম্য অত্যুচ্চ প্রসাদ এ-দেশে অদ্বিতীয়। আমি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ও অভাবশূন্য। আমি যাহার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমি যাহার জন্য রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া এই কিশোর বয়সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে অগ্রগামী, যাহার জন্য এতদিন কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই জয়নাবকে হাসান বিবাহ করিবে? এজিদের চক্ষে তাহা কখনই সহ্য হইবে না। এজিদের প্রাণ কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। যে-হোসেনের এক সন্ধ্যা আহারের সংস্থান নাই, উপবাস যাহাদের বংশের চিরপ্রথা, একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে যাহাদের প্রায়ই ক্ষমতা হয় না, সেই হোসেনকে এজিদ মান্য করিবে? মান্য করা দূরে থাকুক, জয়নাব-লাভের প্রতিশোধ এবং সমুচিত শাস্তি অবশ্যই এজিদ তাহাদিগকে দিবে। আমার মনে যে-ব্যথা দিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণে তাহাদের মনে ব্যথা দিব! এখনই হউক আর দুদিন পরেই হউক, এজিদ বাঁচিয়া থাকিলে ইহার অন্যথা হইবে না; এই এজিদের প্রতিজ্ঞা।"

মারিয়া অতি কষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া সরোষে বলিতে লাগিলেন: "ওরে নরাধম, কি বলিলি? রে পাষণ্ড, কি-কথা আজ মুখে উচ্চারণ করিলি? হায়, হায়, নূরনবী মোহম্মদের কথা আজ ফলিল! তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইল। ওরে পাপাত্মা, তুই কিসের রাজা? তুই কোন্ রাজার পুত্র? তোর কিসের রাজ্য? তোর ধনাগার কোথায়, রে বর্বর? তুই ত আজই প্রধান জাহান্নামী হইলে! আমাকেও সঙ্গী করিলি! রে দুরাত্মা পিশাচ, তোকে সেদিন কে বাঁচাইল? হায়, হায়, আমি তোর এই পাপমুখ দেখিয়াই হাতের অস্ত্র হাতেই রাখিয়াছিলাম। তাহার ফল আজ হাতে হাতেই পাইলাম। ওরে অধর্মী এজিদ, তোর পিতা যাঁহাদের দাসানুদাস, তুই কোন্ মুখে তাঁহাদের প্রতি এমন অকথ্য কথা বলিলি?তোর নিস্তার কোন লোকেই নাই— ইহলোকে নাই, পরলোকেও নাই। তুই জানিস, এ-রাজ্য তোর পিতার নহে। সেই হাসানের পিতা আলী অনুগ্রহ করিয়া— ভৃত্যের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু যেমন কিছু দান করেন— সেইরূপ তোর পিতাকে কেবলমাত্র ভোগের জন্য এই রাজ্য দান করিয়া গিয়াছেন। বল্ ত, কোন্ মুখে এমন কর্কশ শব্দ তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করিলি? আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! তোর এ-পাপ মুখ আমি আর এ-চক্ষে দেখিব না।"

বিষাদ-সিন্ধু, মহরম পর্ব (১৮৮৪), ষষ্ঠ প্রবাহ

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশপূর্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন, "দেবি, মহারাজ তোমার অনুরোধবাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব।" শুনিয়া জানকী অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, কহিলেন "বৎস, আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব।" তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণপূর্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। এই অবসরে জানকী কহিলেন, "বৎস, আমি আজ নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিতেছি। আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আমার মন যেন অসুস্থ, রামের জন্য উৎকণ্ঠা এবং যারপরনাই অধৈর্য্য উপস্থিত। আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন? শ্বশ্রূগণের ত মঙ্গল? গ্রাম ও নগরবাসীদিগের ত কোন বিপদ ঘটে নাই?" এই বলিয়া জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার উদ্দেশে ইঁহাদিগের মঙ্গলকামনা করিলে লাগিলেন। লক্ষ্মণ জানকীর মুখে এই সকল দুর্লক্ষণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক শুষ্কহৃদয়ে কিন্তু বাহ্য আকারে হৃষ্টের ন্যায় কহিলেন, "দেবি, সমস্তই মঙ্গল...।"

...অদূরে পাপনাশিনী গঙ্গা। লক্ষ্মণ অর্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত মনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া নির্বন্ধাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ণ করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বলিতে কি, আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হয় নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ, আমারও সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে।" অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "নৌকা প্রস্তুত।"

বাল্মীকি-রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড (১৮৮৪), ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীর মধ্যে এদেশের স্ত্রীলোকেরা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টরূপে আচরিত। পুরুষেরা যখন খুসি তাহাদিগকে মস্তকে আঘাত করে, সুতরাং তাহাদিগের মস্তক কালশিরায় পরিপূর্ণ। কোন সময়ে একজন ভদ্রলোক একটী কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোককে অত্যন্ত দুঃখের সহিত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া যখন তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন,তখন সেই স্ত্রীলোকটী বলিল যে তাহার স্বামীর তামাক খাইবার নল ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া সে (স্বামী) তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। ভদ্রলোকটী সেই স্বামীর নিকটে গিয়া তাহাকে তাহার "জিনকে" (স্ত্রীকে) ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিল যে, যতক্ষণ না তাহার স্ত্রী তাহাকে একটী নূতন নল দিতে পারিবে, ততক্ষণ সে তাহাকে ক্ষমা করিবে না। সেই স্থানে নল পাওয়া যাইত না বলিয়া ভদ্রলোকটী তাহাকে একটীও নল অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে, বেচারা জিনের নিষ্ঠুর স্বামী তাহাকে স্থূল যষ্টি দ্বারা আঘাত করাতে তাহার একখানা বাহু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

হতভাগিনী জিনেরা যে কেবল এইরূপ প্রহারিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, তাহারা অর্ধাশনেও মরিয়া যায়, কারণ তাহারা মৎস্য ধরিতে বা শিকার করিতে অথবা তীর ছুঁড়িতে পারে না, এবং তাহাদের স্বামীরাও তাহাদিগকে কিছুই খাইতে দেয় না; যে সকল শিকড় তাহারা উপড়াইয়া পায় এবং যে-সকল কীট, টিকিটিকি ও সর্প তাহারা ভূমির উপর দেখিতে পায়, তাহা ব্যতীত তাহাদের পাইবার সম্ভাবনা আর কিছু নাই। তাহাদের মুখের আকৃতি দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, তাহারা কি-প্রকার দুর্দশাপন্ন। পুরুষেরা যখন স্বভাবতঃ বলবান ও দীর্ঘাকৃতি, তখন স্ত্রীলোকদিগেরও অবশ্য বলবান ও দীর্ঘাকৃতি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না হইয়া তাহারা সচরাচর কৃশ, ভগ্নশরীর ও কুৎসিত হইয়া থাকে।

জিন এত যে দুর্বল তথাপি তাহাকে সমুদয় আসবাব বহন করিতে হয়। সে যে কেবল তাহার শিশুকে তাহাব পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া থাকে তাহা নহে, পরন্তু খাদ্যের পুঁটুলি এবং তাহার স্বামীর বন্দুক ও নল পর্যন্তও বহন করিয়া থাকে। এই সময়ে পুরুষটী হস্তে বরশামাত্র ও বাহুতে চুবড়ি লইয়া সগর্বে পদবিক্ষেপ কবিতে থাকে, কারণ সে তাহার স্ত্রীকে বোঝাবহনকারী পশুর ন্যায় বিবেচনা করে। রাত্রিকালে স্ত্রীলোকটকে তাহার নিজের জন্য একটী আশ্রয়স্থান নির্মাণ করিতে হয়, কারণ স্বামী বিবেচনা করে যে, তাহার নিজের জন্য একটী আশ্রয়স্থান নির্মাণ করিলেই যথেষ্ট হইল।

অষ্ট্রেলিয়া (১৮৮৪)

পাঠকগণ, আপনারা পূর্বে অভয়াকে নানা স্থানে দর্শন করিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তরে কখন তাঁহাকে শায়িত, তাঁহার প্রাঙ্গণে কখন তাঁহাকে চিন্তিত, নিয়মিত গৃহকার্যে কখন তাঁহাকে ব্যস্ত, স্বহস্তে রোপিত সেই আম্রবৃক্ষতলে কখন প্রতিবেশিনীগণে পরিবেষ্টিত হইতে আপনারা দেখিয়াছেন; কিন্তু গৃহস্থ হিন্দুরমণীর পক্ষে যে-কার্য দূষণীয়, হিন্দুসমাজে হিন্দুরমণীর যে-কার্য পরিত্যাজ্য, হিন্দু প্রথানুসারে হিন্দুরমণীর পক্ষে যে-সকল কার্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, অভয়াকে বোধ হয় সেইরূপ কার্যে অগ্রবর্তী হইতে আপনারা কখন দেখেন নাই। যদি কখন তিনি সমাজের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, যদি কখন তিনি হিন্দুসমাজের হিন্দুরমণীর কর্তব্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিজের সুখান্বেষণের নিমিত্ত নহে, তাঁহার স্বামীর উদ্ধারের নিমিত্ত। স্বামীর উদ্ধারবাসনায় তিনি আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রামসদয়ের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। আপনাদিগের বিবেচনায় ইহা যদি হিন্দুরমণীর পক্ষে দোষাবহ হয়, তাহা হইলে অভয়া সহস্রবার দোষী। নতুবা এ-পর্যন্ত কোন দোষ তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

এই স্থানে আসিয়া পর্যন্ত অভয়া নৌকাতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন; ক্ষণকালের নিমিত্তও তিনি নৌকা হইতে অবতরণ করেন নাই। স্নান, আহার সেই নৌকাতে; শয়ন, উপবেশন সেই নৌকাতে। পরামর্শ ও চিন্তা করিবার স্থান, সেই নৌকার ভিতর। এইরূপ অবস্থায় এত দিবস পর্যন্ত সেই নৌকার ভিতর অবস্থিতি করিয়াও আজ কিন্তু অভয়া সেই নিয়মের অধীনে থাকিতে পারিলেন না। সমাজের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, লোকলজ্জার ভয় না করিয়া, যশ-অপযশের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এবং রামসদয়ের নিষেধবাক্য না শুনিয়া আজ তিনি একখানি মলিন বসন পরিধান পূর্বক নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন ও রামসদয়ের সহিত বিচারালয়ের অভিমুখে গমন করিলেন।

আজ বিনোদীলালের বিচার দিবস।... বিনোদীলাল যে-স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থান হইতে দেখিতে পাইলেন, একটু দূরে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একটি স্ত্রীলোক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র বুঝিলেন যে, তাঁহার অর্ধাঙ্গিনী ভিন্ন ও-স্ত্রীলোকটি অপর আর কেহই নহে।

অভয়া, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ: চরমদণ্ডে

তারকনাথ বিশ্বাস

যখন স্ত্রী এ-জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী, যখন হর্ষে বিষাদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থাতে সকল সময়েই স্ত্রী একমাত্র সঙ্গিনী, তখন সেই স্ত্রী নির্বাচন করা যে সহজ নহে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? তুমি বিবাহ করিলে, উত্তম রূপবতী স্ত্রী পাইলে, কিন্তু তাহার অন্তর পাইলে না, বা তাহার মনের সহিত তোমার মনের ঐক্য হইল না, তবে সে-বিবাহে সুখ কি? সে-স্ত্রী লইয়া তোমার ইহজন্মে কোন ফল উৎপাদিত হইবে? পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিই বিবাহিত কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই কি সুখী? সকলেই কি প্রণয়সাগরে ভাসমান? কখনই না।

আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুবকেরা বিবাহিত হইবামাত্র মনে করেন যে, তাঁহারা কি-অমূল্য নিধিই হস্তগত করিয়াছেন! পৌত্তলিকের উপাস্যের ন্যায় সতত তাহাকে ভক্তি দেখান, কিন্তু সে-ভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়; ইহার কারণ কোন কোন লোকের সম্বন্ধে মানসিক চঞ্চলতামাত্র। কোন বস্তুই চিরকাল সমান ভাল লাগে না; তুমি নবকামিনীর প্রণয়লাভ-লালসায় নানাপ্রকারে স্নেহ যত্ন বিনয় বাধ্যতা দেখাইলে, তোমার এখন তাহা বড় ভাল লাগিল। ক্রমে তাহাকে হস্তগত করিলে, তাহাকে হাসাইলে, ক্রীড়া করাইলে, সেই কম্বুকণ্ঠীর অমৃত ভাষে হৃদয় পরিতৃপ্ত করিলে। কিছুদিন পরে পুরাতন হইল, সে স্নেহ যত্ন বিনয় প্রভৃতি আর তোমার তত ভাল লাগিল না, সুতরাং তাহার হ্রাস হইতে লাগিল। যেমন বন্যার জল থাকে না, সেইমত রূপবতীর রূপভোগ-জনিত মৌখিক ভালবাসাও চিরকাল থাকে না। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক পরিতৃপ্তি ও অতৃপ্তির ফল বড় বিষময়। বন্যার জল নদী ভাসাইল, দেশ প্লাবিত করিল, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ গৃহাদি স্রোতোবেগে বিধ্বংস করিল, কিন্তু দুই-তিন দিনেই যেখানকার সেইখানে মিশিল, কেবল তৃণশূন্য ভমিখণ্ডে তাহার স্মৃতিচিহ্নমাত্র রহিল। মৌখিক ভালবাসাতেও তদ্রূপ। তখন তোমার পরিণীতা স্ত্রী এই বিসদৃশ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন যে, তুমি আর তাহাকে যত্ন কর না বা ভালবাস না; যেটুকুও বাস, তাহা মৌখিক বা লোকলজ্জা-জনিত। ফলতঃ আন্তরিক স্নেহবন্ধনের গ্রন্থি এক-একটি করিয়া যতদূর খসিবার, তাহা খসিতে লাগিল। আন্তরিক অনৈক্য অবিশ্বাস ও কলহের সূত্রপাত হইল। তুমি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিলে না, অবাক হইলে। পরিণয়ে সুখ নাই বলিয়া স্থির করিলে: স্ত্রী স্বার্থপরায়ণা; সুখের সঙ্গিনী হইতে পারে কিন্তু দুঃখের সময়ে কেহই নহে বলিয়া স্থির করিলে। কিন্তু তুমি এ-কথা স্বীকার করিবে না যে, তুমিই এই অনিষ্টপাতের একমাত্র কারণ।

বঙ্গীয় মহিলা (১৮৮৫), ২. বিবাহ

দেবেন্দ্রবিজয় বসু

যেমন চিত্রকর প্রকৃত ঘটনা অনুকরণ করিয়া তাহার প্রতিচিত্র অঙ্কিত করেন, যেমন ভাস্কর একখণ্ড শিলা খোদিত করিয়া তাহাকে জীবিত-কল্প মনুষ্যে পরিণত করিতে পারেন, সেইরূপ সাহিত্যজগতে যথার্থ শিল্পকর যিনি, তিনি স্বভাব অনুকরণ করিয়া চরিত্রের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। এই স্বভাবের অনুকরণই শিল্পের প্রাণ। যেখানে একটু মাত্র অস্বাভাবিক হইল, সেইখানেই শিল্পকৌশল সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। চিত্রকরের কাজ সহজ, কেননা তিনি কোন বিশেষ অবস্থার, বিশেষ সময়ের, বিশেষ ঘটনার চিত্রমাত্র অঙ্কিত করেন। তাঁহার চিত্রে যাহা অঙ্কিত থাকে, তাহা অতি পরিষ্কাররূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় সত্য, কিন্তু সে-চিত্র দেশ কাল বা পাত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রকৃত কবি-শিল্পীর কাজ বড়ই গুরুতর। তিনি কোন বিশেষ অবস্থা, বিশেষ ঘটনা বা নির্দিষ্ট সময়ের কার্য অঙ্কিত করেন না, দেশকালপাত্র সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ নহে তাঁহাকে এরূপ অনেক ঘটনা চিত্র করিতে হয়; তাহাদের পরস্পর-সম্বন্ধ বুঝাইতে হয়, তাহাদের ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পী যিনি, তিনি সর্বকালিক, সর্বদেশীয় এবং সর্বজনীন এক নূতন সংসার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৃষ্ট এই নূতন জগৎ, প্রকৃত সংসারের সম্পূর্ণ অনুকরণে হওয়া আবশ্যক। সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, সুনীতি দুর্নীতি তিনি কিছুই দেখিবেন না, সংসারে যাহা পাইবেন, তাহাই চিত্রিত করিবেন। চিত্রের ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করিতে পাইবেন না। শুধু তাহাই নহে; তিনি বাহ্য জগতের শুধু উপরিভাগ, শুধু আচরণ দেখিয়া তাহাই চিত্র করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। জগতের মূলকারণ-মধ্যে, তাহার মূলসত্য-মধ্যে, অন্তর্জগতের গূঢ়তম স্থানে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। সাধারণে যাহা দেখিতে পায় না, যাহা দৈব-শক্তিবলে কেবল কবির জ্ঞানচক্ষে প্রকাশ পায়, তাহা সাধারণকে দেখাইতে হইবে, তাহার মর্ম বুঝাইতে হইবে। যাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বোঝে না, তাহা-ই প্রকৃত কবিকে দেখাইতে হইবে। মুহূর্তের বাহ্যিক ভঙ্গিতে আমাদের মনের যে-গূঢ়তর লুক্কায়িত ভাব সকল প্রকাশ পায়, তাহা চিত্রকর কেমন সুন্দররূপে আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। স্বভাবের রত্নভাণ্ডারের মধ্যে চারিদিকে কত অপূর্ব শোভা বিরাজিত রহিয়াছে— সংসারের কঠোর তাড়নায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না, বুঝি সে-শোভা দেখিবার বৃত্তিগুলিই আমাদের শুকাইয়া গিয়াছে। শিল্পী যিনি, তিনি তাহা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দেন। অতএব শিল্পী যিনি তাঁহার কাজ বড়ই কঠিন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, সাধারণের নেতা।

নভেলের শিল্প বা কবিত্ব (১৮৮৫)

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জর্জর, সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হু হু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে, ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়া ছিল; তুমি চাহিবামাত্রই অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগম্ভীর হৃদয় সহজেই একমনস্ক হয়, তুমি একমনে সেই অপূর্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্তিই বা আঁকিবে। কিন্তু তা ত নয়! ভীষণদংষ্ট্র একটা বিষম ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র-দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্মজ্বালা হইল, গগন-চিত্রকরকে মহানিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহাবিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইলে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে-ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে; ভাবিলে, গগন-পটো ক্ষেপা হউক আর যাই হউক, মনের কথা বুঝিতে পারে, পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোক-তাপে গম্ভীর, তখন সেই ভালবাসাও এক দিনে এক মুহূর্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্প-শয্যায় শায়িত হইয়া একমনে, স্থির নয়নে গগনের খামখেয়ালির কারিগরি পর্যালোচনা করিতে লাগিলে।

সাহিত্যে সাধনা (১৮৮৫)

বলি, ও হচ্চে কি? এই রকম ক'রে কি নভেল লেখে? সেই হলদে ঘরের বর্ণনাটা চলেছে ত চলেইছে, ছি! উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ, মেয়েমানুষ কৈ? সেই গুণবতী, জ্ঞানবতী, রসবতী, যুবতী প্রসন্নমতি নায়িকা কৈ? সেই হেসে হেসে ঢ'লে-পড়া কৈ? সেই কেঁদে কেঁদে বুক-ভাসান কৈ? সেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমকে উঠা কৈ? সেই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা কৈ? আচ্ছা, না হয় নায়িকাই এখন নাই। সেই জ্ঞানের সাগর, গুণের নাগর, রসের আকর নায়ক-প্রবরই কৈ? বসন্তকাল, আমের মুকুল, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, পদ্ম, জ্যোৎস্না-রাত্রি, গোধূলি, প্রভাত-তপন, দীর্ঘনিশ্বাস, হা হুতাশ, বুকের ভিতর কুলকাঠের অগ্নি, চোখের ভিতর মন্দকিনী, মুখের ভিতর বক্তৃতা-রাগিনী, কণ্ঠের ভিতর বীণাপাণি, কত আর লিখিবে লেখনী— উপন্যাসের এ-সমস্ত প্রত্যঙ্গ কৈ? এ-কালিয়দমনের যাত্রার রাধাও নাই, কৃষ্ণও নাই, শুধু আখড়াই গাওনায় কতক্ষণ আর আসর থাকিবে, বল?

রাগ করিবেন না। হাতে সবই আছে। কিন্তু ধীরে, ধীরে, ধীরে। যখন যেখানে যেভাবে যেটি চাহিবেন, তখনি সেইখানে তাহাই পাইবেন। শিক্ষিতা, স্বাধীনতা-প্রাপ্তা, সাম্যভাবাক্রান্তা, অবিবাহিতা, যৌবনবিকার-গ্রস্তা বিরহিণী চান কি? দিব। পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। জগৎশেঠের কুঠী। কি-রকম নায়ক দরকার? খাসা, শুকো, নিম-খাসা, চলন, রাশি— এই পাঁচ প্রকার নায়কই উপস্থিত। উপনায়ক, উপনায়িকা, প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী, সখা, সখী আছে। আর ঐ পদ্মফুল, আমের মুকুল, কোকিল, ও-সব ত ধরিই না। আমের মুকুল ত বাগান-ভরা, পদ্মফুল ঠাকুরদাদার খাস-দীঘিতে দিন-রাতই ফুটে আছে— কোকিল ত গাছের পাখী, যাবে কোথা? আছে সব। এখন এনে দিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করিতে পারিলেই হয়।

প্রথমে শাকান্ন, শেষে পায়সপিষ্টক। তাই প্রথমেই বসন্তবর্ণন এবং নায়িকার বিরহবর্ণন না করিয়া, জ্যৈষ্ঠমাসের গরম রোদের কথা পাড়িয়াছিলাম।

মডেল ভগিনী, (১৮৮৫), প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি এ-বিবাহের বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বড়ই গোল বাঁধিতেছে। আমার যে চিরপরিচিত কোন কিছুই দেখিতে পাই না: সে ঢুলি ভায়া নাচিয়া নাচিয়া মাথা নাড়িয়া 'তাকতাকিসিন' করিয়া বাজাইতেছে না, সে সানাইদার পোঁ পোঁ শব্দে 'নিশি নিশি জাগনু' গান গাহিতেছে না, সে হাসির রোল, সে কাজের গোল, কিছুই শোনা যায় না। কদাচিৎ থাকিয়া থাকিয়া যে-দুইএকবার শঙ্খধনি হইতেছে, তাহাও বুঝি অতি চুপে চুপে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঝাড়, লণ্ঠন, খাশগেলাস কিছুরই আয়োজন দেখি না। দেখিতে দেখিতে দুই-চারটি মেটে প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অনেক অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু লুচির খোলা যে কোথায় জ্বলিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইলাম না। শেষ জানিলাম, বন্দোবস্ত চিড়া দই। তাই শুনিয়াই চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে "বর আসিয়াছে, বর আসিয়াছে" শব্দ পড়িয়া গেল। এতক্ষণ যাহাই হউক বা নাই হউক, বর আসিয়াছে শুনিয়া অন্দর-মহলে বড় এক গোল উঠিল। বড় বড় শাঁকে ফুঁ পড়িল; সে শঙ্খরব অতিক্রম করিয়া উলুধ্বনি ছাপাইয়া উঠিল। তারপর গহনার একটা ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্ ঝমর্ ঝমর্ শব্দ উঠিল। পাড়ার বৌ-ঝি বর দেখিতে ছুটিল। ছুঁড়ী বুড়ী কেহই থাকিল না। সকলেই বর আসিয়াছে শুনিয়া দৌড়িল। সারাদিনের মধ্যে যারা একটিবারের জন্যও উঁকি মারে নাই, তারাও লোকমুখে বরের আগমন-সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসল। এ-সব কাজে যুবতীরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। কেহ ছেলে কাঁকে করিয়া, কেহ মেয়ে মাই দিতে দিতে, কেহ ছোট বোন এখন আসিল না দেখিয়া তাহার উদ্দেশে গালি পাড়িতে পাড়িতে মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে ছুটিল। মেয়ে ডাকিল "মা", মা শুনিল না। বুড়ী শাশুড়ি বলিল, "বৌমা, আমি যাব, দাঁড়াও", বধূ শুনিলেন না। বাহিরে শ্বশুর ভাশুর বসিয়া, বধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া তাহাদের সুমুখ দিয়া চলিয়া গেল।

বর আসিয়া ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইল। বর দেখিয়া সৌদামিনী নাক সিঁটকাইয়া ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "ওমা, এই বর?" গোলাপ বলিল, "তাই ত, ভাই, যেন বৃষকাঠ!" নিস্তারিণী বলিল, "এটা যে ঘাটের মড়া!" তাই শুনিয়া নিস্তারের মা তাহাকে চোক টিপিল, পাছে কনের মা শুনিতে পান। নিস্তারিণী চুপ করিল। তখন ক্ষ্যান্ত বলিল, "কামিনীর কি পোড়া কপাল, ভাই, এর আবার ঘর করবে কেমন করে?" সে-কথায় বিনোদা বলিল, "হাঁ, নিয়ে ঘর করলে তো! কুলীনে আবার নিয়ে ঘর করে কোথায় দেখিচিস?"

কুলীনকাহিনী (১৮৮৫), প্রথম পরিচ্ছেদ

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃক্ষটি বহুদিনের পুরাতন। উহা ঐ-স্থানে যে কতদিন হইতে বিরাজিত, তাহা কেহই বলিতে পারে না। নিকটস্থ গ্রামের বৃদ্ধদিগের মতে ঐ-বৃক্ষটি তাঁহাদিগের প্রপিতামহের বয়স্ক। কিন্তু তাহাও তাঁহারা নিশ্চয় বলিতে পারেন না। গাছটির চারিধারে মাটি উঁচু করিয়া একটি বসিবার স্থান প্রস্তুত আছে। ঐ উচ্চ ঢিপির নিম্নদেশে চারিধারে সবুজ রঙের ঘাস। নিকটস্থ গ্রামে কৃষকগণ যখন মাঠে চাষ করিতে আসে, তখন মাঝে মাঝে ঐ-বৃক্ষতলস্থ ঢিপির উপর বসিয়া বিশ্রাম করে। দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ঐ বৃক্ষটি কৃষকদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থান। বিকালবেলায় দু-একদিন দুই চারিটি অল্পবয়স্ক বালককেও সেইখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ঐ-গাছটির চারিধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে। কখনও কখনও খেলিতে খেলিতে দুই একটি বালকের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদও হইয়া থাকে, কিন্তু হাতাহাতি বড় একটা হয় না। গাছটির নিম্নদেশে এক-আধদিন দুই চারিটি বৃদ্ধেরও সমাগম হয়। ছুটাছুটির পরিবর্তে বৃদ্ধদিগের মধ্যে তাস খেলা, দাবা খেলা ও খোসগল্পেরই কিছু প্রাদুর্ভাব; এইজন্য যেদিন বৃদ্ধ-সমাগম হয়, সেদিন গ্রামের নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়: ধান্য কি-রকম হইল, এ-বৎসর কয় আনা আন্দাজ হইবে, কার ঘরে চালে কটা কুমড়া হইয়াছে, অমুকের বিবাহ কবে, পাত্রটি কেমন, এবং ইহা বাদে অমুক কেমন লোক, অমুক কেমন খাইতে পারে, কার বাড়ী আজ কি-রান্না হইয়াছে, এবং পরিশেষে কে কেমন ভোজন করাইতে পারে, ইত্যাদি নানা রকম কথা সেদিন সে-স্থানে উপস্থিত হয়। এই সকল কথার মাঝে মাঝে 'উস্তক পঞ্চাশ' 'কিস্তিমাৎ' প্রভৃতি দুই চারিটি কথার উচ্চ নিনাদ এবং তাশ পেটার চটাশচট শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ শব্দের সহিত হুঁকার ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ খানিকটা করিয়া ধোঁয়ার সহিত আকাশে উত্থিত হইতে থাকে। বৃক্ষটির একটি উচ্চ ডালে একটি বেশ বড় রকমের মধুমক্ষিকার চাক আছে। সেই চাকের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মৌমাছিরা প্রায়ই গান করিতে থাকে। বৃক্ষটি সেই গুন্‌গুন্ শব্দে নিদ্রাপরবশ হইয়া মধ্যাহ্নকালে বাতাসে ঢুলিতে থাকে...। সন্ধ্যার সময় নানা স্থান হইতে আসিয়া পাখিগুলি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ডালে ডালে কিচিমিচি করিতে থাকে। রাত্রিকালে গাছটি নীরবে বসিয়া কত-কি ভাবিতে থাকে: কত অতীতের কথা তাহার সেই বৃহৎ গুঁড়িটির মস্তকে আসিয়া উপস্থিত হয়, কত বালকের খেলা, কত বৃদ্ধের মাথা-চুলকান, কত হুঁকার বাদ্যধ্বনি এবং কত শত মধুমক্ষিকার গুন্‌গুন্ গান তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, অবশেষে কখন নিশীথ-নিদ্রা আসিয়া স্বপ্নে তাহার ডালপালা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এক রাত্রি (১৮৮৫)

বিহারীলাল চক্রবর্তী

অল্পে অল্পে উক্ত দেশে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাকার সে-পূর্বভাব নাই, সে-শোভা নাই, সে-প্রতিভা নাই, সে-হর্ষ নাই, সে-কিছুই নাই। সকলই যেন বিষাদ-বসনে আবৃত রহিয়াছে, সকলই এক অনির্বচনীয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল মনুষ্যই বিষণ্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ ও অপ্রসন্ন; সকলেরি নেত্র ছলছল করিতেছে। দেশে কণামাত্র শস্য নাই, খাদ্যের নামমাত্র নাই; কেবল বৃক্ষের পত্র ও নদীর জল জীবনোপায় হইয়াছে। সকলেই গৃহ-বাটী ছাড়িয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে; কত লোক সপরিবারে দেশান্তর পলায়ন করিতেছে! যাহাদের মুখ চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত দেখিতে পান না, সেই সকল কুলকন্যারাও পাগলিনীপ্রায় পথে আসিয়া পথিকদিগের নিকট হস্ত বিস্তারিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে, দু-নয়ন দিয়া দর দর জলধারা বহিতেছে: আহা! কে তাহাদের মুখ দেখিয়া দয়া করিবে? সকলেই আপন জ্বালায় দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে!... যেখানে যাই, সেইখানেই মানবের কাতর আর্তনাদ ও ঘোরতর ভয়াবহ চীৎকার শুনিতে পাই। কোথাও বা শীর্ণদেহ শুষ্কোদর পুরুষ উরুদেশে করাঘাত করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও বা রমণীগণ আলুলায়িতকেশে অনাবৃত-বক্ষঃস্থলে আপনার শিশু সন্তানগুলি ধারণ করিয়া এক-একবার তাহাদের রোরুদ্যমান বদন অবলোকন করিতেছে, আর এক-একবার উর্দ্ধদিকে নেত্র নিক্ষেপ করিতেছে; কোথাও বা জনক-জননী সন্তানগণকে ক্ষুধানলে দহ্যমান ও মুমূর্ষু দেখিয়া "আমাদিগের অকর্মণ্য দেহ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ কর" বলিয়া অনুরোধ করিতেছে; কোথাও বা বৃদ্ধ পিতামাতার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া সন্তানেরা স্ব স্ব অঙ্গ কর্তন করিতে উদ্যত হইতেছে; কোথাও বা গৃহস্থেরা ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে; কোথাও বা স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের কণ্ঠধারণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতেই নিস্পন্দ হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে।

স্বপ্নদর্শন (১৮৮৫)

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যে-দিবস গৃহদাহ করিয়া রাজকুমার প্রস্থান করিলেন, তাহার পরদিবস কমলকুমারী তাঁহাকে বিস্তর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলেন না। শেষে ভাবিলেন, হয়তো রাত্রে আসিবে; দিনমানে অনেক স্থানে থাকিতে পারা যায়, কিন্তু রাত্রে থাকিবার স্থান পাওয়া দুষ্কর। এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে-রাত্রি, তাহার পর কত রাত্রি অতিবাহিত হইল, কিন্তু রাজকুমার ফিরিলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, কিন্তু রাজকুমার ফিরিলেন না। তাঁহার অদর্শনযাতনায় কমলের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। শয়নে, ভোজনে. উপবেশনে, ক্রীড়ায় রাজকুমার তাঁহার সঙ্গী; বাল্যকাল হইতে তিনি রাজকুমার ভিন্ন অপর বালক-বালিকার সহিত কখন খেলা করেন নাই। আজ সেই বাল্যসহচর, হৃদয়দেবতা, ভালবাসার বস্তু অদৃশ্য হইয়াছে। তিনি দীন নয়নে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু সেই বাল্যবন্ধুর দেখা পাইতেছেন না। ক্রমে যতদিন গত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইতে লাগিল; তাঁহার কোমল হৃদয়-কোরকে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। দিন দিন তাঁহার মুখশশী ম্লান, ইন্দীবরবিনিন্দিত নয়নযুগল কোটরগত, সোনার বরণ মলিন হইতে লাগিল। তিনি সর্বদাই বিরলে বসিয়া রোদন করেন, এক দণ্ডের তরে নয়ন জলশূন্য হয় না। ক্রমে আহারের অরুচি হইলে শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল। হঠাৎ দেখিলে কঠিন পীড়াগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার জননী এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন; কি জন্য কন্যার শরীর এ-প্রকার হইতেছে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। এক দিবস বৈকালে কমলকুমারীকে কোলে করিয়া তিনি ছাদের উপর (যে-স্থানে পূর্বে একদিন কমল ও রাজকুমার বসিয়া ছিলেন) বসিয়া সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন: ‘‘মা কমল, তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে?’’

রাজকুমার, দশম পরিচ্ছেদ: কুসুমে কীট

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়

বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথাই মনে পড়ে। এক কথা শেষ করিলে আর এক কথা স্মৃতিপথে আইসে। হৃদয়ের কত পবিত্রতা ছিল। কোন দূষণীয় ভাবই মনোমধ্যে স্থান পাইত না। প্রেমের সহিত কিছুমাত্র অপবিত্রতা মিশিত না। চিত্তের সকল ভাবই যেন নির্মল রসে পূর্ণ থাকিত। বন্ধুতা ও প্রেমের একই ভাব ছিল। যে-কামিনীর মোহিনী মূর্তি দিনযামিনী হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল, সে-মূর্তিকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা হইত না। দৈবাৎ স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইত না। দর্শন স্পর্শন উভয়েতেই পবিত্র ভাব ছিল। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনর বৎসর। এ-দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে নিন্দায় ভয়ে তিনি আমার সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে অন্যকে মধ্যবর্তী করিয়া আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। হাসিতে তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব সৌন্দর্য যেমন নয়নরঞ্জন করিত, হাসির মধুর ধ্বনিতে কর্ণকুহরে তেমনই সুধাবর্ষণ হইত। তিনি আমার সঙ্গীতে যেরূপ পুলকিত হইতেন, আমিও তেমনই তাঁহার মধুর মনোহর স্বরে মোহিত হইতাম। কিন্তু তিনি যেমন আমার গান ইচ্ছা করিলেই শুনিতে পাইতেন, আমাদের দুর্ভাগা দেশের প্রথাবশতঃ আমি তাঁহার গীত সেরূপ শুনিতে পাইতাম না। তিনি যখন নিভৃত স্থানে সঙ্গিনীমণ্ডলে মধুকরের ন্যায় মৃদুমধুর স্বরে গান করিতেন, তখন আমি লুক্কায়িত থাকিয়া অতি সঙ্গোপনে তাঁহার গীত শ্রবণ করিতাম। কখন কখন তিনি আমার সমাগম বুঝিতেও পরিতেন, অথচ যেন জানিয়াও জানিতেন না। যদি কোন সখী কহিত যে, কেহ চুরি করিয়া তোমার গান শুনিয়াছে, তিনি যেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতেন, "কি লজ্জা! আর ত আমি কখনও গাহিব না।" কিন্তু আমি যেরূপ তাঁহাকে গান শুনাইতে ভালবাসিতাম, তিনিও তেমনই আমাকে তাঁহার গান শুনাইতে ভালবাসিতেন।

আত্মজীবন-চরিত, চতুর্থ পরিচ্ছেদ. মনোমোহিনী কামিনী

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

চন্দ্রশেখর বঙ্গিমবাবুর এক অপূর্ব সৃষ্টি। হৃদয়ের মহান ভাব, চিত্তের ঔদার্য প্রণয়ের প্রগাঢ়তা এ-চিত্রে অতি মনোহররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত সমানক্ষেত্রে রাখিয়া প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষমতাশীল কবি যতদূর মহৎ ও উন্নত চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন, চন্দ্রশেখরের চরিত্র ততদূরই উন্নত ও মহৎ হইয়াছে। আর-একটু রস ফলাইতে গেলেই যেন ইহা আর এরূপ মনোহর হইতে পারিত না— যেন চিত্রটির স্বাভাবিকতা সম্যক বিনষ্ট হইয়া যাইত, এবং আমরা ইহাকে অলৌকিক বলিয়া বোধ করিতে বাধ্য হইতাম। তবে কি চন্দ্রশেখর কাল্পনিক আদর্শ-চরিত্র নহে? অবশ্য কাল্পনিক চরিত্র বটে, কিন্তু কাল্পনিক চিত্রমধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, ইহার মধ্যেও আবার স্বাভাবিকতা ও কাল্পনিকতা আছে। এক শ্রেণীর চরিত্র দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতে তাহা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়, কাজেই সেইগুলি আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সম্যক সমর্থ হয় না। আর-এক শ্রেণীর চরিত্র কাল্পনিক হইলেও তাহা দেখিয়া স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আমাদিগের বিবেচনায়, যিনি যে-পরিমাণে এই শেষোক্ত প্রকারের চরিত্র সৃজন করিতে পারেন, যাঁহার কাল্পনিক চিত্রে যতদূর স্বাভাবিকতার চিহ্ন থাকে, তিনি সেই পরিমাণে প্রতিভাশালী ও চরিত্রসৃজনে ক্ষমতাসম্পন্ন। স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রণে যে একেবারেই নৈপুণ্য প্রকাশিত হইতে পারে না, আমরা এ-কথা বলিতেছি না; জীবনচরিত লিখিতে গিয়াও চিত্রনৈপুণ্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সে-চাতুর্য ও সে-কৌশলে আর আমরা যাহার কথা বলিলাম সে-কৌশলে প্রভেদ বিস্তর। একের প্রশংসা নির্বাচনে, অনের প্রশংসা কল্পনায়। একের প্রশংসা প্রকৃতিরাজ্য হইতে মনোহর ও অভীষ্ট-ফলোৎপাদক চিত্রগুলি নির্বাচন করিয়া তাহাই অবিকৃতভাবে সাধারণ্যে উপস্থিত করায়; অন্যের প্রশংসা প্রকৃাতিরাজ্য হইতে কতকগুলি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট রঙ বাছিয়া লইয়া তদ্দ্বারা একটি অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করায়। তাঁহার চিত্রের রঙগুলি সকলই আমাদিগের পরিচিত, কিন্তু সেগুলির মিশ্রণ আমরা কোথাও দেখিতে পাই না এবং তাহা অতি উৎকর্ষরূপেও জগতে বিরাজ করে না। আমাদিগের বর্ণনীয় চন্দ্রশেখরও এই শ্রেণীর চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর

আশুতোষ চৌধুরী

আমাদিগের এই জগৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র, অসীম সৌর জগতের কণামাত্র, চারিদিকেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কাব্যজগৎ অসীম। অনন্ত আকাশের কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারকা লইয়া, অনন্ত আকাশের নীচে আমাদিগের এই কোটি কোটি ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া, কোটি মনের আশা-দুরাশা, কোটি চক্ষুর অশ্রুজল লইয়া আকাশব্যাপী আলোকে তাহা দেখিয়া কবি তাঁহার জগৎ চিরকালই সৃজন করিতে থাকেন। সে-দৃষ্টির কখনও শেষ নাই, সে অসীমে অসীম যোগ। সৃষ্টির কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতি, যে কোন অর্থেই হউক না কেন সত্য। যে দ্রষ্টা সে পুরুষ, যে-কারণে সৃষ্টি তাহা প্রকৃতি— এই অর্থ যদি কাব্য এবং কবি সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে কবির বিশ্বব্যাপী মমতাই তাহার প্রকৃতি, কাব্য তাহার ফলস্বরূপ, আর এই অনন্তপ্রসারী প্রকৃতির ধ্যানই উপাসনা। তোমার যে-কোন ধর্ম হউক না কেন, যে-কোনরূপে তুমি তোমার ক্ষুদ্র জগৎকে অদৃশ্য জগতের কিংবা জগতের কারণের সহিত আবদ্ধ মনে কর, সে যেরূপ বিশ্বাসই হউক না, তাহাই তোমার ধর্ম। সেইজন্য ধর্ম কখন কখন কাব্যে পরিণত হয় এবং কাব্য ত চিরকালই ধর্ম— যাহা তোমাকে জগতের সহিত ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে। কাব্যে ও ধর্মে একটি চিরন্তন সম্বন্ধ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, কবিতা এককালে স্তোত্রমাত্র ছিল, ধর্মগীতিতেই আধুনিক কবিতার উৎপত্তি। পুরাতন ইংরাজীতে 'কবি' কথার অর্থ গায়ক এবং ভবিষ্যদ্বক্তা উভয় বুঝাইত। আধুনিক ইংরাজী 'পোয়েট' কথাটির মৌলিক অর্থ স্রষ্টা।

আমার মনে হয় যে, ধ্যান যেমন কাব্যের অঙ্গ, দেবমন্দিরও তেমনি কবিতার প্রকৃতির অনুরূপ। পিণ্ডার একটি কাব্যের অবতারণা দেবালয়ের ললাটের সহিত তুলনা দিয়াছেন। নীলাকাশের নীচে যাহা উন্নতভাবে হৃদয়কে ধ্যান করিবার জন্য আহ্বান করে, বিচিত্র সূক্ষ্মকার্যশোভিত প্রশস্ত ললাটে যেমন আকাশের ছায়া পড়ে, তাহাতে সূর্যের আলোক, বর্ষার জল যেমন সমভাবেই লাগে, তাহা যেমন স্থির গম্ভীর সৌন্দর্যময়— একটি মহাকাব্যের আরম্ভও কতকটা সেইরূপ, তাহাতে কেমন একটি অনন্ত বিস্তৃতি, অনন্ত কালের ভাব আছে।

কাব্যজগৎ (২) (১৮৮৬)

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

সেলিম বসিয়া আপনার মনে কি কর্তব্য চিন্তা করিতেছেন, সহসা অস্ফুট বামাস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বিস্মিত হইয়া সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া অতি মৃদু পদে কিছু অগ্রসর হইলেন। কথাগুলি স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। একটী রমণী বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে বসিয়া বলিতেছেন, "হায়, বিধাতা কি-জন্য প্রণয়ের সৃষ্টি করিলেন? হৃদয়ে ভালবাসার বীজ রোপণ করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? নয়ন! কেন তুই তাঁরে দেখিয়াছিলি? আমি যত মনে করি আর ভাবিব না, যত মনে করি তাহাকে ভুলিয়া যাইব, কিন্তু ততই যেন ভাবনা বাড়িতে থাকে, ততই যেন হৃদয়বল্লভের আনন্দময় মূর্তি পূর্ণ শশধরের ন্যায় হৃদয়ে উদয় হয়! জগৎ যেন সেই মূর্তিময় হইয়া পড়ে! আমি মনকে কত কথা বলিয়া বুঝাই, মন প্রবোধ মানে না! কিন্তু আর কেন? আর ভাবিলে কি হইবে? অবিলম্বে ত সকলি ফুরাইবে। ভালবাসা! তোরে কেন আমি হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম? উঃ কি মর্মবেদনা! যখন ভাবি আর তাঁরে পাব না, তখন প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠে, বিশ্ব অন্ধকারময় দেখি। আত্মহত্যা! কি ভয়ঙ্কর কথা! কিন্তু আত্মহত্যা বই আর আমার হৃদয়জ্বালার শান্তির উপায় কি? মন! বিচলিত হইতেছ? আর কেন, চল পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া সকল দুঃখের শেষ করি।" এই বলিয়া সেই কামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া যমুনার দিকে গমন করিল। কূলে উপস্থিত হইয়া একটু দাঁড়াইল। সেই অগাধ জলরাশি দেখিয়া কি মনে ভয়-সঞ্চার হইল? না— তা নয়। রমণী ক্ষণকাল স্থির নয়নে যমুনার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "যমুনে! তুই হিন্দুদিগের পুণ্যাত্মা দেবতা: আমি যবনী, আমাকে কি হৃদয়ে স্থান দিতে ঘৃণা হইবে? না, মহতের ত সেরূপ প্রকৃতি নহে। তবে জননি, দুখিনীর প্রতি সদয় হও।"

রমণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে, সেলিম দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। যুবতী অচৈতন্য। সেলিম তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া উপরে আনিয়া শয়ন করাইলেন। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ তাঁহার বদনকমলে পতিত হইল। এ কি! সেলিম চমকিয়া উঠিলেন। রমণী তাঁহার প্রাণপ্রতিমা প্রেমময়ী মেহেরউন্নিসা! তাঁহার জন্যই প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এবার সেলিম আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত পরেই হৃদয়ে মহাক্ষোভ উপস্থিত হইল: এ-স্বর্গীয় রত্ন ত তাঁহার হইবে না! একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহিল। তিনি অনিমিষ নয়নে যুবতীর মুখসুধাকর-পানে চাহিয়া রহিলেন।

কমলাদেবী (১৮৮৫), তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যমুনা-তটে

সত্যচরণ মিত্র

জেলায় মহা মড়ক উপস্থিত। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হইতেছে। যে-গ্রামে একটি লোকের ওলাউঠা ধরিল, সে-গ্রামের সকলেই মরণ নিশ্চয় ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। বৃদ্ধ পিতা সন্তানগণকে বিষয়ের পরিচয় দিতেছে— কোথায় কাহার নিকট কত টাকা পাওনা আছে, সব লিখিয়া দিতেছে। কে কখন রোগের মুখে পড়ে, সকলে সেই ভয়ে সদা শঙ্কিত, ভীত ও ত্রস্ত। মা ছেলের জন্য, ভগিনী ভাইয়ের জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য ভাবিতেছে। মা ছেলের আগে, ভগিনী ভ্রাতার পূর্বে এবং স্ত্রী স্বামীর কোলে মরিবার জন্য গৃহদেবতার নিকটে মাথা খুঁড়িতেছে। পূর্বে এ ওর বাড়ীতে রোগী দেখিতে যাইতেছিল; কিন্তু যে যায়, সে রোগের হাত ছাড়াইতে পারে না দেখিয়া আর কেহ কাহাকেও দেখিতে যাইতে সাহস করিল না। ক্রমশঃ রোগের এত উৎপাত আরম্ভ হইল যে, গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বার রুদ্ধ হইতে লাগিল। কেননা দ্বার খোলা থাকিলে বাটীর আত্মীয়গণ পাছে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকাডাকি করিয়া বিপদে ফেলে! সূর্য, চন্দ্র, তারা, বাতাস, গাছ, পুকুর, দীঘি, পথ, ঘাট, মাঠ— সব যেন ক্রমে ক্রমে ভীষণতর ভাব ধরিতেছে। পাখীর ডাকে, পবনের শব্দে, পত্রের কম্পনে সকলে আতঙ্ক গণিতেছে। কাকগুলা খা খা খা শব্দে আকাশ তোলপাড় করিয়া সর্বনাশের বিজ্ঞাপন রটাইতেছে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রজনী সকলে যেন হাঁ করিয়া সকলকে গিলিবার জন্য উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম প্রথম মৃতের সৎকার হইতেছিল; মড়ার পর মড়া গিয়া নদীর তীরে দগ্ধ হইতেছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় শ্মশানের জনসংখ্যা বাড়িতেছিল। গ্রাম ক্রমে নিস্তব্ধ হইতে লাগিল: প্রথম কয় মাস শোকের কান্নার মহা তুফান উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে কে আর কাঁদিবে? কাঁদিবার লোক আর নাই। গ্রামের ভিতর নীরব; কেবল শ্মশানে হরিবোলের শব্দ, বাঁশফাটার শব্দ, মড়ার মাথাফাটার শব্দ হইতেছে। ক্রমে শ্মশানে আর মড়া পোড়ে না। কে পোড়াইবে? সব মরিয়া শ্মশানের উদর পূর্ণ করিয়াছে। শ্মশানে আর লোকজন দেখা যায় না। শিয়াল-কুকুরগুলা আগে মনের সাধে মড়া খাইতেছিল; আর মড়া জুটিতেছে না; এখন তাহারা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। গ্রামে যে-ঘরে, যে যেখানে মরিতেছে, তার দেহ সেইখানেই পচিতেছে, তার অস্থি সেইখানেই বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

অবলাবালা, প্রথম পরিচ্ছেদ

অশ্বিনীকুমার দত্ত

সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায়: কাম দ্বারা কাম-দমন। যেমন কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মাদক দ্রব্যের বশবর্তী হইয়া পড়িলে কিংবা কাহারও তাহার বশবর্তী হইবার আশঙ্কা থাকিলে, অন্য কোন মাদক দ্রব্য দ্বারা তাহাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, সেইরূপ যাহার কাম মন্দ দিকে ধাবমান হইয়াছে কি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাকে কোন উৎকৃষ্ট মিষ্ট বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহার গতি ভাল দিকে ফিরাইতে পারা যায়। যে রসপ্রিয়, সে রস চাহিবেই। যদি সে কোন পবিত্র উন্মাদক রস না পায়, অমনি অপবিত্র রসে ডুবিয়া যাইবে। যে-ব্যক্তি কুৎসিতরসপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, সে তৎপরিবর্তে অন্য কোন রস না পাইলে তাহার পক্ষে সে-রস ত্যাগ করা কষ্টকর। তবে কুৎসিত রসের পরিবর্তে পবিত্র রস পাইলে এবং আনন্দ অনুভব করিতে পারিলে অকিঞ্চিৎকর যে-কুৎসিত রস, তাহার দিকে টান কমিয়া আসিবে। ভগবৎকীর্তনাদির রস যে পাইয়াছে, তাহার পুনঃ পুনঃ ঐ রস উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। উপর্যুপরি তাহা উপভোগ করিতে পারিলে কুৎসিত ভাব আপনা হইতেই বিদায় লয়। সর্বদা সৎপ্রসঙ্গের রস পান করিতে করিতে বিহ্বল হইলে আনন্দেরও সীমা থাকে না, কুভাবও আর নিকটে স্থান পায় না। যাহার মন সেই বিদ্যাধামের আদিরসের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার নিকটে আর বটতলার আদিরস কেমন করিয়া স্থান পাইবে? এদিকের সুরাপানের আমোদের পরে খোঁয়াড়ি; ওদিকে সুরাপানে কেবল ঢেউর পরে ঢেউ, আনন্দের পরে আনন্দ, যে-আনন্দলহরীর বিরাম নাই, শেষ নাই, যত পান করিবে ততই আনন্দ; অনন্তকাল আনন্দ সম্ভোগ করিবে, এক মুহূর্তের জন্যও অবসাদ আসিবে না। এদিকের সুরাপানে শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হয়; ওদিকের সুরাপানে শরীর তেজ ও বীর্যে অপূর্বকান্তি ধারণ করে। এদিকের সুরাপানে আত্মগ্লানি মর্মান্তিক দাহ উপস্থিত করে; ওদিকের সুরাপানে আত্মপ্রসাদের অমৃতকৌমুদী শরীর ও মন মধুময় করিয়া ফেলে। এদিকের কাম দুই দিনের মধ্যে পুষ্পোদ্যানকে শ্মশানে পরিণত করে, ওদিকের প্রেম মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানকে পুষ্পোদ্যান করিয়া দেয়; এদিকের কাম দেবতাকে পশু করে, ওদিকের প্রেম পশুকে দেবতা করে; এদিকের কাম শরীর ও মন কলঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে নিক্ষেপ করে, ওদিকের প্রেম শরীর ও মন পবিত্র করিয়া দেবভোগ্য অমৃতসম্ভোগের অধিকারী করে; এদিকের কামে সদা হাহাকার, 'গেল, গেল' ধ্বনি, ওদিকের প্রেমে নিত্য নব উৎসবানন্দ, 'জয়, জয়' ধ্বনি।

ভক্তিযোগ, কাম (১৮৮৭)

(শেখ) আবদুর রহিম

মুহূর্তমধ্যে হজরতের স্বর্গারোহণ-সংবাদ আরবের সর্বত্র প্রচারিত হইল। যে শুনে সে-ই স্তম্ভিত, সে-ই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অবাক, অবশাঙ্গ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সকলের হৃদয়ে যেন বিষমুখী শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। অন্দরে বাহিরে হাহাকার, পথে প্রান্তরে হাহাকার। হাহাকার-উচ্চনাদে আরবের গগনমণ্ডল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখমণ্ডল আজ মলিন, অন্তর সুখশান্তিহীন। ভক্ত মুসলমানগণ "হায় কি হল" বলিয়া অশ্রুপ্লাবিত বদনে দলে দলে অসিয়া হজরতের শবের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উচ্চ রোলে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; ক্রন্দনকোলাহলে যেন তথায় মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। সকলেই শোকার্ত, সকলেই মুহ্যমান; কে আর কাহারে প্রবোধ দিবে? হজরতের প্রাণাধিক দুহিতা ফাতেমার শোকের অবধি নাই। পিতার অন্তর্ধানে তাঁহার মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল; সে-মলিনভাব তাঁহার জীবিতকালে আর তিরোহিত হয় নাই, তাঁহার সে-শ্রীমুখে আর কখন হাস্য বিকশিত হয় নাই। উঃ পিতৃবিয়োগজনিত শোক কি-দুর্বিষহ! আর সেই সর্বলোকবরণীয়া পুণ্যশীলা মহিলা বিবি আয়েসা? তাঁহার শোকসিন্ধু আজ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালেও ধরিতেছে না। তিনি কাতর কণ্ঠে শোকাশ্রুপ্লাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়, যিনি ঐশ্বর্য অপেক্ষা দরিদ্রতাকেই প্রিয় মনে করিতেন, যিনি স্বীয় ধর্মাবলম্বীদিগের পাপ-ক্ষমার জন্য অহোরাত্র প্রার্থনা করিতেন, যিনি শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও নানা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও কখনও তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন নাই, বরং ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকিতেন, যিনি সর্বদা দীন-দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দান করিতেন, শত্রুগণের প্রস্তরাঘাতে যাঁহার দন্ত ভগ্ন ও ললাটদেশ রক্তাক্ত হইয়াছিল. যিনি কখন প্রচুর পরিমাণে যবের রুটিও ভক্ষণ করিতে পাইতেন না, সেই ধর্মপ্রচারকের বিয়োগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি (১৮৮৭), সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বীরেশ্বর পাঁড়ে

আহা! কি-স্বপ্ন দেখিলাম! এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি কখনও দেখি নাই। যাহা দেখিয়াছি— যদিও সমস্ত স্মরণ নাই, কিন্তু যাহা স্মরণ আছে— তাহা মনে করিয়াই আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। পাঠকগণের যদি কৌতূহল থাকে, তবে শ্রবণ করুন।

দেখিলাম, কোন নির্জন গৃহমধ্যে একটী সর্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী রমণী নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছেন।... আমি তন্ময় হইয়া যুবতীর রূপরাশি দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্ববর্তী-দ্বার-উদ্‌ঘাটন-শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ অনুসারে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিলাম, ঐ দ্বার দিয়া একটী ভুবনমোহন যুবা পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি বলিব? আমি পুরুষ! যদি কোন রমণী তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে না-জানি তাঁহার কি দশা ঘটিত! বোধ হয় সমস্ত নারীসমাজ ঐ-যুবাকে দেখিয়া কুল, মান ও লজ্জা বিসর্জন দিয়া তাঁহার পক্ষপাতিনী হইতেন। আমি জানি না, ঐ যুবতীর রূপ অধিক, কি ঐ-যুবকের রূপ অধিক। আমি পুরুষ, সুতরাং আমাকে রমণী-রূপের পক্ষপাতী হইতে হইবে, কিন্তু যদি কোন রমণী তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে ঐ-রমণীর সহিত আমার বিতণ্ডার শেষ হইত না। যুবা ধীরে ধীরে যুবতীর নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু রমণী পুস্তকপাঠে এত মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে, দ্বারোদ্‌ঘাটন-শব্দ বা যুবকের পদধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। যুবক অনেকক্ষণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, এখনও যুবতী তাঁহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেন না, তখন তিনি আপনার বাহুলতা দ্বারা যুবতীর বক্ষঃস্থল বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং প্রণয়পূর্ণ ঈষদ্ধাস্য মুখে কহিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! পুস্তক পড়িতে পড়িতে যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছ! আমি যে এতক্ষণে দাঁড়াইয়া আছি, তাহা কি কিছুমাত্র জানিতে পার নাই?" যুবতী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া লজ্জানম্র বচনে কহিলেন, "হৃদয়েশ্বর অথবা সর্বেশ্বর! পুস্তক পড়িতে পড়িতে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই নাই; তোমাদের কথা চিন্তা করিয়া আমার অন্তরাত্মা কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।"

যুবক নিতান্ত আশ্চর্যান্বিতের ন্যায় কহিলেন, "আমার কি দোষের কথা ঐ পুস্তকে লেখা আছে?" যুবতী সহাস্যে কহিলেন, "একা তোমার নহে, তোমার জাতির— স্বার্থপর পুরুষজাতির!"

অদ্ভুত স্বপ্ন (১৮৮৮), উপক্রমণিকা

ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে "পাষণ্ড, বদমায়েস! ধর্মের ভান করিয়া পৈশাচ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস!" এই কথা বলিতে বলিতে এক ব্যক্তি সজোরে কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক গৌরবর্ণ, বয়স আন্দাজ সপ্তবিংশতি বৎসর, কিন্তু মস্তকের চুল অর্ধেক পাকিয়া গিয়াছে; ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়িয়া যুবক বৃদ্ধ হইয়াছেন। শব্দ শুনিবামাত্র বৃদ্ধ শশব্যস্তে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া যুবতীকে আরতি করিতে লাগিলেন।

আগন্তুক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, "বাজার গুজব, পশ্চিমে বাঙ্গালীগণ হিন্দু, সকলেই হিন্দু, পূর্ণমাত্রায় হিন্দু, কিন্তু বাচবিচার কিছুই নাই! শালিকা কেলিকুঞ্চিকা, ভৈরবী প্রেমমন্ত্রপ্রকাশিকা, কিন্তু এরূপ ভয়ানক দৃশ্য কখন দেখি নাই, শুনি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই। কালের বিচিত্র গতি, পশ্চিমে বাঙ্গালীগণের অপূর্ব মাহাত্ম্য!"

বৃদ্ধের কোন দিকে দৃষ্টিপাত নাই, যেন কেহই আসে নাই, কিছুই ঘটে নাই, ধীরভাবে পঞ্চপ্রদীপ ভূমিতে রাখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে যুবতীকে প্রণামকরতঃ গদ্‌গদ্‌ভাবে কহিতে লাগিলেন, "মা, মরণান্তে যেন সদ্‌ গতি লাভ করি, আর যেন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়!" পরে আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবাজী, সব মঙ্গল? কতক্ষণ আসিয়াছ?" আগন্তুকের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন: "এই ঘোর নিশীথে নিভৃত কক্ষে আমাদিগকে দেখিয়া তোমার ন্যায় ইংরাজিনবিশ বালকগণের মনে স্বভাবতঃ নানা ভাবের উদয় হইতে পারে, কিন্তু পুত্র ও মাতার এবং কন্যা ও পিতার পক্ষে কি স্থান-অস্থান আছে? আমি আমার ইষ্টদেবীর শপথ পূর্বক বলিতেছি যে, কেবলমাত্র সেই দয়াময়ীর প্রসাদ পাইবার নিমিত্তই নিশাকালে এই সতী সাবিত্রীর ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছিলাম। আমার শেষ দশা, পরমার্থ-চিন্তা ভিন্ন আর ভাবনা নাই। আমি তোমার গুরুজন; ইচ্ছা হয়, তুমি আমাকে প্রণাম কর; কিন্তু আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্রও অভক্তি হয়, স্পষ্টাক্ষরে বল, আমি এইক্ষণেই তোমার সম্মুখে তুষানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

আগন্তুক ইয়ং বেঙ্গল, তন্ত্র-মন্ত্র মানেন না, বঙ্গদেশে নিবাস, কলিকাতায় কর্ম কাজ করেন। নাম সদানন্দ, বৃদ্ধের ভ্রাতৃজামাতা; ইহার স্ত্রী দশ মাস বয়ঃক্রমকালে পিতৃমাতৃহীন হয়েন এবং সেই পর্যন্তই পিতৃব্যের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালী (১৮৮৮), তৃতীয় পরিচ্ছেদ: গভীর নিশি— অপূর্ব রহস্য!

দীনেশচরণ বসু

স্বপ্নদেবি! তোমার আশ্চর্য মহিমা! দেবি, তোমার মহিমা এ-সামান্য লেখনীতে বর্ণনা করিতে অক্ষম। দেবি, তোমার কৌশলে যখন দেবতারা পর্যন্ত মোহে অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন মানবগণ তোমার নিকট কোন্ ছার! তুমি যখন যাহার শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন প্রদান কর, তখন সে-জন তোমার কুহকে অভিভূত হইয়া সকলই সত্য জ্ঞান করিতে থাকে, এবং হয়ত কেহ কেহ তোমার দর্শনে চিরকালের জন্য উন্মত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। দেবি, তুমি নিদ্রাবস্থায় নির্ধনীকে ধনবান করিতেছ, ধনবানকে পথের ভিখারী করিতেছ, শতপুত্রবতীকে পুত্রহীনা করিতেছ, আর বন্ধ্যাকে শত পুত্রের জননী করিতেছ। দেবি! তোমার মায়া ও মোহে অভিভূত হইয়া দরিদ্র অতুল ঐশ্বর্য পাইতেছে, দাসদাসী তাহাকে সেবা করিতেছে, দুগ্ধফেননিভ বিরামদায়িনী শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, দাসীরা কেহ পদসেবা করিতেছে, কেহ বা চামর-ব্যজন করিতেছে চাটুকারেরা আসিয়া জুটিয়াছে. আমোদ-প্রমোদে দিবারাত্র সুখে অতীত হইতেছে দেখিয়া এখন দরিদ্রও অপার আনন্দ লাভ করিতেছে। ধনী স্বপ্নবশে ধন, জন, গৃহ, বাগান, পুষ্করিণী, সুখসম্ভোগী দ্রব্য-সমুদায় হারাইয়া সামান্য পর্ণকুটিরে বাস করিতেছে, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, কুসুমসদৃশ শয্যার পরিবর্তে সামান্য পর্ণশয্যায় শায়িত, জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান, তৈলবিহনে কেশসমুদায় জটা বাঁধিয়া গিয়াছে দেখিয়া আপনার পূর্ব ঐশ্বর্যের বিষয় স্মরণ করিয়া অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। বন্ধ্যা নারী স্বপ্নে পুত্রলাভ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছে। আর শতপুত্রপ্রসবিনী পুত্রগণকে স্বপনে 'হাবাইলাম' ভাবিয়া হাহাকার-রবে শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছে। দেবি! তোমারি মোহিনী চক্রে দরিদ্র অতুল ঐশ্বর্য পাইয়া সকল দুঃখ ঘুচিল ভাবিয়া আনন্দ লাভ করিতেছে; ধনী 'সকলি হারাইলাম' ভাবিয়া বিষাদসাগরে ভাসিতেছে; বন্ধ্যা নারী পুত্রলাভ করিয়া স্বামীর নিকট সোহাগ করিতেছে; আর পুত্রবতী 'পুত্রগণকে জন্মের মতন হারাইলাম' ভাবিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু নিদ্রাবসানে দরিদ্র সেই পর্ণকুটিরে, সেই পর্ণশয্যায় শায়িত— যে-পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া এতক্ষণ স্বপ্নবশে সেই সকল ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছিল! নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, পার্শ্বে দেয়ালের গায় সেই ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিতেছে, যে-ঝুলি প্রত্যহ স্কন্ধে করিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে থাকে।

নিরাশ-প্রণয় (১৮৮৮), একবিংশ পরিচ্ছেদ: স্বপ্ন

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংসার নিস্তব্ধ। মধ্যাহ্ন-আকাশে মরীচিমালী মার্তণ্ডদেব মনের সুখে মজা করিতেছেন, তবু সংসার নিস্তব্ধ। রৌদ্রে জগৎ ভাসিতেছে, ত্রিলোক হাসিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। পথিক চলিতেছে, শিশু খেলিতেছে, গাড়ি ছুটিতেছে, কেরাণী খাটিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। কোথাও প্রণয়ের ফুল ফুটিতেছে, কোথাও বিরহী মাথা কুটিতেছে, কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও ক্ষোভের তপ্তশ্বাস, কেহ কাজ লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাজের অভাবে ত্রস্ত; কেহ বা পাইতেছে, কাহার বা যাইতেছে; বেচা-কেনা, লেনা-দেনা, সবই হইতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। এই ইহারই মধ্যে সেই যুবা পুরুষ, সেই দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অধৈর্য হইতে হইতে কত ফেরিওয়ালা কত রকম ডাক ডাকিয়া কত দিক হইতে কত দিকে চলিয়া গেল। তবু সংসার নিস্তব্ধ। "পয়সে কা পচীস সূই"— "সিলবে-জুতিয়ে"— "ইব্-কম-উও"— "মুংকডাল"— স্ফুট, অস্ফুট, অর্ধস্ফুট, সুবোধ, অবোধ, দুর্বোধ, নির্বোধ, কত ডাকা-ডাকি, কত হাঁকাহাঁকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি সংসার নিস্তব্ধ।

ইহাই সংসার। এইরূপই সংসারের নিয়ম। উপন্যাস-লেখকের শব্দবিন্যাস নহে, কবিকল্পনার অলীক জল্পনা নহে, প্রকৃত সংসার ত এই। যখন একটি পয়সা কিম্বা এক লক্ষ টাকার চিন্তায় তুমি উন্মত্ত; যখন তোমার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই; যখন না জানিয়া, না শুনিয়া কিম্বা না মানিয়া তুমি ধর্মাধর্ম নিঃসঙ্কোচে পদদলিত করিয়া যাও; যখন তুমি মনে কর যে, এ-সংসারে তোমার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই— তখন বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করিলে কিম্বা অন্তরাত্মায় উদিত হইলে "কি করি, সংসার চলে না" বলিয়া তুমি যে-উত্তর দাও, সে কোন্ সংসারকে উদ্দেশ করিয়া? ধর্ম প্রতিপালন করিলে, গুরুজনের অবজ্ঞা না করিলে, বিলাসে বাধা পড়িলে, কিম্বা অভীষ্টে বিঘ্ন ঘটিলে, সত্যই কি সংসার অচল হয়? সংসার চলিত না? তুমি ছাড়িয়া গেলে সংসার যদি নিতান্তই ক্রন্দন করে, তাহা হইলে কি অচল হইয়া, স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁদিবে? তাহা নহে। সংসার পূর্বেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে, পরেও চলিবে। যাঁহার সংসার, তিনিই চালাইতেছেন, পরেও তিনিই চালাইবেন। তুমি চলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে। গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল, দিক. দেশ, কাল— কিছুই অচল থাকিবে না, সংসার চলিবে। সংসার তোমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে।

ক্ষুদিরাম (১৮৮৮)

কালীময় ঘটক

সুরনগরের জমিদার সতীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর। নগদ টাকা কত আছে, কেহ বলিতে পারে না; গ্রামের প্রাচীনাগণ বলিয়া থাকে, "বাঁড়ুয্যেদের যক্ষির ন্যায় টাকা, মধ্যে মধ্যে শুকাইতে দেয়।..."

সতীপতিবাবুর ছয় পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। এই পুত্রকন্যাগণও বহুসংখ্য পুত্রকন্যার জনকজননী হইয়াছিল। এই সকল পুত্রকন্যার শাখাপ্রশাখা ও জামাই, বেহাই, আত্মীয়, স্বজনাদিতে সতীপতিবাবুর গৃহ একটি পল্লীবিশেষ। কন্যাগণ সকলেই কুলীন-পরিণীতা, সুতরাং পিতৃগৃহবাসিনী। জামাতৃগণেরও "সারং শ্বশুরমন্দিরং।" কেবল ছোট জামাই অহম্মুখ— শ্বশুরগৃহবাসের সৌভাগ্যে বঞ্চিত। প্রতিদিন প্রদোষসময়ে কর্ত্রীঠাকুরাণী সমস্ত বালকবালিকা সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনার্থ বাটীর পুরঃপ্রাঙ্গণে গমন করিতেন। গমনকালে এক-একটি করিয়া বালকবালিকাগণকে গণনা করিতেন এবং প্রত্যাগমন-কালে পুর্নবার গণনা করিয়া গৃহপ্রবেশ করিতেন। ভদ্রাসনের মধ্যেই একটি স্বতন্ত্র সূতিকা-বাটী ছিল। ঐ বাটীতে এককালে চারি-পাঁচটি প্রসূতির স্থান হইতে পারিত। কেহ বৎসরের মধ্যে একদিনও ঐ বাটী প্রসূতিশূন্য দেখেন নাই। এককালে দুই তিনটি রমণী সন্তান-প্রসবার্থ ঐ গৃহে গমন করিয়াছেন, কখন বা এরূপ ঘটনাও হইত।

কর্তা পরান্ন ভোজন করেন না। বধূগণের মধ্যে দশদিন করিয়া পাক করিবার পালা ছিল। সুতরাং বধূগণকে দুই মাস অন্তর দশ দিন কর্তার জন্য পাক করিতে হইত। বাটীর যে-কোন রমণী কর্তার দুগ্ধ জ্বাল দিতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও ঐরূপ পর্যায়ক্রম ছিল। সাধারণ পাকক্রিয়া বেতনভুক পাচক-পাচিকা দ্বারা নির্বাহিত হইত। এই বাটীতে কোন পর্বাহ না থাকিলেও পরিজন ও বালক-বালিকাগণের আনন্দ-কোলাহলে গৃহটি নিত্যোৎসবময় বলিয়া বোধ হইত। সতীপতিবাবুর এমন সুখের সংসারেও সম্প্রতি অসুখের সঞ্চার হইয়াছে...

পিতা বলিলেন, "আমার আর-চারিটি জামাই আমার বাটীতে বাস করে, সদর মফস্বলে প্রধান প্রধান কার্য করে, আমিরের ন্যায় চাল-চলনে দিন কাটায়! তুমি কেন না করিবে?" তিনি পিতার সমক্ষে কিছু বলেন নাই, কিন্তু আমার সাক্ষাতে বলেন, "শ্বশুর-সম্বন্ধীর অধীনে চাকরি করা কি শ্বশুরবাড়ী বাস করা কাপুরুষের কাজ। পিতা কখন কন্যাগণকে স্বামিগৃহে পাঠান না— আমাকে লইয়া যাইবার জন্য জেদ!"

শর্বাণী (১৮৮৮), দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

অমাবস্যার রাত্রি, শ্রাবণ মাস, চতুর্দিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গাছপালা, বাড়িঘর, নদনদী, সব যেন মসীময়। নক্ষত্র মেঘের কোলে ডুবিয়াছে, পৃথিবীর লোকের সহিত সাক্ষাৎ নাই। আকাশে অন্ধকার, পাতালে অন্ধকার, জলে স্থলে সর্বত্র কেবল গাঢ় অন্ধকার। মেঘের সহিত নক্ষত্রদের যুদ্ধ চলিয়াছে, নক্ষত্রগুলি বাহির হইয়া মিটিমিটি হাসিতে চায়, পথিকদিগকে পথ দেখাইতে চায়, মেঘরাশির তাহা সয় না, ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া ক্রমাগত নক্ষত্রগুলিকে চাপা দিয়া ঢাকিতেছে। পথে-ঘাটে চলা দুষ্কর। ক্রমাগত সাত দিন বৃষ্টি পড়িয়াছে, গ্রাম্য পথ-ঘাট কর্দমময়, জলময়। আজও বৃষ্টি পড়িতেছে অবিশ্রান্ত— টুপ্ টুপ্ টুপ্। রাস্তাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাতে আবার জঙ্গল-বেষ্টিত— অতি কষ্টে পা ফেলিয়া যাওয়া যায়। পদ কর্দমে ডুবিয়া গিয়াছে, কার সাধ্য সভ্যতা রক্ষা করিয়া পথে চলে। আঁধারে আঁধার মিশিয়া গিয়াছে, কর্দমে কর্দম মিশিয়া গিয়াছে, জলে জল মিশিয়া একাকার। মানুষ আর ঘরের বাহির হইতে চায় না। ঘরে বসিয়া গ্রাম্য লোকগুলি অসার হইয়া গিয়াছে। রোগীর ঔষধের জন্যও কবিরাজ ডাকিতে যাইতে চায় না। হাট-বাজার বন্ধ, আহার জুটে না। আজ অষ্টম দিন, আজ অনেককে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ের কান্নাকাটি পড়িয়াছে, তাহা এখন মিটিয়া গিয়াছে। নিদ্রা আসিয়া তাহাদের চক্ষুতে আসন পাতিয়া বসিয়াছে।... এই বাদ্‌লায় বাঙ্গালার পল্লিগ্রামের আজ কি দুর্দিন।

এই দুর্দিনে, মাথায় বৃষ্টি বহিয়া, অন্ধকারে ডুবিয়া একটি মৃতদেহ বহন করিয়া নদীর দিকে যাইতেছেন— কেবল ভাই-ভগিনী। সন্ধ্যার একটু পরই চিরদিনের জন্য বালবাসার ডোর ছিঁড়িয়া মা পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। ভাই-বোন উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া উভয়ে বুক বাঁধিয়াছেন। একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে বৃষ্টি ক্রমাগতই পড়িতেছে, তাতে অস্পৃশ্যা জাতনাশিনীর শব! পাড়ার কোন লোক কাছে ঘেঁষে নাই। ভাই-ভগিনী আশাও করিতে পারেন নাই যে কেহ সাহায্য করিবে। ভাই-ভগিনী সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া কর্দমাক্ত কলেবরে মাতৃশব লইয়া শ্মশানে চলিয়াছেন। সোনাপুরের লোকেরা কি মানুষ না নরকের পিশাচ?

অপরাজিতা (১৮৮৯), নবম পরিচ্ছেদ: শ্মশানে

প্রসন্নময়ী দেবী

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর রজতরশ্মিধারে ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গায়িত হইয়াছে। যে-দিকে নেত্রপাত করা যায়, সবই কৌমুদী-স্নাত। দুঃখীর ক্ষুদ্র কুটীর হইতে সম্রাটের রাজপ্রসাদ সে-কিরণে বিভাসিত ও হাস্যময়।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, অরণ্যকমল একক মুক্ত বাতায়ন-সন্নিধানে বসিয়া প্রাণস্পর্শী স্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল। সে-ধ্বনি দিগন্তে ভাসিয়া যাইতে যাইতে প্রকৃতির ঘুমন্ত ভাব ঈষৎ স্পর্শ করিয়া গেল। প্রকৃতি যেন নয়ন মেলিয়া চাহিলেন, জ্যোৎস্নার উপর আবার জ্যোৎস্না হাসিল। নির্জন নিশীথজগৎ বিকম্পিত করিয়া সেই মধুর স্বরলহরী মথুরা-পুলিনে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাতে নির্মল নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের সহিত অযুত অযুত তারাবলী দীপ্তিভরে মোহিতভাবে ফুটিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে ব্রজবালার মন উদাস ও মুগ্ধ হইয়াছিল; এ-বংশীধ্বনি গরিব বিধবার কুটীরে গিয়া একটী নিদ্রিতা বালিকার হৃদয়ে সুখ-স্বপ্নের সঞ্চার করিল। বালিকা ঘুমঘোরে একটু হাসিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিল। বংশীস্বরে অরণ্যকমলের পিতার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি একটু উদ্বিগ্ন হইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন। এত রাত্রি পর্যন্ত অরণ্যকমল জাগ্রত, এই ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ পুত্রের শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অরণ্য বিমুক্ত বাতায়নে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে এবং অন্যমনে নীলাম্বরে সুন্দর নয়নযুগল স্থাপিত করিয়া কি-চিন্তায় যেন সকল ভুলিয়া গিয়াছে। রাত্রি কত, তাহা তাহারও বোধ নাই। প্রফুল্ল চন্দ্রকিরণ তাহার ঊর্ধ্বস্থিত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আরও রমণীয় করিয়া তাহার শূন্য শয্যার শ্বেত শোভা বাড়াইয়াছে। রাশি রাশি কৌমুদীপাতে গৃহের সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যক্ষরূপে নেত্রগোচর হইতেছিল।

অন্যমনস্ক প্রযুক্ত অরণ্যকমল প্রথমে পিতার আগমন বুঝিতে পারে নাই। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পুত্রের নিকটে উপবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্রুত নিশ্বাস-শব্দে অরণ্যকমলের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সে বাঁশী থামাইল। প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে পিতাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। তাহার পর তাহার পিতা উদয়প্রতাপ সিংহ পুত্রের হস্তধারণ করিয়া নিকটে বসাইলেন ও সস্নেহে বলিলেন, "অরণ্য, এত রাত্রি হইয়াছে, তবু তুমি ঘুমাও নাই?..."

অশোকা (১৮৮৯), চতুর্থ পরিচ্ছেদ: পিতা পুত্র

রামকুমারের জননী একখানি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাজা বাসনগুলি রাখিল। তাহার পর ভিজা কাপড়খানি ছাড়িয়া ডাকিল, "বউ, বউ— ও বউ!"

বধূমাতা তখন অন্য গৃহের মেজের উপর একখানি মাদুরে শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল, সুতরাং শাশুড়ীকে কোন উত্তর দিতে পারিল না। বৃদ্ধা মনে করিল, বউমা বুঝি ঘরে নাই, কার্যান্তরে কোথায় গিয়াছে; কিন্তু তাহারই পর কি মনে করিয়া একবার বড় ঘরের জানালা ঠেলিয়া দেখিল যে, সেই গৃহের মেজের উপর তাহার বড় সাধের বধূমাতা সুখে নিদ্রা যাইতেছে! রামকুমারের জননীর কেমন একটা বকা-রোগ ছিল। মনে কোনরূপ কোরকাপ ছিল না, এখনি যাহার সহিত বকাবকি হইল, পরমুহূর্তেই তাহার সহিত আবার হাসিয়া কথা কহিত। বৃদ্ধা পরিশ্রমে কাতর ছিল না, দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে পারিত; কিন্তু পরিশ্রম করিতে করিতে কাহাকেও দুই-একবার না বকিলে বৃদ্ধার পরিশ্রমে উৎসাহ থাকিত না: বৃদ্ধা যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িত। যখন কাহাকেও না পাইত, তখন হয় আপনার অদৃষ্টকে তিরস্কার করিত, না হয় বাক্‌শক্তিহীন পশুপক্ষীর উপর মনের সাধ মিটাইত। কিন্তু ইদানীং বধূমাতার সম্মুখে তাহাকে কোন কথা বলিতে আর সাহস হইত না। সেই-কারণ এখন, নিদ্রিতা দেখিয়া বৃদ্ধা এ-সুযোগ ছাড়িল না। আরম্ভ করিল: "কি আক্কেল, দেখ। খেয়ে দেয়ে ঘুম হচ্ছে, আর আমি এখনও মুখে জল দিই নাই! লোকে যে ব্যাটার বিয়ে দিয়ে বউ আনে, সে কি ঘরে বসিয়ে রেখে পুজো করবার জন্যে? এমন ছোটলোকের মেয়েও ঘরে এনেছিলাম যত—!"

বৃদ্ধার মুখের কথা মুখেই রহিল, বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার নিদ্রিতা পুত্রবধূ ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে অসিল। বৃদ্ধা পুত্রবধূকে দেখিয়া কিছু থতমত খাইল। তখন বড় বউ গর্জন করিতে করিতে বলিল, "আমার বাপের আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিলে যার দিন সুখে যায়, সে আবার আমার বাবাকে ছোটলোক বলে!"

ক'নে বউ (১৮৯০), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ বসু

কালের গতি অবিরাম। কাল কেবল চলিতেছে। কবে কোথায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেহ জানে না, কেহ কহিতে পারে না। কিন্তু সকলেই দেখে, চলিতেছে, কেবলই চলিতেছে। আবার শুধু চলিতেছে? ভীষণ বেগে চলিতেছে!

কাল চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে— অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে লইয়া চলিতেছে। যেন কালের বেগে বেগপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভীষণ বেগে চলিতেছে। একবার যে এক জায়গায় দুইদণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিব কাল কেমন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমন, তাহার যো নাই। দাঁড়াইব কেমন করিয়া— আমিও যে কালের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বেগে চলিতেছি। কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যাই, আর কত-কি দেখি? কিন্তু হায় এইমাত্র যাহা দেখিয়াছি, তাহা আর দেখিতে পাই না; কালের ভীষণ স্রোতে তাহা কোথায় চলিয়া গেল, দেখিতে পাই না, আমিই বা কোথায় চলিয়া আসিলাম, বুঝিতে পারি না। অতএব কালও দেখিতে পাই না, কালস্রোতে প্রবাহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে পাই না। বড় দুঃখ! ক্ষোভের সীমা নাই।

কবি বলেনঃ ক্ষোভ করিও না! তোমার মনের দুঃখ ঘুচাইব। দেখ, দেখিঃ পৃথিবীর ঐ মধ্যপ্রদেশে, যথায় প্রকৃতির সমস্ত অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত, প্রজ্বলিত, কেমন একটি সুন্দর স্বচ্ছ সুগভীর সরোবর পড়িয়া রহিয়াছে! সরোবরে তরঙ্গ নাই, কেবলমাত্র উহার জল একটু উষ্ণ। উহা এত গভীর, কিন্তু উহার তলদেশ পর্যন্ত যেন চক্ষের নিকটেই পড়িয়া রহিয়াছে। উহার তলদেশে পাঁক কি কর্দম কি বালুকা কিছুই দৃষ্ট হয় না; দৃষ্ট হয় কেবল ঐ উচ্চ উষ্ণ আলোকময় দীপ্তিপূর্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দূরসদৃশ ঘোরতর অনুরাগ। ভ্রম হয়, ঐ সিন্দূরসম অনুরাগ আকাশে না সরোবরে।

অমন অনেক দেখিয়াছ— কিন্তু এমন দেখিয়াছ কি? ঐ উচ্চ উষ্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দূররাগ ঘুচিয়া গিয়াছে। যেখানে সিন্দূররাগ ছিল, সেখানে এখন মেঘরাশিতে যেন আগুন লাগিয়াছে; ঝড়ে সেই জ্বলন্ত মেঘরাশি ভীষণভাবে ভীষণ বেগে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি মারামারি করিতেছে। কিন্তু সেই সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর তেমনি স্থির; উহাতে একটি তরঙ্গ নাই, উহার জলের এতটুকু আন্দোলন নাই, উহার বারিরাশি যেন ঐ উন্মত্ত জ্বলন্ত মেঘরাশি বুকে করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তেমনি নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ।

ত্রিধারা (১৮৯০), প্রথম ধারা, অনন্ত মুহূর্ত

রজনীকান্ত গুপ্ত

প্রকৃতির বিশালরাজ্যে ভারতবর্ষ অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে অপার অনন্ত জলরাশি; আর একদিকে অনন্তসৌন্দর্যময়, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার, অভ্রভেদী অটল গিরিবর। সুতরাং ভারতবর্ষ প্রায় চারিদিকেই প্রকৃতি কর্তৃক সুরক্ষিত। স্থলপথে দুর্গম পার্বত্য ভূমি, সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম না করিলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায় না; আর জলপথে মহাসাগরের তরঙ্গবিক্ষোভী বারিরাশি অতিবাহিত করিতে না পারিলে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করা যায় না। বাহির হইতে দেখিতে গেলে ভারবর্ষে প্রবেশ করা বহু আয়াস ও বহু কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ প্রকৃতির দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতি এত যত্ন করিয়া যে-ভারতবর্ষ আগুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও চিরকাল বিভিন্ন জাতির আক্রমণের বহির্ভূত থাকে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোনও ভূখণ্ড বহুবার বহু বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। যে-সুদূরবিস্তৃত পর্বতমালা ভারতের শীর্ষদেশে বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অপূর্ব গাম্ভীর্যের পরিচয় দিতেছে, তাহার পশ্চিম দিকে একটি গিরিসঙ্কট প্রকৃতির বিশাল প্রাচীর ভেদ করিয়া দিয়াছে। আফগানিস্থান হইতে ঐ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিলেই ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে যাহারা রাজ্যবিস্তার, প্রভুত্বস্থাপন বা সম্পত্তিলুণ্ঠনের আশায় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ ঐ পথে নয়জন বিদেশী ভূপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

এই সকল আক্রমণে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবাসীদিগকে সময়ে সময়ে অশ্রুতপূর্ব দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার সহিতে হইয়াছে।... খৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে এক আক্রমণকারীর পর আর এক আক্রমণকারী উপনীত হইয়াছেন, এক রাজবংশের পর আর এক রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছে এবং এক শাসনবিধির পরিবর্তে আর এক শাসনবিধির বিকাশ দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়গণ দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল বিভিন্ন আক্রমণকারীর অত্যাচার সহিয়াছে, বিভিন্ন রাজবিধি অনুসারে পরিচালিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন সভ্যতার আবির্ভাব তিরোভাব দেখিয়াছে।

এইরূপ উপর্যুপরি আক্রমণে ভারতবর্ষের ধনরত্ন বিলুণ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই।

আমাদের জাতীয় ভাব (১৮৯১)

শরৎকুমারী চৌধুরানী

মাতৃস্থানীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দল এ-কালের বধূদের উপর বড়ই উষ্ম। অপরাধ: বৌ ঘরে এলেই ছেলে পর হয়, সুতরাং সে দোষ বধূর। আরও কি চাই, "যাহাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিলাম, ঝড়ে জলে বৃষ্টিতে এত কষ্ট করিয়া মানুষ করিলাম, আজ সে পর হইল! কোথাকার একটা হতভাগিনীর মেয়ে আসিয়া আমার সোনার ধনকে কি না বুক থেকে কেড়ে নিলে! ও মা, কি হবে? যাব কোথা? কি কলিকাল!"

সচরাচর ঘরে ঘরে এই কথা, এই কাব্য, এই কবিতা চলিতেছে। কোন শ্বশ্রূঠাকুরাণী হাত-মুখ নাড়িয়া অনবরত দৃষ্টান্ত দিয়া কুটুম্ব-কুটুম্বিনী, আত্মীয়-আত্মীয়ানী, বন্ধুবর্গ, যে যেখানে আছেন সকলকেই ঐ কথা বুঝাইতেছেন। কেহ অতি গম্ভীরভাবে কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন যে, কিরূপে ছেলের আর-একটি বিয়ে দেওয়া যায়, ও ছোটলোকের মেয়ে নিয়ে কি করে ঘর করি। কেহ বা অত্যন্ত টিপিয়া টিপিয়া পাড়া-প্রতিবাসিনীর সঙ্গে বধূ ও পুত্র সম্বন্ধে দু-এক কথা কহিতেছেন। কেহ বা বধূর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া ছেলের সঙ্গে একটা মাসহারার বন্দোবস্ত করিতেছেন; কেননা বধূর সংস্রবে থাকা অপমানের কথা। আর বৌ আসিয়া কি সর্বনাশ করিল, তাহা বিধিমত প্রকারে কীর্তন করিয়া গৃহস্থালীকে অরণ্যে পরিণত করিতেছেন।

সত্য বটে— যাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে কোলে করিয়া বুকে করিয়া, জলে ঝড়ে, দুর্দিনে সুদিনে সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, যে মা ভিন্ন জানিত না, আজ সে বৌয়ের খোঁজ নেয়, আজ সে প্রশ্ন করে 'মা, কি হয়েছে, গা? এত কান্নাকাটি কেন?" এত বড় আস্পর্ধা! "কাঁদে কেন? আমি কি জানি! একটা তুচ্ছ কথা হয়েছিল বটে; বড়মানুষের মেয়েকে বাপের বাড়ী থেকে নিতে এসেছিল বটে, তা আমি পাঠাই নাই, তার আবার কথা কি? এত কান্নাকাটিই বা কিসের এত নাগানাগিই বা কিসের আর এত জিজ্ঞেসবাদই বা কিসের?" আজিকার রাত্রির মত কথাবার্তায় ইতি। পরদিন শাশুড়ীর মুখ ভার, বধূ কথা কহে না, ছেলে ম্লান; সংসারে আগুন লাগিল। শাশুড়ীর কান্নাকাটি: "ছেলে বৌয়ের বশ, আমায় মানে না।" আর "এ-কালের বৌ, তাই এমন। আমরা কেমন লক্ষ্মী ছিলাম! সে-কালে এমন ছিল না!" এ-কথা অশীতিবর্ষীয়া হইতে চল্লিশবর্ষীয়া সকল শাশুড়ীর মুখেই শোনা যায়। তাঁহারাও যে এক সময় বধূ ছিলেন এবং এই নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের মনে থাকে না।

শাশুড়ী-বৌ (১৮৯১)

তাহার পর অশোক একজন লোককে সমীপে ডাকাইয়া বলিলেন, "বন্ধো, আমি ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার এই শেষ আজ্ঞাটি তোমাকে পালন করিতে হইবে। তুমি কুক্কুট-আরামে গিয়া এই আমলক-খণ্ডটি আশ্রমকে উপহার দাও। আমার নাম করিয়া আচার্যদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগকে বলিও যে, 'জম্বুদ্বীপের রাজাধিরাজের ঐশ্বর্যের এইটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে: এইটি তাঁহার শেষ দান। আপনারা দেখিবেন যেন এই ফলটি সমুদয় সঙ্ঘমধ্যে বিতরিত হয়।"

তাহার পর অশোক রাধগুপ্তকে বলিলেন, "বল, দেখি, রাধগুপ্ত: এ-দেশের এখন রাজা কে?" রাধগুপ্ত অশোকের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনি এ-দেশের রাজা।" এই কথা শুনিয়া অশোক আসন পরিত্যাগ করিয়া আকাশের চারিদিকে নেত্রক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আজ আমি ভগবতের সঙ্ঘকে আমার ধনভাণ্ডার ব্যতীত এই সসাগরা পৃথিবীও দান করিলাম। যে-পৃথিবীকে সমুদ্র মরকতমণিখচিত-পরিচ্ছদসদৃশ ভূষিত করিয়াছে, যে-পৃথিবী নানা রত্নে বিভূষিত থাকে, যে-পৃথিবী অগণ্য জীবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং যাহার বক্ষে মন্দর পর্বত দণ্ডায়মান, সেই সসাগরা নানাবেশে-অলঙ্কৃতা পৃথিবী আমি বুদ্ধসঙ্ঘকে দান করিলাম। এই কর্মের ফল যেন আমি পাই। আমি এই কর্ম করিয়াছি বলিয়া রাজ্যসুখ চাহি না, ইন্দ্রের রাজভবন প্রার্থনা করি না এবং ব্রহ্মালোকও কামনা করি না; এ-সকলই জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। আমার পূর্ণবিশ্বাসের পুরস্কারস্বরূপ কেবল এই বাঞ্ছা করি, আমি যেন আত্মসংযম করিয়া আমার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারি। পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব চিরদিন থাকে না, কিন্তু আপনার উপর প্রভুত্ব চিরস্থায়ী এবং তাহার পরিবর্তন কখন হয় না।"

পরে তিনি মন্ত্রীকে এই বিষয়ের দানপত্র লিখিতে বলিলেন এবং তাহা লিখিত হইলে তাহার উপর নিজের মোহর স্থাপন করিয়া কুক্কুট-আরামে প্রেরণ করিলেন। ইহাও কথিত আছে যে, বুদ্ধসঙ্ঘকে সসাগরা ধরা দান করিবামাত্র অশোক মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

অশোক-চরিত্র (১৮৯২)

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা বাঙ্গালীর ঘরে যেমন, এমন আর কোথাও হয় কি? বালক আর বালিকা, দুই জনের হৃদয় কেমন একটু একটু করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হঠাৎ চক্ষু মিল হইলেই দুজনেই মহালজ্জা পড়ে। দুয়ারের আড়ালে, থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া বালিকা-স্ত্রী বালক-স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকে। জানালার একটি পাখী তুলিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে স্বামীর মূর্তি নিরীক্ষণ করে। আবার পশ্চাতে স্বামীর পদশব্দ শুনিলে লজ্জিত হইয়া পলাইয়া যায়! সেইটুকু মেয়ের কোথা হইতে এত লজ্জা আসে, কেন যে এত লজ্জা, তাহা জানি না। মনে মনে দুজনে কত-কি ভাবে, তাহারাই জানে। একবার করে নিদ্রিতাবস্থায় করে করস্পর্শ হইয়াছিল, দুজনে তাহাই মনে করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আর একদিন কেশে কেশে মিশিয়াছিল, কপোলে উষ্ণ নিশ্বাস লাগিয়াছিল, কেবল তাহাই মনে পড়ে। আর একদিন নিদ্রাভঙ্গের পর চারি চক্ষে মিলন হইয়াছিল, সে-লজ্জার কথা মনে করিলেই কপোল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। সখীদিগের সঙ্গে খেলার মধ্যে সেই অনিন্দিত মুখখানি মনে পড়ে। কানের কাছে রাজ্যের লোকে দিবানিশি বলিতেছে, "তোর বরের মুখ তেমন ধারাল নয়, চোক দুটি ছোট ছোট, নাক একটু চাপা, ঠোঁট পুরু।" বালিকা ভাবিয়া দেখে, কোথাও দোষ দেখিতে পায় না: সব সুন্দর! যতই সে-মুখ আর সে-মূর্তি মানসচক্ষে দেখে, ততই সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয়; পৃথিবীর যত রূপ, সব যেন স্বামীর শরীরে! আর সে-স্বামী বই পড়িতে গিয়া কেবল সেই মুখখানি দেখিতে পায়, পাতায় পাতায় যেন সেই মুখের প্রতিমূর্তি দেখিতে পায়। শয়ন করিয়া ভাবে, সে তাহার পাশে শুইয়া আছে; ভাবে, তেমন রূপ ত্রিজগতে আর নাই। সেই রূপের ছবি ভাবিতে সে আর কোথাও রূপ দেখিতে পায় না।

কিরণের দিন দিন কত নূতন নূতন সুখদুঃখ হইতে আরম্ভ হইল; তাহা গণিয়া উঠিতে পারা যায় না। সমবয়সী মেয়েরা কেবল শ্বশুরবাড়ীর, নিজের নিজের বরের, আর কিরণের বরেব গল্প করে। যেদিন সুরেশচন্দ্র শ্বশুরলায়ে যান, সেদিন কিরণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়: সমবয়সীরা মিলিয়া তাহাকে ঝালাপালা করিয়া তোলে। আবার ভাবে, আজ রাত্রে কি বলিব, কি বলিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিব? এই ভাবিতে সেই মুখখানি, সে-মুখের কথাগুলি মনে পড়ে, আর— আর কি মনে পড়ে? আর ত কেহ নাই, তবু কিরণের এত লজ্জা কেন? কিরণ মনে করিতেছে, মনে করিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল, মনে করিতেছে: তিনি আগে কথা কহিবেন না আমার মুখ চুম্বন করিবেন? আগে কথা না আগে চুম্বন?

লীলা (১৮৯২), পঞ্চম পরিচ্ছেদ: অনেক রকম

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রিয়ে! শত অপরাধেও ত তুমি আমায় অবজ্ঞা কর নাই; বিনা দোষে আজ আমার সহিত কথার আলাপও পরিত্যাগ করিলে? সুহাসিনি! আমায় কি শঠ কপট ভাবিয়াছ? তাই চিরতরে লোকান্তরে পলাইলে, একবার মুখের সম্ভাষণও করিয়া গেলে না!... কই, কখনও মনেও ত তোমার অপ্রিয় করি নাই, তবে কেন ছাড়িয়া গেলে? আমি নামে পৃথিবীর পতি, প্রেমে ত শুধু তোমারই অধিকার।

সুন্দরি! কুসুমখচিত ভ্রমরকৃষ্ণ তোমার কুঞ্চিত কেশজাল পবনে উড়িতেছে; মূঢ় আমি! আশা হইতেছে বুঝি তুমি ফিরিয়া আসিলে! প্রিয়ে! একবার জাগিয়া উঠ; তুমি আলোকরূপিণী, হৃদয়ের এ বিষাদ-আঁধার দূর হউক! হায়, তোমার মধুর কণ্ঠস্বর থামিয়া গিয়াছে, আজ মুখও ভ্রমরগুঞ্জনহীন নিমীলিত পদ্মের মত হইয়াছে। সখি! শশী আবার রজনীর সহিত মিলিত হয়; চক্রবাক চক্রবাকীর বিরহের অবসান হয়; শুধুই তোমার আমার বিচ্ছেদে মিলন নাই। হায়! কুসুমশয়নে তোমার সুকুমার দেহে ব্যথা লাগিত, আজ সেই দেহ কঠিন চিতায় সঁপিয়া দিব।

সখি! চিরসঙ্গিনী এই মেখলা যেন শোকাতুরা। চিরতরে নীরব হইয়াছে। কোকিলা তোমার মধুর বাণী শিখিয়াছে; কলহংসী তোমার মদালস গতি শিখিয়াছে, মৃগী তোমার বিলোল কটাক্ষ শিখিয়াছে, লতা পবনকম্পনে তোমার বিভ্রম শিখিয়াছে! তুমি স্বর্গে গিয়াছ; আজ তোমার বিরহে কি শুধু ইহাদের দেখিয়া হৃদয় বাঁধিতে পারিব?

সহকার-তরু ও ফলিনীলতার পরিণয়-সম্বন্ধ করিয়াছিলে; কই তাহাদের ত বিবাহ দিয়া গেলে না? তোমার যতনের অশোকতরু কুসুমিত হইয়াছে, কই তাহাতে ত তোমার কেশভূষা হইল না? তোমার নিশ্বাসের মত সুরভি বকুল-ফুলে দুজনে মেখলা গাঁথিতেছিলাম, তাহা ত সমাপ্ত হইল না।...

তোমার বিরহে আজ সুখ অস্তমিত হইল; অনুরাগ হারাইয়া গেল, সঙ্গীত নীরব হইল, বসন্ত উৎসবহীন হইল; অলঙ্কার নিরর্থক হইল। শয্যা শূন্যময় হইল। তুমি কি আমার শুধুই স্ত্রী? তুমি সচিব, সখী, শিষ্যা। হায় কৃতান্ত! আর আমার কি রাখিলে!

কালিদাস ও সেক্সপীয়র (১৮৯২)

যোগীন্দ্রনাথ বসু

তিনি ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান, ভারতের সর্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি ব্যারিষ্টার, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ভাষাসমূহে তিনি সুপণ্ডিত, দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সুহৃদ্, গুণপক্ষপাতী এবং প্রতিভার উৎসাহদাতা, সময়কালবর্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য, তাঁহার স্বদেশীয় ভাষা এবং স্বদেশবাসিগণ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু হায়! এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের পর অতি ঘোরান্ধকারময় রজনী মধুসূদনের জীবনাকাশ আবৃত করিয়াছিল। যে-যন্ত্রণায় তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, আমরা তাহা বর্ণন করিয়াছি। অথবা বর্ণনা দ্বারা তাহার অতি সামান্য অংশমাত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। পৃথিবীর কীটপতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান আছে, কিন্তু বঙ্গের নব্যকবিশিরোমণির তাহাও ছিল না। যে-পরান্নভোজন এবং পরগৃহে অবস্থান আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ মৃত্যুতুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মধুসূদনের ভাগ্যে তাহারও অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়াছিল। আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে পরগৃহে বাস এবং পরদত্ত পিণ্ডে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল; তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকন্যাগণ কখনও উপবাসে কখনও পর্যুষিত অন্নে দিনপাত করিত; তিনি যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন বিনা পথ্যে বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিল; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া এ-সমস্তই তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। আর সর্বশেষে তিনি নিজে রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। যাঁহার রচনা পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন, মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন আর কেহ যে তাঁহার মুখে জলগণ্ডূষ দিতে নিকটে ছিলেন না, ইহার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রের সহিত যদি তাঁহার নিজের জীবনের তুলনা করা সম্ভব হয়, তবে তাহা মেঘনাদবধের রাবণের সহিত হইতে পারে। উভয়ের সর্বনাশের কারণও এক। যে-আত্মসংযমের অভাব সমস্ত সত্ত্বেও রাবণকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, তাহা মধুসূদনের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই বুঝি তিনি মেঘনাদবধকাব্যে রাবণ এবং তাঁহার পরিজনবর্গের সম্বন্ধে সেরূপ পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (১৮৯৩), উপসংহার

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

মধ্যাহ্নে স্নানাহারান্তে পুরন্দর ধীরে ধীরে তালপুকুরের দিকে চলিল। সে-পথ তাহার চিরপরিচিত— দৈনিক ক্রীড়ার রঙ্গভূমি, কত মধুময় বাল্যস্মৃতি হায় তাহার সঙ্গে জড়িত! সে-সব ছাড়িয়া কোন্ অপরিচিত দূর দেশে যাইতে হইবে ভাবিয়া পুরনের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি তাহার সেই ধীরমন্দ গতি দেখিয়া বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। অদূরে শাবক লইয়া তৃণক্ষেত্রে শুকদম্পতি আহারান্বেষণে রত— অন্য সময়ে সেই শাবক-হরণের চেষ্টায় পুরন্দরের কত আনন্দ; কিন্তু এখন সে-প্রবৃত্তি ছিল না। বরং আজ এই প্রথম জীবনে তাহার অনুশোচনা হইল, কেন মিছা খেলার অনুরোধে এতদিন নিরীহ পক্ষীশাবকদের পিতামাতার স্নেহনীড় হইতে কাড়িয়া লইয়াছি! মনে হইল, একদিন ফুল কালীকে দিয়া নিষেধ করিয়াছিল, "কাকের ছানা মেরো না!" অমনি বালিকা-স্ত্রীর সরল সুন্দর মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া গেল; পিতার দুর্ব্যবহারে সে কি ভাবিতেছে ভাবিয়া পুরন্দরের হৃদয়ে মহা যাতনা উপস্থিত হইল। সংসার তাহার যন্ত্রণামাত্রাত্মক মনে হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পুরন্দর তালপুকুরের বটতলায় গিয়া পৌঁছিল। তাহার ঘন ছায়ার নীচে সুশীতল শান্তি বিরাজ করিতেছিল— দূর অদূরে সর্বত্র মৃগতৃষ্ণিকার ছলনা। পুকুরের কালো জলে দীর্ঘ তালগাছের দীর্ঘতর ছায়া-সকল হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছিল; ক্বচিৎ ঘুঘুর সকরুণ গান, কখনও বা চিলের তীক্ষ্ণধ্বনি সেই বিজন মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

অন্য সময়ে এই প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটিয়া পুরন্দর কখন ক্লান্তি বোধ করিত না, কিন্তু আজ ধীরে ধীরে আসিয়াও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, স্বেদে সর্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। বটতলায় আসিয়া মৃদু শীতল বায়ুস্পর্শে তাহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। পুরন ভাবিল, পাঠশালার সময়টা এখানেই কাটাইবে।

ফুলজানি (১৮৯৪), চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

বিদ্যাপতি বঙ্গীয় কবিতাকুসুমের আদি মধুকর। তাঁহার মধুর গুঞ্জনে হৃদয় কমল প্রীতিপবন-ভরে নৃত্য করিতে থাকে। তাঁহার রসভাবযুক্ত বর্ণনামালা শ্রবণে মধুধারা বর্ষণ করে, মন বিমোহিত করে। তাঁহার কবিত্ব কেবল যে মধুমাখা কথার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া শ্রবণ রঞ্জন করে, তাহা নহে; গভীর ভাবতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে হৃয়বেলায় উপর্য্যুপরি আঘাত করে। সে আঘাত তীব্র নহে, নিতান্ত সুখস্পর্শ, অতীব কোমল। তাহাতে হৃদয় আর্দ্র হয়, মনে অনির্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়, অন্তরাত্মা প্রেমরসসিক্ত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। যদিও জয়দেব এইরূপ রচনার অধিনায়ক, তথাপি তাঁহার প্রদর্শিত পথে পশ্চাদ্বর্তী হইয়া কেহই বিদ্যাপতির সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

প্রেমের পবিত্র আকার কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াও, মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতার উত্তেজক দু-একটী শব্দ বিন্যাসে বিদ্যাপতির কবিতা কলুষিত হইয়াছে— যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা দূরদর্শী বলিতে পারি না। দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে লোকের রুচিভেদ হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ভক্তের মতে বৈষ্ণবধর্মের অঙ্গ। যাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা বা মাতার ন্যায় ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি-বিশিষ্ট থাকে, তাঁহাদিগের ভক্তি বৈষ্ণবধর্মের অনুমোদিত ভক্তি নহে। পুংযোগাসংসু কুলটা যেরূপ আগ্রহের সহিত উপপতিকে ভালবাসে, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যাঁহাদিগের সেইরূপ আন্তরিক আগ্রহ, তাঁহারাই বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার চক্ষে সেই প্রেম কলুষিত বোধ হইতে পারে; বৈষ্ণব ভক্তের পক্ষে উহাই পরম পবিত্র। সুতরাং যাহা আধুনিকের নিকট দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বিদ্যাপতির ধর্মভাব তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করিতে দেয় না...। এ-বিষয়ে যদি কিছু দোষ থাকে, সে-দোষ বিদ্যাপতির নহে, বৈষ্ণবধর্মের। এই ধর্মপ্রভাবেই তড়িতলতা অবলম্বনে অবতীর্ণ, নিষ্কলঙ্ক শশধর-বিনিন্দিত রমণীবদন কিছুক্ষণ দেখিয়া বিদ্যাপতির আশা পূর্ণ হয় নাই, 'মদনজ্বালা' বাড়িয়াছিল। সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বে মগ্ন হইয়াও এই ধর্মপ্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। নতুবা, বিদ্যাপতির ন্যায় গুণগ্রাহী, সুরসিক ও সুপণ্ডিত ইদানীন্তন জনগণের রুচিসঙ্গত রচনায় অক্ষম ছিলেন, কে বলিতে পারে? পরন্তু যদি কেহ সুলোমানের প্রেমসঙ্গীতে আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে পান, তাঁহার নিকট বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অশ্লীলতামধ্যেও সেইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের অসদ্ভাব হইবে না।

বিদ্যাপতি (১৮৯৪), উপক্রমণিকা

উৎসাহ, উদ্যম, অনুরাগ, নিষ্ঠা, দান, সদাব্রত, বৈরাগ্য ও বদান্যতা প্রভৃতি মেলার হাওয়ার সহিত এমনই মিশাইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিক্ষণে মনে হইত যেন কোন নূতন জগতে আসিয়াছি। আমাদের মতন লোকের মনও সংসার ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যাইত। এই মেলা এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং এরূপ অপূর্ব ব্যাপার যে, চিন্তা করিলে স্বপ্নকল্পিত রাজ্য বলিয়া মনে হয়। অযুত অযুত সাধুসন্ন্যাসী, কেহ কুটীরে, কেহ বস্ত্রাবাসে, কেহ ছত্রাচ্ছাদনে, কেহ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত বসিয়া আছেন। কেহ গৈরিকধারী, কেহ কৌপিন-বহির্বাসধারী, কেহ বা শুদ্ধ কৌপিনধারী। কাহারও গাত্রে যৎকিঞ্চিৎ আচ্ছাদন আছে, কেহ বা শুদ্ধ বিভূতিভূষিত দীর্ঘজটাধারী। হিন্দুর মনে যত প্রকার সাধু-পরিচ্ছদের কল্পনা আছে, সে-সমস্তই একত্র সম্মিলিত। এই সাধুদলে মহা মহা পণ্ডিত আছেন, মহাধ্যানী, মহাকর্মী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা আছেন।

একদিকে যেমন মেলার বাহ্য দৃশ্য অতি অদ্ভুত, অন্যদিকে ইহার আভ্যন্তরদৃশ্যও অতিশয় গভীর। অযুত অযুত গৃহস্থ নরনারী ভক্তিভাবে সাধুদিগকে প্রণাম করিতেছে; জানি না কিসের জন্য প্রণাম করিয়া বদন তুলিতে কত শত সরলপ্রাণ নরনারীর গণ্ডদেশ নয়নধারায় ভাসিয়া যাইতেছে। কত কত ধনী ব্যক্তি রাশীকৃত উপহার সামগ্রী লইয়া পাছে বা উপেক্ষিত হয়, এই ভয়ে সসঙ্কোচে সাধুদের নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দানের কি-আশ্চর্য প্রণালী! দান গৃহীত হইলে দাতা যেন কৃতার্থ হন!...

এই প্রকাণ্ড সাধু-নিবাসে হাট নাই, বাজার নাই, ক্রয় নাই, বিক্রয় নাই, কোন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কিছুই নাই। অন্যান্য মেলায় আট আনা লোক হইলে ষোল আনা গোল হয়, কিন্তু এ-মেলায় পৌনে ষোল আনা লোকই কথা বলে না। হাজার হাজার সাধু বসিয়া আছেন, ইঁহারা সকলেই অল্পভাষী। সাধুদর্শন করিতে দলে দলে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের মুখেও প্রায়ই কথা নাই, হয়ত দলের মধ্যে কোন একজন কোন সাধুকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অতি-সংক্ষেপ-প্রত্যুত্তর পাইয়া সকলে প্রণাম করিয়া অন্য সাধু-দর্শনে চলিলেন। বস্তুতঃ এত লোকের স্বাধীন সমাগমেও যে এরূপ নিস্তব্ধতা রক্ষিত হইতে পারে, ইহা পূর্বে কখন কল্পনাও করিতে পারি নাই। মেলার শৃঙ্খলা দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

প্রয়াগ-ধামে কুম্ভমেলা (১৮৯৪), আরম্ভ

শ্রীমতী আবার বলিতেছেন, "সখি! সুখের নবদ্বীপের এরূপ দশা কেন? চতুর্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে!..." তখন সখিগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা আর গোপন রাখিলেন না, বলিলেন, "নগরে এরূপ কথা হইতেছে যে, সোনার ঠাকুর নাকি নবদ্বীপ ছাড়িবেন!" এই কথা শুনিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আর পিত্রালয়ে রহিলেন না, তদ্দণ্ডে আপন গৃহে আসিলেন। সেই সময় কিছুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন; আর সন্ন্যাসের রজনীতে সেই রসের বন্যা উঠাইলেন।

তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় কিরূপে পতিকে হারাইলেন, আর কোল শূন্য দেখিয়া "পালঙ্কে বুলাই হাত" ইত্যাদি লীলা পাঠকের স্মরণ আছে। এখন পতি হারাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া শূন্য নবদ্বীপের মাঝে তাঁহার শূন্য গৃহে বসিয়া আছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কখন শোকে, কখন ভক্তিতে, কখন ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি প্রাচীনা বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার শাশুড়ীকে পালন করিতে হইবে। আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন, ও কখন-বা নিরাশ হইয়া সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় মন উঘাড়িয়া রোদন করিতেছেন...

শ্রীমতী ভাবিতেছেন, "আমার প্রভু বড় নিষ্ঠুর!" আবার ভাবিতেছেন, "সে কি! আমার দুঃখ, তাঁর দুঃখ না? আমি ত ঘরে আছি, তিনি যে বৃক্ষতলে!" তখন সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাই! সন্ন্যাসীর কি কি নিয়ম তোরা কিছু জানিস? আচ্ছা, সন্ন্যাসীর যে স্ত্রী, তাহার নিয়ম তোরা বলিতে পারিস? আমি তাহার সমুদয় পালন করিব। প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আমাকে জব্দ করিবেন? আমিও শয্যায় শুইব না! তিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত দুটি অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তা-ই করিব!..."

শ্রীমতী কখন ভাবিতেছেন, তাঁহার শাশুড়ীকে সেবা করিতে হইবে। শাশুড়ী যাহাতে উতলা না হয়েন, এইরূপ ধৈর্য করিয়া তাঁহার চলিতে হইবে। কখন বলিতেছেন, "সখি! আমার হাতে তিনি জননীকে রাখিয়া গিয়াছেন; আর তাঁহার আপনার স্থানে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার সেই ভার কুলাইতে হইবে।"

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত, তৃতীয় খণ্ড (১৮৯৪), প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

দুয়োরাণীর শীঘ্র ছেলে হবে, এই কথা যেমন রাজার কানে গেল আর অমনি রাজার হুকুমে সমস্ত দেবালয়ে শাঁখঘণ্টাকাঁসর বেজে উঠল। রাজপুরীময় আমোদ-আহ্লাদ ধুমধাম হতে লাগল। রাজার হুকুমে কারাগারের দুয়োর খুলে দিলে কত-বছরকার কত শত বন্দী রাজরাণীর জয়জয়কার করতে করতে বেরিয়ে গেল। রাজদ্বারে কত শত কানা খোঁড়া বুড়ো অশক্ত লোক দান পেলে! গরিবদুঃখীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাজার ফুলবাগানে পরমান্ন খাওয়ানো হল।... এত সব হাসিখুশির মাঝখানে কেবল সুয়োরাণী হিংসেয় জ্বলেপুড়ে ছটফট করতে লাগলেন, তাঁর দুই দাসী আর আচার্যিবামনকে নিয়ে ঘরে খিল দিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। পরামর্শ করা হয়ে গেলে তখন সুয়োরাণী একটু স্থির হলেন; রাজার কাছে গিয়ে খুব আহ্লাদ দেখাতে লাগলেন, দুয়োরাণীর কাছে ঘন ঘন গিয়ে খোসামোদ করতে লাগলেন। এক ডাইনিবুড়িকে ডাকিয়ে থলে-ভরা টাকা বুড়ির হাতে দিয়ে তার সঙ্গে সব কথাবার্তা ঠিকঠাক করে রাখলেন। যখন প্রথম ছেলে হবার সময় হল, তখন দুয়োরাণীকে আদর করে করে বললেন, "দিদি, এখন তোমার চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে দিই, নাহলে তোমার বড় কষ্ট হবে।" দুয়োরাণীর সরল মন, সুয়োরাণীর কথায় বিশ্বাস করে বড় কাতর হয়ে বললেন, "দিদি, আমার তো মা বোন কেউ কাছে নেই; তুমি আমার মা বোন সবই, যা ভালো বোঝ তা-ই করো।" সুয়োরাণী দুয়োরাণীর চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে দিলেন, আর যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হল, অমনি তাকে খুব করে কাপড়ে-চোপড়ে পুঁটুলি পাকিয়ে ডাইনিবুড়ির হাতে দিলেন; বুড়ির কানে কানে বলে দিলেন, "দৌড়ে একেবারে শহরের বাইরে সেই গো-ভাগাড়ে যা, সেইখেনে দশহাত গর্ত খুঁড়ে এটাকে পুঁতে ফেল্ গে...।" ডাইনিবুড়ি চলে গেলে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর চোখবাঁধা খুলে দিলেন, আর একটা কাঠের পুতুল দেখিয়ে বললেন, "দিদি, তোমার এই কাঠের পুতুলটি হয়েছে; রাজাকে খবর পাঠিয়েছি, তিনি এখনই দেখতে আসবেন।"

সাত ভাই চম্পা, তৃতীয় দৃশ্য

কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। স্নেহলতা তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে বাতায়ন-সন্নিধানে একাকী একখানি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে চন্দ্রকিরণ আসিয়া তাঁহার কুসুমসদৃশ বদনমণ্ডলে চুম্বন করিতেছে। মৃদু সান্ধ্য সমীরণ নিম্নস্থ জাহ্নবী-সলিল স্পর্শ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। মাঝিরা উচ্চ কণ্ঠে সারি গাহিতে গাহিতে সুন্দর সুন্দর তরণীগুলি ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বাহিয়া চলিয়াছে। নিম্নস্থ রাজপথ দিয়া কত লোক আসিতেছে যাইতেছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে। সকলেই যেন কোন এক গুপ্ত উদ্দেশ্যে জগৎময় পরিচালিত হইতেছে। বুঝে না, জানে না, তবু জগতের কাজ করিয়া সুখী হইতেছে। স্নেহলতা একাগ্রমনে পৃথিবীর এই সকল অভিনব ভাব দেখিতেছেন, এমন সময়ে একটী যুবা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্নেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। যুবা দেখিলেন, স্নেহ ম্লানবদনে কি যেন ভাবিতেছেন। স্নেহের সেই সুকুমার বদনখানি মলিন ও চিন্তাযুক্ত বোধ হইতেছে। যুবা ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "স্নেহ!"

স্নেহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন— অমৃতলাল। তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্তের জন্য কি যেন একটু অব্যক্ত সুখের বিদ্যুৎ খেলিল, মুহূর্তের জন্য আনন্দরাশি হৃদয়খানি অধিকার করিল। মুহূর্তের মধ্যে বড় বড় চক্ষু-দুটীর সহিত সুন্দর বদনখানি, লজ্জাবতী লতার ন্যায়, অবনত হইয়া পড়িল।

অমৃতলাল কহিলেন, "স্নেহ, আজ আমি বাড়ি যাইব, তাই তোমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

কথার প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনর্বার কহিলেন "স্নেহ, আমি তবে যাই।"

স্নেহ এবারেও কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের পূর্বসুখরাশি অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎপরিবর্তে তাঁহার কোমল হৃদয়ে যেন কোন এক অসহ্য মর্মভেদী যাতনা অনুভব করিতেছে।

অমৃতলাল এবার ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "স্নেহ, বিদায় দেও।"

স্নেহ এবার ধীরে ধীরে অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পুনরায় অবনতমুখী হইয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে লাগিলেন।

স্নেহলতা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিদায়

বছর ফেলে নি— গরীব বাপের সেই নোনা-ধরা একতলাতে আরও নোনা ধরেছে, কোন ঘরের কড়ি ঝুলেছে, কোন ঘরের দরজা ভেঙ্গে চুরে ঝুঁকে পড়েছে; উঠানে ঘাস, গলিপথে মাকড়সার জাল গজিয়েছে, তার উপর বেচারীর চাকরি গেছে, আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হয়েছে; উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, জীবনের উল্লাস একে একে ছুটে পালিয়ে গেছে। সে গরীব বাপ আর নাই, গরীব বাপ ভিখারি হয়েছে। একখানা মাংসশিরাহীন কঙ্কাল, যেন একটু জোর বাতাসে ভেঙ্গে চুরে পড়ে যাবে বলে আলতো আলতো দাঁড়িয়ে আছে। সে বাপের জ্বালা বাপই জানে। মায়ার মা-তে আর পদার্থ নাই, সোনার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে অভাগিনী এখন শয্যাশায়িনী হয়ে আছে। জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে এখন ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে, একটু জোরে ফুঁ দিলেই হয় ত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যাবে— অভাগিনীর চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

"মেয়ে আসবে, মেয়ে আসবে" করে দিন গেল। সপ্তাহ গেছে, পক্ষ গেছে। মাস গেছে, বৎসর যায়! কৈ, মেয়ে ত এল না! হয়ত আর আসবে না। হয়ত তারা আর পাঠাবে না। অভাগিনী মা-র প্রাণে আর সয় না যে। আর দেখতে পাবে না— এ-ভাবনার ধারণা কিছুতেই সইছে না; বুক ভেঙ্গে গেছে। সেই ভাঙ্গা পিঁজরের ভিতরে প্রাণ-পাখি আর থাকতে চাচ্ছে না! মায়ায় পীড়িত ভিখারি বাপ কোটর-লগ্ন চক্ষে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছে, পাখি কখন্ পলায়! রুগ্ণা বৈদ্যের ঔষধ নেয় না, পথ্য পায় না, পেলেও খায় না। আগে পাঁজর-ভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলত, এখন আর ফেলে না; ফেলতে ভাঙ্গা বুকে বড় লাগে! আগে হাপুস নয়নে কাঁদত, এখন আর কাঁদে না, কাঁদতে আর পারে না গো! শীর্ণমুখে পাগলিনীর হাসি হাসে, আর অতি ক্ষীণ স্বরে রুগ্ণা সোয়ামীর হাত ধ'রে মাঝে মাঝে বলে, "ওগো! আমার সোনার প্রতিমে যে ভেসে যায়! তোমার পাড়ে পড়ি, এনে তারে স্থাপিত কর— দেখে মরি, ম'রে বাঁচি!" দুখিনী প্রলাপ বকে, ছেঁড়া কাঁথার উপর থেকে থেকে উঠে বসে, আর ঘুরে পড়ে, ভিরমী যায়। মায়ার দুর্বল বাপ, ম'রে ম'রে তার শুশ্রূষা করতে এগোয়, পারে না, জলের গ্লাস কম্পিত হাত থেকে পড়ে যায়...

যতদিন পায়ে বল ছিল, ভিখারি বাপ ততদিন রোজ একবার, দুবার কোনদিন বা তিনবার ক'রে বেইয়ের পায়ে ধ'রে কাঁদতে যেত। কঠোর বেই, হেসে উড়িয়ে দিত, শ্লেষের শূল বিঁধে রক্তপাত করত।

মায়া

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড়-পর্বত; আর ছিল— ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির— আয়নার মত; তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখীর ছায়— সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটীরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল, তাতে অনেক জীব-জন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখী, কত টিয়াপাখীর ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বৎসরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন; তাঁদের পাতার কুটীর ছিল, পরণে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল; আর ছিল বাকল-পরা কতকগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত। আর কি করত? বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধ'লো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল; তাতে গাইবাছুর চরে বেড়াত। বনে ছায়া ছিল; তাতে রাখা-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়াবার বালি ছিল; ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশী ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল— খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল — মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধকথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল আঁধার ঘরের মাণিক, ছোট মেয়ে, শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি— দুধের বাছা— শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখীরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

শকুন্তলা (১৮৯৫)

চণ্ডীচরণ সেন

ভারতবর্ষ আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে আলোকিত। জনসাধারণের কুসংস্কার, অজ্ঞানতা এবং অমূলক ধর্মবিশ্বাস দিন-দিন বিলোপ হইতেছে। যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে কেহ কাহারও প্রচারিত মত ও ধর্ম গ্রহণ করেন না। অভ্রান্ত-গুরু, অভ্রান্ত-শাস্ত্র দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। জনবিশেষের ধর্মনির্বাচন-স্বাধীনতা, জনবিশেষের স্বাধীনমতের অধিকার ধীরে ধীরে সর্বস্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ বিজ্ঞানচর্চা, এইরূপ স্বাধীন অনুসন্ধানের মধ্যে কে বিশ্বাস করিবে যে, মনুষ্যের অগম্য চিরতুষারাবৃত হিমালয়-পর্বতের স্থানে স্থানে অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ এবং যোগিগণ বাস করিতেছেন? কিন্তু এই বিশাল বিশ্বসংসারে শত শত অলৌকিক ঘটনা, অলৌকিক দৃশ্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়া সর্বদাই আমাদের চিন্তা এবং বুদ্ধির গর্বকে খর্ব করিতেছে। এ-সংসারে আমাদের অন্ধাবস্থায় জন্ম, অন্ধাবস্থায় মৃত্যু। চিরান্ধ হইয়া আমরা সংসারে বিচরণ করিতেছি। সুতরাং জনপ্রবাদ-প্রসূত কোন অলৌকিক ঘটনা এই উপন্যাসে উল্লিখিত হইলে পাঠক ও পাঠিকাগণ তাহা একবারে কল্পনাসম্ভূত বলিয়া মনে করিবেন না। সকল প্রকার প্রবাদের মধ্যেই কিঞ্চিৎ সত্যের কণিকা থাকিতে পারে।

সেই চিরতুষারাবৃত হিমাচল-শৃঙ্গের স্থানে স্থানে প্রকৃতি-বিনির্মিত সুরম্য মনোহর মহাত্মা-নিকেতন সকল বিরাজিত রহিয়াছে। এই সকল পবিত্র আবাসে মহাত্মাগণ, যোগাসনে, নিমীলিত নেত্রে সর্বদা সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকে। মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যোগবলে জড়দেহ-বিবর্জিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে জগতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। জগতের শান্তি-সংস্থাপন, জগতের দুঃখ-নিবারণ, জগতের ধর্মোন্নতি ইহাদিগের একমাত্র তপস্যা ও চেষ্টা। কিন্তু জড়জগতে তাঁহারা কার্য করেন না। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে বারিপ্রদান, দরিদ্রকে ধনবিতরণ করিতে তাঁহারা ব্যস্ত নহেন। এই মহাত্মাগণ আধ্যাত্মিক জগতে কার্য করিয়া সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করেন।

এই কি রাম অযোধ্যা (১৮৯৫), প্রথম অধ্যায়: মহাত্মা-নিকেতন

অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের একরকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্রদণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া বালকেরা অবসর-সময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; কখনও-বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে একজনের স্থানে দুই-তিনজন চাপিয়া বসিত; কখনও বা বর্ষার জলে, নদ, নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত; সময়ে-অসময়ে গৃহস্থের গরু-বাছুর চরাইয়া, হাট-বাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস-পাশা খেলিয়া, দাবা-ব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি-তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্ন-বিন্যস্ত লম্বা কোঁচা দোলাইয়া, অনাবৃত দেহসৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্য কাঁধের উপর রঙ্গিন গামছা ছড়াইয়া দিয়া, বাবলী-চুলে চিরুনী গুঁজিয়া, শুক-সারী অথব নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুলবুল হাতে লইয়া, তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরৌষ্ঠে মৃদুমন্দ শিস্ দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম সারিয়া পর্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত স্নিগ্ধতনু দিবা-নিদ্রায় সমাহিত করিয়া, সায়াহ্নে তামাকু-সেবনের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে, নদীসৈকতে অথবা বৃক্ষতলে মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যার পর হরিসঙ্কীর্তনে অথবা পুরাণশ্রবণে ভক্তি-গদ্‌গদ্-হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী অর্ধাঙ্গিনী, তাঁহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে-অসময়ে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া সন্ধ্যার শীতল বাতাসে পুকুর-ঘাট আলো করিয়া বসিতেন; কত কথা, কত রঙ্গরস— তাহার সঙ্গে প্রৌঢ়ার সগর্ব হস্তসঞ্চালন, নবীনার অবগুণ্ঠন-জড়িত অস্ফুট সখী-সম্ভাষণ এবং স্থবিরার স্খলদ্‌বচনে শিবমহিম্নঃস্তোত্রের বিকৃত আবৃত্তি সান্ধ্য সম্মিলনকে কতই মধুময় করিয়া তুলিত।

সিরাজদ্দৌলা, প্রথম পরিচ্ছেদ: সেকালের সুখ দুঃখ (১৮৯৫)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্রকে সেদিন যে-কোনো উপায়ে হউক বাটী পৌঁছিতেই হইবে। সেইদিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ি না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণকলেবর দামোদর-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার ঢল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পড়িলে শত খণ্ড হইয়া যায়। পূর্ণকলেবর দামোদর প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পরপারে; নৌকা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলে সেদিন আর গৃহে যাওয়া হয় না। কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র; তাহারও নিশ্চয়তা নাই। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন, পাঠক শুনিতে চাও? ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; উপন্যাসের কবিকল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব, কিন্তু সত্য সত্যই যে মানুষ এরূপ করিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না; বিদ্যাসাগর মহাশয় আবদারে মায়ের আদেশ-পালনের জন্য বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়া ছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল। কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোনো বাধাই মানিলেন না; সবলদেহে বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গসংগ্রামে জয়ী হইয়া পরপারে উঠিলেন। যাহারা তাঁহার আয়োজন দেখিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া মনে করিতেছিল, তাঁহারা শমন-সদন সন্নিকটে ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল, তাহারা তাঁহারা সাহস ও শক্তিসামর্থ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল ও শত প্রকারে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।... পথে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। যেখানে সন্ধ্যা হইল, সেখানে আবার দস্যু ভয়। সুবিধামতো কোনো পথিককে একাকী পাইলে প্রায় গৃহে ফিরিতে দেয় না। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার ইষ্টদেবতা মাতৃপদ স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরার্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে পৌঁছিলেন। সেই সিক্ত বস্ত্রে ও ক্লান্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া "মা, মা, আমি আসিয়াছি" বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), পঞ্চম অধ্যায়: কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর

বিহারীলাল সরকার

এইবার সেই বিরাট ব্যাপার। যাহাতে হিন্দুসমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর অখ্যাতি, এবং অহিন্দু ও অহিন্দু-ভাবাপন্ন সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি, সুতরাং যাহার জন্য তাঁহার নাম বিশ্বব্যাপী, এবার সেই বিধবা-বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল। এ-সম্বন্ধে এ-ক্ষেত্রে সবিস্তর সমালোচনার স্থান হইবে না; তবে এইখানে এই পর্যন্ত বলাই পর্যাপ্ত যে, তিনি এতদর্থ যেরূপ অটুট অধ্যবসায় সহকারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়ছিলেন, তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হন নাই। এ-অহিন্দু আচার হিন্দুসমাজে যে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই, ইহা হিন্দুসমাজের সম্যক সৌভাগ্যেরই পরিচয় বলিতে হইবে। কারুণ্যপ্রাবল্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মসংযমে সক্ষম হন নাই। তাই তিনি ভ্রান্তবিশ্বাসের বশে এই অকীর্তিকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়ছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহার্থ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেকে তাঁহাতে শাস্ত্রানুরাগিতা আরোপিত করেন, কিন্তু অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না। শেষোক্তের মতে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে তিনি স্বেচ্ছামতে ও সজ্ঞানে অকার্য করিবার লোক নহেন। ভ্রান্তবিশ্বাসই মূলধারা। সারল্য ও কারুণ্যের পরিচয় পদে পদে।

বাল্য-বিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ব্যথিত হইতেন, তাই তিনি বাল্যকাল হইতেই বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন।... বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী বাল্যসহচরী ছিল। এই সহচরী তাঁহারই কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটী বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্বদাই থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটী বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটীতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল। ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই; সেদিন তাহার একাদশী, বিধবাকে খাইতে নাই। এ-কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, "বিধবার এ-দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয় একটা করিব।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩/১৪ বৎসর মাত্র হইবে।

বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), ষোড়শ অধ্যায়: বিধবা-বিবাহ

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "হরিদাস, এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; নামসংখ্যা হ্রাস কর না কেন?..." হরিদাস বিনয়ে অবনত হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমার এক নিবেদন আছে: হীন জাতিতে আমার জন্ম, অস্পৃশ্য অধম পামর হইলেও তুমি আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছ এবং মহা রৌরব হইতে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছি। তুমি আমাকে বহু কৃপা করিয়া অনেক নাচাইয়াছ। ম্লেচ্ছ হইয়াও তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণের 'শ্রাদ্ধপাত্র' খাইয়াছি। কিন্তু প্রভু, বহুদিন হইতে আমার এক বাঞ্ছা আছে: আমার বোধ হইতেছে, তুমি অবিলম্বে লীলাসংবরণ করিলে, তাহা যেন আমাকে দেখিতে না হয়! তাহার পূর্বেই যেন আমার এই পাপদেহ পরিত্যাগ করিতে পারি! হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণকমল ধ্যান করিয়া , নয়নে তোমার শ্রীচন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে এবং জিহ্বায় তোমার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই যেন আমার মৃত্যু হয়!'

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তোমার এই প্রার্থনা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তোমাকে লইয়াই আমার যে কিছু সুখ-সম্ভোগ; তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে ইহা তোমার কর্তব্য নয়!"

এই কথা শুনিয়া হরিদাস তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আমার মায়া বাড়াইও না! এই অধম পাতকীকে এই দয়া করিতেই হইবে! আমার মস্তকের মণিস্বরূপ কত শত ভক্ত মহাশয় তোমার লীলার সহায় রহিয়াছেন, আমার ন্যায় সামান্য একটা কীট না থাকিলে কি ক্ষতি? একটি পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর কি হানি হয়? প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্তাভাস হইলেও অবশ্য আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবে। আজ মধ্যাহ্ন করিতে গমন কর; কাল যেন তোমার দর্শন পাই।"

শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রতীর গমন করিলেন। পরদিন ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী; প্রাতঃকালে জগন্নাথ-দর্শনান্তে ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে মহাপ্রভু হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস, প্রভু ও বৈষ্ণবগণের চরণবন্দনা করিলেন। অনন্তর গৌরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, সমাচার কি?"

হরিদাস উত্তর দিলেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা।"

শ্রীহরিদাস ঠাকুর (১৮৯৫), পঞ্চদশ অধ্যায়: দেহ-সংরক্ষণ

মোজাম্মেল হক

পুত্রের সুবিমল শশধর-সন্নিভ কমনীয় কান্তিচ্ছটায় অন্তঃপুর প্রতিভাসিত— তদ্দর্শনে পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তানের শুভ কামনায় একান্তচিত্তে সর্ব-আনন্দদাতা বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় অবস্থানুযায়ী অর্থাদি-বিতরণে দীন-দুঃখীদের মন-স্তুতি সম্পাদন করিলেন। তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া শিশুকে হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ পূর্বক প্রস্থান করিল। গৃহ উল্লাসময়, আনন্দভরা। যেন স্বয়ং মূর্তিমান আনন্দ আগমনপূর্বক চতুর্দিক বিচরণ করিতে লাগিল। আজ যেন প্রচণ্ডতাপ দিনমণির কররাশি অধিকতর শুভ্র, অধিকতর উজ্জ্বল, অথচ শৈত্যগুণবিশিষ্ট। আবার সুশীতল মলয়-মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহে ঢলাঢলি করতঃ স্ফূর্তিপ্রচারে তৎপর হইল। পুরবাসিগণ এই শুভদিনে আনন্দে উৎফুল্লপ্রাণ। প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবেরাও সে-উৎসবে যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। হাস্যকোলাহলে গৃহভূমি শব্দায়মান হইয়া উঠিল।

বিধাতার কৃপায় এবং জনসাধারণের আন্তরিক আশীর্বাদে এই ক্ষণজন্মা শিশু দিন দিন বর্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার অঙ্গপুষ্টি ও অপরূপ রূপলাবণ্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল, পিতামাতা পরমযত্নে লালনপালন করিতে রহিলেন। আহা এ-জগতে ভবিতব্যতার কথা কে জানিতে পারে? যিনি ঐশীশক্তিপ্রভাবে অলৌকিক কার্য দেখাইয়া জগৎকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন, যে-দৃঢ়ব্রত সত্যপ্রিয় মহাপুরুষ ধ্যানসমাধিতে নিমগ্ন থাকিয়া ধর্মোন্মত্ততার চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়া অকাতরে স্বীয় জীবন বিসর্জন পূর্বক পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, যিনি তপস্বীকুলের মহাতেজস্বী সিংহস্বরূপ ছিলেন, যাঁহারা অপার্থিব বৈচিত্র্যময় জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়মন বিস্ময়াপ্লুত ও কি-এক অভূতপূর্ব ভাবে বিভোর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই পুণ্য সূতিকাক্ষেত্রে এই শিশুরূপে আজ তিনি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যবান পিতা অনন্তর যথাসময়ে শুভদিন দৃষ্টে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি সমারোহের সহিত তাঁহাদিগকে পানভোজনে প্রীতি করিলেন এবং শাস্ত্রসঙ্গত বিধানানুসারে শিশুকে হোসেন মনসুর নামে আখ্যাত করিলেন।

মহর্ষি মনসুর (১৮৯৬), প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবোধচন্দ্র সরকার

বৈশাখ মাস। বেলা শেষ হইয়াছে। সূর্য ক্ষণমাত্র অস্ত গিয়াছেন। তাঁহার রূপ-রাগে পশ্চিম গগন এখনও রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। রৌদ্রের তাপ নাই, নিশার আঁধার নাই। উর্ধ্বে নীলবিমল আকাশ, নিম্নে শ্যামল প্রান্তর। বৃক্ষে বৃক্ষে নবীন পল্লব, নবীন কুসুম। নবীন কুসুমে নবীন ভ্রমর। নিদাঘ-প্রারম্ভে বঙ্গে গোধুলি কি-লীলাময়ী, কি-মনোহারিণী! বিবিধ বিহগকুল— কেহ উড়িতেছে, কেহ বসিতেছে, কেহ মধুর স্বরে সান্ধ্য সঙ্গীত গাইতে গাইতে কোথায় যাইতেছে। বঙ্গোপসাগরোত্থিত শীতল বিমল সমীর গাছের পাতা কাঁপাইয়া কুসুমকুলের সৌরভ লুটিয়া বিজন প্রান্তরে তরঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া ধাবিত হইতেছে। এমন সময়ে কয়েকজন বাহক একখান পাল্কী স্কন্ধে লইয়া বিষ্ণুপুর হইতে মেদিনীপুরের পথে যাইতেছিল...

পাল্কী-মধ্যে একটি সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী আরোহণ করিয়াছেন। বাহকগণ ব্যতীত পাল্কীর পশ্চাৎ একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এবং একজন সবলাকায় প্রবীণ পুরুষ যাইতেছিলেন।... পথিকগণ বনভূমি অতিক্রম করিয়া নিশাগমের পূর্বে কোনও পান্থশালায় পঁহুছিবার মানসে ঘর্মাক্ত কলেবর দ্রুতপদে যাইতেছিল। শ্যামলবসনা শাল্মলী-কুসুম-কিরীটিনী বনভূমির মধুর গম্ভীর মূর্তি, বন-বিহগকুলের গগনব্যাপী সঙ্গীতলহরী, পরিমলবাহী শীতল সমীরের তরঙ্গলীলা পথিকগণ কিছুই দেখিল না, কিছুই শুনিল না, কিছুই উপলব্ধি করিল না। তাহারা একমনে একতানে প্রাণের ভয়ে গন্তব্যপথে ধাবিত হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে নিশার নিবিড় তিমির-ছায়ায় বনভূমির নীলকান্তি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। উর্ধ্বে তমোময় অনন্ত আকাশ-নিম্নে তিমিরবসনা বিশাল বনভূমি পরস্পর আলিঙ্গনসুখে অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। নিশার শিরসুশোভিনী হীরকমালার স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্জালে বনরাজি-মস্তকোত্থিত কুসুম-কিরীট ছটাময় হইয়া উঠিল।

পথিকগণ এখনও সরাই হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে যাইতেছে। হঠাৎ পার্শ্বস্থিত বনান্তরাল হইতে একদল সশস্ত্র ডাকাত বহির্গত হইয়া ভৈরব গর্জনে পথিকগণকে আক্রমণ করিল।

শালফুল (১৮৯৭), প্রথম পরিচ্ছেদ: বনপথে— ডাকাত

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দুস্থানীরা আহারে বলবীর্য 'তাগদ' যাহাতে হয়, সেজন্য কত যত্ন করে। কিন্তু বাঙ্গালীরা রসোপভোগ চায়, তাহাতে বলবীর্য হউক বা না হউক। ঘৃত দুগ্ধ হালুয়া প্রভৃতি বীর্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য হিন্দুস্থানীরা সচরাচর খাইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালীরা ঘৃত দুগ্ধ অপেক্ষা বিকৃত দুগ্ধ ছানা ভালবাসে; এবং ছানা-প্রস্তুত সন্দেশই বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান মিষ্টান্ন...

এত দেশে থাকিতে এই মিষ্টান্নের সন্দেশ নাম হইতে গেল কেন? সন্দেশের প্রকৃত অর্থ খবর বা বার্তা; বঙ্গে প্রধানতঃ এই মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়াই জ্ঞাতি-কুটুম্বের খবর বা সন্দেশ লওয়া হইত বলিয়া ইহার সন্দেশ নাম হইয়াছে। জ্ঞাতি-কুটুম্বের নিকট খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে তাহাকে 'তত্ত্ব পাঠান' বলে। জ্ঞাতি-কুটুম্বের খবরাখবর লইতে গেলেই রিক্তহস্তে না করিয়া কিছু আহার সামগ্রী প্রেরণ করাই এ-দেশের আচারসম্মত; তাই কুটুম্বের নিকট আহারাদি প্রেরণের নামই ক্রমে 'তত্ত্ব পাঠান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গে হিন্দুদিগের মধ্যে তত্ত্ব পাঠাইবার কালে সন্দেশ প্রেরণ করা-ই প্রচলিত প্রথা। তত্ত্ব বা তত্ত্বানুসন্ধান অথবা সন্দেশ অর্থাৎ খবর লইবার কালে যে-মিষ্টান্ন প্রেরণ করা হয়, তাহারই নাম সন্দেশ। কিন্তু তত্ত্ব পাঠাইবার কালে প্রধানতঃ সন্দেশ প্রেরণের ব্যবস্থা হইল কেন? তাহার একটি কারণ বাঙ্গালীর ছানা-প্রিয় এবং অপর কারণ ইতর জাতির স্পর্শেও সন্দেশের কোন দোষ নাই বলিয়া। মেঠাই প্রভৃতি অনেক মিষ্টান্নেই বেসন, চালের গুঁড়ি প্রভৃতি থাকায় উহা অন্নের সামিল বলিয়া ধরে। এই কারণে প্রকৃত অন্ন যেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির স্পর্শে হিন্দুদিগের অভোজ্য বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ বেসন, চালের গুঁড়ি প্রভৃতি যে-সকল মিষ্টান্নে থাকে, তাহারাও সকলের হাতে খাইবার যোগ্য নহে বলিয়াই বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের বিশ্বাস। তাই সন্দেশের ন্যায় মিষ্টান্ন, যাহাতে চালের গুঁড়ি প্রভৃতির কোন সম্পর্ক নাই, যাহা সকলের হাতেই খাওয়া যায়, এইরূপ মিষ্টান্নের প্রেরণ সকলের পক্ষে বড় সুবিধাকর। অবশ্য এ-প্রথা কেবল বঙ্গেই প্রচলিত, অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

মুদীর দোকান, সন্দেশ (১৮৯৭)

প্রিয়নাথ সেন

বস্তুতঃ বহুত্বের ভিতরে এইরূপ ঐক্যানুভব করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত-রহস্য অভিব্যক্ত হয়, কারণ বহুত্ব না থাকিলে ঐক্যের স্ফুরণ হইবে কোথা হইতে? পণ্ডিতেরা নানা কারণে সত্যকে সূর্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন: সূর্য যেমন স্বয়ংপ্রকাশ, আপনার তেজে আপনি জ্যোতিষ্মান, সত্যও সেইরূপ আপনি আপনার অবভাসক। আবার এক সূর্য যেমন পাত্রভেদে প্রতিফলিত হইয়া বহুরূপে প্রতীয়মান হয়, একসত্যও সেইরূপ পাত্রভেদে নানারূপে দেখা দেয়; মূলে স্বর্গ এক, সত্যও এক। সূর্যের কার্য অন্ধকারবিদূরণ, জ্ঞানের কার্য অজ্ঞানের নিরাকরণ; কিন্তু কি অন্ধকার, কি অজ্ঞান কিছুই সহসা তিরোহিত হয় না: সূর্য ও জ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে উদিত হইতে থাকে, অন্ধকার ও অজ্ঞান তেমনি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। উদীয়মান সূর্যের কিরণ-সন্নিপাতে বস্তুসমূহের আকৃতি-সন্নিবেশ যেমন স্ফুট হইতে স্ফুটতর হয়, প্রকাশমান জ্ঞানালোকে তত্ত্বাববোধও সেইরূপ ক্রমশঃ বিশদতর হইয়া থাকে; বিভিন্ন মার্গের বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এই জ্ঞান-বিকাশেরই অবস্থাভেদের পরিচায়ক, এবং অধিকারিভেদে অবস্থা-বিশেষে উপযোগী; কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক। সকলই এক প্রবাহের পরিপোষক শাখাপ্রশাখা। নদীকুল যেমন মেঘরাশি হইতে সলিল সংগ্রহ করিয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একস্রোতে একই মহাসাগরের দিকে ছুটিয়া যায়, সেইরূপ নানা প্রস্থানের বিভিন্নদর্শনসমূহও এক উদ্দেশ্যে এক লক্ষ্যে এক পূর্ণ সত্যের প্রকটন করিতে যত্ন পায়, এবং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাহারই বিকাশে সহায়তা করে। ইউরোপীয় অধুনাতন দার্শনিকদিগের মধ্যে হেগেলীয়ানগণ বিরোধ ও সমন্বয়ের যে-অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য তার্কিক বা ন্যায়সঙ্গত বিবর্তন নামে আখ্যাত করিয়াছে, তাহা উল্লিখিত মতের পরিচায়ক। কিন্তু এই সমন্বয়ের প্রকৃত রহস্য, আধ্যাত্মিক জীবনে ইহার ফলোপধায়িত্ব পাশ্চাত্যদার্শনিকেরা আজিও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

অদ্বৈতবাদ-বিচার (১৮৯৭), উপক্রমণিকা, ঐক্যানুসন্ধান

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

আমরা ইতস্ততঃ যে-সকল পদার্থ দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, দেখিতে পাই, তাহারা ঘোরতর পরিবর্তনের অধীন। শুদ্ধ পরিবর্তন কেন, আপাততঃ অনেক নূতন পদার্থের উৎপত্তি, অনেক বর্তমান পদার্থের ধ্বংসও লক্ষিত হয়। আমরা নিজে জন্মমৃত্যুর অধীন। যত দূর দেখা যায়, তাহাতে জন্মের পূর্বে কোন অস্তিত্বই ছিল না, মৃত্যুর পরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাহাতে কোন কোন দার্শনিক স্থির করিলেন, আমরা অনিত্য পদার্থ। অন্ততঃ আমাদের দেহ অনিত্য পদার্থ: ইহা আজ আছে, কাল নাই।

তাহার উত্তরে অপর দার্শনিক বলিলেন, দেখ, তোমার দেহ অনিত্য কিরূপে? তোমার দেহ ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি যে-উপাদানে গঠিত, তাহার ত ধ্বংস দেখি না। তোমার দেহ ধ্বংস না হইয়া কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। পঞ্চভূতকে তুমি অনিত্য বলিতে পার না।

প্রত্যুত্তরে অনিত্যবাদী বলিলেন, পঞ্চভূতই বা নিত্য কি-প্রকারে? ইহাকে আমি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিকারমাত্র বলি। পঞ্চভূতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভিন্ন আর কি আছে? কিছু নাই। আর রূপরসাদি আমাদের মনের জ্ঞানমাত্র। দেখ, দর্পণে তুমি আপন প্রতিবিম্ব দেখিবে, তাহাতে রূপ আছে— তাহা কি অলীক নয়? তাহা কি তোমার জ্ঞানমাত্র নয়? দেখ, স্বপ্নে তুমি কতপ্রকার রূপরসাদির সংঘস্বরূপ পদার্থের উপলব্ধি কর, তাহারাও কি অলীক নয়? তাহারাও কি তোমার জ্ঞানমাত্র নয়? আরও দেখ, জাগ্রৎ অবস্থায় তুমি কিরূপে প্রত্যক্ষ কর। তুমি সূর্য দেখিতেছ, যেন একটি থালার মত। প্রাতঃকালে লোহিতবর্ণ, আবার মধ্যাহ্নে পীতবর্ণ। উপরিভাগ যেন সমতল। কিন্তু তুমি জ্যোতিষের অনুমানে জানিতে পার, সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়, ইহা বর্তুলাকার। যে-পদার্থ একবার লাল, একবার হলদে দেখায়, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে তাহা লালও নয়, হলদেও নয়। অতএব যে সংসারে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ভিন্ন আর কিছুই দেখি না, তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের খেলা। আমরা জাগিয়া জাগিয়া একপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। সংসারে জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই।... তুমি যে কিছু পদার্থ আছে বলিয়া বল, তাহা কেবল জ্ঞানের বিকার ও ক্ষণিক।

সাংখ্যদর্শন, (২) নিত্য বস্তু

সরোজকুমারী দেবী

আজ বিয়ে-বাড়িতে মহাধুম, আজ নরেন্দ্রের ফুলশয্যা। নরেন্দ্রের সহিত মনোরমার বিবাহ হইয়াছে। মনোরমা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকামাত্র। দেখিতে সে সুন্দরী না হইলেও তাহার সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে, সুগোল সুগঠিত দেহ লাবণ্য-ধারা উছলিয়া পড়িতেছিল, বিশেষ তাহার পদ্মপলাশ নয়ন ও ভ্রূতে সে মুখের শ্রী কি সুন্দর দেখাইতেছিল। বিয়ের কনেটি, তবু তাহার সেই প্রফুল্ল মুখ দেখিলে কোন অপরিচিত লোক বুঝিতে পারিবে না যে, তাহার এই সবে বিবাহ হইয়াছে। সে হাসিয়া গল্প করিয়া সমবয়সী ননদের সহিত পান সাজিতেছিল, ছাতে বেড়াইতেছিল, আর বারবার ঘোমটা টানিতেছিল: দুদিনের অভ্যাসে সে ভালরূপে অভ্যস্ত হইতে পারিতেছিল না। তাহাকে দেখিলেই যেন একটি জীবন্ত আনন্দরূপিণী প্রতিমা বলিয়া ভ্রম হয়। শাশুড়ী খুড়াশাশুড়ী তাহার সেই সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেছিলেন।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি শেষ হইয়াছে। একটি গৃহের কোণেই দালান; মনোরমার শাশুড়ী এবং কয়েকজন আত্মীয়া মহিলা সেইখানে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিলেন; মনোরমা ঘোমটা টানিয়া তাঁহাদের মাঝখানে বসিয়া ছিল। এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ দেবর সুরেন ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিল, "মা, তোমার গুরুঠাকুর আসিয়াছেন; কনে বউকে আশীর্বাদ করিতে আসিবেন কি?"

মা মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন। বালক পুনরায় ছুটিয়া বাহিরে গেল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ভিতরে আসিয়া মনোরমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদরাশি বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার হাত দেখি, মা লক্ষ্মী।"

মনোরমা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সালঙ্কৃত ক্ষুদ্র হস্তটি বাহির করিয়া দিল। তিনি বিশেষভাবে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি চিরলক্ষ্মী হও।" এই বলিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই নিঃশ্বাসটি কেহ শুনিয়াছিল কি? ব্রাহ্মণ কি মনোরমার নির্মল সুখের আকাশে কালো মেঘের ছায়া দেখিয়াছিলেন?

বড় ঘটা করিয়া সন্ধ্যার সময় ফুলশয্যা আসিল।

কাহিনী (১৮৯৮), অদৃষ্ট, ১

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

প্রথম রাত্রে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে; এখন আর কোথাও মেঘ নাই— আকাশভরা নক্ষত্র। আর সেই অসংখ্য নক্ষত্ররাজির মাঝখানে উজ্জ্বলকিরণে জগৎ মাতাইয়া রজনীকান্ত সমুদিত। তন্নিম্নে চকোর চাঁদের সুখাপানাশয়ে মহামত্ত; তাহার অন্যদিকে নজর নাই, আর কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই— কেবল চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে, কেবলি চেয়ে আছে। মৃদু মন্দ সমীরণ শিশিরস্নাত সদ্য বিকশিত কুসুমরাশি হইতে পরিমলাপহরণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

পুনার প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ শিখরদেশে রাজ্যেশ্বর প্রতাপসিংহ পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। আজিও তাঁহার বিবাহ হয় না। বিবাহ যদি হইত, তবে যে প্রতাপসিংহ সে-হৃদয়চন্দ্রমাকে একাকিনী রাখিয়া গগনচাঁদের কৌমুদী সেবন করিতে সৌধশিখরে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে পারিতেন, ইহা বোধ হয় কেহই বিশ্বাস করিবেন না। প্রতাপসিংহের বিবাহ হয় নাই, প্রতাপ আজি মগধ-রাজকুমারী সরোজিনীর রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু মগধরাজ যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, তাহাতে কখনই স্বীকৃত হইতে পারা যায় না; কেননা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সম্মানের মূল্য অধিক। যদি মগধরাজ আমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমি বিন্দুমাত্র আপত্তি করিতাম না। তবে কি দূত দ্বারা তাঁহার কন্যাকে চাহিয়া পাঠাইব?— তাহাও ত হইতে পারে না। যদি মগধরাজ অস্বীকার করেন, সে-অপমান রাখিবার আর স্থান কোথায়? প্রতাপের চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলতা ধারণ করিল; তিনি বলিলেন, "দূর ছাই! একটা মেয়ে-মানুষের জন্য সম্মান নষ্ট করিব?"

অদূরে একটা বকুল বৃক্ষ ছিল; তাহ হইতে একটি কোকিল পঞ্চমে গলা তুলে গান আরম্ভ করিল। লোকে বলেঃ কোকিল-কূজন, কুসুমের সৌরভ, মলয়ার সমীরণ— এ-সকল প্রেমবৃদ্ধি করিবার কেমন একটি অস্ত্র। ইহারা প্রেমপরিবর্ধনের বিধাতার মোহন-মন্ত্র। সকল স্থানে না হইলেও কথাটা যে অনেকটা সত্য, তাহাতে বোধ হয় কেহ আপত্তি নাও করিতে পারেন। অন্ততঃ প্রতাপসিংহ পারিলেন না। তিনি সেই ধবলিত, সুবিস্তৃত সৌধোপরি বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগলেনঃ "কেন! কেন মগধরাজের কন্যার নাম শুনিয়াই তাহার উপর আমার প্রাণের এত টান পড়িল? কে সে? কখনও ত তাহাকে দেখি নাই, পূর্বে আর কখনও তাহার কথা শুনি নাই— কেবল এই! কেন তাহার কথা বলিতেই আমার প্রাণ এমন হইল?"

সরোজিনী (১৮৯৮), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বর্ণকুমারী দেবী

সন্ধ্যবেলা আহারান্তে বাবা বিছানায় শুইয়া গুড়গুড়ি টানিতেন; দিদি যখন থাকিতেন, তখন আমরা দুই বোনে দুই পাশে গিয়া শুইতাম, কিন্তু বাবার গলা জড়াইয়া থাকা আমার একচেটিয়া ছিল। দুই হাতে কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কানে কানে কথা হইত— "বাবা, তুমি কাকে ভালবাস?" মনের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস, আমাকেই ভালবাসে; তিনি কিন্তু তাহা বলিতেন না, বলিতেন, "দুজনকেই ভালবাসি।" উত্তরে সন্তুষ্ট হইতাম না, অসন্তুষ্টও হইতাম না, কেননা তিনি যাহা-ই বলুন, আমার মনে হইত, আমাকেই ভালবাসেন। আমি কানে কানে বলিতাম, "দিদি রাগ করবেন বুঝি?" বাবা হাসিতেন, আমার বিশ্বাস মনে আরো দৃঢ় হইয়া আঁটিয়া বসিত। তখন আমার বয়স কত, জানি না— বোধ হয় ৫/৬ বৎসর হইবে। শীতকালে বাবার গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাকিলেও আমার গায়ের ছোট রুমালখানি দিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে না ঢাকিতাম, ততক্ষণ মনে হইত, তাঁহার শীত ভাঙ্গিতেছে না। গরমী কালে টানা পাখা যতই হউক না কেন, মাঝে মাঝে হাতেপাখা না করিলে আমার তৃপ্তিবোধ হইত না। দাসদাসীর অভাব নাই, কিন্তু আমি সুবিধা পাইলেই কুটনা কুটিবার আড্ডায় গিয়া বঁটি একখানা টানিয়া আলুটা পটলটা যাহা সম্মুখে পাইতাম তাহার উপরেই আচড় পরিবার অভিপ্রায়ে আঙ্গুলের আঁচড় পাড়িয়া বসিতাম, আর রান্নাঘরে গিয়া বামুনদিদির ভাতের কাটী কাড়িয়া লইয়া ডাল, মাঝের ঝোল, অম্বল নির্বিচারে সবই ঘুঁটিবার প্রয়াস পাইতাম, কখন বা ব্রাহ্মণীকে স্তুতি-মিনতিতে বশ করিতে পারিলে তাহার হাতের নুন মসলাটা নিজের হাতে করিয়া হাঁড়িতে ফেলিবার মহানন্দলাভও অদৃষ্টে ঘটিত। এইরূপে রান্নাঘরে কতদিন যে হাত পা পুড়াইয়াছি, তাহার ঠিক নাই। হইলে কি হয়, আমার বিশ্বাস ছিল, অন্নব্যঞ্জনে আমি কাঠী দিলেই বাবার পক্ষে তাহা সুখাদ্য হইবে, কেননা রান্নাটা তবেই আমার হইল।

কাহাকে? (১৮৯৮), প্রথম পরিচ্ছেদ

যাহাতে রস আছে তাহা সরস; যাহাতে রস নাই, তাহা নীরস। দর্শনশাস্ত্র নীরস— এই প্রবাদাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রবাদস্রষ্টার মতে দর্শনশাস্ত্রে কোনও রস নাই। কিন্তু রসের সত্তা বা অসত্তা নির্ণয় করিতে হইলে রসের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। রসের প্রকৃতি জানিতে পারিলে রসের সত্তা বা অসত্তা সহজে নির্ণীত হইতে পারে। আলঙ্কারিকদিগের মতে অলৌকিক চমৎকার— রসের প্রাণ বা সার। চমৎকার একপ্রকার আনন্দ বা বিস্ময়। যাহার অপর নাম চিত্তবিস্তার। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার অনুশীলন বা পর্যালোচনায় সুখানুভব বা বিস্ময় জন্মে, তাহা সরস; এবং যাহার অনুশীলন বা পর্যালোচনায় সুখানুভব বা বিস্ময় হয় না, তাহা নীরস। এইখানেই "দর্শনশাস্ত্র নীরস" এই প্রবাদাংশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা যে তদ্দ্বারা নির্মল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ইহার অপলাপ করা অসম্ভব। দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনকারীগণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।...

সত্য বটে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কেহ কেহ সুখানুভব করিতে পারেন না। কিন্তু রসময় কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কেহ কেহ রসানুভব করিতে পারেন না। তা বলিয়া কি কাব্যশাস্ত্রকেও নীরস বলিতে হইবে? দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সুখানুভব না করিবার কারণ দর্শনশাস্ত্রের নীরসতা নহে। যাঁহারা সুখানভব করিতে পারেন না, তাঁহারা বুদ্ধিদৌর্বল্যবশতঃ দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার-লাভে বঞ্চিত, অথবা তাঁহাদের রসবিষয়িণী বাসনা নাই। রসবিষয়িনী বাসনা না থাকিলে রসের আস্বাদন বা অনুভব হয় না। কাব্য করিবার জন্য যেমন বীজভূতশক্তি বা সংস্কার অপেক্ষণীয়, কাব্য বুঝিবার জন্যও সেইরূপ বীজভূতশক্তি বা সংস্কারের অপেক্ষা আছে। যথাক্রমে উক্ত শক্তিদ্বয়ের নাম কর্তৃত্বশক্তি ও বোদ্ধৃত্বশক্তি। যাঁহার বোদ্ধৃত্বশক্তি নাই, তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ইহাও আলঙ্কারিকদিগেরই সিদ্ধান্ত। কাব্য বিষয়ে আলঙ্কারিকেরা যে-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধেও সে-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব স্থির হইতেছে যে, দর্শনশাস্ত্রের রসাস্বাদনে অসমর্থ ব্যক্তিই উক্ত প্রবাদাংশের স্রষ্টা।

ফেলোসিপের লেকচর, প্রথম বর্ষ: হিন্দুদর্শন (১৮৯৯), উপক্রমণিকা

আনন্দচন্দ্র মিত্র

জনসমাজের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বরোপাসনার আদর্শ উন্নত হইতে থাকে। সুতরাং তখন জড়পদার্থ-সকলের পূজার স্থানে ক্রমে জড়-প্রকৃতির পূজা আরম্ভ হয়। ভিন্ন ভিন্ন জড়ের পূজা পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জড়ের উৎপাদক ও পরিচালক এক অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিতে থাকে। শীতল-সলিলা স্রোতস্বতী, তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র এবং শস্যোৎপাদক মৃদুবর্ষণকারী মেঘের স্বতন্ত্র পূজা না হইয়া জলের অধিষ্ঠাত্রী বরুণের কল্পনা হয়, এবং তাহারই পূজা হইয়া থাকে। এইরূপে দাবাগ্নি, বাড়বাগ্নি ও বজ্রাগ্নির স্বতন্ত্র পূজা লুপ্ত হইয়া এক অগ্নিরই পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। জনসমাজের সভ্যতার ক্রমের সঙ্গে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হইলে, মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জড়কে জড়-প্রকৃতির এক এক অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারে। জ্ঞানের অভাবে পূর্বে ক্ষুদ্র জড়কেই ঈশ্বর মনে করিত। জ্ঞান কথঞ্চিৎ উন্নত হইলে তাহা না করিয়া জড়-প্রকৃতির ঐ অঙ্গবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করিয়া থাকে। স্থূল জড় পরিত্যাগ করিয়া এইটুকু সূক্ষ্মত্বে গমন করিয়া থাকে। কেবল যে মানুষের জ্ঞানের উন্নতিতেই এরূপ হয়, তাহা নহে। মানুষের হৃদয় অর্থাৎ অন্তরের ভাবও প্রশস্ত হইয়া পড়ে; এইজন্য আর ক্ষুদ্র জড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঈশ্বর লইয়াও মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সেই সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রার্থনা প্রভৃতিও উন্নত এবং কিয়ৎ পরিমাণে আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে। প্রকৃতিপূজার ইহাই কারণ।

এই অবস্থার পরেই মানুষের একেশ্বরবাদী হইবার, প্রকৃত তত্ত্বে উপস্থিত হইবার কথা। কেননা জড়-জগতের প্রতি বিভাগে, জড়-সৃষ্টির প্রতি অঙ্গে, এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনার পর মানবের জ্ঞান আরও কিছু উন্নত হইলে মানুষ অবশ্যই দেখিতে পাইবে যে, জড়-প্রকৃতির একই অধিষ্ঠাত্রী, জড়-সৃষ্টির একই প্রাণ। কিন্তু জগতে এরূপ ঘটে নাই; মানুষ প্রকৃতির পূজা পরিত্যাগ করিলেই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারে নাই। প্রকৃতিপূজার পর সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের জগৎময় কর্তৃত্বের ভাব সকল সমাজমধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর এক আপদ আসিয়া মানুষের ধর্মোন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া ঐ ভাবের সমুচিত উন্নতি ও প্রচার হইতে দেয় নাই। সে-আপদ পৌরাণিক পৌত্তলিকতা।

পরমার্থ প্রসঙ্গে (১৮৯৯), ভারতে পৌত্তলিকতা

প্রিয়নাথ সেন

যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত, যখন সে-কোন আধুনিক কবিতা পড়িবে, তাহারই ভিতর অল্প বা অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাব, ভাষা বা ভঙ্গির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের— তাঁহার সেই শিক্ষাগুরুর— প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমি এমন বলিতেছি না যে, বলেন্দ্রনাথের গদ্যে বা পদ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। পরবর্তী লেখককে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্বতন সম্পন্ন লেখকের নিকট কিছু না কিছু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইতেই হইবে। তবে যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেন্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজস্বতা ছিল, এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। ইহার অর্থ নয় যে, তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা অপরিণত বা অসম্পূর্ণ। আমার বক্তব্য এই যে, গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল, গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গি নাই, যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক এ-কথা বলিতে পারি না। তাঁহার পদ্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয়, কবির অন্তর্লীন ক্ষমতা এখনও সমস্ত বিকাশ পায় নাই এবং কালে এই সৌন্দর্য পরিসরে আরও বিস্তৃত হইবে, ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে এবং ইহার ঝঙ্কার ও উন্মাদনা আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে। গদ্য এবং পদ্যের মৌলিক বিভিন্নতা কিন্তু এইরূপ ভাবিবার অপর কারণ। গদ্যের শক্তি ও উৎকর্ষের সীমা আছে, পদ্যের নাই, গদ্য মানব-হৃদয়ের সমস্ত উচ্চতার নাগাল পায় না, গভীরতায় থৈ পায় না, সৌন্দর্যের সমস্ত উচ্ছ্বাস, ললিত-তরঙ্গ ধরিতে পারে না, জীবনের অসীম বিস্তৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্তু মিল ও ছন্দে, ঝঙ্কার, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায়, কমনীয়তায় ও নমনীয়তায় পদ্য জীবনের সমস্ত অনির্দেশ পরিধি তাহার আলোকময়ী গতির চারু বিকম্পনে উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে... বলেন্দ্রনাথের গদ্যপাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হই; পদ্যপাঠে আনন্দলাভ করিলেও আরও উচ্চতর রচনার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৯)

মণিভূষণ বুদ্ধিমান— বলিবামাত্রই সম্মত হইল। কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে; একবার হিমানীর নিকট জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি দিন।" তাহার ভিক্ষামিনতিপূর্ণ সকাতর চক্ষু দুইটি দেখিয়া অধ্যাপক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না— সম্মত হইতে হইল।...

আজ সমস্ত দিন হিমানী একাকিনী নিজ কক্ষে অবস্থান করিয়াছে। কিয়দ্দূরে টেবিলে তাহার ভোজনসামগ্রী অভুক্ত পড়িয়া। শরীর অতিশয় উষ্ণ। চক্ষু দুইটি রক্তকমলের মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা একটিবার শুকাইবার অবসর পায় নাই। মণিভূষণ অতি সঙ্কুচিত পদক্ষেপে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে টেবিলের নিকট একখানি সোফায় হিমানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল, মণিভূষণ গিয়া সেই সোফায় উপবেশন করিল। ইতিপূর্বে আর সে কখনও হিমানীর সহিত একাসনে বসিবার সুখ উপভোগ করে নাই। হিমানীর একখানি সুকোমল তপ্ত হস্ত লইয়া মণিভূষণ নিজ হস্তযুগলের মধ্যে রক্ষা করিল। কথা যাহা যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটিও বলিতে পারিল না। সন্ধ্যা দশটার মেলে মণিভূষণ দেশে যাইবে। ক্রমে তাহার বিদায় গ্রহণের নিষ্ঠুর মুহূর্ত নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে দুই চারি কথা বলিতে পারিল মাত্র। হিমানী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহজগৎকে কেন জানি না মণিভূষণের পরজগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হিমানীর অশ্রুধৌত ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি হাতে করিয়া তুলিয়া সেই স্বপ্নালোকে নিরীক্ষণ করিল। আত্মবিস্মৃতির মোহে সে সমাজ ভুলিল, নীতি ভুলিল, বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিল; সহসা আপনার পিপাসদগ্ধ ওষ্ঠযুগল হিমানীর ওষ্ঠে মিলিত করিল। হিমানীর চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে চমকিল কিন্তু মুখ সরাইল না।

নব-কথা, হিমানী (১৮৯৯)

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম নরনারী তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কত কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন! বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে আদর্শ মানব বা অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহার বিপরীতে কিছু বলিলে তাঁহারা তখন চটিয়া উঠিতেন। ব্রাহ্মিকাগণের গুরুভক্তি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের বাটী লোকে লোকারণ্য। পারিবারিক উপাসনায়, মন্দিরের উপাসনায় সর্বত্র কেশব। ব্রাহ্মসমাজ যেন কেশবময় হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন বৃন্দাবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরের কোলাহলে উদ্বেলিত হইয়া কেশববাবু বিজনবাসের সঙ্কল্প করিলেন। বেলঘরিয়ার নিকট একটী রম্য উদ্যান তাঁহার বনবিহারের জন্য স্থিরীকৃত হইল। তিনি তথায় গিয়া নির্জনবাস আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে এই উদ্যান ব্রাহ্ম নরনারীতে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে কেশবচন্দ্র সেনের বিজনবাস পাণ্ডবদিগের অরণ্যবাসের তুল্য হইয়া উঠিল।

কেশববাবুর প্রতি ব্রাহ্মিকাদিগের অনুরাগ দিন দিন উপচীয়মান হইতে লাগিল। গুরুভক্তির আতিশয্যে স্বামী বা অভিভাবকগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কেশববাবুর মনোহর মূর্তি, প্রতিভাবিচ্ছুরিত মুখকান্তি, মধুর ও চিত্ত-প্রমাথী সম্ভাষণ এবং হৃদয়বিদারী নয়নযুগল প্রকৃতই ব্রাহ্মিকাগণকে উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতই তিনি কেশবাবতার হইয়া উঠিয়াছিলেন। এদিকে ব্রাহ্মিকাগণের কেশবানুরাগের বৃদ্ধির পরিমাণানুসারে ব্রাহ্মগণের অন্তরে কেশববিদ্বেষ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর স্রোতের ন্যায় ধীরে ধীরে বর্ধিত ও অন্তঃপ্রবাহিত হইতে লাগিল। একদিন ইহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ করিলাম।

বীরপূজা (১৯০০), ভক্তবীর সাধু গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত

নিত্যকৃষ্ণ বসু

ঝোঁকটা সেই নিরাশ্রয় অনাথিনী ও তাহার নিরাশ্রয় শিশুটির উপর আসিয়া পড়িত। শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী— তোমরা কেহ কেবল রাজেশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী বলিয়া তাঁহার অসম্মান করিও না— শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী আমার মাতাকে বুঝাইতে চাহিতেন যে, তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার কুপোষ্য সন্তানটিকে প্রতিপালন করিয়া যে-অপূর্ব বদান্যতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দাতাকর্ণের মহিষী পদ্মাবতী ইতিহাসে তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই; নহিলে ঠাকুরাণীর একটি ব্যাকরণসঙ্গত উপমা মিলিত। কিন্তু পোড়া লোকের কেমন স্বভাব: যার যত উপকার করা হয়, তার গুমর ততই বাড়ে! কলিতে কাহারও ভাল করিতে নাই। ঠাকুরাণীর মন বুঝে না প্রাণ কাঁদে, তাই তিনি সেই সকল লোককে বাড়ীতে আশ্রয় দেন। বিধাতার কাছে প্রার্থনা এই: পর তাঁহার আপনার না হউক, তিনি যেন চিরকাল পরের উপকার করিয়া মরিতে পান।

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী কুসুমকোমল শয্যার উপর কুসুমকোমল দেহখানি ঢালিয়া সুষুপ্তি-সমাহিত না হইলে, বিষ্ণুবল্লভবাবুর বাটীতে ঐ সকল বক্তৃতা অবিশ্রাম চলিত। প্রভাতে সাড়ে সাতটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া যখন দেখিতেন, প্রায় সাতটি চল্লিশ মিনিট পার হইয়া গেল, অথচ তাঁহার আলস্য বিজড়িত বাহুখানির সম্মুখে সেই দিব্যবাসসুরভিত. প্রধুমিতদ্রবময় প্রাতরাশ উপস্থিত হইল না— বক্তৃতা তখনই চলিল। যখন দেখিতেন, তিনি শয্যাত্যাগ, হস্তমুখ-প্রক্ষালন, স্নান, গাত্রমার্জন, শুষ্ক, শুভ্র বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি কত কাজ সারিয়া ফেলিলেন, তথাপি তাঁহার রাঁধুনি-ঠাকরুণ তাঁহার জন্য একমুষ্টি অন্ন এখনও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলেন না— বক্তৃতা তখনই চলিত। যখন দেখিতেন, প্রস্ফুটিত মল্লিকারাশিতুল্য অন্নরাশির চারিপার্শ্বে ব্যঞ্জনপাত্রগুলি প্রথমত যথাক্রমে সাজান হয় নাই, কোথাও একটু গোলমাল হইয়া পড়িয়াছে, অথবা তাঁহার নবনির্মিত রজতপাত্রে জল না রাখিয়া সেই পুরাতন কাঁসার গ্লাসটাই ধরিয়া দিয়াছে— বক্তৃতার স্রোত তখন আর কিছুতেই বাধা মানিত না। হায়! এ-সংসারে দাসদাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইবার জন্যই কি শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর জন্ম হইয়াছিল?

ভবানী (১৯০০), অভিভাবক

শরচ্চন্দ্র সরকার

রমণী তখন নানা রাগ-রাগিনীর আলাপ করতঃ সযতনে পরিশ্রান্ত বীণাকে সম্মুখে রাখিবার উপক্রম করিতেছে— এমন সময় পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত্ হইল। এদিকে ওদিকে চাহিয়া আবার রমণী বীণা তুলিয়া লইয়া ক্ষুদ্র অঙ্গুলির যতদূর সাধ্য ততদূর জোরে বীণায় ঝঙ্কার দিয়া বাজাইতে লাগিল। সহসা বনাস্থলী ভেদ করিয়া একটী যোড়শ-বর্ষীয়া যুবা এবং জনকয়েক মাওয়ালী শরীররক্ষক অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটী অতুলনীয়া সুন্দরী যুবতী ক্ষুদ্র নদীতীরে বসিয়া বীণায় পীযুষরসবর্ষী রাগিণীর আলাপ করিতেছে।

সুন্দরী যুবতী আপন মনে বাজাইতেছে, কাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। যোড়শ জন অশ্বারোহীর অশ্বপদশব্দেও তাহার চেতনা হইল না। এ কি কোন দেবী? অশ্বারোহী যুবক রমণীর অনুপম লাবণ্যরাশি অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এই স্থির সৌদামিনী যুবকের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নিরাশার তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। যুবক উহার ঘাত-প্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই যুবক কে? মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি বীরশ্রেষ্ঠ শিবজী। আর ওই সুন্দরী রমণী কে? কঙ্কণ-প্রদেশের প্রসিদ্ধ দসুকন্যা লীলাময়ী। ধীরে ধীরে যুবক অগ্রসর হইতে লাগিল। যেন কোন কুহকী মায়ায় আবদ্ধ করিয়া কে তাহাকে রমণীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যখন যুবক রমণীর প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে অবস্থিত, তখন লীলাময়ী একবার সম্মুখে নিরীক্ষণ করিল। বীণাবাদন থামিয়া গেল, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী নদী গুন গুন স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতে লাগিল, বনস্থলী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতঃ সুমধুর পীযূরসবর্ষী বীণাধ্বনি বন্ধ হওয়াতে যেন আপনাদিগের মানসিক ক্লেশের পরিচয় দিতে লাগিল। শিবজী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নীরবে নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রমণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণী নড়িলেন না; শিবজীর— বীরপুরুষের ন্যায়— অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়াও বিচলিত হইল না।

শিবজী ধীরে ধীরে আরও নিকটবর্তী হইলেন। মাওয়ালী সৈন্যগণ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। রমণী দেখিল, যুবা তাহার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছে। সুতরাং ধীর নম্র মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিল: "মহাশয়, আপনি কে?"

লীলাময়ী (১৯০০), প্রথম পরিচ্ছেদ

কালাবর বেদান্তবাগীশ

একদা তাঁহার ভবনে কতিপয় পর্যটক অতিথি আগমন করিলে তপস্বিনী শঙ্কর-জননী তাঁহাদের নিকট প্রিয়তম পুত্রের ভাবী শুভ-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার এই পুত্র গুণে শিবতুল্য, কিন্তু স্বল্পায়ু।" পুত্র স্বল্পায়ু— এই বজ্রতুল্য দুঃসহ শব্দ শ্রবণে তিনি মুহূর্তেকের জন্য চেতনাশূন্য, নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন, পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া ভয়ে ও শোকে পুনঃপুনঃ কাতরা হইতে লাগিলেন। শোকনাশক শঙ্করও নানা প্রকার বচনরচনার দ্বারা জননীর ভয় ও শোক নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেদিন ঐরূপ অতিবাহিত হইল। পরদিন শঙ্কর জননী-সকাশে আপন অভীষ্ট ব্যক্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াও উপযুক্ত অবসর-অভাবে করিতে পারেন নাই। ঐরূপ তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, আর থাকিতে পারিলেন না, পঞ্চম দিবস আসিলে তিনি জননীর সমীপবর্তী হইয়া অতি বিনীত ও বিষণ্ণভাবে অঞ্জলি বদ্ধ করতঃ বলিতে লাগিলেন, "জননি, যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া নিয়তই সংসারপথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদের দুঃখের সীমা ও ইয়ত্তা নাই। সেই কারণে আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ঐ পথের অবসান ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি প্রসন্না হইয়া অনুমতি প্রদান করুন।" শুনিবামাত্রই তাঁহার ভয় শোক ও উদ্বেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, কিয়ৎক্ষণ মৃতপ্রায়া হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "বৎস, তুমি যে চতুর্থাশ্রমের ইচ্ছা করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। তোমার ঐ বুদ্ধি শীঘ্র অপনীত হউক। আগে গৃহস্থ হও, পুত্রলাভ কর, যাগযজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগকে প্রসন্ন কর; পশ্চাৎ তুমি যতি হইও। বৎস, তাহাই সজ্জনদিগের চিরসেবিত ধর্ম। বৎস, তুমি ব্যতীত আমার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। এ-অবস্থায় তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চিত আমি জীবিত থাকিব না। তোমার প্রস্থানের পর আমার মৃত্যু হইলে কে আমার অন্ত্যেষ্টি কার্য করিবে, তাহাও ভাবিয়া দেখ।" সতী শঙ্কর-মাতা শঙ্করসকাশে রোদন সহকারে ঐরূপ কথা বলিতে লাগিলেন, শোকনাশন শঙ্করও প্রবোধপ্রদান দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এদিনও সন্ন্যাসানুমতি পাইলেন না। পরদিন প্রভাতাগতে তাঁহার বৈরাগ্য দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এখন আমার কর্তব্য কি? কোন বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত ইনি যে আমাকে সন্ন্যাসানুমতি প্রদান করিবেন, তাহা করিবেন না, অথচ আমার সন্ন্যাস ইহার অনুমতিসাপেক্ষ।

শঙ্কর ও শাক্যমুনি (১৯০০)

ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যদ্বেষী, কপটাচারী, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ঔরঙ্গজেব ভারতের সিংহাসনে শোণিত-সাগর সন্তরণ করিয়া, দুরাকাঙ্ক্ষার কঠোর শেলাঘাতে ভারতবাসীর জাতীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, ভ্রাতার শোণিতে, পিতার অশ্রুজলে আকবরের পবিত্র প্রেতাত্মার তর্পণ করিয়া, পবিত্র ইসলাম-ধর্ম স্বার্থসিদ্ধির আশায় বিকৃত ও কলঙ্কিত করিয়া ঔরঙ্গজেব দানব-দর্পে, পিশাচ-গৌরবে, ভারতের সিংহাসনে আসীন। ধর্মের পূর্ণ অবতার দেব-মহম্মদ, পাপের উচ্ছেদ-সাধনব্রতে, অবনীতলে প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করিয়া স্বর্গীয় উপদেশে মানবজাতিকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিয়াছিলেন। দানব-সম্রাটের আদেশে সেই স্বর্গীয় উপদেশমালা লোকসমাজে আজ কলুষিত ও রাক্ষসধর্মে পরিণত! আজ পুণ্যভারতে সেই পবিত্র মুসলমান-ধর্মের পুণ্যব্রত প্রচারকগণ পাপ-প্ররোচনায় 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' নামে অভিহিত! সমগ্র আর্যাবর্ত পদাঘাত-প্রপীড়িত হিন্দুর হাহা-রবে ও যবন-পিশাচের অট্টহাস্যে প্রতিধ্বনিত। ম্লেচ্ছের লোমহর্ষণ অত্যাচারে ও পশুবৎ পাপাচারে আর্যজাতি বিস্মিত ও স্তম্ভিত। বিংশ কোটি হিন্দু ধর্মলোপের ও পাপস্পর্শের আশঙ্কায় নীরব ও ম্রিয়মাণ। যমুনাতটে আর বেদপাঠ-শব্দ নাই, জাহ্নবী-তরঙ্গে আর শঙ্খঘণ্টার প্রতিধ্বনি নাই, মন্দিরমধ্যে আর মঙ্গল-আরতি নাই। অধীতশাস্ত্র, অধ্যয়নব্রত পণ্ডিত বেদ ও পুরাণ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, গীতা ও উপনিষদ, মনু ও পরাশর, মাঘ ও কালিদাস ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে; কেননা সংস্কৃত পুস্তক দেখিলে যবন তাহার অগ্নিসংস্কারের ব্যবস্থা করে। অসীম আয়াসে নির্মিত, অশেষ যত্নে রক্ষিত, অসংখ্য জনে সমাদৃত, অনন্ত প্রেমে পূজিত দেবমূর্তি-সকল অতি নিভৃত গৃহের ভিতরে, পল্লবরাশির অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন; বাদশাহের আদেশঃ হিন্দুর দেবমূর্তিতে মুসলমান-মসজিদের সোপান নির্মিত হইবে। জ্যোতির্ময়ী পবিত্রতাময়ী আর্যললনা সীতা ও দ্রৌপদীর, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর জীবন্ত মূর্তি, মর্ত্যলোকে দেবরমণী, পিশাচ-ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইয়াছেঃ যবনের ঘোষণা— ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য ললনাকুলের সৃষ্টি! রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অরণ্যে পরিণত। কৃষাণ কৃষিকার্যে যাইতে সাহস করে না; গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া, গাভী ও গোবৎস-সকল গোপনে রাখিয়া ভূতলে পড়িয়া রোদন করে; কেননা গোমাংস ভক্ষণ না করিলে যবনের জঠরানল পরিতৃপ্ত হয় না!

সম্রাট ঔরঙ্গজেব আপন জুম্মা-মসজিদের ছাদে দাঁড়াইয়া মুদ্রিত নেত্রে নমাজ পড়িতেছিলেন।

কোহিনুর, প্রথম পরিচ্ছেদ: দানব-সম্রাট

নিমে দত্তের প্রকৃতি হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, হীরকের ন্যায় সারবান ও দুর্লভ। কিন্তু এই হীরকখণ্ড যত্নে রচনা করিয়া বিধাতা কি জানি কি কারণে ইহার মর্ম্মমধ্যে এমন একটি কলঙ্কবিন্দু নিবেশিত করিয়া এই পাপপুণ্যময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন যে, সে-কলঙ্কবিন্দু ক্রমশ আয়ত হইয়া সমগ্র হীরকদেহকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতাকে নিজেরই মালিন্যপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার স্বচ্ছতাকে নিজেরই ত্রুটিপ্রদর্শক করিয়াছে, তাহার বহুমূল্যতাকে পাঠকগণের ক্ষোভপরিবর্ধক করিয়াছে মাত্র। নিমে দত্ত স্বভাবত সরল, খলদ্বেষী, পবিত্রচেতা, সারবান, বুদ্ধিমান। কিন্তু সুরাসেবনরূপ এক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাদোষ এই সমগ্র গুণকেই ভ্রষ্ট করিয়া তাহার প্রকৃতিকে বিকৃত কহিয়াছে। এই প্রকৃতি-বিকৃতি নিমে দত্তের নিজের নিকটে অবিদিত নহে। তেমন বুদ্ধিমান ও স্বভাবত পবিত্রচেতা ব্যক্তির নিকটে অবিদিত থাকিতে পারে না। এই প্রযুক্ত তাহাকে সর্বদাই অনুতাপ করিতে হইত।...

এই প্রকৃতি-বিকারের প্রকাশ নিমে দত্তের কেবল চরিত্রভ্রংশে হয় এমন নহে। অধিক মদ্যোন্মত্ততা প্রযুক্ত তাহাতে ঈষৎ বায়ুবিকার পর্যন্ত প্রকাশ পায়। নাটকমধ্যে নিমে দত্তের প্রকৃতি যেরূপ রচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত এই কথাটি স্মরণে রাখা আবশ্যক। যাঁহারা এই কথাটি স্মরণে না রাখেন অথবা না বুঝেন, তাঁহারাই 'সধবার একাদশী'কে অসৎভাবের উদ্দীপক জ্ঞান করেন। 'সধবার একাদশী' অশ্লীল বটে, কিন্তু নিমে দত্তের অশ্লীলতায় মনে অনুচিত বিকার জন্মে না। যে-ব্যক্তির প্রকৃতি স্বভাবত এমন সুন্দর যে, তাহাতে কলঙ্ক-স্পর্শ না হইলে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারা যাইত, তেমনি ব্যক্তি বিকারবশত অশ্লীল জল্পনা করিলে তাহাতে মনের অনুচিত ভাব জন্মে কি? যাহার জন্মে তারা অশ্লীল রচনা পাঠে ভয় কি? বিধাতা ত তাহাকে অশ্লীল করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। নিমে দত্তের চরিত্রদর্শনে অশ্লীল ভাবের উদয় হয় না। অশ্লীল ভাব যে-জাতীয়, সে-জাতীয় ভাবের উদয় হয় না; অপরিসীম ক্ষোভেরই উদয় হয়। পাপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার জন্য তেমন ব্যক্তির এমন ব্যবস্থা! এমন চিত্তবিকৃতি! অসৎ ভাবের উদয় হওয়া দূরে থাকুক বরং ইন্দ্রিয়সেবামাত্রেরই উপরের মর্মান্তিক ক্রোধ উপস্থিত হয়। সে-ক্রোধ পাপপুণ্যের সৃষ্টিকারী বিধাতার প্রতিও ধাবিত হয়। কেন তিনি পুণ্যের সহচরস্বরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেন? অমৃতরাশিমধ্যে গর নিক্ষেপ করিলেন?

"সধবার একাদশী"

জলধর সেন

ভগবানের অনুগ্রহে পথে পথে জীবনের কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কোন স্থানেই দশ দিন স্থিরভাবে ঘর পাতিয়া বসি নাই। শুধু প্রাতঃকালে উঠিয়া পথে নামি, মধ্যাহ্নে কোন বৃক্ষতলে, গিরিগহ্বরে বা পর্ণকুটীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি; অপরাহ্নের পূর্বেই আবার পথে দাঁড়াই। সন্ধ্যার সময় ভগবান যেখানে লইয়া যান, সেইখানেই মাথা রাখি। এমনই করিয়া যাহার জীবনের মধ্যাহ্ন কাটিয়া গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে পথের কথা ব্যতীত আর কিছু জানিবার জন্য কাহারও আশা করা দুরাশামাত্র। আমার পথের কথা শীঘ্র শেষ হইবার নহে। হিমালয় পর্বতের নির্জন পথের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; আমি পথ দেখিয়া ভয় পাইতাম না; এতটা পথ চলিতে হইবে ভাবিয়া আমি কোন দিন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ি নাই। পথ যতদূর বিস্তৃত, যত বন্ধুর, যত চড়াই-উতরাই-পূর্ণ, আমার স্ফূর্তি তত বেশী হইত। জীবনের অন্যান্য সংগ্রামে আমি পরাজিত, অবসন্ন কিন্তু পথের সহিত সংগ্রামে? সে-সংগ্রামে আমি এক সময়ে অপরাজিত ছিলাম। পথশ্রমে আমার ক্লান্তিবোধ হইত না। কি এক অমানুষী শক্তি আমার ক্ষুদ্র দুর্বল হৃদয়কে বলীয়ান করিয়ছিল, তাহা আমি এখন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। সত্যসত্যই কে যেন আমার হাত ধরিয়া প্রকাণ্ড চড়াই পার করিয়া দিত; আমি কোন এক চিরপ্রেমময় অনন্ত দেবতার স্নেহবর্মে আবৃত হইয়া হিমালয়ের বনজঙ্গলে নিরাপদে পথ চলিতাম; রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, শীত, বরফ— কিছুই আমাকে সে-সময়ে বিচলিত করিতে পারিত না। তাহা হইলে কোন্ দিন কোন্ পাহাড়ের ক্ষুদ্র প্রান্তে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের অবসান হইত, কেহ জানিতেও পারিত না। শুধু সেই নির্জন হিমালয়ের একটি প্রস্তরময় মরুপথের বুকে আমার অস্থিকঙ্কাল কিছুদিন পড়িয়া থাকিত; তাহার পর সব শেষ হইয়া যাইত। কত সন্ন্যাসী, কত গৃহহীন শোকতাপক্লিষ্ট মানবের অস্থি এমনই করিয়া হিমালয়ের প্রস্তররাশির সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কে তাহার অনুসন্ধান করে, কেই বা তাহা জানে? তাই বলিতেছি: আমার এই সুখহীন, শান্তিহীন, লক্ষ্যহীন জীবনপথের তুচ্ছ কাহিনী শুনিবার জন্য কি কাহারও আগ্রহ জন্মিবে?

পথিক (১৯০১), তিহারী

চন্দ্রশেখর কর

এবার ছুটি ফুরাইবার সাত-আটদিন পূর্বেই শরৎ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, পড়া এখন বেশী পড়িয়াছে। পড়ার কথা শুনিয়া বাড়ীতে কেহই আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শরতের মা-র মনে ইহাতেও যেন এক খটকা লাগিয়া গেল। এবারে শরৎ যে-কদিন বাড়িতে ছিলেন, তাহা যেন অন্যমনস্কের ন্যায় কাটাইয়াছেন। সর্বদাই তিনি যেন কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেন। বাড়ী যেন তাঁহার ভাল লাগিত না। পিতা, পিতৃব্য বা অগ্রজের কাছে তিনি অধিকক্ষণ বসিতে পারিতেন না। মাতার সহিত তেমন প্রাণ খুলিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতেন না। সেই মাছ না খাওয়ার দিন হইতেই শরতের জননী তাঁহার স্বভাবে পরিবর্তন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভবতারণকে তিনি অনেকবার বলিয়াছিলেন, "ছেলের মনে রোগ জন্মেছে।" ভবতারণের প্রকৃতি বড়ই ধীর, তিনি কিছুতেই উদ্বেলিত হইবার লোক নহেন। গৃহিণী পুনঃপুনঃ ঐ কথা বলায় তিনি কহিলেন, "ও কিছু না; বি এ টা পাশ করুক, ছেলের বিয়ে দাও; দেখ, সব সেরে যাবে।"

ফলতঃ শরতের মনের ব্যারাম কতকটা এই সম্বন্ধেই বটে। বৈশাখ মাসে যে-শরৎ বাড়ী আসিয়াছিলেন, অগ্রহায়ণ মাসে সে-শরৎ বাড়ী আসেন নাই; ইহা নিশ্চয়, শবতের পরিবর্তন হইয়াছে। শরৎ এফ এ পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে পড়িয়ছেন, বি এ পড়িতে তিনি কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় যাইয়া কয়েক মাস তিনি সুস্থ ছিলেন; তাহার পর হইতেই তাঁহার অল্প অল্প মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে রোগ উৎকট দাঁড়াইয়াছে। দেশের কিছুই আর শরতের ভাল লাগে না। দেশের সমস্ত আচার-ব্যবহারই যেন তাঁহার কাছে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, পিতার স্নেহ, মাতার বাৎসল্য, ইহাও যেন আরও মার্জিত হওয়া আবশ্যক। আর বিবাহ— সে ত জীবনের এক মহা ব্রত; তাহাতে পিতামাতার অধিকার— এ তো বর্বর সমাজে ভিন্ন হইতেই পারে না। শিক্ষিত লোকে কখনই এ-প্রথার প্রশ্রয় দিতে পারে না। শরতের মাথায় এইরূপ খেলিতেছিল। শরৎ স্থির করিলেন, দেশে বিবাহ হইতে পারে না। দেশের বানরীর সহিত আমার মনের মিল হইবে কিরূপে? না আছে শিক্ষা, না জানে কথা কহিতে! লেখাপড়া জেনে মাথায় লাথি মারিলেও সহ্য হয়। নিজে দেখিব, তবে বিবাহ করিব; ইহাতে যিনি চটেন চটুন, তা বলে পশুর সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হতে পারি না। মা-বাপ কদিনের জন্য? স্ত্রী জীবনের সঙ্গিনী।

সুরবালা (১৯০১), ষষ্ঠ অধ্যায়

দামোদর মুখোপাধ্যায়

গড় মান্দারনে বীরেন্দ্র সিংহের সেই দুর্গ সমানভাবে আকাশপথে মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; দুর্গপার্শ্বস্থ সেই আম্রকানন সমভাবে শাখা-প্রশাখা দুলাইতে দুলাইতে বায়ুর সহিত খেলা করিতেছে, সেই ক্ষুদ্রকায়া দামোদর নদী পূর্ব্ববৎ মৃদু-মধুর ধ্বনি করিতে করিতে দুর্গমূল প্রধৌত করিয়া, সমানভাবে সকলের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সেই কবি-প্রসিদ্ধ বসন্তের অবিচ্ছিন্ন অনুচর কোকিল বৃক্ষপল্লবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন-দেহ হইয়া ক্রমোচ্চ কণ্ঠে তান ছাড়িতেছে; সুনীল গগনাঙ্গনে সেই চন্দ্রতারকা সমভাবে নাচিতে নাচিতে মেঘ-মধ্যে লুকাচুরি খেলিতেছে।

সকলই সমান আছে, কিন্তু কি-অল্পকালের মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটিয়া গিয়াছে! সেই শৈলেশ্বর-মন্দিরে যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত বিমলা ও দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার প্রথম সাক্ষাৎ, আর পাঠান-দুর্গে বিমলার অস্ত্রাঘাতে নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু— এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটিয়াছে! সেই কালরাত্রি, যে-রাত্রিতে বিমলার অসাবধানতায় পাঠানগণ দুর্গজয় করিয়া দুর্গস্বামী বীরেন্দ্র সিংহ ও জগৎসিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন, সে-কালরাত্রির কোন চিহ্নই এখন আর বিদ্যমান নাই। যে-শোণিতস্রোতে সেদিন দুর্গের নানা স্থান কলঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অণুমাত্র অঙ্কও এক্ষণে পরিদৃষ্ট হইতেছে না। যে-হাহাকার রবে সেদিন দুর্গ প্রকম্পিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও এক্ষণে শ্রবণগোচর হইতেছে না। দুর্গের সর্বত্র শোভা ও সমৃদ্ধির বিবিধ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। সকলই সমভাবে রহিয়াছে সত্য; কিন্তু সে বীরকেশর বীরেন্দ্র সিংহ আর নাই। এই স্বল্প কালের মধ্যে বিমলা বিধবা হইয়াছেন, তিলোত্তমা পিতৃহীনা হইয়াছেন। দুর্গের সকলই আছে, সকলেই ফিরিয়াছে, কেবল সেই বীরেন্দ্র সিংহ আর নাই, তিনি আর ফিরেন নাই। যে যমের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকে কেহ কখন আর ফিরিতে দেখিল না।

নবাব নন্দিনী (১৯০১), প্রথম পরিচ্ছেদ: বিষাদের ছায়া

বাহিরে একজন খরিদ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরমহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরে গমন করিলেন। খরিদদারের সহিত তাঁহার কথাবার্তায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে পাঁঠার মাংস ভিন্ন অন্য মাংস লইবে না: পাঁঠা তাহাকে দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য সে অধিক মূল দিতে প্রস্তুত আছে। খোঁয়াড়ের ভিতর যে তিন চারটি পাঁঠা ছিল, তাহার একটিতে ঠাকুরমহাশয় অনেক কষ্টে বাহির করিয়া খরিদদারকে দেখাইলেন। ক্রেতার তাহা মনোনীত হইল। তাহার পর ঠাকুরমহাশয় সেই পাঁঠাকে বাটীর ভিতর আনিলেন। যে-স্থানে আমি বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিতে প্রোথিত ছিল। পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুরমহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীবন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ, আক্ষেপ ও ভৎর্সনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সে চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়া উঠিলাম, "ঠাকুরমহাশয়! ঠাকুরমহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথম উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন!" ঠাকুরমহাশয় উত্তর করিলেন, "চুপ, চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পারিবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূলে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা; দয়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।"

মুক্তমালা (১৯০১), দ্বিতীয় রজনী: গুরুদেব

গ্রাম্য বধুর এক বিন্দুও অবসর নাই। প্রাতঃকাল হইতে নিশীথকাল পর্যন্ত তিনি একটী নয়, প্রতিক্ষণেই এক গৃহস্থালীর বহু কাজে নিযুক্ত। বধু-লক্ষ্মী এইমাত্র গোময়সিক্ত হস্তে গৃহ মার্জিত করিতেছিলেন, তখনি দেখি, সম্মুখে বাসনের রাশি, গ্রাম্য বধূ বাসন মাজিতেছেন, বাসন মাজিতে মাজিতেই বাহিরের আর দশখানা বাসি পাট সারা হইয়া গেল। পুত্রকে পাঠশালায় পাঠান হইল, গোময়ের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া থরে থরে রাখা হইল; কাষ্ঠের সুসার হইবে। স্বামী দেবরাদির স্নানসজ্জা সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। বধূ ঠাকুরাণী এখনি প্রাতঃস্নাত— সিক্তবস্ত্রেই দেবগৃহে নিত্যপূজার আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন। পুষ্পবাটিকা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়াছেন, চন্দন ঘসিতেছেন। বধূর তখনি অন্নপূর্ণা-মূর্তি, রন্ধনগৃহে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে। মুহূর্তেকেই দেখ, ঐ গনেশ-জননী-মূর্তি গৃহাভ্যন্তরে শিশুকে স্তন্যদান করিতেছেন। গৃহ-বাহিরে, তখনি পুনশ্চ দেখ, গ্রাম্য বধূর জগদ্ধাত্রী-মূর্তি: জন-মজুরদিকে তৈল-জলখাবার দিতেছেন। দিবা তৃতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে; গৃহের সকলেরই আহার হইয়া গিয়াছে, হয় নাই কেবল অন্নপূর্ণার। গৃহস্থালীর একমাত্র বধূ ইনি— অভুক্ত অতিথি অভ্যাগত যদি এখনও কেহ আসেন, গৃহিণী সেই প্রতীক্ষায় আছেন। অন্নপূর্ণা কখন আহার করিবেন, আদৌ আহার করিলেন কি না, কেহ জানিল না। কিন্তু দেখিতেছি, উচ্ছিষ্ট স্থান, বাসনাদি সত্বরেই সব সাফ হইয়া গিয়াছে; গ্রাম্য বধূ পুনঃ স্নানে পরিষ্কৃত হইয়া কলসী-কক্ষে শীতলামূর্তিতে প্রায় ক্রোশার্ধ দূর হইতে শীতল পানীয় জল আনিতেছেন। এখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বধু যশোদা-মূর্তিতে গোশালায় গোসেবায় নিযুক্ত। গ্রাম্য বধুর প্রতিক্ষণেই এক-একটী দেবীভাব...

কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সহুরে হাওয়া জোরে বহিয়াছে। সহরের বধূ-ব্যবস্থা গ্রামে বিলি হইলে আর এই সাবেক গঠনের গ্রাম্য বধূ দশ গ্রাম খুঁজিয়াও একটীও দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এখনও গ্রামে গ্রামে দু-দশটি করিয়া এ-গঠনের গ্রাম্য বধু আছেন। আছেন বলিয়াই গৃহস্থকে আজও বনবাসী হইতে হয় নাই।

সহর-চিত্র (১৯০১), ষষ্ঠ স্তবক: সহর-বধু ও গ্রাম্য বধু

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে-ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর, সে-ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে-ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও-ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল— ঐ একচাল— নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল, এ-কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটা বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব, পশ্চিম, যে-দিক হইতে আসুক না কেন, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখতে হবে। যত রেল ও গতাগাতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব পশ্চিমে ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ এক কলকেতার ভাষাই রাখবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে-কথা হচ্ছে না; কোন্ ভাষা জিতেছে, সেইটি দেখ।

ভাববার কথা

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

পুরুষেরা মনে করেন, আমরা বড় সুখে আছি। আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে রামরাজ্যে রাখিয়াছেন, পূর্বজন্মের তপস্যার ফলে তাঁহাদের পদ্মহস্তে পড়িয়া আমরা সশরীরে স্বর্গভোগ করিতেছি। আর যত জ্বালা তাঁহাদেরই— যত জ্বালা আমাদেরই জন্য! তাঁহারা রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিয়া আনেন; আমরা পায়ের উপর পা দিয়া কেবল বসিয়া খাই, আর সোনার চন্দ্রহার এবং বারাণসী শাড়ীর স্বপ্ন দেখি। তাঁহারা দারুণ সংসার-জ্বালায় ক্ষিপ্ত কুকুরের মতন দিনরাত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করেন; আমরা ঘরে বসিয়া তাঁহাদের বুকের রক্ত শোষণ করি, আর পান খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গা করিয়া, তার উপর মুচকি হাসিয়া, সম্মুখস্থ দর্পণের ভিতর জ্যোৎস্নার উপর বিজলিখেলা দেখিযা দিন কাটাই। আমাদিগকে ঘরের বাহির হইতে হয় না, চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখিতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা ভাবিতে হয় না, কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই— আমাদের সুখের সীমা কি?

বটেই ত! আমাদের সুখের সীমা কি? অনুগ্রহ কবিয়া পেটে এক মুখ খাইতে দেন, পরনে একখানা পরিতে দেন, নিশান্তে চরণ দুখানি একবার দেখিতে দেন— আর সুখের চাই কি? আমাদিগকে সোহাগ করিয়া বুকে করেন, পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গেন, "প্রাণাধিক" "জীবনসর্বস্ব" বলিয়া চিঠি লেখেন— আর সুখের বাকী কি? রাগ হইলে পদাঘাত করেন, বিনাপরাধে মুখ বাঁকান, কথায় কথায় পরিত্যাগ করিতে চাহেন— আমাদের সুখের অভাব কি?

তা এতই যদি সুখ, তবে আসুন, না-হয় একবার অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দেখা যাক, একবার দেখিয়া লউন কিসে কত সুখ-দুঃখ!... আপনারা রাঁধিবেন, বাড়িবেন, পাখা হাতে করিয়া কাছে বসিয়া আমাদিগকে খাওয়াইবেন, আচমনের পর পান তামাক দিয়া আমাদের পাতে প্রসাদ পাইবেন; আমরা খোঁপার উপর শামলা পরিয়া, চোখের কাজল চশমায় ঢাকিয়া বড় বড় আইনের পুথি হাতে করিয়া কাছারি যাইব। আপনারা ঘরে বসিয়া লক্ষ্মীর আলপনা দিবেন, চুলের দড়ি বিনাইবেন, ছেলেকে দুধ খাওয়াইবেন, চাকরাণীর সঙ্গে গণ্ডগোল করিবেন...

আপনাদের সুখের সীমা থাকিবে না। আপনাদের সেই অতুল সুখ পাপচক্ষে একবার দেখিব— এই আমার বড় সাধ।

কুঞ্জলতার মনের কথা (১৯০২), মেয়ের সুখ

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

রামদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য, বয়সে নবীন, ব্যবসায়ে ডাক্তার। নিজ বল্লভপুরে এবং তাহার আশেপাশে রামদাসের ভারি পশার, ও-অঞ্চলে নাকি তার জোড়াটি মিলে না। কিন্তু কেবল ডাক্তারিতেই তার গুজরান নয়, সে বহুরূপী। যখন হুঁকা হাতে, খালি গায়ে, শুধু পায়ে "মাঠ তদারকে" বাহির হয়, তখন যে দাদাঠাকুর; যখন কপালে চন্দন, কাঁধে নামাবলি হাতে নৈবেদ্য, তখন 'পুরুত ঠাকুর'; আবার যখন পোষাক-আঁটা, ঘোড়ায়-চড়া, তখন ডাক্তারবাবু। তার আরও রূপ আছেঃ যখন ঢুলুঢুলু নয়নে, স্খলিত বসনে চঞ্চল চরণে ফেলু শা-র দোকান হইতে বাহির হয়, তখন সে অপরূপ!

কিন্তু এ-হেন রামদাস-চরিতামৃতের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে লইতে গেলে একটু পূর্বভাষের প্রয়োজন। রামদাসের পিতা ত্রিলোচন ভট্টাচার্য পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস নয় বৎসর বয়সেই পিতার সহকারিরূপে ব্রতী হন। দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রামদাস। বল্লভপুরের গুরুমশায় যখন জানাইলেন, রামদাসকে আর তিনি পাঠশালায় রাখিতে পারেন না, ত্রিলোচন তখন পুত্রের পরিণামচিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এইরূপে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অকস্মাৎ সম্মুখে কূল দেখিতে পাইলেন। তাঁর এক যজমানের বন্ধুর জামাতা সুকুমার মৈত্র কলিকাতায় ডাক্তারি করেন। সুকুমারবাবু শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন, শ্বশুরের অনুরোধে, ত্রিলোচনের আশীর্বাদে বদ্ধ হইয়া রামদাসকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। সুকুমারবাবুর ক্ষুদ্র পরিবার; বন্দোবস্ত হইল, রামদাস তাঁর বাসায় রাঁধিবে, আর সুবিধা ও 'সাবকাশ' মত পড়াশুনা করিবে।... মহা উৎসাহে রামদাস নিজের ক্ষুদ্র পুঁটলিটি কোমরে বাঁধিয়া সবে এই সতের বৎসব-মাত্র বয়সে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। নিজের কলি-হুঁকাটি লইতে ভুলিল না, কিন্তু মনের আনন্দে বাপভাইকে বিদায়ের প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল।

সুকুমারবাবু রামদাসের গুণগ্রামের পরিচয় কিন্তু পূর্বে পান নাই। একে একে তিনি দেখিলেন, রামদাস বিনা লবণে দাল রাঁধিতে পারে, ঝাল ব্যাতীত মাছের ঝোল রাঁধে, তেল না হইলেও 'ভাজাভুজিতে' তার আপত্তি নাই। প্রায়ই যেখানকার ঝাল-মসলা-লবণ, সেখানেই পড়িয়া থাকে, রামদাস এদিকে অবাধে ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া যায়। এইরূপে ডাক্তারবাবুর দিনে দিনে আশঙ্কা জন্মিতে লাগিল, বুঝি বা শাপভ্রষ্ট নল রাজা প্রচ্ছন্নবেশে পাচকরূপে তাঁহাকে ছলিতে আসিয়াছেন।

চিত্র-বিচিত্র (১৯০২), ডাক্তারবাবু

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বহুদিন পূর্বে ইণ্ডিয়ান মিরর্-এ দেখিয়াছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্য গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে, হিন্দুরা যাঁহাকে পরমহংস বলে, সে-পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বসুপাড়ায় দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন। কৌতুহলবশতঃ দেখিতে যাইলাম, কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথবাবুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছে ও কেশববাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছে। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে?" আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, "ঢং দেখ! সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে কিনা!" আর কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর স্ট্রীটস্থ বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন; সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধুকীর্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোক-সমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ-পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত: অতি দীনভাবে পুনঃপুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি আমার পূর্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে!" কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখবে?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি, কিন্তু জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ

ব্রজেন্দ্র আর একবার যমুনার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। সেই সুন্দরীর অনুপম রূপরাশি-সুন্দর মুখকান্তি— মুহূর্তমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে একটা পরিবর্তন ঘটাইয়া দিল। যমুনাও নীরবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে; সেই কর্ণবিশ্রান্ত পদ্মনেত্রের বিলোল-কটাক্ষ তাঁহার হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। সে-কটাক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই, তীব্রতা নাই, বিদ্যুদ্দামের বিকাশ নাই। সে-কটাক্ষ সরল, মধুর, সহাস। তাহাতে যেন কেমন একটা মাদকতা আছে, কেমন একটা মোহ আছে, কেমন একটা-কি বিজড়িত রহিয়াছে। ব্রজেন্দ্র চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না, একদৃষ্টে সেই মূক-বধির যুবতীর মুখপদ্মের দিকে লোলুপনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অজয় অন্যমনস্ক ছিলেন, ব্রজেন্দ্রের সে-ভাব লক্ষ্য করেন নাই।

এদিকে যমুনার হৃদয়েও চাঞ্চল্য জন্মিল। যমুনা এ-পর্যন্ত কোন পুরুষের প্রতি এরূপভাবে দৃষ্টিপাত করে নাই, কখন তাহার দৃষ্টি কাহারও উপর এত অধিকক্ষণ স্থায়ীভাবে থাকে নাই। যমুনা মূক-বধির যুবতীর, কিন্তু তাহার হৃদয় নারীজাতির হৃদয়ের উপকরণে গঠিত। পুষ্পধন্বার পঞ্চশর সর্বত্র অব্যাহত। ব্রজেন্দ্রকে দেখিয়া যমুনা পঞ্চশরের বশীভূত হইল।...

ব্রজেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। অজয় তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করিতে অনুরোধ করিলেন। যমুনাও ইঙ্গিতে তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রজেন্দ্র সম্মত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। যমুনার সেই কৃষ্ণতারা নয়নের বিল্লোল কটাক্ষ, অজয়ের অজ্ঞাতে ব্রজেন্দ্রকে অনেক কথা বলিল। ব্রজেন্দ্র প্রস্থান করিলেন— মূক-বধির যুবতীর বিপুল উরস চঞ্চল করিয়া একটি সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস পতিত হইল।

যমুনা পিতার ন্যায় গর্বিত ও উদ্ধতপ্রকৃতি। তাহার আচরণে বাড়ীর দাস-দাসী ভয়ে কম্পিত। মুখ দিয়া কর্কশ কটু বাক্য বিনর্গত না হইলেও তাহার ক্রোধবিস্ফারিত নয়নদ্বয় হইতে যে-নীরব ভৎর্সনা বাহির হইত, তাহাই যথেষ্ট। ফণিনীর ক্রুরতা এবং দংষ্ট্রানির্গত বিষভয়ে যেমন কেহ তাহার মস্তকমণি গ্রহণ করিতে সাহস করে না, সেইরূপ কোন যুবকও যমুনার তেজস্বিতা ও অহঙ্কারের কথা ভাবিয়া তাহার দিকে সপ্রেমদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে সাহস করিত না। ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন হইতে যে-অস্বাভাবিক তেজ বাহির হইত, তাহার সম্মুখে সকল যুবককেই মস্তক নত করিতে হইত। যমুনার হৃদয় কঠিন পাষাণবৎ হইলেও আজি তাহাতে কোমলতা দেখা দিলে। পুষ্পচাপের শরাঘাতে পাষাণেও পুষ্প ফোটে, মরুভূমিতেও প্রবাহিণী ছোটে।

যমুনা (১৯০২), সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুখে হউক, দুঃখে হউক, দিন যায়, থাকে না...। কল্যও এমনই নিশা প্রভাত হইয়াছিল। কিন্তু সে-প্রভাতে আর এ-প্রভাতে কি প্রভেদ! সংসারের সুখ নিতান্তই জলের বিম্ব— বাতাসের ভার সহে না। আজও তেমনই পূর্ব দিক-চক্রবালে রক্তরাগ দিয়া কিরণ-কিরীটী মহাদ্যুতি অরুণ-সারথি একচক্ররথে নিশার রাজ্যে সমুদিত। আজও তেমনই উষানিল-বীজনে বিহগকণ্ঠে কলকাকলী ধ্বনিত। আজও তেমনই নিশাপগমে জীবজগৎ জাগরিত। জড়জগতে পরিবর্তন কোথায়? পরিবর্তন মনে। হৃদয়দর্পণে বিষাদের ছায়া পড়িলে আর কোনও প্রতিবিম্বই স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল, পরিস্ফুট হয় না। অশ্রু-আবিল লোচনে দৃষ্ট পদার্থ ঔজ্জ্বল্যহীন, মলিন দেখায়। কুমুদিনীর নয়নে আজ জগৎ শ্রীহীন, মলিন; তাঁহার নিকট জীবন সুখলেশহীন ভারমাত্র।

অদ্য যে আপনাকে সর্বসুখে সুখী ভাবিয়া গর্বিতা, কল্য যদি তাহার সে-গর্ব খর্ব হইয়া যায়, তবে তাহার জীবনে আর কি সুখ থাকে? অদ্য যে সংসারের সর্ব সুখসম্পৎশালিনী, কল্য যদি মুহূর্তে তাহার সে-সম্পদভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে তাহার জীবনে বেদনা ব্যতীত আর কি থাকে? আজ যাহার সব আছে, কাল যদি তাহার সব যায়, তবে সে আর কি সুখে বাঁচিয়া থাকে? রমণীর সুখ বল, ঈশ্বর্য বল, গর্ব বল, সবই স্বামীতে। পতির প্রেমবঞ্চিতা নারী মুকুটমণ্ডিতা রাজেন্দ্রাণী হইলেও ভিখারিণীর অধিক দুঃখিনী। যে-রমণী স্বামীর ভালবাসা হারায়, তাহার আর কি থাকে? কাল কুমুদিনীর সব ছিল; আজ তাঁহার কিছুই নাই। কাল জীবনে সুখ ছিল, হৃদয়ে আনন্দ ছিল, সংসারে আকর্ষণ ছিল। আজ আছে জীবনে জ্বালা, হৃদয়ে বেদনা, নয়নে অশ্রু।...

কুমুদিনীর সন্তান ছিল না। দেবর যোগেন্দ্রনাথের পুত্রদিগকেই তিনি অপত্যস্নেহে পালন করিয়াছিলেন। আজ এই বিষম বেদনায় তিনি তাহাদিগকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তপ্তবক্ষ জুড়াইল কি? মরুময় হৃদয় উর্বরতা লাভ করিল কি? জ্বালার শান্তি হইল কি? একের অভাব কি অন্যে পূর্ণ হয়?..

নলিনী আসিল না।

প্রেমের জয় (১৯০২), দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ: দুঃখের আস্বাদ

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্বতশিখরে, বায়ুকম্পিত নদীর তীরে, দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রান্তমধ্যে ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন? বালক ভাবিতেছে; আবার ভাবিতেছেন বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল। কি আশ্চর্য! কে এরূপ করিল? পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদিকবি কারণের কারণ পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল! ভক্তেরা যে-যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, সকলে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁহারা কখন শুনে নাই— যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেম-মাখা বালকের মা মা বলে ডাকা তাঁহারা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই। আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখিবার প্রয়োজন কি? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ দেখিবার প্রয়োজন কি? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহমধ্যে কি তা-ই দেখিতেছি? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে? অবতার হউন, আর না হউন, ইহার চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার যো নাই। ইহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। দেখি, ইহার হৃদয়সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখবিগলিত হরিনাম আর মায়ের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, "মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত!... দেহসুখ চাই না, মা; লোকমান্য চাই না; অষ্টসিদ্ধি চাই না; কেবল এই ক'রো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ (১৯০২) চতুর্দশ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলবার অবকাশ পেলেম কই? কথা হয়েছে কাল, চলেছি আজ। অন্য রমণীর মত স্বামিবিচ্ছেদে কাঁদতে তোমায় ঘরে আনি নি। এনেছি আমরা অনুপস্থিতিতে আমার স্থান অধিকার ক'রে কার্য করতে। এখন তোমাকে কি বলতে এসেছি, শোন। তুমি সহধর্মিণী; পরামর্শে মন্ত্রী, বিষাদে সান্ত্বনা, চিন্তায় অংশভাগিনী। তোমাকে কিছু গোপন করার আমার অধিকার নেই। আগ্রা আমাকে যেতেই হবে। শুনলুম, আমাকে জ্ঞানলাভের জন্যে কিছুকাল সেখানে থাকতেও হবে, তবে সেখানে গিয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করি আর নাই করি, যাবার পূর্বে এই যশোরেই আমি আমি অনেক শিক্ষা লাভ করলুম। বুঝলুম, কপট-ভালোবাসায় গা ঢেলে এত কাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি— রাজ-ঐশ্বর্যমধ্যে বাস করেও আমি দীন হতে দীন। আজ আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃহীন। মায়াময়ী প্রেমময়ী ভার্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুতলী কন্যা. এমন অপূর্ব সম্পদের অধিকারী হয়েও আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী; খুল্লতাতের এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করব, তোমাদের ত্যাগ করব, কোন্ অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন্ অপরিচিত পবগৃহে নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা কবব। শুধু চিন্তা— বিরহ-সহচরী চিন্তা। আমাকে আশ্বস্ত করতে আমি, পীড়ন করতে আমি— মুহূর্তে মুহূর্তে সঞ্চিত, দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত, সাগরতুল্য গভীর, ধরণীতুল্য দুর্ভর চিন্তা, কেবল চিন্তা!...

তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি আগ্রা থেকে ফিরব। কিন্তু এমন মূর্তিতে ফিরব না। এই রাজ-পরিচ্ছদের আবরণে পরমুখাপেক্ষী দাসমূর্তি লয়ে আমি আর যশোরে পদার্পণ করব না। তুমি পুত্রকন্যা লয়ে অতি সাবধানে দিন যাপন ক'রো। যত দিন না ফিরি, তত দিন পর্যন্ত বিন্দুমতীকে শ্বশুরালয়ে পাঠিও না। উদয়াদিত্যকে একদণ্ডের জন্যেও কাছ-ছাড়া ক'রো না। সর্বদা চোখে চোখে রাখবে। আমি বসন্ত রায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না।

.প্রতাপ-আদিত্য (১৯০৩), দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

উমেশচন্দ্র গুপ্ত

আমি বোনের নিষ্প্রভ ম্লান মুখ আর দেখিতে পারি না: তার সে লাবণ্য নাই, সে-কান্তি নাই, সে-প্রফুল্লতা নাই, সে-প্রসন্নতা নাই। সে আপন ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছে। যেখানে সকলে আমোদ করে, আহ্লাদ করে, দুটো সুখ সমাবেশের কথা কয়, সে সেদিক মাড়ায় না। আমি একদিনও দেখিলাম না যে, সুরমা হাসিয়া কথা কহিতেছে, কোনও আনন্দ উৎসবে যোগ দিতেছে। বার বছরের মেয়ে, তবু কত গম্ভীর, কত স্থির-ধীর! কত লজ্জা, কত নম্রতা! একালের মেয়েরা তাস খেলে, নভেল পড়ে, কত-কি ছন্দোবদ্ধে কথা কয়; কিন্তু সুরমা একদিনের তরেও উহাদের কাছে গেল না! কাহারও সঙ্গে মেশে না, কাহারও বাড়ী যাইতে ভালবাসে না। মা তার জন্যে যত কাঁদেন, সে ততই পাষাণ হইতেছে। এ-বয়সেও কেবল দিনরাত রামায়ণ, মহাভারত ও চাণক্যশ্লোক প্রভৃতি ভাল ভাল বই পড়িয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকে। এ-বইগুলি সুরমার যেন কণ্ঠহারবিশেষ।

হতভাগিনী সুরমার এই অবস্থাতে আমি কেমন করিয়া বিবাহ করিতে পারি? আমি তার অশ্রুজল মুছাইয়া দিব, না তার অশ্রুপাতের নিদান হইব? আমি কোন্ প্রাণে তার সামনে সুখের পসরা সাজাইয়া বসিব? আপনারা কি আমাকে পশু অপেক্ষা অধম মনে করিয়া থাকেন? আমি যখনই সুরমার জীবন্ত দাহ ও আমার সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভার পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করি, তখনই আত্মহারা হই, আমার অস্তিত্ব আমি ভুলিয়া যাই। আমার মত হতভাগ্য জীবের কি আর বিবাহ করা সাজে? মায়ের শুশ্রূষা? তা আমি ও সুরমা থাকিতে তাঁর কিসের অভাব? তিনি যতদিন আছেন, তাঁর কোনও কষ্টই হইবে না। পুত্রবধূ শাশুড়ীর শুশ্রূষা ও পরিচর্যা করিবে? আপনারা কি এখনও এ-হতভাগাদের দেশে সে আশা করেন? যে-বিবাহে আমার একমাত্র আরাধ্য মাতৃদেবীর পূজাবিঘ্ন ঘটিতে পারে, যে-বিবাহে সুরমার হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, আমি কখনই সে-বিবাহে সম্মত হইতে পারি না। সুরমা এখনও তার পরিণামের গুরুত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, আমি বিবাহ করিয়া কেন ঘুমন্ত বাঘকে জাগাইয়া দিব? কেন তার নিদ্রিত প্রাণের জাগতি সম্পাদন করিব? আমার অদৃষ্টের সুখ থাকিলে আমি হিন্দুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিতাম না, বাবাও সুরমাকে বাল্যবিবাহ দিয়া অকালে সাগরে ভাসাইয়া দিতেন না।

শান্তিলতা (১৯০৩), প্রথম পরিচ্ছেদ: সুরেশচন্দ্র

শিবনাথ শাস্ত্রী

হেয়ার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে নামক তাঁহার এক বন্ধুকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারই সঙ্গে বর্তমান কয়লাঘাটের নিকটস্থ এক ভবনে বাস করিতেন। সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১শে মে দিবসে রাত্রি ১টার সময় তিনি হঠাৎ দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি আমরণ কৌমার্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে-সময়ে তাঁহার প্রিয় বেহারী ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন না। দুই-একবার দাস্ত ও বমন হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে, কালশত্রু তাঁহাকে ধরিয়াছে। নিজের বেহারাকে বলিলেন, "গ্রে সাহেবকে গিয়া আমার জন্য কফিন আনাইতে বল।" প্রাতঃকালে ডাক্তার ডাকা হইল।... চিকিৎসা-বিদ্যাতে যাহা হয়, ঔষধে যাহা করিতে পারে, বন্ধুজনের যত্ন, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রইল না। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন ওলাউঠা হইলে সর্বাঙ্গে ব্লিষ্টার লাগাইত। তদনুসারে হেয়ারের গাত্রে ব্লিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে তিনি ধীরভাবে প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন, "প্রসন্ন, আর ব্লিষ্টার দিও না: আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও।" এই বলিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা শান্তভাবে যাপন করিয়া ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে "হেয়ার চলিয়া গিয়াছেন" এই সংবাদ কলিকাতা সহরে প্রচার হইলে উত্তরবিভাগে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে-সকল দরিদ্র পরিবারের পিতামাতা ছিলেন, সেই সকল পবিবারের হিন্দুরমণীগণ আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তিনি যে-সকল বালককে পালন করিতেন, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিমুখে ছুটিল। গ্রে সাহেবের ভবনে ছোট বড় বাঙ্গালী ভদ্রলোক লোকারণ্য। হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় রাধাকান্ত দেব হইতে স্কুলের ছোট বালক পর্যন্ত কেহ আর আসিতে বাকি থাকিল না।... তাঁহার শব যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল, তখন গাড়ীতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা সেদিন যে-দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহা আর দেখিবে না।... একদিকে সহরের পথে যেমন শোকের বন্যা, অপরদিকেও তেমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হইতে লাগিল। মনে হইল, দেবগণও প্রচুর অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন। এইরূপ সুরনরে মিলিয়া হেয়ারের জন্য শোক করিলেন।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৩), সপ্তম পরিচ্ছেদ

জগদীশচন্দ্র বসু

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা সেখানে ফুরাইয়া যায়, সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক সেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন; শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে-রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্যনিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বারা অসংখ্য! প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন, সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখা-ই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ-কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই সেখানে একত্র মিলিয়াছে, সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি— উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।

অব্যক্ত, বিজ্ঞানের সাহিত্য (১৯০৪), কবিতা ও বিজ্ঞান

দীনেন্দ্রকুমার রায়

চন্দ্রকান্ত শর্মা লোকটি পরিণতবয়স্ক, বেঁটে, কাল। পরিপুষ্ট গোঁফজোড়াটা মোটা, এবং ঝাঁটার মত সোজা। পাঠশালার কোন ছেলের উপর রাগ করিয়া যখন তিনি এই গোঁফে 'চাড়া' দিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চাহিতেন, তখন তাঁহাকে যমের একটি ছোট-খাট সংস্করণ বলিয়া ভ্রম হইত; ছেলেরা তাঁহাকে যমের অধিক ভয় করিত। তাঁহার দাড়ী কামানো, মাথার অনেকখানি স্থান কেশ-সম্পর্ক-শূন্য; মাথার মধ্যস্থলে মরুভূমি-মধ্যস্থ ওয়েসিসের মত দুই চারি গাছি চুল ছিল মাত্র, টাকের সঙ্গে মানান করিবার জন্য সেগুলি তিনি খাট করিয়া কাটিতেন, ও চিরুনি-সাহায্যে সেগুলিকে একটু কায়দায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু চুলগুলি বড় স্থিতিস্থাপক ছিল, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা না বাঁকিয়া কদম্ব-কেশরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিত।...

চন্দ্রকান্তের কত বয়স হইয়াছিল, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না; তাঁহার মাথায় একগাছিও পাকা চুল থাকিবার যো ছিল না, সুতরাং তিনি বৃদ্ধ হন নাই; বিশেষতঃ তাঁহার দুইপাটি দন্তই এমন দৃঢ় ছিল যে, যখন তিনি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া দংষ্ট্রাপংক্তির পরস্পর সংঘর্ষণে কড়মড় শব্দ উৎপাদন পূর্বক কোন প'ড়োকে বলিতেন, 'তোর মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাব' তখন সে-কথা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত বোধ হইত না। প্রায় সকল ছাত্রকেই তিনি বলিতেন, 'তোর বাবা আমার ছাত্তর!' কিন্তু বয়সের কথা উত্থাপিত হইলে তিনি কখন চল্লিশের উর্দ্ধে উঠিতেন না। বস্তুতঃ তিনি চিরযৌবন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়, কিন্তু গৃহিণীর মুখরতাবশতঃ তিনি মধ্যে মধ্যে ধরা পড়িতেন; ব্রাহ্মণীর বয়স পঞ্চান্ন বৎসরের কম বোধ হইত না। এই অপরাধে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে চক্রবর্তী মহাশয়ের মধ্যে মধ্যে প্রেমকোন্দল বাধিয়া যাইত; কিন্তু ব্রাহ্মণী ত আর তাঁহার ছাত্র নহেন, কাজেই তাঁহাকে কখন কখন উচিত জবান শুনিতে হইত। কত দিন আমরা রাস্তা হইতে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী গর্জন করিয়া বলিতেছেন, "আ মোলো যা অলপ্পেয়ে মিনসে! আমি ম'লে তুই একটা নোলোক-পরা বৌ ঘরে আনবি না কি? চিরকালই ছেলের চামড়া গায়ে দিয়ে থাকতে চাস?" ব্রাহ্মণীর প্রতি ক্রোধটা চক্রবর্তী মহাশয় পাঠশালার ছাত্রবৃন্দের পৃষ্ঠে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিক্ষেপ করিতেন।

পল্লীচিত্র (১৯০৪), সেকালের পাঠশালা

সতীশচন্দ্র রায়

ছাত্র আসিয়া গুরুর পায়ে প্রণত হইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল: আজ আমার ব্রহ্মচর্যের কাল শেষ হইল। এখন আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আপনার স্নেহে এবং শাসনে আমি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারিয়াছি। মহাত্মন, আমি বললাভ করিয়াছি, আমার শরীর তেজে পূর্ণ হইয়াছে, মন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং হৃদয়ে করুণা আবির্ভূত হইয়াছে। আমি চন্দ্রসূর্যের মহিমা দেখিতে পাইয়াছি, অগ্নির তেজ আমি অনুভব করিয়াছি, বৎসরের ছয় ঋতুর আনন্দের আমি আস্বাদন করিয়াছি, বনের শান্তি আমার প্রাণে তিষ্ঠিয়াছে এবং পশুপক্ষী তরুলতার জীবনচেষ্টার উৎসাহ আমার চিত্তকে গিয়া স্পর্শ করিয়াছে... এখন আমাকে মনুষ্যসমাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেখানে আমার মত শত শত মানুষ রহিয়াছে, সেই গৃহস্থাশ্রমই জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। তরুলতা পশুপক্ষী আমাদের করুণা না হইলে বাঁচিতে পারে, ঈশ্বরই উহাদিগকে নানা উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন; কিন্তু মানুষ তো মানুষের ভালবাসা না পাইলে বাঁচে না— সেইজন্য গৃহস্থাশ্রমই প্রধান আশ্রয়, সেইখানেই মানুষের প্রধান কর্তব্য। কত দুঃখ সহিয়া, সুখে না মাতিয়া, কত ধীরভাবে পরের মঙ্গল করিয়া সেখানে থাকিতে হইবে— সেইখানেই আমাদের প্রধান পরীক্ষা, কিন্তু গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি ব্রহ্মচারী হইয়াছি, আমার কোন ভয় নাই, আমি সেখানে গিয়া মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব। আমার শরীর দৃঢ় হইয়াছে, ক্লেশে ভয় পাইব না; আমার জিহ্বা মধুময় হইয়াছে, কাহাকেও কথা দ্বারা কষ্ট দিব না; আমার কান গভীর শ্রবণশক্তি লাভ করিয়াছে, সকলকেই আমি ভালবাসিব। মহাত্মন্, আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম; আপনি আমার পিতা, আপনার আশীর্বাদ অক্ষয় কবচের মত চিরদিন আমাকে ঘিরিয়া থাকিবে। গুরো, এখন আদেশ করুন, আপনাকে কি-দক্ষিণা আনিয়া দিব? দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইব।

গুরুদক্ষিণা (১৯০৪)

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শীত যদিও পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি রাজ-উদ্যানের অতীব মনোরম শারদীয় সৌন্দর্য এখনো লুপ্ত হয় নাই; ঘন গাছের পাতার জাল অপরাহ্নের মৃদু বাতাসে হেলিতে দুলিতে অস্তমান সূর্যকিরণে সবুজ-সোনালী ও নানা আভার লাল রঙের বিচিত্র শোভা বিকীর্ণ করিতেছে; গাছের তলায় ক্রীড্যমান লাল নীল মাছে পরিপূর্ণ কৃত্রিম সরোবর-সকল প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবর্তনশীল কারুকার্য প্রতিবিম্বিত করিতেছে... কিন্তু যে-কয়টি অর্থপিশাচ সেখানে একত্র হইয়াছিল, প্রকৃতির মাধুর্যের সহিত তাহাদের কথোপকথনের কোন প্রকার সামঞ্জস্য ছিল না।

হাইমা নামক এক আমলা বলিতেছিল: "দেখুন দেওয়ানজী! দাঁড়িপাল্লা, মাল-- বইবার বাঁক আর ঘরে বিছোবার চাটাইয়ের উপর যে মাশুল বসবার কথা আমি গোড়ায় প্রস্তাব করি, এরি মধ্যে তার কি-রকম সুফল ফলেছে: জাঁক করে বলতে পারি যে, রাষ্ট্রীয় সভায় সচিবের পদ পেলে দুইদিনে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি ক'রে দিতে পারি..."

আরেক আমলা, তানাকা, তাহার কথায় বাধা দিয়া বলি: "দেখ, হাইমা! তুমি যা করেছ, আমি তা খাট করতে চাইনে, কিন্তু তোমার মাশুলের চোটে প্রজারা যে মহা গণ্ডগোল লাগিয়েছে!... কিন্তু দেখুন, দেওয়ানজী মশায়! আমি কলমের এক আঁচড়ে আপনাকে মবলক টাকা যোগাড় ক'রে দিয়েছি। হাইমা যে-টুকিটাকির উপর মাশুল আদায় ক'রে এত জাঁক করছে, আমার দ্বারায় এক চোটে তার একশ গুণ ঘরে এসেছে!..."

ইহাতে হাইমা কিছু গরম হইয়া বলিয়া উঠিল: "তোমার সে-জালজুয়াচুরীর কথা হচ্ছে, বুঝি?... এটুকু তোমায় বলি বাপু যে, সরকারী আমলা ছাড়া আর কেউ এ-সব বদমাইসি করলে তার আর ধড়ের উপর মাথা থাকতে হত না!..."

—"কি? তুমি সামুরাইকে জালিয়াৎ বলতে সাহস কর?" এই বলিয়া তানাকা তলওয়ারে হাত দিল।

—"বেশ! বেশ! খুব সামুরাই বটে! জাতের মুখ উজ্জ্বল করছে আর কি! এস ত বাপু! এস ত দেখি!" বলিতে বলিতে অপরটিও তলওয়ার ধরিল।

একটি বসন্ত-প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা-পুষ্প (১৯০৪), ১: ক্ষেত্র

শুভদিন শুভক্ষণে সিন্দুর ও দধির ফোঁটা পরিয়া, নারায়ণকে স্মরণপূর্বক বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিলাম। হর্ষবিহ্বলচিত্তে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরঘর করিতে চলিলাম। নারীজন্মের ইহাই পরিণতি। যাত্রাকালে আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছিল। শঙ্কিতচিত্তে আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলাম।

কলিকাতা পহুঁছিবার মধ্যপথে গাড়িতে স্বামীর মুখে যাত্রা শুনিলাম, তাহাতে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু মূর্চ্ছিত না হইয়া আপনাকে সামলাইয়া লইলাম। তখন নিমেষের মধ্যে আমার বিবাহের সকল ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। বাসরঘরে প্রথম আলাপে স্বামী বলিয়াছিলেন, "এখন শেষ রক্ষা হলে হয়।" এখন তাহার অর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম ও শুনিলাম, আমার এক সপত্নী বিদ্যমান। আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যখন বুঝিলাম যে, রূপের জন্য নয় (কেননা আমি সুন্দরী নহি) বা অর্থলালসার জন্যও নয় (কেননা আমরা দরিদ্র), কেবলমাত্র অনাথিনী, বোরুদ্যমানা, মুমূর্ষু বিধবার অন্তিমকালের অনুরোধে আমাদেরই জাতি রক্ষা করিবার জন্য আমার স্বামী আপনাকে এইরূপে বিপন্ন করিয়াছেন— এবং আমার সপত্নী আমার অপেক্ষা সুন্দরী ও ধনাঢ্যের কন্যা— তখন তাঁহার প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শান্ত করিলাম, বলিল, "শোন... আমি অন্য বাড়িতে যাইব না, তোমার বাড়িতেই থাকিব। বরং আপাততঃ তোমার বন্ধুপত্নীর পরিচয়ে উঠিব। পরে কি হয়, দেখা যাইবে।" তাহাই ঠিক হইল। সংসারানভিজ্ঞা মাতৃহীনা অপরিচিতা অন্তঃসত্ত্বা বিস্ময়বিহ্বলা বালিকা সপত্নীর অধীনে শ্বশুরগৃহে স্বামী ভাগ করিয়া লইতে চলিলাম। অবশিষ্ট পথটুকু ভয়, বিস্ময়, আত্মবিশ্বাস ও সকলের অধিক কৌতূহলে আমার বেপমান বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

সন্ধ্যার পূর্বে কম্পিতপদক্ষেপে স্পন্দিতহৃদয়ে স্বামীগৃহে অবতীর্ণ হইলাম। গাড়িতে আসিতে আসিতে সপত্নীর আদর্শ কল্পনায় অঙ্কিত করিয়াছিলাম; তাহাকে চাক্ষুষ করিয়া দেখিলাম, আমার কল্পিত মুখসের সহিত আসলের অত্যন্ত প্রভেদ। পশ্চিমেও অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন জ্যোতির্ময় লাবণ্য, এমন অপরূপ মাধুর্য, এমন বিচিত্র সৌন্দর্য আমার চক্ষে কখনও পড়ে নাই...

এইরূপ সন্দিগ্ধহৃদয়ে, বন্ধুপত্নীর ছদ্মবেশে, সপত্নীভবনে আসিয়া উঠিলাম। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী কেহ ছিলেন না।

পঞ্চমুখী (১৯০৪), বিচিত্র বন্ধন

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

জানকীর চতুর্থ পরীক্ষা চতুর্দশ বর্ষ বনবাসে। অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্য, দণ্ডকারণ্য হইতে দক্ষিণাপথে জন্মস্থানের প্রান্তপরিসর পদব্রজে এক মাস কি দুই মাসের পথ নহে; এবং বন বলিলে এখন লোকে যাহা বুঝে, সে বন-ভূমিও সে-প্রকারের বন নহে। কিন্তু জানকী, জনক-হেন রাজার কন্যা, দশরথ-হেন রাজাধিরাজের পুত্রবধূ এবং ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও, শুধু পতিপ্রেমের আকুলতায়, এই সমস্ত পথ পাদচারে চলিয়া গিয়াছেন, পথক্লেশে অবসন্ন হইয়া পড়িলেও পতির মুখমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই প্রাণে প্রফুল্ল রহিয়াছেন, পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটিলে হাসিমুখে তাহা সহিয়া লইয়াছেন, গাছের তলায় কঙ্কর-সংকীর্ণ ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়াও আপনার প্রাণাধিক পতিকে প্রীত-প্রফুল্ল রাখিতে যত্ন পাইয়াছেন, এবং গৃহবাসে বহুসংখ্য দাসদাসীর দ্বারাও যাহা না সম্ভবে, আপনি একা তাহা সে-সুকুমার বয়সে, অহরহঃ অক্লান্তশরীরে সম্পাদন করিয়া দূরস্থিত গোদাবরী হইতে জলের কলসী কাঁখে বসিয়া, ফুল তুলিয়া, ফল আহারিয়া, বিবিধ সুখাদ্য ও সুপেয় বস্তু সতত কুটীরে প্রস্তুত রাখিয়া, রাজ্যাধিকার-বঞ্চিত নির্বাসিত পতির তাপিত প্রাণ সুখশান্তিতে শীতল রাখিয়াছেন।

তারপর সে বন... বনে কোথাও ক্ষুধিত ব্যাঘ্রনিবহ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া বনভূমিকে নিনাদিত করিতেছে; কোথাও উচ্চণ্ড ভল্লুক-সকল পালে পালে ও দলে দলে পরিভ্রমণ করিয়া বন্য জন্তুরও শঙ্কা জন্মাইতেছে; কোন স্থানে বা বৃহৎকায় অজগর-সকল, নিশ্বাস-বহ্নিতে দাবানল সৃষ্টি করিয়া বনের প্রচ্ছায়া শীতল শ্যামল প্রদেশসমূহ পোড়াইয়া ফেলিতেছে; এবং বিকটমূর্তি বনচর রাক্ষসেরা, হাতে বিবিধ অস্ত্র লইয়া, মানুষের সর্বনাশ-বাসনায় সর্বদা চারিদিকে ঘুরিতেছে। পতিপ্রাণা ও প্রেমমাত্রপরায়ণা জানকী ইহার মধ্যেও নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তহৃদয়ে দিবারাত্রি পতিসেবায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং পতির মুখখানি মুহূর্তের তরেও মলিন দেখিলে তাঁহাকে একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য আপনার একটা প্রাণকে যেন শত প্রাণে প্রসারিত করিয়া তাহার পদতলে পাতিয়া দিয়াছেন।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা (১৮০৫)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বন্দে মাতরম্। বাঙালা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অতিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

এমন সময়ে মর্ত্যে কলির উদয় হল। লোকে ধর্মকর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন— হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, "আমি বাঙলার লক্ষ্মী; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাঙলা ছেড়ে চললেন।" রাজা কেঁদে বললেন, "না, মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি করছি।" রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বসলেন। দরবারে ব'সে পশ্চিমদেশে কনোজে লোক পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচজন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তারা বাঙলাদেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চল; তিনি আবার চঞ্চল হলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলার রাজা হলেন। হিঁদুর জাতিধর্ম নষ্ট হতে লাগল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মসজিদ তুলতে লাগলেন। অর্ধেক হিঁদু মোছলমান হন। হিঁদু-মোছলমান এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি-কাটাকাটি করলে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন— হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হল। তখন বাঙালাতে গৌড়ের পাঠান-বাদশা রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল হোসেনশা।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৫)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাস্তায় বাহির হইলে কত রকম ধরনের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়! কোন মুখ দেখিলে কাছে যাইতে ইচ্ছা করে; কোন মুখ দেখিলে পলাইতে ইচ্ছা হয়। কোন মুখ দেখিলে মনে হয়, সে হাজার অপরাধী হউক, সে যেন আমার কতদিনের জানা-শুনা! আবার কোন মুখ দেখিলে মনে হয় যেন আমাদের মারিতে আসিতেছে, না খাইতে আসিতেছে!...

একজন লোককে দেখিবামাত্রই তাহার সম্বন্ধে একটা না ভাব আমাদের মনে উদয় হয়। লোক-চেনার অভ্যাস ভাল রকম না থাকিলে অনেক সময় আমরা ভুল করিতে পারি। ভাল লোককেও মন্দ মনে করিতে পারি, মন্দ লোককেও ভাল মনে করিতে পারি। লোক চেনাও বড় সহজ নয়। কতকগুলি অক্ষর ও তাহার যোগাযোগে যত বাক্য হয়, তাহা শিখিলে যেমন আমরা একটি ভাষা শিখিতে পারি, সেইরূপ মুখ-চিহ্ন দেখিয়াও আমরা মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র এত বিভিন্ন যে, তাহার অনুরূপ মুখের গঠন-চিহ্নও অসংখ্য। তাহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। সেইজন্য পণ্ডিতেরা এখনও ইহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই বিষয় অনুশীলন করিয়া তাঁহারা যে-সকল চিহ্ন ও নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহা সকলেই অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এইরূপ পরীক্ষায় আমোদও আছে, উপকারও আছে।

কারবারের অধিকাংশ কাজ বিশ্বাসে বিশ্বাসে চলে। যাহাদের লোক চিনিবার অভ্যাস নাই, তাহারা যে-কাজের যে উপযুক্ত তাহা বুঝিয়া লোক রাখিতে পারে না: হয়তো অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এইরূপ মুখ-পরীক্ষার আর-একটি সুফল আছে। আমরা বাঙ্গালী, আমরা চতুর্দিকে যাহা দেখি, কিছুই ভাল করিয়া দেখি না। সব জিনিসই যেন আমরা চোখ বুজিয়া দেখি। সম্প্রতি কলিকাতায় যে-মহামেলা হয়, তাহা দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক ত গিয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর দেখি: অমুক জিনিসটা কিরূপ দেখিলে?— অমনি চক্ষুস্থির। কেহ হয়তো বলিবে, "বেশ দেখিলাম, চমৎকার দেখিলাম, এমন ভাল যে, না দেখিলে বুঝান যায় না!" কেহ বলিবে, "তাতে এমন একটা ইয়ে আছে যে ইয়ে হয়েছে, সেটা কিছুতেই ইয়ে করা যায় না!" একজন ইংরাজকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি, প্রত্যেক জিনিসের তন্নতন্ন বর্ণনা করিবেন, একটি খড়িকা পর্যন্ত তিনি ছাড়িবেন না। তাই বলিতেছি, যদি এই মুখ-পরীক্ষার আর কোন ফল না হয়, অন্ততঃ খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার অভ্যাসটি হয়।

প্রবন্ধমঞ্জরী (১৯০৫), ততঃ মুখ-চেনা

ফুল্লরা বলিল: তুমি এখানে কি করিয়া থাকিবে, আমি বার মাসে কত কষ্ট সহ্য করি, তুমি নবনীত-কোমলা, তুমি তাহা কেমন করিয়া সহিবে? এই দেখ তাল-পাতার ছাউনি, ভাঙ্গা কুঁড়ে, মধ্যে ভেরেণ্ডার থাম, বৈশাখী ঝড়ে তাহা প্রায় প্রত্যহ ভাঙ্গিয়া যায়— তুমি কেমন করিয়া এ-ঘরে থাকিবে? জ্যৈষ্ঠে পশরা করিতে কত কষ্ট, খরতর রবি-কিরণে পথের বালু উত্তপ্ত হইয়া যায়, হাঁটিতে শরীর ঘর্মজলে সিক্ত হয়। প্রায়ই জ্যৈষ্ঠমাসে বইচির ফল খাইয়া আমি উপবাস করিয়া থাকি। আষাঢ়ে আকাশ নব মেঘে পূর্ণ হইয়া যায়, বড় বড় গৃহস্থের তখন সম্বল টুটিয়া যায়, মাংসবিক্রয় হওয়া কষ্টকর হয়; পশরা ছাড়িয়া যদি তৃষ্ণায় একটু জল খাইতে যাই, তবে দেখিতে দেখিতে চিলে অর্ধেক সাবাড় করিয়া ফেলে। শ্রাবণ মাসে পথ-ঘাট জলে একাকার হইয়া যায়, কচুর ঝাড় ও শেওলা ভাঙ্গিয়া এক-হাঁটু জলে পশরা মাথায় লইয়া যাই, তখন কত জোঁকে আসিয়া পায়ের রক্ত খায়, আমার কর্মদোষে সাপে দংশন করে না। ভাদ্র মাসের দুরন্ত বাদলে কুঁড়ে ঠেলিয়া বান আসিয়া পড়ে, গাত্রে আচ্ছাদন নাই, বৃষ্টির জলেই স্নান করি। 'মাটিয়া পাথর'খানাও জুটে না; ঐ দেখ, কুঁড়ের ভিতর গর্ত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাতে আমানি রাখিয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করি। আশ্বিন মাসে ঘরে ঘরে দেবী চণ্ডিকার পূজা হয়: নববস্ত্রপরিহিত যুবক-যুবতীগণের আনন্দের সীমা নাই, অভাগিনী ফুল্লরা হরিণের ছড় পরিয়া দিন যাপন করিয়া থাকে। আশ্বিন মাসে মাংস-বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; দেবীর প্রসাদ-মাংস সকলে পাইয়া থাকে, এই আনন্দের সময় আমরা নিরানন্দে কাটাই। কার্তিক মাসে হিম পড়িতে আরম্ভ হয়, কুজ্ঝটিকায় শিকার দেখা যায় না, আমাদের নিত্য উপবাস। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন, তখন চাউলের মূল্য সুলভ হয় বটে, আমরা নিত্য উপবাসী থাকি না, মাঝে মাঝে পেট পুরিয়া দুটা খাইতে পাই, কিন্তু পুরান ছেঁড়া দোপাটায় শীত ঘুচে না। মাঘ মাসে শীতে থর থর করিয়া কাঁপিয়া খড়ের আগুন জ্বালিয়া শীত নিবারণ করি, তখন বনে একটি শাকও থাকে না। তুমি কি করিয়া এই গৃহে থাকিবে? তুমি রাজনন্দিনী, আমরা ভিখারিণী। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মন্দমারুতে কাননে নানা প্রকার পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠে, দম্পতীগণ প্রেমোৎসবে, বসন্তোৎসবে মত্ত হয়, অভাগিনী ফুল্লরা তখন ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতে থাকে।

ফুল্লরা (১৯০৫)

নিখিলনাথ রায়

বালার্ক-কিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনশৃঙ্গ যাঁহার কিরীট, তরঙ্গায়িত নীরনিধি যাঁহার মেখলা, সুচিত্রিত রাজব্যাঘ্র যাঁহার বাহন, ভাগীরথী পদ্মাবতী ব্রহ্মপুত্র-সলিলসেকে যিনি সর্বদা অভিষিক্তা, সেই শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসবিনী আমাদের মাতৃভূমি। তিনিই আমাদের সোনার বাঙ্গলা। তাঁহার জলে সোনা, স্থলে সোনা, ফলে সোনা। তাঁহার অঞ্জলিপরিমাণ জল ছিটাইয়া দাও, দেখিবে সোনা ফলিবে; অর্ধহস্ত ভূমি কর্ষণ কর, দেখিবে সোনা ফলিবে; বৃক্ষে বৃক্ষে চাহিয়া দেখ, সোনা ফলিয়া রহিয়াছে। আবার তাঁহার গৃহে গৃহে সোনা ফলিত, ব্রাহ্মণবিধবার হস্ত হইতে তন্তুবায়ের তন্ত্রে পর্যন্ত সোনা ফলিয়া থাকিত। তাই মা আমাদের অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া যুগযুগান্তর হইতে সমগ্র জগতে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। জগতের আদিম অবস্থায় যখন মানবসভ্যতার প্রভাত-তপন ভারতবর্ষে স্বর্ণকিরণ বিকিরণ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই দুই একটী ছটা ক্রমে ক্রমে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে নিপতিত হইয়া তাহাকে স্বর্ণভূমি করিয়া তুলে। আর্যসভ্যতার কৃষিবাণিজ্যবিজ্ঞান বঙ্গের উর্বরভূমিতে সোনা ফলাইতে আরম্ভ করে। তাই মা আমাদের ক্রমে ক্রমে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে নিপতিত হইয়া তাহাকে স্বর্ণভূমি করিয়া তুলে। আর্যসভ্যতার কৃষিবাণিজ্যবিজ্ঞান বঙ্গের উর্বরভূমিতে সোনা ফলাইতে আরম্ভ করে। তাই মা আমাদের ক্রমে ক্রমে স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়া সোনার বাঙ্গালা হইয়া উঠিয়াছিলেন ও ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইয়া সন্তানগণের মস্তকে নিয়ত কল্যাণবর্ষণ করিতেন। এই সোনার বাঙ্গলার সোনার বঙ্গের শস্যরাশি ভারতের বহু স্থানের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বৃহৎকায় জলযানে দেশ-দেশান্তরে, দ্বীপদ্বীপান্তরে নীত হইত— গ্রীক ও রোমক-সভ্যতাদীপ্ত ইউরোপ পর্যন্তও ধাবিত হইয়াছিল। ইহার গর্ভজাত লবণরাশি বহুদেশের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার সাথী হইত। ফলমূলও সুরুচির উদ্রেক করিত। এই সোনার বাঙ্গলার সুচিক্কণ বস্ত্রপুঞ্জ ভারতের লজ্জানিবারণ করিয়া নানা দেশের লজ্জানিবারণ করিতে করিতে ইউরোপীয় মহিলার অঙ্গ-আবরণে নিযুক্ত হইত। সভ্যজগৎ তাহার কারুকার্যে মোহিত হইয়া যাইত। বিলাসিনী রোমক মহিলাগণ এই সুচ্চিকণ বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া আপনাদের রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেন। ইহারই স্বর্ণবর্ণের রেশম ও রেশমী বস্ত্র সভাজগতের বিস্ময় উৎপাদন করিত। এশিয়ার সর্বত্র ও ইউরোপে তাহার আদরের সীমা ছিল না। যে-সোনার বাঙ্গলা একদিন সমগ্র জগতে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়াছে, আজ তাহার সর্বত্র অন্নের হাহাকার উঠিয়াছে। আজ তাহার সন্তানগণ নগ্নকায় ঢাকিবার জন্য বিদেশীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। কেন আজ সোনার বাঙ্গলার এ-দুর্দশা ঘটিল?

সোনার বাঙ্গলা (১৯০৬)

বিধুভূষণ বসু

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে; স্বামীর আফিস হইতে আসিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া কমলা উৎসুক নেত্রে বারবার পথের দিকে চাহিতেছেন। হস্তপদ প্রক্ষালণের জল এক প্রাত্রে, মুখ প্রক্ষালনের সুবাসিত শীতল জল অন্য পাত্রে রাখিয়া কমলা ষ্টোভের উপর চায়ের জল গরম করিতেছেন। পার্শ্বে জলখাবার প্রস্তুত; হাতের কাছে পাখা। পাখাখানি বেশ পরিষ্কার, তবু দুই-তিনবার কমলা তাহা ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিলেন। একবার একটু বাতাস করিলেন, যেন পাখার বাতাস তৃপ্তিপ্রদ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। পালঙ্কের উপর সুপরিচ্ছন্ন শয্যা বেশ করিয়া ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিলেন। আঁচল দিয়া চেয়ারখানি মুছিলেন; টেবলটি ঝাড়িলেন; বই, কাগজ, কলমদানি ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিলেন। ক্রমে ছয়টা বাজিল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল; তবু যাঁহার জন্য কমলা গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলেন না, তিনি আসিলেন না। কমলা বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। আফিস হইতে আসিতে এরূপ বিলম্ব মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, চিন্তার কোনও কারণ নাই; কিন্তু এরূপ হইলে কমলার মন বড় ভাল লাগে না; কেমন একটা উদ্বেগ আসিয়া পড়ে। অন্য কাজে মনোনিবেশ করা যায় না। কি করা যায়? কমলা স্বামীর গড়গড়ায় জল ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন, তবু আবার ফিরাইলেন, নলটিতে ফুঁ দিয়া অনর্থক তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলেন। আঁচলের বাতাস দিয়া দেওয়ালের ছবিগুলি ঝাড়িতে লাগিলেন।

বালিকা ফুলরাণী বাবার পা টিপিবে, মাথা আঁচড়াইবে, পিঠে হাত বুলাইবে, আর তাঁহার কাছে ভাল গল্প শুনিবে ভাবিয়া অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। বাবা আসিলেন না দেখিয়া বালিকার ধৈর্যচ্যুতি হইল, ছুটিয়া খেলিতে গেল। কমলার বড় দায় হইল; এদিকে গৃহকর্মের সময় যায়। ঝি আসিয়া বলিল, "উনুনে কয়লা ধরাইব?" "একটু বাদে ধরাইও" বলিয়া কমলা তাহাকে বিদায় করিলেন। কিন্তু আর এরূপে বসিয়া থাকা যায় না। রান্নার আয়োজন করিতে হইবে, খোকাকে দুধ খাওয়াইতে হইবে; নরেন্দ্রনাথের ক্ষুধা পাইয়াছে, সকালে সকালে তাহাকে ভাত দিতে হইবে; শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আহ্নিক করার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কমলার বড় রাগ হইল। ভাবিলেন, আজ আসিলে ঝগড়া করিব!

সতী-লক্ষ্মী (১৯০৬), প্রথম পরিচ্ছেদ

বড় চোর ভারি সেয়ানা। সে ভাবিল, "মাঠে মাঠে কে গরু তাড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়! ও-কাজটা ছোট চোরের পক্ষেই মানাইবে ভাল। আমি গাছের গোড়ায় দুই-চারি কলসী জল ঢালিয়া সমস্ত দিন বেশ মজা করিয়া বেড়াইব।" এই ভাবিয়া সে গাছে জল দিবার ভার লইল। আর ছোট চোরের ভাগ্যে জুটিল গরু চরান। পরদিন ভোরের বেলা ছোট চোর গরু লইয়া বাহির হইল, আর বড় চোর গাছে জল ঢালিতে সুরু করিল। সে ভাবিয়াছিল, দুই-চারি কলসী ঢালিলেই গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইবে; কিন্তু কি-সর্বনাশ! যত ঢালে, সব জল কোথায় শুকাইয়া যায়! একরত্তি মাটি ভিজিতে না ভিজিতে তাহার আর চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্ত সকাল, সারা দুপুর, এমন কি সন্ধ্যা পর্যন্ত শত শত কলসী জল ঢালিল, কিন্তু কিছুতেই সেই পোড়া গাছের গোড়ায় একবিন্দুও দাঁড়াইল না! শেষে একেবারে ক্লান্ত হইয়া বেচারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ওদিকে ছোট চোরের দুর্দশার অবধি ছিল না। সে গরুটা চরাইবার ভার লইয়াছিল। গ্রামের মধ্যে সেইটাই সকলের ওঁচা। তেমন দুরন্ত গরু আশেপাশে আর একটাও দেখা যাইত না। ছোট চোর গরুটী লইয়া সেই মাঠে গিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, অমনি সে শিং বাগাইয়া, লেজ উঠাইয়া, চারি পা তুলিয়া লাফ মারিল এবং চক্ষুর পলকে এ-মাঠ সে-মাঠ, একজনের ধানের ক্ষেত হইতে অপরের ক্ষেতে, কাহাও তরিতরকারির বাগানে, কাহারও শস্যের খামারে— এইভাবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট চোর সমস্ত দিন গরুটার পিছন পিছন ছুটিয়া একেই ভয়ানক ক্লান্ত, তাহার উপর যাহাদের ফসল নষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের গালাগালিতে দুঃখে-কষ্টে একেবারে নাকালের একশেষ হইল। শেষে কোন গতিকে গরুটা ধরিয়া টানিতে টানিতে মনিবের বাড়িতে হাজির করিল। বড় চোর বাহিরেই ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভায়া, এত দেরি যে?"

ছোট চোর: "কি আর বলি, ভাই? বড় সুখেই আজ দিন কেটেছে; গরুটা যে এত শান্ত, তা আমি আগে মনে করি নি। ভেবেছিলাম, না জানি আজ কত নাকালই হতে হবে, কিন্তু আসলে দেখি, কিছুই না। আমিও তাকে ছেড়ে দিলাম, আর সেও ধীরে ধীরে চ'রে বেড়াতে লাগল। কাজ নেই কর্ম নেই, শুধু ব'সে ব'সে কি করি, কাজেই গামছাখানি বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম; যেমন শোয়া অমনি ঘুম। সেই এক ঘুমে একেবারে দিন শেষ। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে দড়িগাছি ধ'রে এই আসছি। আচ্ছা তোমার খবর কি?

মজার গল্প (১৯০৬), ছোট চোর ও বড় চোর

জামাই হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পাতানো সম্পর্কেও কেহ কখন আমাকে জামাই বলিয়া ডাকে নাই। আর এ-কাঠামোয় যে জামাই হইব, সে-আশাও নাই। চুল সাদা হইয়া আসিয়াছে, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, দাঁতগুলি হল হল করিয়া নড়িতেছে। দেহটি রসবিহীন পল্লববিরহিত পাদপের ন্যায় কোন প্রকার তিষ্ঠিয়া আছে। বসন্তের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিয়া উঠে না। বিহগকূজন আর প্রাণকে আলোড়িত করে না। এখন প্রাণে যা মাঝে মাঝে সাড়া হয়, কেবল কাঠঠোকরার ঠকঠকানির জ্বালা বই আর কিছু নয়।

এত রসহীন, এত শুষ্ক, তবুও ষষ্ঠীবাটার ঘটায় মন পুলকিত হইয়া উঠে। ল্যাংড়া বোম্বাই মধুফলে বা বাগবাজারের রসগোল্লায় বা কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ায় আমার মন যে উথলিয়া উঠে, তাহা নহে। আমি ধ্যানবলে মাতৃরূপিণী শ্বশ্রূঠাকরুনদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারি। ঐ কোমল হৃদয় কি দুরুদুরু দুলিতেছে, কি সকরুণ উদ্বেলনে আলোড়িত হইতেছে! নব জামাতাকে আদর করিবার জন্য শাশুড়ী ঠাকরুন কতই না আয়োজন করিতেছেন! কত বকাবকি ঝকাঝকি ডাকাডাকি লইয়াই না ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন! কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি সদাই অচলা। এই প্রীতির কথা যখন আমি ভাবি, তখন আমার পুলকরোমাঞ্চ হয়। ঐ প্রীতি কি অপত্যস্নেহ? তাহা ত বটেই। কিন্তু উহাতে অন্য ভাবও সংমিশ্রত আছে? আমার প্রাণপ্রতিম কন্যাকে সৎকুলে প্রদান করিয়াছি, আমার দুহিতা সেই কুলীন পরিবারের অলঙ্কাররূপে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিবে, অবশেষে জননীরূপে সেই কুল রক্ষা করিবে— ইহা কি কম গর্বের কথা? এইরূপ ধর্মসঙ্গত সম্প্রদানের কথা মনে করিলে স্বাভাবিক ক্ষুদ্র স্নেহ বড়ই এক উদারভাব ধারণ করে। সেই উদার ভাব জামাইষষ্ঠীর দিন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

এই শুভদিনে কুলশীলসম্পন্ন সৎপাত্র আসিবেন। তিনি আত্মজার বর। আজ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কত আমোদ। শ্যালিকারা ঠাট্টাতামাসা করিয়া জামাতার প্রাণকে মধুমাখা করিয়া তুলিবে। আর ব্রীড়াময়ী লতারূপিণী নববধূ আজ কি এক অজানিত আনন্দে বিবশা হইয়া পড়িবে! কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যে শ্বশ্রূঠাকরুন উপবাসী থাকিবেন...

ব্রহ্মামৃত (১৯০৭), জামাই-ষষ্ঠী

(শেখ) আবদুল জব্বার

অসাধারণ মনোবলসম্পন্ন ঈশ্বরপ্রেমিক মহাপুরুষগণের রীতি এই যে, তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন, লোকের অপ্রীতিকর হইবে জানিয়াও তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতে ভীত হন না। তাঁহারা নিজেদের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়াই জগতের হিতসাধনে ব্যাপৃত হন। বিশ্বনিয়ন্তার বিশেষ দৌত্য সম্পাদনার্থেই তাঁহারা অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং আপনাদের সাধ্যমতে সেই দৌত্যকার্য সম্পন্ন করিয়াই পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করেন। সমসাময়িক লোকে তাঁহাদের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাদের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী-আলোচনায় জানা যায় যে, সমকালবর্তী লোকসাধারণের নিকট তাঁহারা হৃতাদৃত হইলেও তাহাদের উত্তরপুরুষেরা উক্ত মহাপুরুষগণের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। হজরতের জীবনকালে সমগ্র আরব তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পৃথিবী হইতে তাঁহার অন্তর্ধান হইতে না হইতেই সমগ্র আরব তাঁহার নবধর্মের মহামন্ত্রে মুগ্ধ ও দীক্ষিত হইয়া পড়ে।

মহামতি হজরত মোহম্মদের আবির্ভাব-সময়ে আরবদেশে ঘোরতর অজ্ঞান-তমসা বিরাজ করিতেছিল। তদ্দেশবাসীরা তখন একতা কাহাকে বলিত, তাহা আদৌ পরিজ্ঞাত ছিল না। তাহারা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর নিরন্তর বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত থাকিত। লুণ্ঠন ও হত্যাকার্যই তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। নারীজাতিকে তাহারা পণ্যদ্রব্যের মত মনে করিত। কোন কোন সম্প্রদায়ে বালিকাহননেরও ব্যবস্থা ছিল এবং সম্প্রদায়বিশেষে বালিকাগণকে জীবিতাবস্থায় ভূপ্রোথিত করা হইত। ফলতঃ তাহাদের হস্তে রমণীজাতির দুরবস্থার একশেষ হইত।... তাহারা নৈতিক চরিত্রের যেমন কোন ধার ধারিত না, তাহাদের ধর্মজীবনও তেমন অতিশয় দুর্দশাসম্পন্ন ছিল। তাহারা পৌত্তলিকতার ঘোর পঙ্কে আকর্ণ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত কাবা-মন্দির পর্যন্ত তাহাদের উপাস্য দেবতার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। বলিতে কি, আরবের মত দুরবস্থাপন্ন দেশ তখন অতি অল্পই ছিল।

এই দুঃসময়েই মক্কা-নগরীর কোরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

মদিনা শরীফের ইতিহাস (১৯০৭), অবতরণিকা

নবীনচন্দ্র সেন

বিদ্যুৎ আমার কোন দূর আত্মীয়ার কন্যা। তাহার ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে পড়িত। দিনরাত্রি আমরা প্রায় একসঙ্গে পড়িতাম, খেলিতাম; কখন কখন ঝগড়া করিতাম। বিদ্যুৎ তখন ক্ষুদ্র বালিকা— চঞ্চলা, মুখরা, হাস্যময়ী। বিধাতার হস্তের একটি অপরূপ একমেটে প্রতিমা। যখন যে তাহারা নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত অলকরাশি দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া যাইত দেখিতাম, তখন সে শত ত্যক্ত করিয়া গেলেও তাহাকে মারিতে ইচ্ছা হইত না। সেও আমাদিগকে বিরক্ত করাটি একরূপ বিজ্ঞান-শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভ্রাতা আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান। যখন বিদ্যুৎ সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা, সে একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভাবী সংসারযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তদবধি আমি তাহার গৃহে বড় একটা যাইতাম না; গেলে মনে কি যেন দুঃখ, হৃদয়ে কি যেন একটা অভাব বোধ হইত। চার কি পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রবেশিকার পরীক্ষার পর একদিন বিদ্যুতের মাতা আমাকে ডাকিলেন। আমি অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছি, পাশে ও কে ধীরে ধীরে কোমল পদবিক্ষেপে আসিয়া বসিল? বিদ্যুৎ! কি চমৎকার পরিবর্তন। যে-বালিকা ছুটিয়া, বাতাসে কুন্তলের কুঞ্চিত অলকাবলি এবং অঞ্চল উড়াইয়া ভিন্ন চলিতে পারিত না, সে আজি ধীরে ধীরে কোমল পদক্ষেপে অলক্ষিতভাবে আসিয়া বসিল। যাহার হাসি ও কণ্ঠ বাঁশীর মন অনবরত বাজিত, আজি তাহার সে তরঙ্গায়িত অধরবিপ্লাবী হাসি কোমলার অধরপ্রান্তে বিলীনপ্রায় হইয়া এক অস্ফুট ভাব ও শোভা বিকাশ করিতেছিল। কণ্ঠ নীরব। যে কখনও গলা জড়াইয়া ধরিয়া অংসে উরসে ভিন্ন বসিত না, কি আশ্চর্য, আজি তাহার সঙ্গে চোকে চোকে দেখা হইলে সে চোক নামাইয়া লইতেছে। আমি অন্য কাহারো সঙ্গে কথা কহিতে, সে তাহার কমলদলায়ত দুই ভাসা চক্ষু আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে স্থাপিত করিয়া অতৃপ্তভাবে চাহিতেছে। কি দৃষ্টি! কি অর্থ! কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে কলকণ্ঠে কাকলি বর্ষণ না করিয়া থামিত না, সে আজি ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তরে অধোমুখে চাহিতেছে।

আমার জীবন (১৯০৭), প্রথম অনুরাগ

গিরিশচন্দ্র সেন

আমার বাল্যক্রীড়ার মধ্যে প্রধান ক্রীড়া ছিল ঠাকুর-পূজা। পিত্তলনির্মিত ক্ষুদ্র গণেশ, গোপাল এবং অন্নপূর্ণা মূর্তি ছিল; সে-সকল আমা কর্তৃক গৃহের এক প্রকোষ্ঠে সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে এই সমস্ত মূর্তিপূজার জন্য আমি পুষ্প চয়ন করিতাম। স্নান করিয়া বা বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্য এবং ধূপ দীপযোগে নিবিষ্টমনে সেই প্রতিমূর্তি-সকলের পূজায় নিযুক্ত হইতাম। ক্ষুদ্রাকারের সিপকোষা টাট পুষ্পপাত্রাদি পূজার বাসন এবং ক্ষুদ্র কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য আমার ছিল। আমি বৈদ্যবংশীয়, আমাদের দেশে বৈদ্যজাতি উপবীত ধারণ করে না, কিন্তু আমি বিগ্রহপূজা করি বলিয়া অনেক সময় স্কন্ধে উপবীত ধারণ করিতাম। আমি কি-প্রকার মন্ত্র পড়িয়া সেই সকল ক্ষুদ্র পুতুলকে সচন্দন পুষ্প অর্পণ করিতাম, তাহা আমার মনে নাই! ঠাকুর-দেবতার প্রতি আমাব অগাধ ভক্তি ছিল। আমাদেব পরিবারে লক্ষ্মী-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। বেতনভোগী পূজক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সেই বিগ্রহের পূজা করে. সেই ঠাকুরপূজার সময় আমি ঠাকুর-ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইতাম, ভক্তিপূর্বক চরণামৃত গ্রহণ ও প্রণাম করিতাম, নৈবেদ্যের চিনি কলা প্রসাদেরও প্রত্যাশী হইতাম। সায়ংকালে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া বৈকালী প্রসাদের জন্য দেবালয়ের দ্বারে দৌড়িয়া যাইতাম। আমি সেই পারিবারিক পুতুল-সকলকে চূড়া, হার ও স্বর্ণময় উপবীত এবং বিচিত্র বসন দ্বারা সাজাইতাম। সুবর্ণনির্মিত তুলসীপত্র ও চম্পক কুসুম উপহার দিয়াছি, উৎকৃষ্ট সিংহাসন, শয্যা ও মশারি দান করিয়াছি। যাত্রার সময় আমি ঠাকুরকে দোলমঞ্চে আরোহণ করাইতাম। আমার জন্য ক্ষুদ্রাকার দোলমঞ্চ, সিংহাসন ও মকর কাঠাম ছিল। কুলপুরোপিত রীতিমত হোম ও পূজা করিয়া লক্ষ্মীজনার্দন নামক শালগ্রামকে দোলমঞ্চের উপর সিংহাসনে স্থাপন করিতেন। পারিবারিক বৃহৎ হিন্দু পৌত্তলিক ছিলাম। পারিবারিক বিগ্রহাদি সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত গোঁড়ামি ছিল। আমি মনে করিতাম, আমাদের বাড়ীর ঠাকুর-দেবতার ন্যায় এবং আমাদের শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবের ন্যায় অন্য কোন দেবতা জাগ্রত নহে। আমি শাক্ত পরিবারের বালক ছিলাম, শৈশবকালে সময়ে সময়ে কদলী তরু কাটিয়া আনিয়া তাহাকে মহিষ বা পাঁঠা কল্পনা করিয়া পুতুলের সম্মুখে বলিদান করিতাম। অনেক পক্ষীর ছানা পোষা গিয়াছে; কখন কখন আমি পাখীও বলিদান করিয়াছি।

আত্ম-জীবন (১৯০৭), বাল্য-জীবন

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পদ্মা নদীর নিকট এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণের ইষ্টকের গৃহ ছিল। একদিন পাড় ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণের গৃহ জলসাৎ হয়। ব্রাহ্মণ তদবধি নিরাশ্রয় হইয়া বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন। একদিন এক মোদকের দোকানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভগ্নগৃহের সমস্ত কড়িকাঠ মোদকের দোকানের নিকট পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণ মোদককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, তোমার দোকানে এ-সব কাষ্ঠ কোথা হইতে আসিল?" মোদক বলিল, "পদ্মায় ভাসিয়া যাইতেছিল, আমি অনেক যত্নে এই কাঠগুলি উদ্ধার করিয়াছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই কড়ি কয়খানি আমার ছিল; এক্ষণে তুমি যখন পাইয়াছ, তখন তোমারই। ইহা যে আমার, তাহার প্রমাণ দিতেছি।" এই বলিয়া একটা কড়ির মাথা একটু কাটিতে বলিলেন। মোদক যেমন কড়ির মাথাটি কাটিল, অমনি তাহার ভিতর হতে কতকগুলি মোহর বাহির হইল। মোদক দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল, "ঠাকুর, আপনার মোহর আপনি গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ কিছুতেই সম্মত না হইয়া বলিলেন, "ভদ্র, এ-ধন তোমারই। আমি তোমার গচ্ছিত ধন এতদিন রক্ষা করিয়াছি।" ময়রা বলিল, "তবে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ স্বীকার পাইলে মোদক বড় বড় সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক মধ্যে তিন-চারটা মোহর পুরিয়া সেই মিষ্টান্নগুলি ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিল। ব্রাহ্মণও তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সন্দেশ হস্তে ব্রাহ্মণ যখন নদী পার হন, তখন নৌকার মাঝি ব্রাহ্মণকে বলিল, "ঠাকুর, তুমি অনেক দিন আমাকে পারানি পয়সা দেও নাই, অদ্য দিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজিও পয়সা নাই, তবে এই সন্দেশগুলি পয়সার পরিবর্তে গ্রহণ কর।" মাঝি মিষ্টান্ন লইয়া ভাবিল, "এতগুলি মিষ্টান্ন লইয়া কি হইবে? যাই, ময়রার দোকানে বিক্রয় করিয়া পয়সা লই।" এই বলিয়া সেই সমস্ত মিষ্টান্ন সেই পূর্ব মোদকের দোকানে আনয়ন করিল। মোদক দেখিয়া চিনিতে পারিল— সেই ব্রাহ্মণের মিষ্টান্ন। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এত সন্দেশ কোথায় পাইলে?" মাঝি বলিল, "এক ব্রাহ্মণ পারানির পয়সা পাওনা থাকাতে এই সন্দেশ দিয়াছেন।"

মোদক অবাক হইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ যে বলিয়া গিয়াছেন, এ-ধন তোমারই, ইহা সপ্রমাণ হইল— মনে করিয়া সাদরে সেই মোহরগুলি গ্রহণ করিল ও সৎকার্যে ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

বঙ্গের রত্নমালা (১৯০৭), লব্ধধনে বিরাগ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

এক যে ছিল রাজা। রাজার সাত রাণী: বড়রাণী, মেজরাণী, সেজরাণী, ন-রাণী, কনেরাণী, দুয়োরাণী আর ছোটরাণী। রাজার মস্ত বড় রাজ্য, প্রকাণ্ড রাজবাড়ী: হাতীশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মাণিক, কুঠরীভরা মোহর— রাজার সব ছিল। এছাড়া মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাই, লস্করে, রাজপুরী গম্‌গম্ করিত। কিন্তু রাজার মনে সুখ ছিল না; সাত রাণী, এক রাণীরও সন্তান হইল না। রাজা, রাজ্যের সকলে, মনের দুঃখে দিন কাটান।

একদিন রাণীরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী বড়রাণীর হাতে একটি গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন, "এইটি বাটিয়া সাত রাণীকে খাওয়াইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।" রাণীরা মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, গা-মাথা শুকাইয়া সকলে পাকশালে গেলেন। আজ বড়রাণী ভাত রাঁধিবেন, মেজরাণী তরকারী কাটিবেন, সেজরাণী ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন-রাণী জল তুলিবেন, কনেরাণী যোগান দিবেন, দুয়োরাণী বাটনা বাটিবেন আর ছোটরাণী মাছ কুটিবেন। পাঁচরাণী পাকশালে রহিলেন, ন-রাণী কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরাণী পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।

সন্ন্যাসীর শিকড়টি বড়রাণীর কাছে। বড়রাণী দুয়োরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বোন, তুই বাটনা বাটবি; শিকড়টি আগে বাটিয়া দে না, সকলে একটু খাই।" দুয়োরাণী শিকড় বাটিতে বাটিতে কতটুকু নিয়ে খাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর রূপার থালে সোনার বাটি দিয়া ঢাকিয়া বড়রাণীর কাছে দিলেন। বড়রাণী ঢাকনা খুলিতেই আর কতকটা খাইয়া মেজরাণীর হাতে দিলেন। মেজরাণী খানিকটা খাইয়া সেজরাণীকে দিলেন। সেজরাণী কিছু খাইয়া কনেরাণীকে দিলেন। কনেরাণী বাকীটুকু খাইয়া ফেলিলেন। না-রাণী আসিয়া দেখেন, বাটিতে একটু তলানী পড়িয়া আছে। তিনি অহাই খাইলেন। ছোটরাণীর জন্য আর কিছুই রহিল না।

মাছ কোটা হইলে ছোটরাণী উঠিলেন। পথে ন-রাণীর সঙ্গে দেখা হইল। ন-রাণী বলিলেন, 'ও অভাগি! তুই তো শিকড়বাটা খাইলি না! যা, যা, শীগ্‌গীর যা।" ছোটরাণী আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া ছুটিয়া আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, শিকড়বাটা একটুকুও নাই। দেখিয়া ছোটরাণী আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলেন।

ঠাকুরমা'র ঝুলি (১৯০৭), কলাবতী রাজকন্যা

হারাণচন্দ্র রক্ষিত

রামরূপ যখন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া পহুঁছিলেন, তখন দণ্ড দেড়েক রাত হইয়াছে। জ্যোৎস্নারাত, তায় ফাল্গুন মাস, তায় নূতন জামাই নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, সুতরাং গ্রামময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বিশেষ, বিবাহের পর আট বৎসরের মধ্যে জামাই এ-মুখো হন নাই। সুতরাং বিবাহ পুরাতন হইলেও জামাই সেই নূতনই আছেন। তারপর এক গুজব উঠিয়াছিল যে, জামাই কেমন এক ক্ষেপাটে রকমের, রাতদিন পূজাহ্নিক নিয়েই আছে, আর আপন মনে মা মা ক'রে কাঁদে। কেউ বলে, সন্ন্যাসী হবে; কেউ বলে, পাগল হবে; কেউ বলে, বউকে নিয়ে ঘর করবে না, কেননা তার মুখের বলিই এই: "কামিনীকাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যাজ্য!" সেই জামাই যখন এতদিন পরে, বিনা আহ্বানে, কোনরূপ সংবাদাদি না দিয়াই হঠাৎ আসিয়াছে, তখন গ্রামশুদ্ধ লোকের যে কিরূপ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য হইতে পারে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন।

—ঘোষালগিন্নী জামাতার এই আকস্মিক আগমন-সংবাদে হর্ষে বিষাদে তুল্যরূপে দোদুল্যমান হইতে লাগিলেন। জামাইকে কি খাওয়াইবেন, কি পরাইবেন, কোথায় বসাইবেন— এই সব ভাবনার কাল্পনিক দুঃখ ও উৎকণ্ঠায় তিনি অধীরা হইয়া পড়িলেন। আবার পরমুহূর্তে কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া এবং প্রতিবেশিনী রমণীগণের উল্লাস-আহ্লাদ দেখিয়া একা দশজনের উৎসাহে জামাতার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থায় মনোযোগিনী হইলেন।

বিধবার আর দ্বিতীয় সন্তানসন্ততি কিছুই নাই। দুই বৎসর হইল স্বামী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যজন-যাজনকার্যে তিনি কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা বিধবার ছিল না। একমাত্র প্রাণাধিক কন্যা শিবসুন্দরীকে লইয়া তিনি সচ্ছলেই দিনযাপন করিতেন।

ভাবনা ও মনঃকষ্ট ছিল তাঁহার কন্যাকে লইয়া। অমন সোনার প্রতিমা শিবতুল্য স্বামীলাভ করিয়াও স্বামীর ঘর কি স্বামি-সন্দর্শন অবধিও করিতে পারিতেছে না— এ-দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশ জাগরূক ছিল। কত সাধ্য-সাধনা, কত অনুনয়-বিনয় করিয়া তিনি জামাতাকে আপন বাটীতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কত লোক দিয়া কত চিঠিপত্র তিনি লিখাইয়াছেন, বেহানের নিকট কত কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন— কিছুতেই কিছু হয় নাই! এমন কি, তাঁহার স্বামি-বিয়োগের সময় ও তাহার পরেও যে একবার খোঁজ লয় নাই, সেই জামাই কিনা আজ সহসা, একরূপ সাধিয়া, তাঁহার বাটীতে উপস্থিত।

ভক্তের ভগবান (১৯০৭), প্রথম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচকড়ি দে

একদিন প্রত্যূষে দেবেন্দ্রবিজয় স্থানীয় থানায় আসিয়া ইন্‌স্পেক্টার রামকৃষ্ণবাবুর সহিত দেখা করিলেন।

যাঁহারা আমার 'মনোরমা' নামক উপন্যাস পাঠ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যে-সময়কার ঘটনা বলিতেছি, তখনকার ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ, সুদক্ষ ও শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ। তাঁহার ভয়ে তখন অনেক চোর চুরি ছাড়িয়াছিল, অনেক ডাকাত ডাকাতি ছাড়িয়াছিল, অনেক জালিয়াৎ জালিয়াতি ছাড়িয়াছিল; স্ব স্ব ব্যবসায়ে এরূপ একটা অপরিহার্য ব্যাঘাত ঘটায় সকলে কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ ইষ্টদেবতার নিকট দেবেন্দ্রবিজয়ের মরণ আকাঙ্ক্ষা করিত। সকলেই ভয় করিত; ভয় করিত না গর্বিতা জুমেলিয়া। সে ইষ্টদেবতার নিষ্ফল সহায়তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সেই সময়ে স্বহস্তে দেবেন্দ্রবিজয়কে খুন করিবার জন্য 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত। দেবেন্দ্রবিজয় যদি তেমন একজন ক্ষমতাবান, বুদ্ধিমান লোক না হইয়া একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতেন, তাহা হইলে সে তাঁহাকে পদতলে দলিত করিয়া মনের সাধ মিটাইতে পারিত। তা না হইয়া দেবেন্দ্র কি না প্রতিবারেই তাহাকে হতদর্প করিল। ছিঃ ছিঃ ধিক্ ধিক্! এই সব ভাবিয়া জুমেলিয়া আরও আকুল হইয়া উঠিত। এই বর্তমান আখ্যায়িকা পাঠ করিবার পূর্বে পাঠকের 'মনোরমা' নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভাল হয়: এখানিকে মনোরমা পুস্তকের পরিশিষ্ট বলিলেও চলে।

যখন দেবেন্দ্রবিজয় রামকৃষ্ণবাবুর সহিত দেখা করিলেন, তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে বাঁশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ন্যায় একটি চুরুট দন্তে চাপিয়া ধুমপান করিতেছিলেন; তেমনি পরম নিশ্চিন্তমনে দেখিতেছিলেন, সেই ধুমগুলি কেমন কুণ্ডলীকৃত হইয়া উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। তেমন প্রত্যূষে দেবেন্দ্রবিজয়কে সহসা সেই কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। সসম্মানে তাঁহাকে নিজের পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি? আমাকে দরকার না কি? এত সকালে যে!"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য!"

মায়াবিনী, প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ: নূতন সংবাদ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

যখন তুমি এই চিঠি পাইবে, তখন আমার জীবনের পঁচিশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ এক শত বৎসর ধরিলেও তাহার তিন ভাগ মাত্র রহিল। কিন্তু জীবনের আদর্শ এখনও বহু দূরে। কীট্‌সের এই বয়সে তাঁহার অন্তরের সমস্ত রসসৌন্দর্য ঢালিয়া একটি অপূর্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মৃত্যু-খণ্ডিত অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি?

আমার কথা যাক। তোমার সংবাদ কি? তুমি যে-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার অন্তরে যে কতখানি মহৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা উপলব্ধি করিবার জিনিস বটে। বিকাশোন্মুখ তরুণ মনকে তোমার মনের অনুকূল হাওয়ার মধ্যে এক-একটি করিয়া পাপড়ি খুলিতে অবসর দেওয়া যে কতখানি আনন্দের ব্যাপার, তাহা আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি।

সেদিন পরেশনাথের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় একটা অপরিচ্ছন্ন পল্লীর মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, একটা দুর্গন্ধের উত্তেজনায় মনটা এই পল্লীর অধিবাসীদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাবে বাঁকিয়া বসিতেছিল। পচা আমানির গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ, পাঁকের গন্ধ এবং গৌহাটার অকথ্য দুর্গন্ধ বাতাসটাকে একেবারে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর কলের ধোঁয়া, গাড়ীর ধূলা, গাভী-বিক্রেতাদের বাক্‌বিতণ্ডা, ঋণকারী বৃদ্ধ চাচার শ্মশ্রু-উৎপাটনকারিণী ভোজপুরবাসিনীর বীররসাত্মক গ্রাম্য ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর ও পল্লীর মিঞা-মহলে উত্তেজনা। ইহারই মধ্যে— তুমি কি মনে করিতেছ? রূপের ঝলক? না, একটি সদ্যোজাত নিতান্ত শিশুর ক্রন্দনশব্দ! এক মুহূর্তে আমার সমস্ত অবজ্ঞা, সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই আবর্জনার মধ্যে যে-ক্ষুদ্র মানবসন্তানটির কণ্ঠস্বর শুনিলাম, সে-স্বর আমাদের নিতান্ত পরিচিত, সে আমার কিংবা তোমার ঘরে যে-মূর্তিতে প্রকাশ হইয়া থাকে, এখানেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। সে-স্বর মনের যে-পর্দায় আঘাত করে এবং যে-অপূর্ব সঙ্গীতের সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের সঙ্গীত রচনা করে, তাহা স্থান ও কালের একেবারে অতীত হইয়া মনের রাজ্যে সনাতন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবশিশু! মানবের সমস্ত আশা-ভরসা! মানবের ভবিষ্যৎ! মানবের সর্বস্ব! তুমি সেই শিশুদের অপূর্ব এবং অপরিণত পথপ্রদর্শক, সহচর এবং গুরু একাধারে! তোমার জীবন ধন্য!

একজন শিক্ষককে লিখিত পত্র (১৯০৮)

বাণ, বাণ! কেবলই বাণের পর বাণ। অর্জুন মারেন, কর্ণ কাটেন; কর্ণ মারেন, অর্জুন কাটেন। অর্জুনের বাণে পৃথিবী, আকাশ, সূর্য অবধি জ্বলিয়া উঠিল! যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন! বেচারারা বুঝি পলাইবার পূর্বেই মারা যায়। উহার নাম আগ্নেয় অস্ত্র। উঃ! কি-ঘোরতর হুড়্ হুড়্ ধক্ ধক্ শব্দ! গেল বুঝি সব।

ঐ দেখ, কর্ণ বরুণাস্ত্র ছুঁড়িয়াছেন। ঐ কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল! কি-ঘোর অন্ধকার! কি-ভয়ানক বৃষ্টি! সৃষ্টি বুঝি রসাতল হয়।

অমনি দেখ, কি-বিষম ঝড় বহিল! মেঘ বৃষ্টি উড়াইয়া নিল; সৃষ্টি বাঁচিল! অর্জুন বায়স্য-অস্ত্র মারিয়াছেন, তাহাতেই এত ঝড়!

আর একটা অস্ত্র আরো ভীষণ। ইহা অর্জুন ইন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলেন। অস্ত্রের অদ্ভুত গুণে গাণ্ডীব হইতে কত ক্ষুরপ্র, কত নালীক, কত অঞ্জলীক, কত নারাচ, কত অর্ধচন্দ্রই বাহির হইতেছে। এবার বুঝি আর কর্ণের রক্ষা নাই।

কিন্তু কর্ণ মরিলেন না! তিনি ভার্গবাস্ত্রে অর্জুনের সকল অস্ত্র দূর করিলেন। আর লোকও মারিলেন কত! কর্ণের কি-অসীম তেজ! কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তিনি কি-ব্যস্তই করিলেন! তখন ভীম ক্রোধভরে বলিলেন, "ও কি, অর্জুন! মন দিয়া যুদ্ধ কর!" কৃষ্ণও বলিলেন, "অর্জুন! তোমার উৎসাহ দেখিতেছি না কেন? তাহাতে অর্জুন ব্রাহ্মাস্ত্র মারিলে কর্ণ তাহাও কাটিতে ছাড়িলেন না। কত যোদ্ধাই তাহাতে মরিল। কিন্তু তথাপি বাণক্ষেপে ত্রুটি নাই: বৃষ্টিধারার মতো তাঁহার বাণ পড়িতেছে।

তখন অর্জুনের আঠারোটি বাণ ছুটিয়া চলিল। তাহার তিনটি বিঁধিল কর্ণের গায়ে, একটিতে একটি তাঁহার ধ্বজ, আর চারটি খাইলেন শল্য। বাকি দশটিতে রাজপুত্র সভাপতির মাথাটি কাটা গেল। বাণের আর অন্তঃ নাই; হাতি, রথী, পদাতিক সবই বুঝি কাটিয়া শেষ হয়। এবারে কর্ণ কাবু হইবেন। কিন্তু হায়! অর্জুনের ধনুকের গুণ ছিঁড়িয়া গেল, এখন উপায়? কর্ণ সুযোগ পাইয়া কত বাণই মারিতেছেন! কৃষ্ণকে ষাট, অজুর্নকে আট, ভীমকেও অনেক সৈন্যগুলিকে তো অসংখ্য। সর্বনাশ হইল বুঝি; দেখ কৌরবদের কত আনন্দ!

যাহা হউক, ঐ অর্জুনের ধনুকে আবার গুণ চড়িল। আর কর্ণের বাণের সে-তেজ নাই, এখন অর্জুনের বাণেই আকাশ অন্ধকার। ঐ, কর্ণের গায়ে উনিশ বাণ পড়িল, শল্যের গায়ে দশটি বিঁধিল! কর্ণ রক্তে লাল হইয়া গিয়াছেন।

ছেলেদের মহাভারত (১৯০৮), কর্ণ পর্ব

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় তিনিও অধ্যক্ষমহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, এবং একজন দীর্ঘশিখাযুক্ত, নামাবলী-পরিহিত ভট্টাচার্যের বংশধর হইলেও বিধবাবিবাহটাকে হিন্দুশাস্ত্রের দৃঢ়বদ্ধ সীমার ভিতর আনিবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় সহপাঠিগণের সহিত তুমুল বাক্যান্দোলন উপস্থিত করিতেন। এই সকল বাক্যান্দোলনকালে তাঁহার উৎসাহ-অগ্নি এরূপ প্রজ্বলিত হইত যে, তিনি অবলীলাক্রমে বলিতেন, যদি কোন ধর্মোৎসাহী যুবক তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি আপন পত্নীকে অবিলম্বে বিধবা করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য উল্লিখিতরূপ কথোপকথন কলিকাতায় 'মেস'-এর বাসাতেই সংঘটিত হইত। পল্লাগ্রামের বাটীতে হইলে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সধবা সহধর্মিনী সম্মার্জনীর সাহায্যে এমন একটা ঝটিকা উৎপাদন করিতে পারিতেন যে, তাহাতে পত্নীকে বিধবা করিবার উজ্জ্বল আশাটি জন্মের মত নির্বাপিত হইয়া যাইত।

বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি পত্নীকে কোনক্রমেই বিধবা করিতে পারেন নাই। বরং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও এবংবিধ নানা উৎকট উপসর্গসমাকুল জীবনটা এমন আশ্চর্যভাবে জীবিত ছিল যে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করা তাঁহার পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কেশবপুরের স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে পঁয়ত্রিশ টাকা মাসিক দরমাহ পাইতেন, তাহার দ্বারা দুইবার অন্নধ্বংসকারিণী, ইলিস-মৎস্যের মুণ্ড ও কাৎলা-মৎস্যের পুচ্ছাভিলাষিণী এবং অনেক্য অলঙ্কার-দর্শনে অসুয়াপরতন্ত্রা সধবাপত্নীকে তিনি কোনমতে স্বামিভক্তি শিক্ষা দিতে সমর্থ হইতেন না। হায়! তিনি কেন অলঙ্কারবিরাগিণী, একান্নরতা, বিধবা বনিতা বিবাহ করেন নাই?

ফলতঃ তাঁহার সংসার প্রথমতঃ কষ্টে, তৎপরে অতিকষ্টে চলিয়া শেষে একেবারে অচল হইয়া পড়িল। এই সময় তাঁহার একটি আত্মীয় তাঁহাকে সুবদ্ধি দিবার অভিপ্রায়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতা কি রকমে সংসার চালাতেন?"

পূর্ণিমা, অন্নদা (১৯০৮), প্রথম পরিচ্ছেদ: কৃষিজীবন

যতীন্দ্রমোহন সিংহ

অন্তঃপুরের গোময়লিপ্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণে কয়েকখানা বড় বড় চাটাইয়ের উপর ধান শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর মেয়েছেলেরা সকলে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত আছেন। বড় রন্ধনশালায় মহেন্দ্রর স্ত্রী কাদম্বিনী রন্ধন করিতেছেন। সেই ঘরের বারান্দায় রমানাথের স্ত্রী মেজগিন্নী তরকারি কুটিতেছেন। নিরামিষ রন্ধনশালায় দেবেন্দ্রর বিধবা স্ত্রী শরৎশশী রাঁধিতেছেন। এই বাড়ীর রন্ধনকার্যটা বধুগণই করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা শাশুড়ীদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাঁহারা বসিয়া নবেল পড়েন না। ছোটগিন্নী অর্থাৎ হরিনাথের স্ত্রী উত্তরের ঘরে বারান্দায় বসিয়া বিবাহের পিঁড়ি চিত্র করিতেছেন। বড়গিন্নীর একটি সধবা কন্যা নীরদা-সুন্দরী সেখানে বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছেন: বধুগণ পিত্রালয়ে আসিলে তাঁহাদের একরূপ ছুটি; ইনিও সেই ফার্লো-সুখ ভোগ করিতেছেন। মেজগিন্নীর একটি বিধবা কন্যা যামিনী উঠানের এক কোণে বসিয়া বাসন মাজিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আরও দু-তিনটি স্ত্রীলোক নানাবিধ কার্যে নিযুক্ত আছেন।...

উঠানে পাঁচ-ছয়টী শিশু বড়গিন্নীর খাস তত্ত্বাবধানে বসিয়া আলুভাতে 'ফেনভাত' খাইতেছিল। তিনি উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা অন্যমনস্ক হইয়া এদিক ওদিক করিতেছিল। একটি ছেলে উঠিয়া গিয়া একটা বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিতেছিল। বড়গিন্নী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কি রে! তোরা খাচ্ছিস না? ভাত দেখি নড়ে না।" ধমক খাইয়া তাহারা আবার ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। একটি মেয়ে গালের মধ্যে ভাত পুরিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "বড়মা, তারপর সে-কুমার কি করিল, বল না!"

বড়গিন্নী ভাত খাওয়াইতে খাওয়াইতে একটা ঢেঁকি কিরূপে কুমীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি গল্প বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাওয়াতে ছেলেরাও অন্যদিকে মন দিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের ভাত না খাওয়ার খুব সন্তোষজনক ওজোর ছিল। তিনি কিন্তু সেই ওজোর একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কড়া হুকুম দিলেন, "না, এখন বেলা হইয়াছে, এখন আর কুমীর-টুমীরের কথা হবে না। খা, তোরা শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর খেয়ে ওঠ্।"

একটি ছেলে বলিল, "টুমীর আবার কি?" ইহাতে সকলে হাসিয়া উঠিল। বড়গিন্নীও হাসিয়া বলিলেন, "টুমীর তোর শ্বশুর!"

ধ্রুবতারা (১৯০৮), প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বড়-মা

এই সময় একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে মহামতি ডেপুটি কমিশনারের সম্মুখে একটি বৃদ্ধার স্ত্রীলোক কয়েকটি যুবতী কন্যা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইল। সাহেব ব্যাপার কি জানিবার জন্য মেমসাহেবকে ডাকিলেন। মেমসাহেব অনেক কষ্টে সেই বৃদ্ধার কাঁদিবার কারণ কি জানিতে পারিলেন। বৃদ্ধার চার কন্যা সকলেই অবিবাহিতা। কিছু দিন হইলে তাম্তিয়ার নজর তাহাদের মধ্যে দুই জনের উপর পড়ে। তাম্তিয়া তাহাদের উভয়কে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে; অনেক প্রলোভন, অর্থদান, ভয়প্রদর্শন, সকলই নিষ্ফল হয়। অগত্যা প্রেমের বন্যা হৃদয়ে আর ধারণ করিতে না পারিয়া তাম্তিয়া সেইদিন সন্ধ্যার সময় দুজনকে গৃহ হইতে বলপূবর্ক লইয়া চলিয়া যায়। এরূপ ভীষণ অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারা যায় না; যদি সাহেব তাহার কোনও প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে সেই বৃদ্ধা ও তাহার দুই কন্যা তাঁহার সম্মুখে প্রাণ দিবে।

তাহাদের কথা শুনিয়া সাহেব একটু লজ্জিত হইলেন; এবং অমিততেজ-সম্পন্ন বৃটিশশক্তির উপর তাঁহার এক প্রকার ঘৃণা জন্মিল। যে-শক্তি সসাগরা ধরাতলকে আয়ত্ত করিবার জন্য সর্বদা ব্যগ্র, পৃথিবীর মধ্যে যাহাদের শক্তি ও সভ্যতা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে, সেই শক্তিকে সামান্য এক ভীলতস্কর পর্যুদস্ত করিল! এক কৌশলজাল বিস্তার ও অর্থের প্রলোভন দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা গেল না, বৃটিশরাজের সুশিক্ষিত সৈন্য এ-প্রদেশের সমস্ত ঘাঁটি আগলাইয়া এতদিন বসিয়া রহিল, অথচ সেই পার্বত্য মূষিক অসিয়া ফাঁদে পড়িল না! অপরন্তু তাহাদের অত্যাচারের সংখ্য প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইয়া বৃটিশশক্তির শক্তিহীনতার কথা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছে! এই সকল চিন্তায় সাহেব একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সাহেব স্থির করিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে-কোন উপায়ে তাম্তিয়ার সজীব বা নির্জীব দেহ আনিয়া হাজতে পুরিবেন! ইহাতে প্রাণ যায় ক্ষতি নাই। জীবন, অর্থ, সামর্থ্য সকলই পণ করিয়া বৃটিশ গবর্নমেন্টের এক উচ্চ রাজকর্মচারী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিখ্যাত দস্যু তাম্তিয়াকে সদলবলে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখনই কর্তব্যনিষ্ঠ ডেপুটি কমিশনার মহোদয় তাঁহার ডায়েরীতে লিখিতেন যে: অদ্য হইতে কল্য প্রথম প্রহর রাত্রের মধ্যে তাম্তিয়াকে গ্রেপ্তার করা হইবে; যদি অক্ষম হই, গর্বনমেন্টের চাকুরী ছাড়িয়া দিব... ঈশ্বর আমার সহায় হউন!

তাম্তিয়ার বাহাদুরী (১৯০৮), প্রথম পরিচ্ছেদ

পরদিনই শশিমুখীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল, কিন্তু সুপ্রসব হইল না। ছেলে জন্মিবার পর প্রসূতির প্রাণসংশয় হইয়া উঠিল। নয়নতারা যথাসাধ্য রোগিনীর শুশ্রূষা করিল, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। প্রসবের পরদিন রাত্রেই শশিমুখী বুঝিল যে, তাহার বাঁচিবার আশা নাই; তখন নয়নকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, খোকাকে আমার কাছে সরিয়ে দাও না, ভাই।"

নয়ন খোকাকে শশির কাছে আনিতেই তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া শশি কহিল, "দিদি, আমি তো ভাই চললেম। খোকা রইল। তোমাকে দিয়ে গেলেম। আমার কাছে শপথ কর, যেমন তোমার ছেলেটিকে দেখ, সেই রকম আমারটিকে দেখবে।"

নয়ন বলিল, "সে কি কথা বোন! তোর ছেলেও যেমন, আমার ছেলেও তেমনি! আর তুই বাঁচবি নে, সেই বা কেমন কথা, ভাই! তবে যদি একান্তই ভগবান আমাদের এমন সর্বনাশ করেন, তাহলে তোর ছেলে কোনদিন জানতেই পারবে না যে, তার মা নেই!"

রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই সব শেষ হইল। শশিমুখী নয়নতারার হাতে ছেলেটি দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল।

নয়নতারা পূর্বেই রামসদয়কে পীড়ার সংবাদ তারযোগে জানাইয়ছিল; সেই টেলিগ্রামের পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পরেই মৃত্যুর খবর লইয়া দ্বিতীয় টেলিগ্রাম রামসদয়ের নিকট পৌঁছিল।

নয়নতারা ছেলে দুটিকে লইয়া বসিয়া আছে। মিটমিট করিয়া ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এমন সময় শশিমুখীর পরিচিত মেয়ে দল আসিয়া উপস্থিত হইল। নয়ন শশিমুখীর ছেলেটিকে দুধ দিতেছিল, আর তার নিজের ছেলে বিছানায় শুইয়া ছিল। সকলকে বসিতে বলিয়া নয়ন প্রদীপে আরেকটা সলিতা দিয়া তেজ বাড়াইয়া দিল...।

অধিকাংশ স্ত্রীবন্ধুরা ডেপুটি বাবু এবং তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে নয়নের ছেলের এত সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, নয়ন স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রথমটা সে প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ মুখের কথা মুখেই বাধিয়া গেল। কোন্ ছেলে তাহার, আর কোনটি শশির, সে-ভ্রম আর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল না। পাড়ার লোকে বুঝিয়া গেল, নয়নের ঐ কৃশকায় দুর্বল চেহারার ছেলেটি শশির, এবং সদ্যোজন্মের অপেক্ষা অনেক বড় দেখিতে ঐ হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটিই নয়নতারার।

মাতা-শত্রু (১৯০৮), ২

দেবেন্দ্রনাথ দাস

এইরূপে কয়েক দিন কাটিল, আমার ভালবাসার প্রথম স্রোত বহিয়া গেল। ক্রমে জগদম্বার লেখাপড়ার কথা ভাবিলাম। সে একেবারে মুর্খ ছিল না, পাড়াগাঁর মেয়ে হলেও তাহার কিছু কিছু বাঙ্গালা শিক্ষা হইয়াছিল...। নিজের পয়সায় দুই-চার খানা সরল বাঙ্গালা বই কিনিয়া তাহাকে পড়িতে দিলাম। নিজের পড়াশুনা ছাড়িয়া কি করিয়া তাহাকে শীঘ্র শিখাব, কি করিয়া তাহার পাঠে মন বসিবে, তাহারই উপায় করিতে লাগিলাম। রাত্রিতে ঘুমাবার আগে তাহাকে কিছু কিছু পড়াতাম, কিন্তু পড়ান দূরে থাকুক, সে যেই প্রদীপের আলোর সামনে বই হাতে করিয়া পড়িতে আরম্ভিত, আমি সব ভুলিয়া গিয়া তাহার মুখপানে তাকাইয়া একমনে তাহার মুখই আলোচিতাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বই টই সব বন্ধ হইয়া যাইত; হৃদয় যখন প্রেমরসে থই থই করে, তখন কি আর কিছু ভাল লাগে? উচ্চণ্ড প্রেমের ভরে সময়ে সময়ে কিই বাড়াবাড়ি না করিতাম!

এ-সুখস্বপ্ন অধিক দিন থাকিবার নয়। দুই মাস পরে জগদম্বার দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল, আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হল। আবার পূর্ব্বের বিরহ-যন্ত্রণা সকল একে একে মনে পড়িল; ভাবিলাম, এইবার নিশ্চয়ই আমার আমি উতলা হইয়া উঠিলাম। স্ত্রী লেখাপড়া সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি হয় নাই, কিন্তু আমার কপালটা অতি ভাল যে, সে অল্প অল্প লিখিতে ও পড়িতে পারিত। তাহাকে বাপের বাড়ী যাবার আগে আমাকে প্রায় পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলাম। কি করিয়া পত্র লিখিতে ও কিরূপে চিঠী মুড়িতে হয়, তাহা বার বার তাহাকে দেখাইয়া দিলাম; কতগুলা খামে আমার নাম-ঠিকানা লিখিয়া তাহার হাতে দিলাম ও বলিলাম: "জগদম্বে, দেখিও, এই চিঠীতে আমার প্রাণ রক্ষা হবে, চিঠী লিখিতে কখনও ভুলিও না।" আবার বলিলাম, "দেখিও, ভুলিও না!" সে আমাকে নিশ্চয় পত্র লিখিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল; আর যখন আমাকে বলিল, "দেখিও, তুমি আমাকে লিখিতে ভুলিও না!" তখন আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দমিয়া না রাখিতে পারিয়া তাহার গাল চুমায় ভরিয়া দিলাম।

পাগলের কথা, সপ্তম অধ্যায়: জগদম্বা

অরবিন্দ ঘোষ

আলিপুর গবর্নমেন্ট হোটেলের যে-বর্ণনা করিলাম, এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়; সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, নির্দোষীর দীর্ঘকালব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া-দৃষ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম; তাহার পরে— কি উপায়ে তাহা পরে বলিব— মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সর্বপ্রথম জেলের পোষাক পরিয়া আমার পিঞ্জরে ঢুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম, তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগে বুঝিয়া লইয়াছিলাম; সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় অনুদার ও নিন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমিদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে-অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন চুরি ডাকাতি নয়, দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ চেষ্টা করা বা সমরোদ্যোগের ষড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধ প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর ডাকাতদের মত রাখা, চোর ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার-খাওয়ান, জলকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করান ইহাতে বৃটিশ রাজপুরুষদের ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাহাদের চরিত্রগত দোষ। ইংরাজদের দেশে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু বা বিরুদ্ধাচরণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা ষোল আনা বেনে।

কারাকাহিনী (১৯০৯), ২

সরোজনাথ ঘোষ

সমরসিংহ, সাজি-ভরা শিশির-স্নাত ফুলের গুচ্ছ সহ কুটীরদ্বারে দাঁড়াইল। দ্বারপথে উঁকি মারিয়া দেখিল, গৃহে কেহ নাই। গুরুদেব স্নান সারিয়া এখনও ফিরেন নাই? আজ এত বিলম্ব হইতেছে কেন?... সমরসিংহ বাহিরে আসিয়া একখানি বড় পাথরের উপর বসিল। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে স্বরচিত একটি ভজন গাহিতে লাগিল।

অদূরে গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের বিরাট দেহ প্রথম সূর্যরশ্মির অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত। কুহেলিকামুক্ত নীল অরণ্য, কুসুমচিত্রিত লতাকুঞ্জ স্বপ্নদৃষ্ট পরীরাজ্যের ন্যায় জাগিয়া উঠিতেছিল। এ-সৌন্দর্য তাহার পক্ষে নূতন নহে, আজ দশ বৎসর সে এই পুণ্য তপোবনের স্নেহক্রোড়ে লালিত; তথাপি এখনও সমরের মনে হয়, প্রকৃতি রাণী প্রতি ঊষায় নতুন সৌন্দর্য, নবীন সুষমার অর্ঘ্য লইয়া বিশ্বদেবতার অর্চনা করিতে আসেন! এই পবিত্র কাননে, ঐ বিহগ-কাকলীমুখর বনচ্ছায়ায় বসিয়া সে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন অভ্যাস করিয়াছে! ঐ প্রশস্ত তৃণমণ্ডিত ভূমির উপর তাহার অস্ত্রবিদ্যা ও মল্লযুদ্ধের সহিত প্রথম পরিচয়! এই প্রস্তরাসনেই তাহার সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রথম অনুশীলন। শরতের স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া সে যখন ঋষিকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের অপূর্ব কাব্যসুধা পান করিত, কালিদাস, ভবভূতি ও মাঘের বিচিত্র শ্লোকরাজির ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে রত থাকিত, তখন পুষ্পগন্ধ-ব্যাকুল পবন ঊষার কিরণ মাখিয়া তাহার গ্রন্থের পাতায় পাতায় খেলা করিত, তাহার কল্পনাকে মুখর করিয়া তুলিত। অতীতে বিশ্বপ্লাবী গৌরবভাতি বর্তমানের নিবিড় তমোজাল বিদীর্ণ করিয়া ভবিষ্যতের প্রসন্ন আকাশে কখনও কি বিপুল উচ্ছ্বাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে না?

সমরসিংহ কল্পনার স্বপ্নে, সৌন্দর্যের ধ্যানে এত নিবিষ্ট হইয়াছিল যে, গুরুদেব শঙ্করস্বামী কখন তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা সে অনুভব করিতে পারে নাই।

"সমর!"

মস্তকের মূল্য (১৯০৯), মস্তকের মূল্য

সত্যচরণ শাস্ত্রী

কোন্ সুদূর অজ্ঞাত প্রদেশের অধিবাসী আমাদের ভারতবর্ষের দুই চারি দিন শান্তিভঙ্গ করিতে বা পর্যাপ্ত ধনসম্পদের কিয়ংদশ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সকল অশান্তিপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আমাদের পূর্বজেরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। এই কাল-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে উৎপন্ন হইয়াই কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহা বিলীন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত গণনা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া পারলৌকিক উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতেন। স্বাধীন হিন্দুর এরূপ চেষ্টা প্রশংসাজনক হইতে পারে। কোন দস্যু বা তস্কর সম্পন্ন গৃহস্থের যৎসামান্য বিষয় লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেলে, সেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যেরূপ অতি অল্পকাল মধ্যেই সে-দস্যুর অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ অলিকসন্দর-আদির ভারতবর্ষ-আক্রমণের কথা অতি অল্পকাল মধ্যেই আমাদের দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্যই আমাদের কোন গ্রন্থে অলিকসন্দরের কোনরূপ নামোল্লেখ নাই। ঐরূপ দস্যুর নাম-কীর্তন করাও বোধ হয় তাঁহারা পাপজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মনুষ্যপরমায়ু অল্পকালস্থায়ী; এই সংক্ষেপ সময়ে দস্যুকাহিনীর চর্চা না করিয়া তাঁহারা পুণ্যচরিত্র আলোচনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদিগের নামোল্লেখ না করিবার যে-কোন কারণ থাকুক না কেন, তাহা জানিবার আমাদের বিশেষ আবশ্যক নাই। কিন্তু অলিকসন্দরের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য, প্রতি পদে তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য তাঁহার প্রদত্ত সম্মান ও অপমানের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ভারতবাসীরা কি-রূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

ভারত অলিকসন্দর (১৯০৯), প্রথম অধ্যায়

অবিনাশচন্দ্র দাস

কুমার-পর্বতের পশ্চিমদিকের পাদমূলে একটি নির্ঝর আছে। এই নির্ঝরের জল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে নিরন্তর বারিপাত হইতেছে। ক্ষণেকের জন্যও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল সেই একই শব্দে অবিরল ধারায় বারিপাত...

একদা মুখর হৈমন্তিক প্রভাতে এই মনোরম নির্ঝরের পার্শ্বে একটি অপূর্ব রমণীমূর্তি উপবিষ্ট ছিল। মূর্তিটি এরূপ স্থির ও নিষ্পন্দ যে, সহসা দেখিলে মনে হয় তাহা যেন ভাস্কর-খোদিত শ্বেতমর্মর-প্রস্তরের কোনও সুগঠিত প্রতিমা। ভ্রমরকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশপাশ আলুলায়িত। কেশগুচ্ছ যদৃচ্ছক্রমে পৃষ্ঠে, অংসে, স্কন্ধে ও বক্ষের উপর নিপতিত। উজ্জ্বল ক্ষুদ্র কপালের উপর চূর্ণ কুন্তলগুলি প্রাভাতিক মারুত-হিল্লোলে কম্পমান। বিশালায়ত কৃষ্ণতার চক্ষু দুটি নির্ঝরের বারিধারার উপর স্থাপিত। কিন্তু দৃষ্টি যেন তন্মধ্যে নিবদ্ধ নাই। তাহা যেন এই স্থূল মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্ব শোভায় পরিতৃপ্ত হইতেছে। বদনমণ্ডল উজ্জ্বল, প্রশান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন। তদুপরি একটি অপার্থিব দিব্য জ্যোতি ক্ষণপ্রভার আলোকের ন্যায় যেন মধ্যে মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। পরিধানে একখানি শুক্ল বসন। অঞ্চলখানি বাহু পৃষ্ঠ ও বক্ষের উপর সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বৃক্ষের আবরণ-বস্ত্রাংশটি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। দক্ষিণ হস্তখানি বাম হস্তের উপর ন্যস্ত হইয়া ক্রোড়দেশে স্থাপিত। যেন যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া কোনও দ্যুলোক বাসিনী তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

সূর্যদেব বহুক্ষণ পূর্বগগনে সমুদিত হইয়াছেন। কিন্তু পর্বতের এই পশ্চিমাংশে এখনও তিনি দৃষ্ট হন নাই। দূরস্থিত গিরিশৃঙ্গ ও গিরিগাত্র সকল তাঁহার কনক কিরণমালায় বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কুমারী-পর্বতের পশ্চিমভাগটি বহুদূর ব্যাপিয়া কেবল এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর আলোকে উদ্ভাসিত। সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর আলোকে, এই অপূর্ব রমণীমূর্তি যেন আকাশচ্যুতা ঊষাদেবীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রমণী এরূপ ভাবনিমগ্না, যেন বিহঙ্গের কাকলী, নির্ঝরের ঝর্ঝর-শব্দ বা বৃক্ষপত্রের মর্মর-উচ্ছ্বাস, কিছুই তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছিল না। সহসা অদূরে মানবকণ্ঠধ্বনিত একটি শব্দ উচ্চারিত হইল।

কুমারী (১৯০৯), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নির্ঝর

ভবানীচরণ ঘোষ

রামশঙ্কর রায় বিকালবেলায় ফুলের বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সঙ্গে ছোট ছোট পৌত্রপৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী। তাহারা দাদামশায়কে বাগানের মধ্যে বেঞ্চের উপর বসাইয়া ফলফুলপত্রপল্লবে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিল। পৌত্রী-দৌহিত্রী ফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরাইল, পৌত্র-দৌহিত্রেরা সপুষ্পপত্র কামিনীর একটি ক্ষুদ্র শাখা তাঁহার মস্তকে চূড়ার ন্যায় বাঁধিয়া সেই চৈত্রমাসেই রাসলীলার আয়োজন উদ্যোগ করিল। এমন সময় ঠাকুরবাড়িতে শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদিত হইয়া বিগ্রহের সান্ধ্য আরতি সূচিত করিল। আরতি-অন্তে সেদিন ঠাকুরবাড়িতে কীর্তনের কথা ছিল— তাহারা প্রস্তাবিত রাসনাট্য পরিত্যাগ করিয়া সেই দিকে ছুটিল।

সেদিন পূর্ণিমা। দেখিতে দেখিতে দূরস্থ আমগাছের মাথার উপর দিয়া পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল। চৈত্রের শেষ, সুগন্ধ মৃদুবায়ু ঝুর ঝুর করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে মালতী, বেল, মল্লিকা, রজনীগন্ধা ফুটিয়া বাগান প্রফুল্ল, হাসিময় করিয়া তুলিল। আর কোকিল? সে তো ডাকিয়া আকুল। ভ্রমরও আসিল।

সেই চন্দ্রালোকফুল্ল স্ফুটকুসুমামোহিত কুহুস্বরমুখরিত উদ্যানে রামশঙ্কর একাকী বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বয়স ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মস্তকে বিরল কেশ, তাহাও পক্ক, শরীর বলিত, দন্ত স্খলিত। কিন্তু স্থান ও ঋতু-মাহাত্ম্যে তাঁহার শীর্ণ শরীরও যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ফুল যুবক-যুবতীর সাক্ষাতেও ফোটে, বৃদ্ধের সাক্ষাতেও ফোটে, সুবাসিত বায়ু আবালবৃদ্ধাযুবক সকলের শরীরেই মৃদু প্রহত হয়; গাছে বসিয়া যখন কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করে, তখন শ্রোতার যৌবন কি বার্ধক্য কিছুই লক্ষ্য করে না। আর পূর্ণিমার চাঁদ? সে তো পৃথিবী ভরিয়া হাসি ছড়ায়! যুবা-বৃদ্ধ, অন্ধ-কুব্জ বাছে না, জল-স্থল বিচার করে না, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, চেতন-অচেতন কোন প্রভেদ মানে না। বসিয়া বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া রামশঙ্কর রায়ের জীর্ণ শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রামশঙ্কর ভাবিলেন: "সেই ফুল ফোটে, সেই কোকিল ডাকে, সেই বাতাস বহিয়া যায়, সেই চাঁদ হাসে, সেই আমিও আছি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক সকলই তো আছে, তবু কেন ফুল ফুটিয়াও ফোটে না, কোকিল ডাকিয়াও ডাকে না, চাঁদ হাসিয়াও—" রামশঙ্কর দাঁড়াইলেন, কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "বিধাতা, কেন এমন হইল?"

উপকথা (১৯০৯), (রামশঙ্করের তিন প্রার্থনা), প্রথম প্রার্থনা

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

সার্বভৌম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ বলিয়া মেনকা বরাবরই আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন। গ্রাম্য ব্রাহ্মণী-সমাজেও এজন্য পদগৌরবে তিনি আপনাকে অনেক বড় মনে করিতেন। ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে লোক বাড়ীতে গেলে এজন্য তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন কেহ না করিলে তাঁহার রোষ ও অসন্তোষের সীমা থাকিত না। এ-সম্মানটুকু দিতেও কেহ বড় কার্পণ্য করিতেন না। কারণ মেনকার মুখের ভয় সকলেই কিছু করিত। তারপর মেনকা ঠাকুরাণী কাহারো নিকট কখনো কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেন না, বরং সময়ে অসময়ে তাঁহারি অনুগ্রহ সকলে কিছু না কিছু পাইত। মেনকা জানিতেন, অনুগ্রহ চাইলেই আপনাকে ছোট করা হইত। সার্বভৌম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হইয়া কি তিনি কাহারো নিকট আপনাকে এতটুকুও ছোট করিতে পারেন? তাঁহার কিসের অভাব? পয়সা-কড়ি যথেষ্ট। বিপদে আপদে স্বয়ং সার্বভৌম ঠাকুর রহিয়াছেন, ব্রাহ্মোত্তর জমিও যথেষ্ট। বিপদে আপদে স্বয়ং সার্বভৌম ঠাকুর রহিয়াছেন, অন্যের সাহায্যে তাঁহার কি অভাব ছিল না। কাহারো কোন অভাব দেখিলে অকাতরে ঘরের জিনিস বিলাইয়া তিনি সে-অভাব দূর করিতেন। ক্রিয়াকর্মে, ব্যারাম-পীড়ায়, শোকে বিপদে, প্রতিবেশীদের গৃহে গিয়া তিনি আপনার ঘরের মত নিজে খুঁজিয়া, দরদ করিয়া উঠান কুড়ান হইতে রন্ধন পরিবেশন পর্যন্ত সকল কাজই করিতেন। দৈনিক সাংসারিক কাজকর্ম সব সারা হইলে প্রত্যহ বৈকালে একবার মেনকা ঠাকুরাণী পাড়ায় ও গ্রামে বাহির হইতেন। কাহারো কোন অভাব দেখিলে দূর করিতেন; দুঃখ দেখিলে সান্ত্বনা দিতেন, আবার দোষত্রুটি পাইলে গালি দিয়া ভূত ছাড়া করিতেন। বাড়ীর কাছে মেনকার উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলে কেহ আশায় উৎফুল্ল হইত, কেহ ভয়ে কাঁপিত। গৃহকর্মে উদাসীনা, লজ্জাহীনা, ক্রীড়া ও গল্প-প্রবণা কন্যা ও বধূরা খেলা ও গল্প ফেলিয়া দ্রুত পলাইত, হাতের কাছে যে-কোন কাজ পাইত লইয়া বসিত, সাবধানে গায়ের কাপড়, মাথার কাপড় ঠিক করিয়া দিত। ইহাদের এরূপ কোন ত্রুটি মেনকার চক্ষে পড়িলে বাড়ীর কাছে গাছে কাক-চিল বসিতে পারিত না, নিদ্রিত বিড়াল-কুকুর চমকিয়া জাগিয়া দূরে পলাইত, মা-র কোলে ঘুমন্ত শিশু আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিত।

ঋণ-পরিশোধ (১৯০৯) চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সার্বভৌম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই প্রাপ্য, তথাপি সেই অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান-চর্চায় অভ্যস্ত না হইলে "আমি কে, আমার স্বরূপ কি?" ইহার বিশেষ তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না, ও সেই নিমিত্ত আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে লোকের এত মতভেদ। কেহ বলেন, আমার সচেতন দেহই আমি ও আমার স্বরূপ। কেহ বলেন, আমার আত্মাই আমি ও সেই আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, এবং দেহ আমার বন্ধন ও পিঞ্জরমাত্র। আবার যাঁহারা আত্মাকেই আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা বলে, তাঁহারাও একমত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন, আত্মাসকল পরস্পর-পৃথক, ও আর এক সম্প্রদায় বলেন, এই ভেদজ্ঞান বা অহংজ্ঞান অধ্যাস, অবিদ্যা বা ভ্রম-মূলক, ও প্রকৃতার্থে আত্মা ও ব্রহ্ম একই। আত্মজ্ঞান বিষয়ে এইরূপ নানা মতভেদই "আমি কে, আমার স্বরূপ কি?" এই প্রশ্নের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যখন এতই মতভেদ, তখন "আমি কে, আমার স্বরূপ কি?" ইহা অজ্ঞেয়, এবং ইহা জানিবার জন্য সময় নষ্ট না করিয়া সহজে-জ্ঞেয় যে-সকল বিষয় আছে, তাহা জানিবার জন্য সময় ব্যয় করিলে উপকার হয়। কিন্তু এ-কথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা কে ও তাহার স্বরূপ কি, ইহা না জানিয়া ও জানিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের ও জ্ঞেয় পদার্থের আলোচনা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞাতার অবস্থান্তর। জ্ঞাতার স্বরূপ অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে জানা না থাকিলে তল্লব্ধ জ্ঞান ও তৎকর্তৃক জ্ঞেয় পদার্থের আলোচনা যে ভ্রান্ত ও বৃথা নহে, এ-কথা কে বলিতে পারে? আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ আমি যদি বস্তুর প্রকৃত বর্ণ বা আকার দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমার চক্ষু দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত, ও তাহা বিনা সংশোধনে গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব জ্ঞাতার স্বরূপ-নির্ণয় আমাদের সাধ্যানুসারে অবশ্য কর্তব্য। অন্ততঃ যতক্ষণ না ইহা স্থির হয় যে, জ্ঞাতার পক্ষে যদিও অন্য বিষয় জ্ঞেয়, তাহর আত্মাস্বরূপ অজ্ঞেয়, ততক্ষণ আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে কখনই বিরত থাকা যায় না। জ্ঞাতাই যে আপনার প্রথম ও প্রধান জ্ঞেয়, কেহই এ-কথা অস্বীকার করিতে পারে না।

বহির্জগতের বৈচিত্র্য আমাদের চিত্তকে এতই আকর্ষণ করে, ও বহির্জগতের পদার্থের উপর আমাদের দৈহিক সুখ এতই নির্ভর করে যে, বাহ্যজগৎ লইয়াই আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের অস্থায়িত্ব ও সেই সুখের অনিত্যতা যখন যখন মনে পড়িয়াছে, তখনই মানব আত্মজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম (১৯১০), প্রথম অধ্যায়: জ্ঞাতা

রসিকচন্দ্র বসু

গঙ্গাতীরে বীরজাওন গ্রামের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র আম্রকানন। সেই আম্রকাননের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটিরের দ্বারদেশে প্রেমানন্দ বাবাজী কুশাসনে বসিয়া আছেন।

বাবাজীর মস্তক মুণ্ডিত, কেবল শুভ্র কেশের একটি ক্ষীণগুচ্ছ দিব্যজ্যোতিঃশিখার ন্যায় মস্তকের পশ্চাদ্দেশে লম্বমান রহিয়াছে। বদনমণ্ডলে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্ন নাই। শরীর তপঃকৃশ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। মুখমণ্ডলে শান্তি ও প্রেমের অপূর্ব জ্যোতিঃ।

বাবাজী নয়ন মুদ্রিত করিয়া নামজপ করিতেছেন।

তখন বৈশাখ মাস। অপরাহ্নের স্নিগ্ধদক্ষিণপবন আম্রপল্লবগুলি ঈষৎ কম্পিত করিয়া ধীরে প্রবাহিত হইতেছে পত্রশ্যাম সহকারে শাখায় বসিয়া কোকিল আনন্দে কু-উ কু-উ গান করিতেছে। বাসন্তী শোভায় জগৎ আনন্দময়। বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুষ্পে ও ফুলে সে-আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। বাবাজী আনন্দকাননে বসিয়া পরমানন্দে মগ্ন আছেন।

এমন সময় একটি নবীন যুবক ধীরে ধীরে সেই আম্রকাননে প্রবেশ করিল। যুবক তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি; কাঞ্চনপ্রতিমার মতই সেই অঙ্গ শোভা ও সৌন্দর্যের অপূর্বশ্রীতে উজ্জ্বল। যুবকের পরিধানে শুভ্র কৌষেয় বসন, স্কন্ধে শুভ্র কৌষেয় উত্তরীয়, দক্ষিণ বাহুতে ইষ্টকবচ, মস্তকে সুবিন্যস্ত দীর্ঘ কৃষ্ণকেশগুচ্ছ; ললাট চন্দনলিপ্ত, মুখমণ্ডল নবোদ্ভিন্ন গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজির কৃষ্ণরেখায় ভ্রমরাসীন প্রফুল্ল প্রভাত-কমলের ন্যায় সুন্দর।

যুবক বীরজাওনের ভৌমিক নয়াচাঁদ রায়ের পুত্র কালাচাঁদ রায়। কালাচাঁদ প্রেমানন্দ বাবাজীর শিষ্য; প্রত্যহ অপরাহ্নে বাবাজীকে দর্শন করিতে আসেন। আজিও আসিয়াছেন।

কালাচাঁদ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কুটিরের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন বাবাজী জপে নিবিষ্ট; চক্ষু মুদ্রিত, কদাচিৎ অধর একটু কম্পিত হইতেছে। সে-প্রসন্নমূর্তি হইতে প্রেম ও আনন্দ যেন গলিয়া পড়িতেছে। কালাচাঁদ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ততক্ষণে বাবাজীর নামসংখ্যা পূর্ণ হইল। চক্ষু মেলিলেন। কালাচাঁদকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, "বাবা, কতক্ষণ এসেছ? বস।"

কালাপাহাড় (১৯১০), আনন্দ

বিপিনচন্দ্র পাল

হে দেব, তোমার তত্ত্ব এ-অধমের নিকট কবে সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবে, বল। নিরাকারে ভক্তি হয় না। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে যখন তত্ত্ববস্তুকে দেখি, তখনও মন ছড়াইয়া যায়, ভাল করিয়া ধরিতে পারি না। পুরুষরূপে যে আমি তোমার ভজনা করিতে চাই। সে-পুরুষরূপ তোমরা কোথায়? তাহা-ই আমার নিকট প্রকাশিত কর। তুমি আদ্যা শক্তি, ইহা বেশ বুঝি। তুমি কারণ-কারণ বেশ ধরিতে পারি। বিশ্বের আশ্রয় তোমার অনন্ত জ্ঞান, ইহাও যেন ধরিতে পারি। কিন্তু এ-সকলই তোমাকে দূরে, অতি দূরে রাখে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম— এতটা মনে হয় যেন ধরিতে পারা যায়। তুমি জগতে পরিবর্তনের মধ্য নিত্য, তুমিই জ্ঞানজালে বিশ্বের বিচিত্রতাকে ধরিয়া আছ, ফলে এই সত্য ও জ্ঞান অনাদি অনন্ত, সর্বব্যাপী সর্বগত, বিভু ও মহান; তুমি ব্রহ্ম, ইহা যেন বুদ্ধিতে কিয়ৎ পরিমাণে ধারণা সম্ভব। কিন্তু তুমি আনন্দহেতু, তুমি ভগবান, তুমি আমার সঙ্গে নিত্য লীলা করিতেছ; তুমি পুরুষ, আমি তোমার প্রকৃতি, তুমি নিয়ত দিতেছ, আমি নিতেছি, আবার আমি দিতেছি, তুনি নিতেছ; এই মধুর আদান-প্রদানের সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার— ইহা বুদ্ধিতে বুঝিলেও ঠিক ধ্যান করিতে পারি না। তোমাকে আংশিকভাবে নানা আধারে ধ্যান করিতে পারি। পিতার আধারে— পিতৃদেবের দেহে ও চরিত্রে ও কার্যে এবং নিজের অন্তরস্থ যে-পিতৃভাব যাহা সন্তানকে আশ্রয় করিয়া এ-অধমের মধ্যেও প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে তোমাকে পিতারূপে ধ্যান করিতে পারি। মাতৃ-আধারে— আমার মাতাঠাকুরাণীর দেহে ও চরিত্রে ও আমার সন্তানগণের মাতৃদেহে তোমার প্রভুত্ব, পুত্র-কন্যার মধ্যে তোমার পুত্রত্ব ও কন্যাত্ব, মানুষের মধ্যে তোমার মানুষী তনু, এ-সকল খণ্ড খণ্ড ভাবে ধ্যান করা সম্ভব। মাঝে মাঝে এ-ধ্যান করিয়া পরমানন্দ লাভ করি। কিন্তু দেব, তুমি যে একাধারে পিতামাতা সকলই, পরমপুরুষরূপে তুমি সর্বত্র সর্বদা বিরাজ করিতেছ, তুমি অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া আমাকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিয়া, আবার বাহিরে পরম-অনাদি-অনন্ত-পুরুষরূপে বিরাজ করিতেছ। তুমি অজর-অমর-নিত্য-নিরাময়-চিদানন্দ-সদানন্দ-ভূমাষড়ৈশ্বর্য ও সর্বৈশ্বর্যময় ত্রিগুণাতীত পরম দিব্য পুরুষ— এই সত্য ধ্যানে আনিতে পারি না।

জেলের খাতা (১৯১০), চতুর্থ চিন্তা, আভাস ও আকাঙ্ক্ষা

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন, হিন্দুসন্তান ধর্মনীতি-বিষয়ক শিক্ষা কখনই লাভ করে না বলিয়াই হিন্দুদিগের বংশলোপ হইতেছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মাতাল হইয়া উৎসন্ন হইতেছে। কথাটা এক হিসাবে মিথ্যা নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? মুসলমান শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দু শাস্ত্রেও সুরাপান— এমন কি সুরার আঘ্রাণ পর্যন্ত— নিষিদ্ধ, জাতি-ভ্রংশকর। শুদ্ধ তাহাই নহে, হিন্দু শাস্ত্র সকল প্রকার অনাচারেরই ঘোর বিরোধী। কিন্তু সেকালেব ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী হিন্দুশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সে-নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন; দেশের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ঘোষণা করিলেন যে, মদ্য-মাংসের সেবা ভিন্ন হিন্দুজাতির উন্নতি কখনই হইবে না। পানাহারের শাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রকাশ্যভাবে লঙ্ঘন করা-ই তাঁহারা সমাজের পক্ষে হিতকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়ছিলেন। অনেকেই কথা অনুসারে কাজ করিয়া নৈতিক সাহসের ও সুদৃষ্টান্তের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। ইংরাজসমাজে ও ইংরাজী-শিক্ষিত দেশীয় সমাজে তাঁহাদিগের নামে প্রশংসাসূচক করতালিধ্বনি বর্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে সমাজের উচ্চ বা শিক্ষিত স্তরে প্রকাশ্য-ভাবে যে-ব্যবহারের বা দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হইল, সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবতরে জনাঃ" এই ন্যায়ে তাহারই অনুসরণ করিল। এক্ষণে চারিদিকে তাহারই বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, শিক্ষিত লোকেরা যদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, শাস্ত্রের অকারণ নিন্দা পরিত্যাগ করেন... ভোগের আদর্শ অপেক্ষা ত্যাগের ও নীতির আদর্শকেই শ্রেষ্ঠত্ব-দান করেন, ধর্মোৎসব-কালে সাত্ত্বিকতা রক্ষার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখেন, সমাজবিধি-লঙ্ঘনকারীর প্রতি খড়্গহস্ত হন, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীর লোকের উচ্ছৃঙ্খলতার হ্রাস ও নৈতিক অবস্থার বহুল-উন্নতি অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। মুসলমান সমাজে ধর্মহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রচার অতি অল্প; যে দু-চার জন সে-শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সমাজের অধিকাংশ লোকের মতের বিরুদ্ধাচরণ বা কোরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে মুসলমান সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিমাণ ও সমাজদ্রোহীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। মুসলমান সাহেবিয়ানার স্রোত বা পাশ্চাত্য ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া আত্মহারা হয় নাই বা হইবার সুযোগ পায় নাই বলিয়াই তাহাদের মধ্যে ধর্মভীরুতা ও শাস্ত্রভীরুতা অধিক, উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা কিছু অল্প।

হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ? (১৯১০), (১২)

একদিন দুই জনে সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া, তীর্থযাত্রার পরামর্শ হইল। চক্রবর্তী মহাশয় খুব আগ্রহ দেখাইলেন, বলিলেন "এবার ধান কাটার পর মাঘ মাসের শেষে শ্রীক্ষেত্র যাওয়া যাক, চল!"

গোপাল প্রস্তুত; সে বলিল, "দাদাঠাকুর. আমি ত এখনি যেতে রাজি। ধান কাটার জন্যে দেরী করে কি হবে? ছেলেপুলেরা বড় হয়েছে, তারাই দেখে শুনে সব করবে এখন।" নীলাম্বর হাসিয়া কহিলেন, "পাগল! ওদের উপর ভরসা করে কি যেতে পারি? ছেলেমানুষ— কি করতে কি করবে! কুড়েমি করে ধানগুলো নষ্ট করবে, না হয় জোতদার কৃষাণগুলো ফাঁকি দেবে। আর এত তাড়া-ই বা কি?"

সেদিনকার মত কথা এই পর্যন্ত হইল। তারপর মাঘ মাস গেল, ধান সব গোলাজাত হইল। গোপাল আসিয়া আবার তীর্থযাত্রার কথা উঠাইল; চক্রবর্তী মহাশয় পুনরায় আক-কাটা, আক-মাড়াই ইত্যাদি আপত্তি দেখাইয়া তাহাকে ফাল্গুন মাসের শেষে শ্রীক্ষেত্র-যাত্রার কথা বলিলেন। কিন্তু আক উঠিলে আবার চৈতালীর কথা ভাবিয়া তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন। চৈতালীর কথা শুনিয়া গোপাল একদিন বলিল, "দাদাঠাকুর, আমাদের চাষের ফসল একটার পর একটা লাগিয়াই আছে; তা ভাবিলে কি আর তীর্থে যাওয়া হবে? চোখ-মুখ বুজে বেরিয়ে পড়া যাক! ও-সব ছেলেরা একরকম করেই নেবে। আর বাঁচবই বা কতদিন! ফসল আর ফসল করে কি পরকালের কাজটা করব না? তাহার পর এখন ত ছেলেরা পারবে না বলছে, কিন্তু আমরা গেলে তখন ত ওদেরই সব করতে হবে!"

চক্রবর্তী মহাশয় গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া থাকিলেন; পরে বলিলেন, "দেখ, গোপাল, আমি সবই বুঝি; কিন্তু এই নূতন গোয়ালঘরটা আরম্ভ করেছি। এটা অর্ধেক রেখে কি করে যাই? আর মেজো নাতিটার পৈতে দেব মনে করেছি, তা-ই বা শেষ না করে যাই কেমন করে? তাহার পরে এই সব কাজে এখন হাতের টাকাও ফুরিয়ে এল। টাকাও ত চাই!"

পঞ্চপ্রদীপ (১৯১০), তীর্থযাত্রী, ২

শরৎকুমার রায়

একদিন বালক নানক বিপাশা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন; নিকটে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তর্পণ করিতে দেখিয়া তিনি হস্তদ্বারা তীরভূমিতে জল সেচন করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক বালককে বিনা প্রয়োজনে এইরূপ জল সেচন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিয়া উঠিলেন, "বালক, তুমি জল লইয়া কি করিতেছ?" বুদ্ধিমান বালক উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা জল দ্বারা ও কি করিতেছেন?" জনৈক ব্রাহ্মণ উত্তর কহিলেন, "আমাদিগের পরলোকগত পুর্বপুরুষদিগকে জলদান করিতেছি।" নানক উত্তর করিলেন, "আমি আমার তালবণ্ডীর শাকের ক্ষেতে জল সেচন করিতেছি।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "তুমি কি-নির্বোধ! তোমার শাকের ক্ষেত রহিয়াছে তালবণ্ডীতে, আর এখানকার ভূমিতে তুমি জল ছড়াইতেছ! এই জল দ্বারা কি সেই ক্ষেত্র সিঞ্চিত হইবে?" নানক বলিয়া উঠিলেন "কে বেশী নির্বোধ? তুমি না আমি? তুমিই বলিতেছ যে, আমরা এই জল কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী তালবণ্ডীতে পঁহুছিবে না; তবে তোমার প্রদত্ত ঐ জল কি করিয়া তোমার পরলোকগত পুর্বপুরুষদিগের নিকট পঁহুছিবে?" বালকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা অবাক হইয়া গেলেন...।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানকের ধর্মানুরাগ বাড়িতে লাগিল। সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সংসারের কার্যাদিতে ও ধনোপার্জনে নানক নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। পুত্রের এই প্রকার সংসারে-ঔদাসীন্য ঘোর সংসারী ধনলোভী কালুকে পীড়িত করিত। ধর্মভাবে বিহ্বল পুত্রকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া তিনি মাঝে মাঝে গভীর শোক করিতেন। তাঁহার মতি ধনোপার্জনের দিকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত পিতা তাঁহাকে গোমহিষ-চারণে ও কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিলেন। নানক পিতৃনির্দেশে গোমহিষ লইয়া প্রান্তরে গমন করিতেন। তথায় পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে তরুতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। গোমহিষগুলি কাহার শস্য নষ্ট করিত, নানক তাহার খোঁজ হইবার অবসর পাইতেন না। পিতা কালু উত্যক্ত হইয়া নানককে এই কার্য হইতে অব্যাহতি দিলেন। পিতা তাঁহাকে বারংবার কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিতে বলায়, নানক এই সময়ে বলিয়াছিলেন, "হে পিতাঃ, আমি একখানি নূতন ক্ষেত পাইয়াছি; সেই ক্ষেতের কর্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, নূতন নূতন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে; এই সময়ে আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইতেছে। এমন সময়ে আমার অন্যের ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর নাই, তাহার ভারও লইতে পারি না।"

শিখগুরু ও শিখজাতি (১৯১০), দ্বিতীয় অধ্যায়: বাবা নানকের জীবনকথা

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

এতদিন আপনার বলিতে একজন কাছে ছিল, সে আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হইয়াছিল; এই বিদেশে নির্জনবাসে আমার নিকট চিন্তামণির মূল্য অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি করিব! শ্রীগুরুদেবের যাহা ইচ্ছা, তাহা-ই পূর্ণ হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আহারাদি করিয়া বেলা সাড়ে বারটার সময় চিন্তামণি আমাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জেইলারের সঙ্গে চলিয়া গেল; যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ আমি তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। স্বদেশের শেষ চিহ্ন যাহা সেবকরূপে সঙ্গে ছিল, আজ তাহাও বিলুপ্ত হইল।...

চিন্তামণি চলিয়া যাওয়ায় আজ হইতে কিছু কিছু কার্যভার আমার নিজের উপর পড়িল। আমি তাহাতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করি নাই, কেননা কিছু কাজ হাতে থাকিলে কতকটা সময় কাটিয়া যায়।... ছয়টার পূর্বে উপরে উঠিলাম। ঠাকুরের বৈকালিক ভোগের জন্য যাহা যাহা প্রস্তুত করা কর্তব্য, এতদিন চিন্তামণিই তাহা করিত; আজি সে-সমস্ত কার্য নিজ হাতে করিতে যাইয়া অনেকটা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলাম। নিজের হাতে জায়গা লেপিয়া কম্বল পাতিয়া দিয়া ঠাকুরের ভোগের আসন করিলাম। পেস্তা, আখরোট, কিশমিশ, কলা, কমলালেবু বাছিয়া ধুইয়া কাটিয়া ছুলিয়া থালার চারিদিকে সাজাইলাম, মধ্যস্থলে ক্ষীর রাখিলাম। মনে বড়ই আনন্দ হইল। চিন্তামণি উপস্থিত থাকিতেও এ-সমস্ত কার্য আমার নিজেরই করা কর্তব্য ছিল, কিন্তু সে কিছুতেই আমাকে করিতে দেয় নাই। বিশেষতঃ সে অতি পবিত্র ভাবে ও আনন্দের সহিত এই কার্য করিত বলিয়া আমি তাহাকে বাধা দিই নাই। এই কয় দিনে তাহার মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিয়াছি। কেবল যে কর্তব্যজ্ঞানে অথবা আমার শ্রমলাঘবের জন্য সে এই সকল কার্য করিত, তাহা নহে, ভক্তির সহিতই করিত। ভোগের সময় যখন আমি কীর্তন ও নিবেদন করিতাম, তখন সে যুক্তকরে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকত। আমার উপদেশমত রাত্রিতে নিদ্রার পূর্বে অনেকক্ষণ বসিয়া হরিনাম জপ করিত।

"তোমার আসিতে হবে আসনে" এই আবাহন-সঙ্গীত গাহিয়া সাতটার সময় নিয়মিতরূপে ঠাকুরের ভোগ লাগাইতাম। মাঝে মাঝে ভ্রম হইতে লাগিল, যেন চিন্তামণি কাছে আছে। এতদিন চিন্তামণি চাকরমাত্র ছিল, কিন্তু আমার নির্বাসনের সঙ্গী হইয়া সে আমার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দাসদাসী যে পরিজন, সঙ্কটকাল ভিন্ন অন্য সময় সর্বদা তাহা মনে থাকে না।

নির্বাসন-কাহিনী (১৯১০)

বঙ্কুবিহারী ধর

কে জানে সৌন্দর্যের কি বিশ্ববিমোহিনী শক্তি! সুকুমারমতি বালক, যে চলিতে, হাঁটিতে বা ভালরূপ কথা কহিতে পারে না, সেও কিশলয়-শিরে প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য দেখিয়া তাহাকে ধরিতে যায়, আকাশে পূর্ণচন্দ্রের শোভা সন্দর্শনে ক্রন্দন সম্বরণ করে। নটবর নয়নতারার রূপমাধুর্যে মোহিত হইয়া নিজের বল, বুদ্ধি, বিবেক আজ সমস্তই বিসর্জন দিলেন। তিনি আশৈশব নয়নতারাকে পবিত্র চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যার সময়. সেই সরসীতটে, একাকিনী অবস্থায় পাপপুরিত-নয়নে একবার নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়সাগরের বাসনা-তরঙ্গের অবিরাম আলোড়নে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি জীবনতারার আত্মত্যাগ, অতুল্য সেবা-শুশ্রূষা ভুলিয়া, নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া, নয়নতারার চিত্তাকর্ষণে মনঃসংযোগ করিলেন। নয়নতারার চিত্ত পবিত্র, নির্মল; সে দিদিমণির সুখে সুখী; দিদিমণির যাহাতে কষ্টের লাঘব হয়, সেজন্য সে প্রাণদানেও কাতরা নহে। সে জীবনতারার পরিশ্রম লাঘব-মানসে নটবরকে সময় সময়ে ভাত, জলখাবার, পান প্রভৃতি দিয়া আসিত। নটবর কলুষিত নয়নে তাহার প্রতি আকুল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রাণে আনন্দ অনুভব করিতেন। নয়নতারার দৃষ্টি কখনও উর্ধ্বগামী ছিল না, সে মাটির দিকে চাহিয়া নটবরের সহিত কথা কহিত, কিন্তু নটবর যেন তাহার সহিত অধিক কথা কহিলে সুখ অনুভব করেন। নয়নতারার সহিত কোন কথা হইতেছে, এমন সময় যদি জীবনতারা তথায় উপস্থিত হইত, তাহা হইলে নটবর মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাহাকে কোন একটা মিছা কাজে পাঠাইয়া দিতেন; নয়নতারা দিদিমণির সহিত চলিয়া যাইত। জীবনতারা নয়নতারাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, সে নিজের পরিধেয় উত্তম বসন তাহাকে পরাইত; এই সুযোগে নটবর দুই ভগ্নীর একই রূপ বসনভূষণ কিনিয়া আনিতেন। নয়নতারা কিসে সুখী হয়, তাহার জন্য নটবর সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি অনেকবার জীবনতারাকে কর্কশ বাক্যে সম্বোধন করিয়া নয়নতারাকে মধুর বচনে আপ্যায়িত করিতেন। জীবনতারা পান সাজিয়া দিলে নটবর তাহাকে অধিক চুণ দেওয়ার ছলে তিরস্কার করিতেন, আবার কখনও বা চুণ কম হওয়ার ছলে তাহার কার্যের অশেষ নিন্দা করিতেন; নয়নতারার হস্তের সাজা পান তাহার বড় ভাল লাগিত।

অঞ্জলি, দিদিমণি, ৫ (১৯১০)

রায়মহাশয় কহিলেন, "ছি ছি! ও-সব কথা মুখে আনতে নেই! কেন? হয়েছে কি? আমায় খোলসা ক'রে বল। আমি যে তাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি। তার লেখাপড়ার জন্য আমি সর্বস্ব ব্যয় করেছি। আমার ক্ষুদকুঁড়া আর যা কিছু আছে, সকলই যে তার। সে কি আমার নিকট কখনও কোনও জিনিস চেয়ে পায় নি ব'লে ক্ষুব্ধ হয়েছে? আমার তো স্মরণ হয় না, তার কোনও অভাব কখনও আমি অপূর্ণ রেখেছি। যদি কিছু থাকে, যদি সে আভাষ কিছু পেয়ে থাক, আমায় নিঃসঙ্কোচে বলতে পার; আমি প্রাণ দিয়েও তার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। সে ঘড়ি-চেন চেয়েছিল; আমি বিয়ের আগেই তার পছন্দ-মত ঘড়ি-চেন কিনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে পোষাকের জন্য আবদার করেছিল; আমি নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সাহেব-বাড়ী থেকে দু'শো টাকা খরচ ক'রে তার পোষাক তৈরী ক'রে দিয়েছি। ঘুণাক্ষরে তার অভাবের কথা শুনলে আমি কখনও তো তার অভাব অপূর্ণ রাখি নি।"

হরিচরণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শিরে করাঘাত করিলেন: "হা হতভাগ্য! তোর পোড়া-অদৃষ্টে এ সুখ-সৌভাগ্য সম্ভব কি? যিনি পুত্রের অধিক যত্নে তোরে প্রতিপালন করলেন, তাঁরই বক্ষে তুই এই ভীষণ শক্তিশেল হানলি!"

রায়মহাশয়ের এখনও যেন বিশ্বাস হইল না, শচীন্দ্র আসে নাই। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন, "সে যা চায়, আমি তা-ই দেব। তুমি শীঘ্র তাকে নিয়ে এস। চল, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

হরিচরণ উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবলই শিরে করাঘাত করিয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে পালকী-বেহারা সঙ্গে লইয়া রামদাস ফিরিয়া আসিল। রামদাস রায়মশায়ের বাটীর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। সম্মুখে হরিচরণকে দণ্ডায়মান দেখিয়া রামদাসের রোষকষায়িত লোচনে হরিচরণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বিট্‌লে বামুন! তুই যে সর্বনাশ করিলি; তোকে কেটে ফেললেও সে রাগ যায় না!"

হরিচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন: "রামদাস! তা-ই কর! আমায় এখনি কেটে ফেল! আমার নিকট সে যন্ত্রণা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ!"

চিত্রাবলি, বিয়ে-বাড়ী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজবল্লভ রায়

কলিকাতার কাছাকাছি কালীঘাটের কমলাকান্ত কৃষ্ণগঞ্জের কাঁসারিপাড়ার করালীকুমার করের কনিষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনীর করপীড়ন করিয়াছিল। করুণাময়ী কালিকার করুণায় কমলাকান্তের কামানুযায়ী কতিপয় কমলকোরকোপম কুমার-কুমারী কাদম্বিনীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিল; কিছুকাল কৌতুকেও কাটিল।

কমলাকান্ত 'কুক-কেলভি' কোম্পানির কারাখানায় কেরানির কর্ম করিত। কাদম্বিনীর কেমন কপাল! কসবীটোলার কোনো কৃষ্ণকায় কুৎসিতা কামিনী— কথার কৌশলে, কামের কুহকে— কমলাকান্তকে করায়ত্ত করিল! কাজে কাজেই কম্বুকণ্ঠি কষিতকনক-কান্তি কাদম্বিনীর কপালে কদলী!

কমলাকান্ত কুহকিনী কামিনীর কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটিরে কোনো কাজে কখনও কৃপণতা করিতনা। কিন্তু কেহ কেহ কমলাকান্তকে কৃপণ কহিত! কুহকিনী কাবাব কাটলেট কেক কারী কোর্মা করিয়া কমলাকান্তের কায়ক্লেশে কামানো কড়ির কর্ম কাবার করিত! কাদম্বিনী কি করিবেন? কাঁদিয়া কাটিয়া কষ্টে কোনোরূপে কাল কাটাইতেন, কেননা কান্তকে কষ্টের কথা কহিলে কর্ণপাত করিতনা, কেবল কুকথা কহিত! কিন্তু কাদম্বিনী কান্তের কুব্যবহারের কথা কখনো কাহারও কাছে কহিতনা। কেহ কমলাকান্তের কলঙ্কে কটাক্ষ করিয়া কোন কুৎসা কহিলে কেবল কাঁদিতেন। কুমার-কুমারী কয়টির কারণে কিছু কিছু কর্জ করিতেন...।

ক্রমে, কান্তের কদর্য কাণ্ডকারখানায় ক্লিষ্ট-কলেবরা কাদম্বিনীর কুসুম-কোমল-কমনীয় কায়া কাসরোগে কাহিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় করালীকুমার কন্যার কাসের কথা কাঁচড়াপাড়ার কৃপাসিন্ধু কাব্যচঞ্চু কবিরাজকে কহিলেন; কবিরাজও কুষ্মাণ্ডখণ্ড, কাঞ্চনাদ্র, কুঙ্কুমঘৃত, কিন্নরকণ্ঠ, কনকাসব, কল্যাণসুন্দর— কত কি করিলেন, কিছুতেই কাদম্বরীর কাসি কমিলনা, 'কডলিভার' কোনো কাজ করিলনা।

কাল কি কস্মিনকালে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? করিবে কেন? কার্তিকমাসে কাদম্বিনীকে কৃতান্ত কঠোর কবলে কবলিত করিল। কন্যাশোক-কাতর করালীকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে কাশীযাত্রা করিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের কোটা কস্যচিৎ কাপ্তেন কিনিল।

ক্রমে কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা কমলাকান্তকে কুদৃষ্টি করাতে, কমলাকান্ত কাজে কামাই করিয়া কুহকিনীর কুঞ্জ-কুটিরে কাল কাটায়। কাজেই কুক-কেলভি কোম্পানির কর্তাটি কোপে কটূক্তি করিয়া কমলাকান্তকে কর্মচ্যুত করিলেন।

কমলাকান্ত (১৯১০)

বড়দাদার একটি ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ. কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি— অনেক সময় অকারণেশ; চসমা খুঁজে পাচ্ছেন না, তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকারধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্ছে, অথচ সেই চসমা হয়ত নিজের পকেটে— পকেটে বলাটাও ঠিক হল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে— আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এদিকে এক হাতে তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হাতে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালিগালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।

বড়দাদার ভোল স্বভাবের দরুন যে কত লোকে বিপদে পড়ত, তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন; সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত, কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই; তাকে খাওয়ান দূরে থাকুক, তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেল, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল। একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, বড়দাদা ঠিক সেই সময়ে বেরবার উদ্যোগে আছেন, তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে; এতক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন, তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে। বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পিঠে চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন।

বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য ক্ষমতা; তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে: "চড়াই পাখী, চাউলখাকী, আয় না, ঠোকরানী..." এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের ত কথাই নেই; ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই। কিন্তু কাককে প্রশ্রয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড়কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন, সে-কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হুলস্থূল বেধে গেল: সে কোথায়, খোঁজ খোঁজ! খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান হল; তারা দ্যাখে, যে-কাক কোন্ একটা দূরের গাছে বসে আছে। তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।

আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাসে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১১)

পাঁচুলাল ঘোষ

যে-বৎসর নীলরতনের ঘরের প্রদীপ অনেক রাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে দেখিয়া বাড়ীর সকলে এবং পাড়ার অনেকে এক রকম স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, "নীলু এবার পাস হবেই", সেই বৎসর নীলরতন ফেল হইয়া সকলের সিদ্ধান্তকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল।

মেধাবী বলিয়া নীলরতনের এতদিন একটা খ্যাতি ছিল; এখন "কিছু না, শুধু ফক্কড়" বলিয়া সে অবজ্ঞাত হইতে লাগিল। নীলরতন কিন্তু পূর্বের ন্যায় নির্বিকার চিত্তে ফুটবল ক্রিকেট পার্টিতে যোগদান, বারোয়ারীর চাঁদা আদায়, নাইট স্কুলের শিক্ষকতা এবং স্বগ্রামে লাইব্রেরী স্থাপন করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি সমস্ত কার্যই করিয়া যাইতে লাগিল। নষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য নীলরতনের পিতা নীলরতনের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে এ-বৎসরটার জন্য শুধু স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই নিয়োজিত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নীলরতন আর দ্বিতীয়বার সরকারী সরস্বতীর দ্বারে 'হত্যা' দিতে রাজী হইল না। ইহাতে অনেকের ধারণা হইল, নীলরতনের পড়াশুনা করিবার মতলব নহে। স্নেহাতুর পিতা পুত্রের বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

সে-সময় নীলরতনের জন্য একটি পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতেছিল, সেই সময় হরিচরণবাবু দুই মাসের ছুটি লইয়া দেশে ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন তাঁহার স্ত্রী এবং দুইটি অনূঢ়া কন্যা; তন্মধ্যে একটি প্রায় বিবাহযোগ্যা, সেটি দেখিতেও সুন্দরী। হরিচরণ বিশ্বাস নীলরতনের পিতার পরম বন্ধু, প্রতিবেশী, স্বজাতীয়। কন্যাটিকে পুত্রবধু করিতে নীলরতনের মাতার বড় সাধ হইল। উভয় পক্ষই তাহাতে আনন্দে সম্মত হইলে।... ফাল্গুন মাসে হরিচরণবাবুর ছুটি ফুরাইবে, অতএব ফাল্গুনেই বিবাহ স্থির হইল। কিন্তু দুই পিতার কথাবার্তা স্থির হইবার বহুপূর্বে কখন যে প্রথম সন্দর্শনেই প্রজাপতি দুইটি নূতন প্রজার মধুর শুভদৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, তাহার কেহ সন্ধান রাখে নাই। গাড়ী হইতে অবতরণ-কালে সুরমাকে দেখিয়া নীলরতন মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিল, "বাঃ বেশ দেখতে ত! যদি—" লজ্জা আসিয়া নীলরতনের মনের মুখে হাত চাপা দিল...

এক মাস কাটিয়া গেল। এই এক মাস শরীর-খারাপের দোহাই দিয়াই নীলরতন প্লে গ্রাউণ্ডে যায় নাই, বারোয়ারীর চাঁদা আদায়ের ভার সে নিরঞ্জনের উপর দিয়াছে, এবং লাইব্রেরীর জন্য আর এক কপর্দকও অধিক সংগৃহীত হয় নাই।

আঙুর (১৯১১), জীবন-পথে

আমোদিনী ঘোষ

ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে বারুণী স্নানের মেলা বসিয়াছে, উপরে বালুকাময় সৈকত ও নীচে তরঙ্গ-বিভঙ্গে বিসৃত, সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, তরল কাঞ্চনের মত জল অসংখ্য স্নানার্থীর সমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভিড়ের উপর ভিড় জমিতেছে, জনতার উপর জনতা বাড়িতেছে, নৌকার গায়ে নৌকা লাগিতেছে। গায়ে গায়ে সকলে স্নান করিতেছে, স্ত্রী- পুরুষের ভেদাভেদ নাই, শুচিসম্পন্না অসূর্যম্পশ্যা পুরস্ত্রীগণ— স্বজন ভিন্ন কাহাকেও যাঁহারা দেখা দেন না— তাঁহারা লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন লোকের সঙ্গে একত্রে অবগাহন করিতেছেন, কোনও দ্বিধা নাই, কোনও কুণ্ঠা নাই, কোনও মালিন্য নাই, বর্ষান্তে এই ক্ষণস্থায়ী পুণ্য মুহূর্তটি যেন একটি অপরূপ মায়া-দণ্ড লইয়া এই বিপুল জনতার উপরে দাঁড়াইয়াছে, পরশপাথরের মত তাহার স্পর্শে সব যেন পুণ্যময় হইয়া গিয়াছ! এত কাছাকাছি তবু কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, অসংখ্য জনতা একটিমাত্র আগ্রহের আবেগে স্থির হইয়া রহিয়াছে ও একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর তাহাদের সমস্ত চঞ্চল মনোবৃত্তিগুলি নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

এই অগণিত স্নানার্থীদের ভিতর একদিকে বিলাসপুরের দত্ত বাড়ীর মোক্ষদা ঠাকুরাণী স্নান করিতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর এবং তাঁহার দেবর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও তৎপত্নী সরমাসুন্দরী।

মোক্ষদা ঠাকুরাণী বিধবা... বিলাসপুরের এক প্রান্তে নিবিড় তরুপুঞ্জের তলে তাঁহার গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন ঘরখানি— অধিকাংশ সময়ই তাহা ছায়াচ্ছন্ন থাকিত। ঘরের ভিতর একদিকে হরিণের ছাল বিছানো, তাহার কাছেই পিতলের একটি জাফরি কাটা ছোট খাটের উপর বালগোপালের মূর্তি; মোক্ষদা ঠাকুরাণী প্রায় সারাদিন তাহার পূজায় দিন কাটাইতেন। তিনি একটু বেশীরকমে শৌচাচার-সম্পন্ন ছিলেন, শিশুর কলকাকলীবর্জিত তাঁহার মৌন দিনগুলির সহচর ছিল সেই রঙিন ছোট ছোট লেপ-বালিসের ভিতর হসিত-আনন মৃন্ময় মূর্তিটি, আর ঘরের চারিদিকে ঘেরিয়া তাঁহার নিজের অবিরাম শৌচাচার।

মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাঁহার বালগোপালকে ছাড়িয়া কোথাও নড়িতেন না। কিন্তু এবারকার মত যোগ আর শীঘ্র বড় হয় নাই, তা ছাড়া হেমেন্দ্রপ্রসাদও বধূসহ স্নানে যাইতেছে, এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ও-পাড়ার অন্নদাপিসীর উপর বালগোপালের ভোগ সাজাইবার ভার দিয়া গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া একদিনের জন্য বিদায় নিলেন।

যূথিকা (১৯১১), পোষ্যপুত্র, ১

স্বামী সারদানন্দ

চতুর্দশ বৎসরে প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী নিতান্ত বালিকাস্বভাবসম্পন্না ছিলেন। দাম্পত্যজীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ববোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে তখন বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে ঐ কালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন।... কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন— এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন, বলন, আচারণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটি পরিবর্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, এ-কথা আমার বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ; কারণ উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্ভা না করিয়া চিন্তাশীল করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টি-নিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থপ্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্ন করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐ স্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সম্বরণপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিতেন; ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না, সময় হইলেই নিজ সকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৯১১), বিংশ অধ্যায়: ষোড়শী-পূজা

আবু নাসের সইদুল্লা

একদিন আমি দরবার করিতেছি, এমন সময় আমির আজম খানের তনয়ার নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলাম। এই মহিয়সী মহিলা তখন কাবুলে বাস করিতেছিলেন। ইহার সহিত আমার পরিণয়প্রস্তাব নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। রাজকুমারী তাঁহার পত্রবাহককে বলিয়া দিয়াছিলেন যেন যে আমার নিজ হস্তে পত্রখানা প্রদান করে এবং অপর কোনও ব্যক্তিকে না দেখাইয়া আমার দ্বারা উহার উত্তর লেখাইয়া ও বদ্ধ করাইয়া যেন তাহা লইয়া যায়। আমি পূর্বেই লিখিয়াছি, লেখাপড়ায় আমার কোনকালেই স্পৃহা ছিল না: যে-সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাও এই সময় মধ্যে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই পত্র পাইয়া আমি কত যে লজ্জিত হইলাম, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে অসমর্থ...

আমার হৃদয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। আমি নিজেই নিজেকে নিন্দা করিতে ও পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বড় অহঙ্কার যে, আমি একজন শ্রেষ্ঠ লোক, কিন্তু হায়! প্রকৃতপক্ষে আমি কাপুরুষ, মনুষ্যনামেরও অযোগ্য! মনুষ্যত্ব আমা হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছে, কারণ আমি অশিক্ষিত বর্বর! একটি নারীর গৌরব পর্যন্ত আমার মধ্যে বর্তমান নাই।

সেইদিন রাত্রে যখন শয়ন করিবার জন্য গমন করিলাম, তখন শয্যায় পড়িয়া বহুক্ষণ কাঁদিলাম। নিতান্ত দীনতার সহিত সকাতরে দয়াময়ের কৃপা প্রার্থনা করিলাম; সেই অগতির গতি, বিপন্নের চিরসুহৃদের নিকট অনুরোধ করিবার জন্য মহর্ষিদিগের আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে পবিত্র খোদা, হে অর্ন্তযামী, আমাকে আলোক প্রদান কর, যেন আমার অন্তরাত্মা আলোকে মণ্ডিত হইয়া যায়! যেন আমি লেখাপড়ায় শিক্ষিত হই: হে দয়াময়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুই আমাকে কদাচ স্বীয় সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিতে লজ্জিত, হেয় ও অপদস্থ করিবি না!" শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি-প্রভাতের অল্প পূর্বে নেত্রপল্লবদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল; নিদ্রাঘোরে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম; নিদ্রা তদীয় প্রিয় সহচর স্বপ্নকে লইয়া অসিয়াছিল।

স্বপ্নে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মহাপুরুষ— দেহাকৃতি নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র কিন্তু খুব সরল। চক্ষুর্দ্বয় বাদামসদৃশ, ভ্রূযুগল সুন্দর, শ্মশ্রু দীর্ঘ, বদনমণ্ডল ডিম্বের ন্যায়, অঙ্গুলিগুলি সুচিক্কণ ও লম্বা। মস্তকে পাটকিলে বর্ণের একটি পাগড়ি...। বোধ হইল যেন মহাত্মা আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে বলিতেছেন, "আবদুল রহমান, উঠ ও লিখিতে আরম্ভ কর।"

আফগান আমির চরিত (১৯১১), প্রথম অধ্যায়: প্রথম জীবন

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

বৈশাখ মাসের বেলা অবসানপ্রায়, নিত্যানন্দপুর কৃষ্ণপল্লীর একটি বাড়ীর ভিতর দুইটী আমের আর একটী কাঁঠালের গাছে বাড়ীর উঠানটী আচ্ছন্ন— একটী আমগাছের তলায় ষোড়শী ফুলকুমারী, একখানি চাটুনি জাল হাতে, গাছের উপর-দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মানা— উপর হইতে স্বামী গগন মণ্ডল ডাঁসান আম দুটী-তিনটি করিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, আর সে সেই জালখানিতে আটকাইয়া গাছের গোড়ায় আমগুলি জড়ো করিতেছিল— আবার আসিয়া গাছের উপর চাহিয়া দাঁড়াইতেছিল। গগন গাছের উপর হইতে ফুলকুমারীর অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখখানিতে শুক্লত্রয়োদশীর চাঁদের সৌন্দর্য দেখিতেছিল— যেহেতু মুখখানির কিয়দংশ অবগুণ্ঠনে ঢাকা— নবমুকুলিত সহকারের কমনীয়তা, ফুল্ল মল্লিকার সৌরভসম্ভার, নবকিশলয়ের কোমলতা, মলয়ানিলের স্পর্শসুখ সমস্তই অনুভব করিতে করিতে আমের দিকে বাড়ান হাতে আম না ধরিয়া একদৃষ্টিতে নীচে চাহিয়াছিল— সে দেখিতেছিল কি? ফুলকুমারীর যৌবনরাগ-রঞ্জিত মুখশ্রীটুকু, ফিকে জ্যোৎস্নার মত রংটী, সরু টুকটুকে ঠোঁটের উপরে ছোট নতনিটী, তাহাতেই যেন সোনার ঝাপটা, সোনার কানের সমস্ত সৌন্দর্য, খঞ্জনের ন্যায় সদা-নর্তনশীল চক্ষু দুইটী, আর ভ্রূজোড়াটী— আর সেইসঙ্গে ভাবিতেছিল, দিবা দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহার গৃহপ্রত্যাগমনে ফুলকুমারী যে পা-দুইটী ধুইয়া দেয়, পাখার বাতাস করে, আর আহারকালে কাছে বসিয়া "এটী খাও, ওটী খাও, আর একটু দুধ দিলে আর চারিটী ভাত খেতে পারবে" ইত্যাদি।

ফুলকুমারী গগনকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "কচ্ছো কি, আম যে হাতের উপরই রয়েছে!"

গগন একটুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, "কি বলছিলে? আবার বলো না।"

ফুলকুমারীর কণ্ঠস্বর গগনের বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। ফুলকুমারী পুনরপি বলিল, "আম যে তোমার হাতের উপরই আছে— পাড়ো না।"

ছোট গল্প, ২ (১৯১২), তৃষ্ণার জল

তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সঙ্কীর্ণতা, অতীত গৌরবের অতিপূজা কিংবা বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্বে এবং বিধিনির্দিষ্ট বিশেষ কার্যে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশেরও যে এইরূপ বিশেষত্ব, বিশেষ কার্য এবং ভবিষ্যৎ আছে, তাহা তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, অনাবশ্যকও মনে করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ সকলের একটা নিকৃষ্ট নকল মাত্র হয়, কিংবা উৎকৃষ্ট নকলও হয়, ইহা তিনি চান না। পশ্চিমের নিকট হইতে আমরা লইব, পশ্চিমও আমাদের নিকট হইতে লইবে। ভিক্ষুকের মত, পৈত্রিক-সম্পত্তিবিহীন অনাথ বালকের মত আমরা পশ্চিমের রাজপ্রাসাদের দ্বারস্থ হইব না। আমাদেরও প্রকৃতিতে সর্ববিধ মহত্ত্ব, সর্ববিধ আলোড়ন, পশ্চিমের উত্তাপে, পশ্চিমের নবশিক্ষাবারিসেচনে ঐ সব জীবকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে হইবে। অসাড় আমরা প্রাণবান পশ্চিমের সংস্পর্শে চেতনা পাইব। অন্ধকার গৃহের বন্ধ বাতাসে আমরা ছিলাম; পশ্চিম আমাদিগকে বাহিরের ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, বাহিরের জনতার সহিত ঠেলাঠেলির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এখন হাত, পা ও মনটা একটু স্বাভাবিক ও সতেজ হউক। পশ্চিম উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। উহার আবির্ভাব আমাদেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাধির ফল ও বাহ্য লক্ষণ। জোর করিয়া পশ্চিমকে গলাধাক্কা দিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। আমরা মানুষ হইলে, সুস্থপ্রকৃতি হইলে, স্বদেশকে বাস্তবিক স্ব-দেশ করিতে পারিলে, ভাবে, চিন্তায়, জ্ঞানে, কার্যে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে স্বদেশী করিতে পারিলে, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য স্বদেশী চেষ্টায় স্বদেশকে বরেণ্য করিতে পারিলে আপনা আপনি পশ্চিমের প্রভুত্ব খসিয়া পড়িবে।

সুতরাং তাঁহার রাজনীতি আবেদন-নিবেদন ততটা নহে, যতটা স্বদেশবাসী প্রত্যেকের ও স্বদেশী সমাজের আভ্যন্তরীণ সুস্থতাসম্পাদন ও শক্তিবর্ধন। ভিতরে যে প্রবৃত্তির, স্বার্থের, ভয়ের, অজ্ঞানতার, কুপ্রথার দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। অতএব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পথ আগে ভিতরেই অন্বেষণ করা চাই। এইজন্য রাজনীতিক্ষেত্রের রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মাচার্য রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা (১৯১২)

বিনোদিনী দাসী

যাঁহারা এই ক্ষুদ্র লেখা দেখিয়া ঘৃণা বা উপহাস করিবেন, তাঁহারা যেন এ-পুস্তক পাঠ না করেন। কেননা রমণীজীবনে যাহা প্রধান ক্ষতস্থান, তাহাতে লবণ দিয়া নাই বিরক্ত করিলেন! যাঁহারা দুঃখিনী হতভাগিনী বলিয়া একটুখানি দয়া করিয়া সহানুভূতি দেখাইবেন, তাঁহারা যেন এ-হৃদয়ের মর্মব্যথা বুঝেন। এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত, কত মর্মভেদী যাতনার বোঝা হাসিমুখে চাপা, কত নিরাশা হা-হুতাশ দিবানিশি আকুলভাবে হৃদয় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কত আকাঙ্খার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জ্বলন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা কি কখন দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে আশ্রয়াভাবে বারাঙ্গানা হয় বটে, কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণীহৃদয় লইয়া সংসারে আসে। যে-রমণী স্নেহময়ী জননী, তাহারাও সেই রমণীর জাতি! যে-রমণী জ্বলন্ত অনলে পতি সনে হাসিমুখে পুড়িয়া মরে, আমরাও সেই একই নারী-জাতি!... বারাঙ্গানা-জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে, কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননীজঠর হইতে তো একবারে ঘৃণিতা হয় নাই! জন্ম-মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না। ভাবিতে হয়: এ-জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে, কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির-কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক-যাতনা সহ্য করে। সে-সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন কি? যাঁহারা লোকালয়ে ঘৃণা দেখাইয়া, লোকচক্ষুর অগোচরে পরম প্রণয়ীর ন্যায় আত্মত্যাগের চরম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া, ছলনা করিয়া, বিশ্বাসবতী অবলা রমণীর সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন, হৃদয়ের ভালবাসা দেখাইয়া আত্ম-সমর্পণকারী রমণীহৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়া অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলিয়া অন্তর্হিত হন, তাঁহারা কিছুই দোষী নহেন? দোষ কাহাদের? যে-সকল হতভাগি নারী সুধাবোধে বিষপান করিয়া চিরজীবন জর্জরিত হইয়া হৃদয়জ্বালায় জ্বলিয়া মরে, তাহাদের কি? যে-ভাগ্যহীনা রমণীরা এইরূপে প্রতারিতা হইয়া আপনাদের জীবনকে চির-শ্মশানময় করিয়াছে, তাহারাই জানে যে, বারাঙ্গানা-জীবন কত যন্ত্রণাদায়ক! যাতনার তীব্রতা তাহারাই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। আবার এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য ঐ অবলা-প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি-পবিচালক হন!

আমার কথা, প্রথম খণ্ড (১৯১২)

গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বৈশাখের এক সন্ধ্যাবেলায় যখন চারিদিক অন্ধকার করিয়া বজ্রগর্জনের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন কুপিতা ভ্রাতৃজায়া ননদিনী কমলার প্রতি অকথ্য গালি বর্ষণ করিয়া কহিল, "তুই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা!"

কমলা আজ চারি বৎসর স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত। তাহার কুলে কি-একটা দোষ ছিল, সেই দোষ উপলক্ষ্য করিয়া তাহার স্বামী কমলাকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সবে দুই বৎসর মাত্র বিবাহ হইয়াছিল; নবীন যৌবন যখন তাহার অশেষ উন্মাদনা সঞ্চারিত করিয়া বিশ্বকে একটা অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিক সেই সময়টিতে কমলা তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত করিয়া ম্লানমুখে ভ্রাতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

সেখানে ভ্রাতৃজায়ার অনাদর এবং অপমানের মধ্যে যে চারি বৎসর কাটাইয়াছে। যখন আসিয়াছিল তখন সে ছোট ছিল, তখন সংসার তাহার কাছে এতটা দীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই; বয়সের সহিত যখন ক্রমশঃ সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিল, তখন এই প্রশ্নটা তাহার মনে বারম্বার উদয় হইত: কিসের আশায়, কাহার জন্য সে এমন করিয়া জীবন কাটাইতেছে? ভবিষ্যতে যখন তাহার কোন আনন্দ এবং কোন আশ্বাস নাই, তখন কেন সে তাহার জীবনকে কোন উপায়ে সমাপ্ত করিয়া না দেয়!

দিন দিন এই প্রশ্নটা তাহাকে গভীরভাবে আবিষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল, এবং সে তাহার দিবারাত্রের অজস্র অপমান-অপবাদের মধ্যে কেবলই একটিমাত্র পরম মুক্তির পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

মনের যখন এই অবস্থা, তখন সন্ধ্যায় ঝঞ্ঝার মধ্যে তাহার ভ্রাতৃজায়ার এই দারুণ অপমান-বাণী তাহাকে মর্মে মর্মে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। তাহার অন্তরের সমস্ত বিরাগ, সমস্ত বিমুখতা, এই আর্দ্র সন্ধ্যার মধ্যে একটি সজল মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সংসারে যে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই. .

মঞ্জরী (১৯১২), ত্যাগ

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

নীলসলিলা যমুনার, স্নিগ্ধ সীকর-সম্পৃক্ত সুশীতল বায়ু এক শ্বেতমর্মর-মণ্ডিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অভ্যন্তরের উষ্মা দূর করিতেছিল। স্তম্ভগাত্রাবলম্বী মল্লিকা, মালতী, চামেলি, নাগকেশর ও গন্ধরাজের শুভ্র মালিকারাশি— কক্ষমধ্যস্থ অসংখ্য দীপাবলীর প্রোজ্জ্বল আভাস-সন্তপ্ত হইয়া— সেই গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট শীতল বহির্বায়ুতে আবার স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সেই মদগন্ধাকুলিত দীপাবলীর উজ্জ্বল শিখা কক্ষের দর্পণসমূহের উপর সুবৃহৎ হীরকখণ্ডের মত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। আর লাল, নীল, সবুজ, জরদা প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের স্বর্ণখচিত ঝালরমণ্ডিত গবাক্ষরাজি এই অসংখ্য দীপাবলীর উজ্জ্বল রশ্মি বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া তাহা পার্শ্বপ্রবাহিতা যমুনার বক্ষে প্রতিফলিত করিতেছিল। কক্ষতলে স্বর্ণখচিত মখমল-মণ্ডিত দীবান, সোফা প্রভৃতি সুখাসনের অভাব নাই। হীরকমণ্ডিত গুলাবপাশ এবং আতরদানের অপ্রাচুর্য নাই। ইস্তাম্বলের চিত্তোন্মাদক সুগন্ধেরও অভাব নাই। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের মনোমদ সুগন্ধের সহিত লোবানের তীব্র-মধুর গন্ধের মিশ্রণে সে-কক্ষ যেন এক চিত্তমোহকর সৌরভে আকুল হইতেছিল।

সেই কক্ষমধ্যে সুকোমল দীবানের উপর বসিয়া আছেন এক সৌম্যমূর্তি, সুগঠিতকায়, গৌরকান্তি বীরপুরুষ। ইনি দিল্লীশ্বর আকবর শাহ্। সম্রাটের কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ক্লান্ত, পথশ্রান্তিজনিত-বিষাদকালিমামণ্ডিত এক বিশালকায় সৈনিক। বাদশাহের গম্ভীর মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি চিন্তামগ্ন। সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া আকবর শাহ বলিলেন, "তাহা হইলে এখনও সেই নরাধম ইদল-মহলেই বাস করতিছে! কি স্পর্ধা! আমাকে যে এরূপ কথা বলিতে সাহস করে, তাহার কি জীবনের মায়াও নাই?"

দণ্ডায়মান সৈনিক সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, প্রাণের মায়া দূরে থাক, ভয় কাহাকে বলে, সে তাহা জানে না। আমি প্রত্যাগমন-সময়ে পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার ঔদ্ধত্য ও গর্বময় উত্তর এখনও ভুলিতে পারি নাই। জাঁহাপনার সম্মুখে সে-কথা বলিতে আমার জিহ্বা স্তম্ভিত হইতেছে।"

শীশ্ মহল (১৯১২), তস্‌বীরের মূল্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অধ্যাপকের হৃদয়ের যে ভাবান্তর ঘটে নাই তাহা বলা যায় না। ভাগ্যবান খানবাহাদুর সাহেবের অতি আদরের অতি সোহাগের একমাত্র কন্যা— মরিয়ম। তাহার বিচিত্র রংএর বেশ-ভূষার অন্ত নাই। সে প্রাতে যে-পোষাক পরিধান করিয়া পড়িতে যায়, মধ্যাহ্নে তাহা বদলাইয়া ফেলে। আবার বৈকালে ভিন্নরূপ পোষাকে রমণীয় দেহ সুশোভিত করে। তাহার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্নরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মতি চমৎকৃত হইয়া যায়। বালিকার খোপা-বন্ধনের প্রণালীই বা কতরূপ!

সে যখন বৈকালে নৈপুণ্য ও পরিপাট্য সহকারে সুরুচিসঙ্গত বিচিত্র খোপা বাঁধিয়া গোলাপী রং এর চেলী পরিধানপূর্বক, ভূষণশিঞ্জনে দিক মুখরিত করত মতির নিকটে পড়া দিতে যায়, যখন সে পুস্তকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া কলহংসী-কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে থাকে, যখন সায়ংসূর্যের সোনালী কিরণাভা বাতায়নপথে আসিয়া তাহার লাবণ্যবিচ্ছুরিত মুখপদ্মকে অধিকতর দীপ্তিময় করিয়া তোলে, তখন মতি সেই বেহেস্তের হুর-মূর্তির প্রতি না চাহিয়া থাকিতে পারে কি? তখন অপূর্ব তড়িদ্বেগে তাহার প্রশান্ত নির্মল হৃদয়খানি চঞ্চল না হইয়া যায় কি? আবৃত্তি শেষ করিয়া বালিকা পুস্তক হইতে মুখ তুলিতেই মতি নিমিষ মধ্যে দৃষ্টি সরাইয়া লয়।

উভয়ের সহজভাবে দেখাশুনা পূর্বাবধিই আছে, পাঠের আদান-প্রদান সময়ে চারি চক্ষের মিলনও নিত্যই ঘটিতেছে। কিন্তু তাহাতে চোখের ভাষায় কোন কথাবার্তা কোন পক্ষ হইতে এ-পর্যন্ত হয় নাই, অবহিত দৃষ্টিযোগে কেহ কাহারও সৌন্দর্যদর্শনে যেন প্রত্যেকের হৃদয়ের কথা প্রত্যেককে জানাইয়া দিতেছে।

একদিন পূর্বাহ্নের পাঠের সময় মতিকে কহিল, "ভাইজান, একটি কথা—" মতি বিশেষ উৎকণ্ঠিতচিত্তে মরিয়মের মুখের দিকে চাহিল। এই সময় চুনীর মা তৈলপাত্র হাতে করিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। মতির স্নানের সময় হইয়াছে জানিয়া মরিয়ম অন্দরে চলিয়া গেল। চুনীর মা খানবাহাদুরের চিরবিশ্বস্তা চাকরাণীর মরিয়মের ধাত্রী।

সুখলতা রাও

এক রাজা, তাঁর ছেলেপিলে কিছু ছিল না, তাই তাঁর মনে বড় দুঃখ ছিল। শেষে অনেক দিন পরে, রাণীর একটি মেয়ে হয়েছে। রাজামশাই ভারি খুশি হয়েছেন। মেয়েটির ভাত হবে, তাতে ভারি ধূমধাম হবে। সে-দেশের যত বড় লোক, যত গরীব লোক সকলের নেমন্তন্ন হয়েছে। সেই দেশে তেরজন পরী ছিল। রাজা ভাবলে, "পরীদের যদি নেমন্তন্ন করি, তাহলে নিশ্চয় তারা আমার মেয়েকে অনেক কিছু দেবে।" পরীরা তেরজন, কিন্তু রাজার বাড়িতে মোটে বারখানা সোনার থালা; তেরজনকে খেতে দেবেন কি করে? তাই রাজামশাই করলেন কি, তাঁদের মধ্যে সকলের চেয়ে যে বুড়ী পরী, তাকে বাদ দিয়ে আর বারজনকে নেমন্তন্ন করলেন।

ভাতের দিন সব লোকজন এসেছে। বারজনও পরী এসেছে। বারজনকে বারখানা সোনার থালায় খেতে দেওয়া হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পরীরা মেয়ে দেখতে চাইল। এক-একজন পরী মেয়েকে এক-একটা বর দিল। একজন বর দিল, "এই মেয়ে পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী হবে!" আর একজন দিল "এ খুব লক্ষ্মী হবে!" কেউ দিল "এর খুব টাকা হবে!" এমনি করে যত ভাল বর একে একে সব তারা সেই মেয়েটিকে দিল। এগারজন পরী মেয়ে দেখেছে, একজন শুধু বাকী আছে; এমন সময়ে সেই যে বুড়ী পরী, যার নেমন্তন্ন হয় নি, সে এসে হাজির। সকলে ত তাকে দেখে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোথায় বসতে দেবে, কি খেতে দেবে! বুড়ী কিন্তু কারোর দিকে চেয়ে দেখল না। নেমন্তন্ন হয় নি বলে তার এমনি রাগ হয়েছে যে, সে ঠক ঠক করে কাঁপছে। সে এসেই একেবারে সোজা মেয়ের কাছে গেল। গিয়ে চোখ পাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "এই মেয়ে যখন পনের বছরের হবে, তখন চরকায় হাত কেটে সে মারা যাবে।" এই বলে বুড়ী রাগে গর গর করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল। বুড়ীর কথা শুনে সকলে হায় হায় করতে লাগিল; রাজারাণী ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন।

এমনি করে যখন তাঁরা কাঁদছেন, তখন আরেকটি পরী এগিয়ে এল। এটি সেই বারজন পরীর একটি; তার এখনো মেয়ে দেখা হয় নি। সে এসে বলল, "পনের বছর বয়সের সময় চরকাতে মেয়ের হাত কেটে যাবে বটে, কিন্তু সে একেবারে মরবে না, শুধু ঘুমিয়ে পড়বে। একশ বছর পরে তার ঘুম ভাঙ্গবে!" এই কথা শুনে রাজা-রাণী একটু সুসস্থির হলেন। তারপর রাজা হুকুম দিলেন, দেশে যত চরকা আছে, সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে!

ঘুমের দেশ

বিশ্বামিত্র পূর্ব্ববৎ স্থিরপ্রতিজ্ঞ। হরিশ্চন্দ্রের শোকাকুলতা, শৈব্যার অশ্রুধারা, বালক রোহিতাশ্বের কাতরতা সবই বিশ্বামিত্রের 'অজেয়-হৃদয়ের' কাছে বহ্নিমুখে তৃণের মত ভস্ম হইয়া গেল। তিনি দক্ষিণার জন্য হরিশচন্দ্রকে বারংবার ভর্ৎসনা ও তাড়না করিতে লাগিলেন। শৈব্যা অধিকতর ব্যথিতা হইয়া, অধিকতর উত্তেজিতা হইয়া পতির চরণতলে আত্মবিক্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্রের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া সত্যব্রত হরিশচন্দ্র যে সত্যভ্রষ্ট হইতেছে, এই ক্ষোভে, এই দুঃখে শৈব্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সুশিক্ষিতা রমণীর কাছে জগতের সকল জিনিস হইতে স্বামীই একমাত্র প্রিয়; আবার সেই স্বামী হইতেও স্বামীর ধর্ম্ম অধিকতর প্রিয়। যে-অভাগিনী স্বার্থপরতা-প্রণোদিত হইয়া স্বামীকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করে, কুকার্যে অভ্যস্ত করে, সে আত্মপরায়ণা হইয়া স্বামীকে ধর্ম্ম ও কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করে, সে-রমণী নারীকুল-কলঙ্ক।

বিশ্বামিত্রের ভর্ৎসনায় এবং শৈব্যার পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় রাজা পত্নী-প্রস্তাবিত শোচনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার নিকট হইতে একজন ব্রাহ্মণ চারি কোটি সুবর্ণ-মূল্যে শৈব্যা ও কুমার রোহিতাশ্বকে ক্রয় করিলেন। অযোধ্যার সম্রাজ্ঞী শিশু-পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণগৃহে নিযুক্ত হইলেন। হায় মানব-ভাগ্য! ধিক মানবকে যে, সে তোমাকে লইয়া অহঙ্কার করে! মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর কিরণ সহসা মেঘে ঢাকিয়া দশদিক আঁধার হইয়া যায়, মানবের সৌভাগ্য-আলোক বড় আশা ও উৎসাহের সময়ে হঠাৎ নির্বাপিত হইয়া মানবকে 'হতভাগ্য' বলিয়া প্রতিপন্ন করে। আমরা ইহা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়াও জানি না— এই কারণে ধিক আমাদিগকে!

ভার্যা-পুত্র বিক্রয় করিয়াও রাজা সমস্ত দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। সেই শোকসন্তপ্ত, ভগ্নহৃদয় হরিশচন্দ্র আবার বিশ্বামিত্রের কটূক্তি পাইতে লাগিলেন। তখন নিরুপায় রাজা আত্মবিক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্মশানের অধীশ্বর চণ্ডালরাজ, শবদাহকার্যে নিযুক্ত করিবার আশায়, হরিশচন্দ্রকে তিনকোটি সুবর্ণমূল্যে ক্রয় করিতে চাহিল। কিন্তু এতাদৃশ নীচ ও নৃশংস কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ভাবিয়া রাজার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা সাধিয়া লইতেছেন— কেবল প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য, কেবল সত্যরক্ষার জন্য। বহু যত্ন ও চেষ্টায় হৃদয় সংযত করিয়া, অযোধ্যার সম্রাট চণ্ডালের দাসত্বে নিযুক্ত হইলেন। বিশ্বামিত্রকে অবশিষ্ট দক্ষিণা দিয়া সত্যরক্ষা করিলেন এবং ঋণমুক্ত হইলেন।

শুভ-সাধনা (১৯১২), আর্যমহিলা

প্রমথ চৌধুরী

দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে; কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করা চলে না, কেননা অত সৌন্দর্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্মের পর্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোনো অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য— এ-বিশ্বাসও আমাদের চলে গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু গড়ে গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলগা করা, দু-চারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপরপক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে: মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা— কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে, দেওয়া নয়। এ-পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনো জিনিস মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে, আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যত কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায়, বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে-নবসূর্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্ততঃ ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবকাশ নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে, নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ-যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়; কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে: পয়লা বেরনো। কি যে বেরল, তাতে বেশি কিছু আসে যায় না। তাছাড়া আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখতে হয়। নীতির জুতোসেলাই থেকে ধর্মের চণ্ডীপাঠে পর্যন্ত সকল ব্যাপারেই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নবসাহিত্যে কোনরূপে 'শ্রমবিভাগ' নেই— তার কারণ, যে-ক্ষেত্রে 'শ্রম' নামক মূল পদার্থের অভাব, সে-স্থলে তার বিভাগ আর কি করে হতে পারে?

তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোটগল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ (১৯১৩)

নিরুপমা দেবী

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। জীর্ণ ক্ষুদ্র বাটীখানির দাওয়াতে বসিয়া অকালবৃদ্ধ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য তামাকু টানিতেছিলেন। নিকটে কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো একটা পিঞ্জরের মধ্যে সদ্যোজাগরিত টিয়া-পাখীটি কয়েকবার "দুর্গা, দুর্গা, তারা ব্রহ্মময়ী, হরে কৃষ্ণ" প্রভৃতি নাম পড়িয়া আপাততঃ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাসি ও তামাকু টানার শব্দের প্রতিধ্বনি করিতেছিল। জীর্ণ, খড়ে-ছাওয়া রান্নাঘরের পৈঠার একধারে কুকুরটা শুইয়া আরামে নাম ডাকাইতেছিল। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা আম্রবৃক্ষের নিম্নে খোঁটায়-বাঁধা গাভীটি সস্নেহে বৎসের গাত্র লেহন করিতেছিল। চারিদিকই স্থির, শান্ত। বাতাস নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে প্রাঙ্গণের একপার্শ্বস্থিত কলাগাছ-কয়টির পাতাগুলি নাড়িতেছে, গাছের তাহাতে তেমন চাঞ্চল্যের ভাব নাই। ভট্টাচার্য বোধ হয় ভাবিতেছিলেন যে, সবাই এমন নিশ্চিন্ত, এমন স্থির, কেবল মানুষই এত উদ্বিগ্নচিত্ত, এত চঞ্চল কেন? পাখীটা আনন্দে পড়িতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে, গাভীটা সস্নেহে বৎসকে আদর করিতেছে, কুকুরটা নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছে, তাহাদের তো চিন্তার লেশ নাই। তাহারাও তো খায়, কিন্তু সে-জন্য ভাবিয়া মরিতে হয় না। তাহাদের জন্য যে মানুষেরা ভাবিতেছে, তাহারা যেন ইহা স্থির-নিশ্চিত জানে। তবে মানুষের জন্য কেহ ভাবে না কেন? মানুষকেই কেন খাটিয়া ভাবিয়া নানা কৌশল করিয়া উদর পুরাইতে এবং সংসার চালাইতে হয়? পৃথিবীটা এমন পক্ষপাতী কেন? যাহা লইয়া তাহার গৌরব, সেই মানুষের উপরই তাহার করুণা এত কম কেন?

ভাবিতে ভাবিতে ভট্টাচার্য সেখানে ধূমের একটা ছোটখাট মেঘ সৃজন করিয়া ফেলিলেন। বহুপুরাতন, কঙ্কালমাত্র-অবশিষ্ট, ইষ্টকনির্মিত গৃহের দ্বার খুলিয়া একটি রমণী বাহির হইয়া আসিল। পরিধানে একখানি সরু লালপেড়ে বস্ত্রমাত্র, হস্তে দুইগাছি শাদা সঙ্খ, ললাটে সিন্দুরবিন্দু, এই সামান্য বেশেই দাওয়াখানি যেন আলো হইয়া উঠিল। রমণী কুয়া হইতে জল তুলিয়া দ্বারে-চৌকাঠে ছড়াইয়া দিল, পরিষ্কৃত তুলসীপাতাটি হস্ত দ্বারা নিকাইয়া ফেলিল। হাত ধুইয়া স্বামীর নিকটে এক ঘটি জল ও দাঁতন রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মৃদুস্বরে বলিল, "এত সকালে উঠেছ? কাল রাত্রে বুকে এত বেদনা করেছিল, কেন ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ?"

অন্নপূর্ণার মন্দির (১৯১৩), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভাতে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে নগরের দিক হইতে কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। তখন শিশির কাল। হিমকণসিক্ত প্রান্তরে শুভ্রতুষারের ক্ষীণাবরণ শুক্ল উত্তরচ্ছদের ন্যায় দেখাইতেছিল। হিমকণসিক্ত পল্লবে তুষারখণ্ড আবদ্ধ থাকায় মনে হইতেছিল যেন বনস্পতিগণ পুণ্যাহে লাজ নিক্ষেপ করিতেছেন। নৈশ তমোভেদ করিয়া যখন পূর্বপ্রান্তে বাহ্লীকাঙ্গনার সীমন্তে সিন্দূরচ্ছটার ন্যায় অরুণরাগ লক্ষিত হইল, তখন জনসঙ্ঘের পাদপেষণে প্রান্তরের তুষারাবরণ কর্দমে পরিণত হইয়াছে, অসাধারণ কোলাহলে বিহগকুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, নানা রাগরঞ্জিত উষ্ণীষে ও শিরস্ত্রাণে সমগ্র প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জনতার মধ্যদেশে রজ্জুরক্ষিত কোষ্ঠপালগুপ্ত পথ স্তূপবেষ্টনী হইতে নগরদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। যেন একটি বিশাল কালব্যাল মৃত্যু যন্ত্রণার লম্বমান হইয়াছে। সূর্যোদয়ের ঈষৎ পূর্বে পুরাঙ্গনাগণ এই পথ পরিষ্কৃত করিয়া গেল, তাহাদিগের পর কুমারীগণ দলে দলে অঞ্চল ভরিয়া নানাবিধ পুষ্প লইয়া আসিয়া সুগন্ধি কুসুমে পথ আচ্ছন্ন করিয়া গেল। সুগন্ধ জলপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে বালকগণ আসিয়া পুষ্পরাশি সিঞ্চন করিয়া গেল; ইতিমধ্যে স্তূপের চারি তোরণের আবরণপার্শ্বে উপবিষ্ট বাদকগণ যন্ত্রসংযোগে স্তুতিগান আরম্ভ করিল। আমরা যে-পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলাম, তাহা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য পরিচালকগণ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপর্যুপরি গন্ধবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নগরদ্বারে তুর্যনিনাদ শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নগরতোরণ হইতে দেবযাত্রা নির্গত হইল। দেবযাত্রার পুরোভাগে, পংক্তির পর পংক্তি চীবরধারী ভিক্ষু ও শ্রমণ...। পরে বাদিকা ও নর্তকীগণ পুণ্যসঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন করিতে করিতে ভিক্ষুগণের পদানুসরণ করিল। তাহাদিগের পরে বহুমূল্য বেশভূষায় ভূশিত হইয়া নগরের দেবদাসী, গণিকা, লেনাশোভিকাগণ আসিল। ইহারা নগরদ্বার হইতে নির্গত হইলে অত্যুচ্চ শ্বেতবর্ণ সপ্তচ্ছত্র পরিলক্ষিত হইল। শ্বেতচ্ছত্র দর্শনে জনতা হইতে বিশাল কলরব উত্থিত হইল, কোষ্ঠপালগণের রজ্জুবন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া জনসঙ্ঘ নগরাভিমুখে প্রতিগমনের চেষ্টা করিতে লাগিল... শ্বেতাচ্ছত্র ক্রমে নিকটে আসিলে দৃষ্ট হইল যে, উহার নিম্নে সুবর্ণদণ্ডযুক্ত মুক্তা-ও-হীরকখচিত চন্দ্রাতপ। রাজা ধনভূতি ও তাঁহার মহিষীগণ নিজ হস্তে চন্দ্রাতপের স্বর্ণদণ্ড ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

পাষাণের কথা (১৯১৪), ৫

(শেখ) রেয়াজউদ্দিন আহমদ

অবশেষে এমাম হোসায়ন ব্যতীত একে একে তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে একবার জলপান করিতে ইউফ্রেতিজ নদীর দিকে অশ্বচালনা করিলেন; কিন্তু শত্রুদিগের পুনঃপুনঃ বাণবর্ষণে জর্জরিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। শিবির প্রত্যাবর্তন করতঃ যখন তিনি স্বীয় শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, হায়! সেই সময় শত্রুদিগের এক বাণে প্রাণপ্রতিম পুত্ররত্নের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়া গেল। এইপ্রকারে যুদ্ধে ও অনাহারে ক্লান্ত এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ অন্যান্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহারই কোলে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পাঠক, কি-হৃদয়বিদারক দৃশ্য! স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত ও ধমনীতে বিদ্যুৎবেগে শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে। বাণাঘাতে জর্জরিত, অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ এবং অনাহারে ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরিশ্রান্ত এমাম হোসায়ন একাকী শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় শিবিরের দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন। এই সময় শিবিরস্থ জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার জ্বলন্ত পিপাসা প্রশমিত করিতে তাঁহার হস্তে একপাত্র জল প্রদান করিল। আহা! জলপানেচ্ছায় যেমন তিনি পাত্রটি ওষ্ঠাধরে ধরিলেন, অমনি বিপক্ষের একটি বাণে তাঁহার পবিত্র বদনমণ্ডল বিদ্ধ হইয়া গেল। অবশেষে স্বর্গাভিমুখে হস্তদ্বয় উত্তোলিত করিয়া মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদিগের মঙ্গলকামনায় সেই সর্বশক্তিমান ন্যায়বিচারক মহান ঈশ্বরের নিকট একবার শেষ প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে তিনি প্রতিকূল সৈন্যের যুদ্ধপিপাসা নিবৃত্তি করিতে শত্রুব্যূহে ভীষণবেগে প্রবেশ করিলেন। দ্বিষদ্‌বর্গও একযোগে চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শীঘ্রই তিনি মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; ইহা দেখিয়া শত্রুগণ হত্যাকরণোদ্দেশ্যে চতুর্দিক হইতে মুমূর্ষু বীরের উপর আপতিত হইল। তৎপর তাহারা তাঁহার শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করতঃ মৃতদেহ পদদলিত ও তৎপ্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া স্বীয় অবজ্ঞা ও পশুত্বের পরিচয় প্রদান করিল। এজিদের সৈন্যদল মহাত্মা এমাম হোসায়নের ছিন্ন মস্তক কুফার দুর্গে লইয়া গেলে পাপমতি ওয়ায়দুল্লা তাঁহার পবিত্র বদনমণ্ডলে একটা বেত্রাঘাত করিয়া স্বীয় ক্রোধ নির্বাপিত করিল।

আরবজাতির ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৯১৪), সপ্তম অধ্যায়

সরযূবালা দাসগুপ্তা

সে আজ যেন কত দিনের কথা। যেন এক মৃত্যুর ব্যবধান সেকাল ও একালের মধ্যে।

আমার প্রথম পাওয়ায়, ভোগের অবসানে, দিক-নির্ণয় হয়েছিল; দ্বিতীয়বার পেয়ে কর্ম কি, তা বুঝেছি। কর্ম বোঝার পর যদি পাওয়ার কথা ভুলে পাবার আশা না রেখে কর্ম করতে পারি, তবেই তৃপ্তি, আর তবেই জ্ঞানও একদিন আসবে। কর্মের পথে চলতে চলতে যা পাব, তা গ্রহণ করব। যদি বসন্ত আবার এসে কিছু দেয়, তাহা বসন্তের দান বলে মাথা পেতে নেব। বসন্তের পথ চেয়ে আর বসে থাকব না। যদি কেহ কিছু দেয়, অযাচিত যদি কিছু পাই, তাহা সব লোহার সিন্দুকে আপাততঃ বন্ধ করে রাখব। তবে পাবার জন্য এখন আর কর্ম নয়, দেবার জন্য কর্ম। হে বসন্ত, তুমি এখন আমার জন্য নও! আর আমার সহচরেরা, তোমরাও আমার জন্য নও, আমি এখন তোমাদের জন্য। তবে ফুল, তোমাকেও কি আমি এখন ত্যাগ করব? তুমি আর বসন্তের ফুল নও, পূজার নির্মাল্য। এ যে ঝরা ফুল। তোমার রূপ আমি চাই না। তোমার গন্ধ থাকুক! এ আমার কর্মের সহায়। একজনকে যে রাখতে হবে, তা না হলে একলা কি কর্ম হয়? তোমাকে না হলে আমার দানকর্ম হবে না। তুমি যে দেবতার দান, পূজার নির্মাল্য। তোমার সহায়েই বুঝব, আমারও দান করতে হবে।

আজ আমার পাওয়ার কর্ম শেষ হয়েছে। পাওয়ার কর্ম ছিল বড় কঠিন। তাতে অনেক অশান্তি, হাহাকার, দুঃখ। সে যেন এক অশেষ মৃত্যুপথ: সেথায় কত মৃত্যু আশার শব, কত উৎসাহের ভগ্ন হৃদয়, কত অনুরাগের জীর্ণ কঙ্কাল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে! এই মৃত্যুপথ উত্তীর্ণ না হলে, এ-পথে সুখ-দুঃখের বাসনাবহ্নি নির্বাপিত না করলে, দান-কর্মে অধিকার হয় না। আজ আমার সে-পথে চলা শেষ হয়েছে। পথ-শ্রান্তি দূর হয়েছে। আজ সে-কর্ম অবসান করে নূতন কর্ম পেয়েছি, দান-কর্ম পেয়েছি।

মন, তুমি এখনও কষ্ট পাচ্ছ। তোমার ভাণ্ডার দান করতে করতে খালি হবে বলে কষ্ট পাচ্ছ। মন, তুমি রিক্ত হতে সঙ্কুচিত হচ্ছ। তুমি আবার পাবে। দেখবে, তোমাকে দিতে আরও কত জন এগিয়ে আসবে! প্রকৃতি তার ভাণ্ডার খুলবে। তোমার ভাণ্ডার তখন বিশ্বের হীরা-মণি-মুক্তায় বোঝাই হবে। তুমিও বেশ নিতে জান, মন। আচ্ছা, তখন আবার ভরে নিও।

বসন্ত-প্রয়াণ (১৯১৪), মধ্যলীলা, দেওয়ার কথা

মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা বিনোদিনীর সুন্দরাননে অস্তমিত সূর্যের ক্ষীণ রশ্মি পড়িয়া তখন নবীনচন্দ্রের বাটীসংলগ্নস্থ উদ্যান সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। চঞ্চলবায়ু-বিতাড়িত বিনোদিনীর অঞ্চল কখনও গোলাপ বৃক্ষাগ্রভাগে জড়াইয়া যাইতেছিল, কখনও বা তাহা ভূমিতলে লুটাইতেছিল। আলুলায়িতকুন্তলা বিনোদিনী পবনদেবের অসভ্যতা ও লজ্জাহীনতা দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। সম্মুখ কাচখণ্ড-সদৃশ মনোহর সরোবর। বায়ুবিকম্পিত স্ফটিকজলে বিনোদিনীর ছায়া পড়িয়া কম্পিত হইতেছিল। সে-ছায়ায় মলয়-মারুতের অত্যাচারপ্রপীড়িত আপনার অর্ধনগ্ন মূর্তি দেখিয়া লজ্জাবনতা বিনোদিনী বাপীতটে বসিয়া পড়িল।

বিনোদিনী কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিত্তল কলসে গাত্রমার্জিনী বন্ধন করিয়া অন্যমনে সান্ধ্যগগনের রৌদ্রদীপ্ত খণ্ডবিখণ্ড মেঘমালা দেখিয়া সে ভাব-তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছিল; আর ভাবিতেছিল, ঐ অনন্ত আকাশের মহাশূন্যে পলকমাত্রে হয়, হস্তী, বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির অনুরূপ মেঘখণ্ড কেমন করিয়া ছুটাছুটি করে। নীড়ে প্রত্যাগমনশীল বিহঙ্গকুল সেই উদার অনন্ত আকাশ শব্দায়মান করিয়া বিনোদিনীর সৌন্দর্য-উপলব্ধির স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছিল এবং নীড়ে প্রত্যাগত দ্বিজকুলের মধুর কাকলী বিনোদিনীকে ভাব-রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া দিতেছিল।

এমন সময় পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটি স্ত্রীলোক বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "মর্ ছুঁড়ী, গলায় গামছা বেঁধে ভাব-সাগরে ডুববি নাকি? এত যদি, তবে পুরুষগুলার মত কবি হয়ে জন্মালি নি কেন?"

লজ্জিত বিনোদিনী ত্রস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আমি তোমাদেরই অপেক্ষায় বসে বসে ভাবছিলাম, দিদি। গামছাখানা উড়ে যাবে বলে কলসীতে বেঁধে রেখেছি। কৈ, মেজদি এলেন না?"

নবাগতা রমণী নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু।

নবীনের সংসার (১৯১৪), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(মোহাম্মদ) মনিরজ্জমান ইসলামবাদী

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের স্বকপোল-কল্পিত ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস পাঠে এবং তাঁহাদের আদর্শে ও ছায়া-অবলম্বনে লিখিত পাশ্চাত্য সভ্যতা-মুগ্ধ নবালোক-প্রদীপ্ত এতদ্দেশীয় লেখকগণের তীব্র সমালোচনা-পূর্ণ, বিদ্বেষবিষ-সমাকীর্ণ গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে ভারতে মুসলমান রাজত্বের যে-মলিন ও কলঙ্ককালিমা-যুক্ত শাসন-চিত্র পাঠকবর্গের মানসপটে অঙ্কিত হয়, তাহার বিষয় স্মরণ করিতেও প্রাণে নিদারুণ কষ্টের সঞ্চার হইয়া থাকে...

ইংরেজী ভাষায় লিখিত বৈদেশিকদিগের ভারতের ইতিহাস ও দেশীয় ভাষায় সে-সকলের অনুবাদ ও ভাবার্থ পাঠ করিয়া সচরাচর পাঠকবর্গের অন্তরে এরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া থাকে যে, মুসলমানগণ একমাত্র বাহুবল ও তরবারি সাহায্যেই ভারতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কঠোর শাসন ও শোষণ-নীতি দ্বারা বিলাস-ব্যসন ও নিজেদের সুখ-সম্পদে চিত্তবিনোদন ব্যতীত দেশের ও দশের সুখ সুবিধা এবং জন-হিতকর সদনুষ্ঠানাদির প্রতি আদৌ রক্ষ্য করেন নাই। দেশময় সর্বদা হা-হুতাশ ও ঘোর অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত ছিল, লোকের ধনপ্রাণ ও মান-সম্মান নিরাপদ ছিল না, দস্যু-তস্করের ভয় সর্বদা লাগা-ই থাকিত। নির্বিঘ্নে লোকের আহার-নিদ্রা হইত না। দেশে রাস্তা-ঘাট ও গমনাগমনের সুপথের কোনও সুবিধা ছিল না। মুসলমান নরপতিগণ দেশের পথ-ঘাট নির্মাণ, কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষসাধন, শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলেন। বৃটিশ শাসনে ঐ-সমুদায় অভাব অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, জনসাধারণ পরম সুখে নিরাপদে কাল হরণ করিতেছে! স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও ঐরূপ ঘৃণিত কলঙ্ক-জনিত ভাব-প্রভাবের অভাব নাই। কোমল-মতি বালকগণ শৈশবকাল হইতে তাদৃশ্য ইতিহাস পাঠ করিয়া স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় শাসনপদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং বিদ্বেষপরবশ হইতে অভ্যস্ত হয়।

ভারতে মুসলমান সভ্যতা, প্রথম ভাগ (১৯১৪), অবতরণিকা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

আইস, বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর মতন আমরাও মাটির— আমাদের মা-টির— ফেরি করিয়া জীবন ধন্য করি। মাটি নিবি গো। যে-মাটিতে তুমি, মা, শিব গড়িয়া পূজা কর, এবং সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও, সেই মাটি নিবি গো? এই মাটি চোরে চুরি করে না, বিদেশী ব্যবসায়ী কাটিয়া দেশান্তরে লইয়া যায় না; এ-মাটির মূল্য নাই, যথার্থ মূল্য আজ পর্যন্ত কেহ করিতেও পারে নাই। তোরা কেউ মাটি নিবি গো! এ-মাটির প্রতি কণা বিশাল ভারতবর্ষের বক্ষবিধৌত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কোটি তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া এ-মাটি সর্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গার স্রোতোমুখে বাঙ্গালার বক্ষে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এ-মাটির স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস গাঁথা রহিয়াছে, যুগযুগান্তরের কত গাথা ইহাতে খচিত রহিয়াছে! আমাদের বড় সাধের মা-টি নিবি গো! এ-মাটি আমার সত্যই কল্পলতিকা; যাহা চাও, তাহাই দিবেন, দিতেছেন, দিয়াছেন। এ মা-টির প্রভাবে আমাদের সকল অভাব দূর হইয়াছেন, সকল কষ্টের মোচন হইয়াছে। এই মাটি হইতে বাঙ্গালার কার্পাস এবং সেই কার্পাস হইতেই ঢাকার মল্‌মল্‌। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতেই তুঁতের চাষ আর সেই তুঁতে হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র। এই মাটি হইতেই অন্ন, আর সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের অন্নপূর্ণা। আমাদের বাঞ্ছাকল্পলতিকা মৃত্তিকা তোরা কেউ নিবি গো! ছার রজত কাঞ্চন, ছার দ্বিরদরদ-নির্মিত আসন, ছার মণিমুক্তা, প্রবাল, হীরা, ছার বিভব বাণিজ্য! আমার মাটির বজায় থাকিলে, তাহা হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটি বজায় থাকিলে তাহা হইতে ঘাস উৎপন্ন হইলেও অন্নজলের সংস্থান করিয়া দেন। আমার মাটির বাঁশবনেও টাকার তোড়া সাজান আছে, কলাবনে মণিমুক্তা ছড়ান আছে। হায় বাঙ্গালী, এমন মাটিকেও অবহেলা করিতেছ!

মাটি নিবি গো (১৯১৫)

ব্যোমকেশ মুস্তাফী

একদিন মনে হইল— যখন সত্যযুগের চারিপোয়া ধর্মের শৃঙ্খলা ত্রেতাযুগে ক্ষয়িত হইয়া তিন পোয়ায় এবং দ্বাপরে দুই পোয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর সেই সকল ভ্রষ্টাচার-নিরাকরণের জন্য, পৃথিবীকে পাপভার হইতে মোচনের জন্য, ভগবানকে যুগে যুগে অবতার হইয়া কত কাণ্ডকারখানা বাধাইতে হইয়াছ, এবং তারা পুরাণকারের কথায় আমরা বিশ্বাস করিয়া মানিয়া আসিতেছি, তখন কলিকালের এই তিন পোয়া পাপের আক্রমণ-জনিত ভ্রষ্টাচারের জন্য আমরা ক্ষুণ্ণ হইতেছি কেন? যে-শাস্ত্রের কথায় সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের ইতিহাস বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, সেই শাস্ত্রেই যখন কলিকালের জন্য এই ভ্রষ্টাচার ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা বিশ্বাস না করিয়া আমরা ইহার জন্য এত বিমর্ষ হই কেন? তারপর সেই শাস্ত্রেই কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা, কলির রমণী কেন হইবে, তাহা যখন ভগবদ্বাক্যচ্ছলে পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার অন্যথা কল্পনা করি কেন? আমরা এ-প্রথার পরিবর্তন করিব, বেদহীন করিল ব্রাহ্মণকে বেদশিক্ষা দিয়া আবার সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিব— এ-সকল কল্পনা করিয়া মস্তিষ্ক বৃথা পীড়িত করি কেন? ইহা দ্বারা কি আমাদের ভগবদ্বাক্য-হেলন, ভগবদ্বাক্যে অনাস্থা-প্রদর্শন করা হয় না? তদ্ভিন্ন আর এক কথা আছে। ভ্রষ্টাচার ও পৃথিবীর পাপ ভার-লাঘবের জন্য ভগবান নিজেই অবতার হইয়া সে-কার্য সম্পাদন করেন: "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটা তাঁহারই শ্রীমুখ-বিনির্গত; অতএব যাঁহার কার্য, তাঁহারই জন্য রাখিয়া দিয়া আমরা যদি অনধিকারচর্চা পরিত্যাগ করিয়া সার্ষপ-নিদ্রা ভোগ করি, বর্ণাশ্রমাচার সংস্থাপন, পতিত জাতির উদ্ধার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলন, নিষিদ্ধভোজন বিচার প্রভৃতি বড় বড় সামাজিক সংস্কারের কথায় নাচিয়া না বেড়াই, শাস্ত্রানুসারেই আমাদের কোন অকর্ম করা হইবে না।

...চৈতন্যবতারের পূর্বে যাঁহারা 'পাষণ্ডী জনার' অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং ধরণীকে নিপীড়িত দেখিয়া ক্লেশানুভব করিতেন, সেই অদ্বৈত-শ্রীবাস-চন্দ্রশেখরাদি গোপনে শ্রীবাসের বা অদ্বৈতের অঙ্গিনা কাঁদিয়া ভিজাইতেন। তাঁহারা তখনকার ম্লেচ্ছরাজের সাহায্যে সতীদাহ- প্রথা নিবারণ, গঙ্গাসাগরে পুত্রনিক্ষেপ, রাজপুত্রের কন্যাহত্যা, চড়কপূজায় বাণ-ফোঁড়া প্রভৃতি সমাজের অনিষ্টকর কুসংস্কারগুলির সংস্কার কল্পনা করিয়া কোন আইন পাশ করাইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তাঁহারা প্রাণের ব্যথায় প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেন, আর ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতেন। হইলও তাই: সেই চৈতন্য আসিয়া যাহা করিতে হয় করিয়া গেলেন।

রোগশয্যার প্রলাপ (১৯১৫), ১৩

এয়াকুব আলী চৌধুরী

এই যে মহাকাল দিন-রাত্রির পদক্ষেপ করিয়া তালে তালে গমন করিতেছে, এই যে নিয়মিত ঋতুপর্যায় ও ফুল ও ফলের প্রবাহ, এই সকলের মধ্যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যপিপাসার পরিচয় আছে। বিশ্বব্যাপী জলধারা নানা পথ বাহিয়া সাগরে পড়িতেছে; নির্ঝরণী তরঙ্গিনীকে অঙ্গ মিশাইতেছে, তটিনীমালা তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সাগরে ছুটিতেছে; জীব তরু ও গিরি মরুর বিপুল বৈচিত্র্য বক্ষে লইয়া এক বিশাল ধরা ও নানা কক্ষচারী গ্রহরাজি নানা পথে একমাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; শত শত সূর্য লক্ষ লক্ষ গ্রহ লইয়া ভ্রমণ করিতেছে; অনন্ত অম্বরে অনন্ত জ্যোতিষ্ক ঐকতানে নৃত্য করিতে করিতে অন্তরের বন্দনা করিতেছে; কোথাও কোন বিরোধ নাই, বৈষম্য নাই, সমস্ত একই আকর্ষণে আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির বিকাশের মধ্যে ঐক্যসূত্র পরিষ্কাররূপে প্রকাশমান।

এই ঐক্যপিপাসা মানব-প্রকৃতিতেও সমভাবে বিদ্যমান আছে। সুতীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ— মানুষের অন্তরের ধর্ম, রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনকে অন্তহীন বৈচিত্র্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আপনাকে অন্যের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে মানুষ কিছুতেই প্রস্তুত নহে। মানুষ বুঝিতে চায়, দেখাইতে চায়, সে স্বতন্ত্র, সে স্বতন্ত্র, সে কিছু, তাহার আসনে সে গরীয়ান সম্রাট, সে কিছু, তাহার আসনে সে গরীয়ান সম্রাট। তথাপি মানুষ স্বীয় সুখস্বার্থ সংহত করিয়া পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে, স্বাতন্ত্র্যমুখী আত্মবোধ অতিক্রম করিয়া সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র সৃজন করিতেছে, স্বাতন্ত্র্যমুখী আত্মবোধ অতিক্রম করিয়া সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র সৃজন করিতেছে; গিরি নদীর গণ্ডি কাটিয়া ধর্মের মণ্ডলী গড়িতেছে। সাহিত্যের স্বাদ, জ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞানের আবিস্কার ও মনীষীর চিন্তা দিন দিন মানুষ হইতে মানুষের দূরত্ব হ্রাস করিয়া আনিতেছে। নানা দেশের ও নানা ভাষার মানুষ নানা সংঘর্ষের মধ্য দিয়া একমাত্র বিশ্বমানবতার দিকে পদক্ষেপ করিতেছে। মানুষের মধ্যকার সমস্ত ভেদ ও বিসম্বাদ নষ্ট করিয়া এক মহা রাজচ্ছত্র-তলে মহামানব-মণ্ডলী গড়িবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তরে চিরকাল জাগ্রত রহিয়াছে। এমন একদিন আসিবে যখন স্বার্থদ্বন্দ্ব ও ধর্ম-বিদ্বেষ ঘুচিয়া যাইবে, পাপতাপের অবসান হইবে, এবং একধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় লইয়া মানুষ পৃথিবীতে প্রেমের শান্তিময় স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিবে। মানুষ চিরকাল ধরিয়া এই চরম ঐক্যের আশায় তাকাইয়া আছে।

শান্তিধারা

অজিতকুমার চক্রবর্তী

পশ্চিমের লোকেরা জানে যে, মহাভারতের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্লোক এবং রামায়ণের আটচল্লিশ হাজার শ্লোক এবং যত রাজ্যের অসম্ভব অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পই হিন্দুসাহিত্য— কেবল উপমা অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের ঘটা— শব্দের চাতুর্য এবং তত্ত্বের কচ্‌ কচি তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, আপাদ-মস্তক-গহনামণ্ডিত দেহের মতো, তাহার গড়ন যে কেমন, সৌন্দর্য যে কেমন, তাহা বুঝিবার জো নাই। আমরাও তেমনি জানি যে, পশ্চিমের সাহিত্য মানে শেই শেক্‌সপীয়র এবং টেনিসন এবং তাহাদের সমালোচকবর্গ। পশ্চিমের লোকেরা যখন আমাদের গালি দেয় যে, তোমাদের কলাবোধ নাই, আমরা পাল্টা জবাব দিই যে, "ও বোধটা তোমাদের জন্য কায়েম করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা তো তত্ত্বের ধার ধারো না, ঐ বস্তুর বোধ ভিন্ন আর কোন্‌ বোধ তোমাদের জন্মিবে, বলো?"

যাহাই হউক, আমাদের অজ্ঞাতসারে বিধাতাপুরুষের গোপন দূতেরা হাওয়ার মুখে পশ্চিমের শিল্পসাহিত্য হইতে কলাসৌষ্ঠববোধের বীজ এ-দেশে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং পূর্বদেশের ভারী ভারী তত্ত্বের বীজ ও সাধনার বীজ ও-দেশে লইয়া যাইতেছিল। কেবল আমাদের সঙ্গে পশ্চিমের প্রভেদ ছিল এই যে, আমাদিগকে যে-কারণেই হউক বাধ্য হইয়া পশ্চিমের সাহিত্য পড়িতে হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে সেই সাহিত্য হইতে রস আদায় করিয়া আমাদের নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গে তাহার একটা সজীব সম্বন্ধ সাধন করিতেও হইয়াছিল। এইরূপে আমরা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু বিদেশীরা আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; শুধু জানিত এই যে, হিন্দুসাহিত্যে অনাবশ্যক মাল মসলা এতই অধিক যে তাহার মধ্য হইতে রস আদায় করা বিষম শক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের উপমার আড়ম্বরের এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রাসের ঘটার যেটুকু রস পশ্চিমীরা চাখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত হইয়াছিল।

কাব্যপরিক্রমা (১৯১৫), গীতাঞ্জলি

সতীশচন্দ্র ঘটক

অয়ি নাসাগ্রদোলক মৌক্তিক-বিন্দু! অয়ি বালিকা-যুবতী-বয়োমধ্যবিহারিণি, অপূর্ব্বলাব্যণ্যময়ি নোলকেশ্বরি, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। অয়ি নবোঢ়াবদন-কমলোদ্ভাসিনি! তুমি নববধূর সলজ্জকপোল, সুস্মিতাধর, ব্রীড়াবনত মুখখানির উপর যে-অতুলনীয় শ্রী ছড়াইয়া দাও, তাহার নিকট তাজমহলের শোভাসম্পদও ম্লান বলিয়া প্রতিভাত হয়। সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবনা ও পূর্ণাবয়বার মধ্যে যে-স্বল্প অবকাশটুকু, তাহাই তোমার রাজত্বকাল; তাহার মধ্যেই তুমি রাজ-রাজেশ্বরীর ন্যায় বিরাজ কর, এবং তাহার অন্তেই তুমি বিলীন হও। চাণক্যের ভাষায় বলিতে গেলে "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে" তোমাকে আর বড় দেখিতে পাই না। অন্যান্য আভরণ পূর্ব্ববৎ নারী-অঙ্গে বিহার করিতে থাকে বটে, কিন্তু তুমি পত্রাগ্র-বিলম্বী লম্বমান শিশিরকণার ন্যায় প্রখর যৌবন-মার্তণ্ডাতপে শুকাইয়া যাও। তুমি নলিনী-দলগতজলবৎ সততই তরল, সততই চঞ্চল, সততই টলটল করিয়া দুলিতেছ; যৌবন-তরঙ্গের উদ্বেল হিল্লোলে তুমি টুপ করিয়া পড়িয়া যাও। আমার ইহাও মনে হয় যে, প্রত্যাসন্ন-যৌবনবসন্তে মুকুলিত দেহলতিকার তুমি একটি নবোদ্‌গত শুভ্র কলিকা; পরিণত বসন্তের তাপাধিক্যে তুমি নাসাবৃন্ত হইতে খসিয়া পড়।

তরুণী বালার তুমি একমাত্র আভরণ। অন্যান্য আভরণ তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে। অন্যান্য আভরণে তাহার ন্যায় যুবতীরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তুমি বালিকার অঙ্গে প্রযুক্ত হইলেও যুবতীর অঙ্গে প্রযুক্ত হও না: তুমি সম্পূর্ণ বালিকাশ্রয়িনী বা বালিকাত্ব-ব্যাপিনী...

নোলকেই বালিকার বদন-কমল সর্বাপেক্ষা অধিক শোভামান হয়। কেবলমাত্র নোলক নাসাগ্রে দোদুল্যমান থাকিলে বালিকার যে সৌন্দর্য বিকশিত হয়, নোলক না থাকিলে তদ্ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কারেও সেরূপ হয় না। আবার ঐ নোলক যদি কোন বিংশতিবর্ষীয়া রমণীর নাসায় দোলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে-নাসা তিলফুলের ন্যায়ই হউক আর শ্যেনচঞ্চুর ন্যায়ই হউক, তাহাকে অবিলম্বে সূর্পনখার নাসায় পরিণত করিতে ইচ্ছা হয়।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ (১৯১৫), নোলক

হরিদাস হালদার

ভারবর্ষের সকল ধর্মই অনুষ্ঠান-গত। অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ধর্মসাধনা হয় না। বক্‌র-ঈদের সময় এ-দেশের মুসলমানেরা যে গো-হত্যা করে, তাহা তাহাদিগের ধর্মের অনুষ্ঠানবিশেষ। আর, হিন্দুদিগের গো-রক্ষিণী সভা হইলে যে গো-মাতার পূজা ও রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাও একটি ধর্মানুষ্ঠান। এই দুই ধর্মানুষ্ঠানের পরস্পর-সংঘর্ষে প্রতি বৎসর যে-লাঠালাঠি হয় ও রক্তের নদী বহিয়া যায়, তাহা অবলোকন করিয়া স্বর্গে দেবতাগণ শত ধন্যবাদ প্রদান করেন। আর, মর্তে রাজপুরুষেরা পূর্বাপর এই সংঘর্ষের মধ্যে নিলিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া পক্ষাপক্ষের আইনমত ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করিয়া শাসনদণ্ডের গুরুত্ব ও লঘুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দিতে পারেন না: প্রজার ধর্মরক্ষা করা-ই রাজার ধর্ম।

কি-উপায়ে ভারতের প্রজাপুত্রের ধর্মবিরোধ ঘুচিয়া যায়, অথচ তাহাদিগের সকলের ধর্ম সর্বতোভাবে রক্ষা হয়, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য আমাকে একবার কিছুদিনের জন্য দেশের নানা স্থানে পর্যটন করিতে হইয়াছিল। আর পাঞ্জাবে গিয়া দেখিয়াছিলাম, সেখানে শিখ ও মুসলমানের মধ্যে যতদূর ধর্মবিরোধ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততদূর নহে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের বিবাদ ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে গুরু নানক উভয়ের ধর্মশাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সামঞ্জস্যমূলক শিখ ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, ধর্মের সিমেন্ট দিয়া রাম ও রহিম নামক দুই সহোদরকে জুড়িয়া এক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেখানে দাঁড়াইয়াছে রাম, রহিম ও গ্রন্থসাহেব; এবং এই তিন সহোদরের মধ্যে বহুদিন যাবৎ পৈতৃক বাস্তুভিটার জন্য পার্টিশনের মামলা চলিতেছে। পঞ্চনদের কোন্ অংশে কাহার ভাগে পড়িবে, তৎসম্বন্ধে এখনও কোনও রায় বাহির হয় নাই।

বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের মধ্যস্থ ধর্মবিরোধের ত্রিভুজকে জ্যামিতির ছকে ফেলিয়া ধর্মসমন্বয়ের গোলাকার বৃত্তে পরিণত করিতে গিয়া চতুর্ভুজ ধর্মবিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের নবজাত মানসপুত্র ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সমাজের মধ্যে কোনও সমাজই এক্ষণে আপনার ক্রোড়ে স্থান দিতে রাজী নহে। আশা হয়, এই শিশু বাঁচিয়া থাকিলে এককালে সাবালক হইয়া বঙ্গের চার আনির সরিক হইয়া দাঁড়াইবে এবং অন্ন পৃথক করিয়া লইবে।

গোবর গণেশের গবেষণা (১৯১৫), প্রথম পরিচ্ছেদ: ধর্ম ও অনুষ্ঠান

ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়

"বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে ত্রিভঙ্গমুরারি শ্যামের রাধানামে সাধা বাঁশী বাজিত— আর সে বাঁশীর সুরে যমুনা উজান বহিত, ব্রজগোপীগণ কুলমান লজ্জাভয় তাজিয়া, সংসারের খুঁটিনাটি কাজ ফেলিয়া, নিত্যকৃত জলাঞ্জলি দিয়া, ত্বরিত চরণে ত্রস্তবসনে, আকুলমনে, উদাসপ্রাণে, সেই রাধারমণ বংশীবদনের সঙ্গে মহারাসে মিলিবার জন্য, লীলানন্দরসে মজিবার জন্য, বনপথে ছুটিত, কণ্টক কঙ্কর কুশাঙ্কুর কিছুই গ্রাহ্য করিত না। সাফ কবিকল্পনা! আর কবিকল্পনা যেমন হয়— কালিদাস, শেক্‌সপীয়ার, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু সর্বত্র যেমন দেখি— সব আদিরসে ওতঃপ্রোত, কামিনী ও কামনা তাহার সর্বস্ব। যমুনা উজান বহার কথা ত রঞ্জিকা গঞ্জিকার রঙ্গনী একেবারে ডন্ জুয়ানের দ্বাপরের সংস্করণ। এই সব লইয়া আবার ভক্ত ভাবুকে ভাগবতগণ বড়াই করেন: শুধ্ বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।"

শাক্তবংশে জন্মিয়া, ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া, জনৈক-বৈষ্ণব বন্ধুর অনুরোধে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধান্তর্গত রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়াছিলাম ও পাঠান্তে তাঁহার নিকট এই তীব্র মন্তব্য প্রকটন করিতেছিলাম, এমন সময় খঞ্জনী বাজাইয়া গৌরদাস বাবাজী দ্বারে সাড়া দিলেন। বাবাজীর গলা বড় মিঠা, আবার ধরনধারণ অনেকটা হাল ফ্যাশানের। তাই বাবাজী আসিলে আনন্দলাভ করিতাম। আজ কিন্তু ঠিক এই সময়ে বাবাজীর সাড়া পাইয়া একটু থতমত খাইলাম...।

বাবাজী আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "বাবুজী, পাগলের মত কি কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছিলেন, পাষণ্ডের মত কি অজস্র অকথা-কুকথা বলিতেছিলেন?... ব্রজগোপীগণ কেহ ঘরের পাট করিতেছিলেন, কেহ দুধ জ্বালা দিতেছেন, কেহ কুটনা কুটিতেছেন, কেহ বাঁটনা বাঁটিতেছেন, কেহ রান্না চড়াইয়াছেন, কেহ আহারে বাসিয়াছেন, কেহ পতিসেবা করিতেছেন, কেহ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছেন, এমন সময় শ্যামের বাঁশী বাজিল— আর অমনি হাতের কাজ ফেলিয়া সব উধাও হইয়া ছুটিল, 'কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া সব বিসরিত ভেল', ইহা কি আপনার কাছে নিতান্তই অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়? ইহা কি আদিরসাশ্রিত অভিসার ভিন্ন আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না?"

পাগলা ঝোরা, শ্যামের বাঁশী (১৯১৫)

ফণীন্দ্রনাথ পাল

সুনীতির স্বামী যামিনীকান্ত কলিকাতায় কোন এক সওদাগরি আপিসের কুড়ি টাকা মাহিনার কেরানি। তাহার বিদ্যার দৌড় ছিল ইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলে লোকে সহজে মনে করিতে পারিত না, যামিনীকান্ত এহেন ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিয়া থাকেন। দরিদ্র শ্যালকপত্নীর অলঙ্কারের বিনিময়ে যামিনীকান্তর এই সমস্ত পোষাক সরবরাহ হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। 'কামান'র দিন সুনীতির ভ্রাতৃগৃহ হইতে প্রয়োজনীয় কাপড় ইত্যাদি আসা-ই নিয়ম। আজ সেই দিন, কিন্তু এখনও কাপড় আসিয়া পৌছয় না। সুনীতি মুখখানি কালি করিয়া বসিয়াছিল।

ননদ আসিয়া তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া কহিল, "কি গো বউদিদি, তোমার দাদা ত দেখছি বেশ কেলেঙ্কারী করলে। তুমি আবার দাদার জাঁক করে বেড়াও না? কাল বলছিলে, খাক না খাক, তবু দাদা কাপড় পাঠাবে!"

সুনীতি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল: সে কি-উত্তর দিবে? এক কথা বলিতে আরম্ভ করিল, "কোথায় বা তোমার দাদা, আর কোথায় বা তোমার কাপড়? যা হোক, বউদিদি, তোমার দাদা সত্যি ভারি ছোটলোক!"

এই শেষ কথায় সুনীতি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল 'আমাকে তোমাদের যা ইচ্ছা হয় বল, আমার দাদাকে তোমরা কিন্তু কিছু বলতে পারবে না!"

এমন সময় কোথা হইতে তাহার শাশুড়ী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, চীৎকার করিয়া কহিল, "আরে আমার ভাই-সোহাগি, ওঁর ভাই করবে ছোটলোকের বেহদ্দ কাজ, আর সে-কথা কেউ ওঁর সামনে বলতে পারবে না— কেন বলবে না? এক শ বার বলবে!"...

যামিনীকান্ত সেদিন সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইল; কেবল চীৎকারে জীর্ণ গৃহখানি কাঁপাইয়া বারংবার তর্জনী তাড়না করিয়া পত্নীকে শাসাইয়া গেল: "আজকের দিনটা আর কিছু বললাম না, শুধু তোর দাদা ছোটলোক, তোর বাবা খুড়ো জ্যাঠা সবাই ছোটলোক, ছোটলোকের ঝাড়; না হলে আজকের দিনে কাপড় দেয় না! তোকে দু-চার ঘা দিতে পারলে তবে এ-অপমানের শোধ হত।"

সই-মা (১৯১৫), দাদা

কিন্তু আমাদিগের এই হতভাগ্য দেশের প্রতি নেত্রপাত করুন। এই অভিশপ্ত দেশের আধুনিক ইতিহাস পাঠ করুন: দেখিতে পাইবেন, আমাদিগের দেশে প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভাব নাই। যে-বয়সে অন্যান্য দেশে প্রতিভা বিকশিত হয় না, যে-বয়সে অন্যান্য দেশে কর্মীরা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকেন, আমাদিগের দেশে সেই বয়সে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ সীমার সমীপবর্তী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতিষ্ঠার দ্রাঘিমাচক্র অতিক্রম করিবার পূর্বেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। যে-সুন্দর ঊষা ও বিমল প্রভাত দেখিয়া দেশবাসী মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণজাল ও সূর্যাস্তের গৌরবময় দৃশ্য দেখিবার আশা করিয়াছিলেন, তাহাদের সে-আশা পূর্ণ হয় নাই, আকস্মিক ঘন মেঘের অন্তরালে তাঁহাদিগের প্রতিভালোক অদৃশ্য হইয়াছে। সিপাহী-যুদ্ধ ও নীলবিপ্লবের সময়ে, দেশের সেই মহাসঙ্কটকালে, দুর্দিনের অন্ধকারে, যাঁহাদিগের প্রতিভালোক রাজা ও প্রজাকে গন্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্বজাতিবৎসল হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের কথা স্মরণ করুন। পরবর্তী যুগের রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল ও সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা স্মরণ করুন। চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই নিষ্ঠুর কালের আহ্বানে তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ দেশবীরগণের চরণপ্রান্তে বসিয়া অনভিজ্ঞ বালকগণ যে-বীরত্বকাহিনী, যে-জয়পরাজয়কাহিনী শ্রবণ করিয়া উৎসাহ ও উত্তেজনা লাভ করে, হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সমাজদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করে, আমাদিগের দেশের নব্যযুগের ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে, সে-কাহিনী শ্রবণ করিতে পান নাই, তাঁহাদিগের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ পূর্ববর্তী আচার্যগণ বার্ধক্যের বহু পূর্বেই কর্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। নব্যযুগের সাধকগণকে পুনরায় নূতন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে; পূর্ববর্তী যুগের মণীষিগণ দেশে যে-জীবনস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, সে-স্রোতের গতি ইহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই; তাঁহাদিগের স্থান ইহারা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। নূতন প্রতিভা নূতন পথ প্রস্তুত করিতেছে। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য, কারণ ইহাতে উন্নতির গতি মন্দীভূত হয়।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৯১৫), প্রথম পরিচ্ছেদ: বাল্যজীবন

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

মুসলমান শাসনের সে-সময়ে সকলেই সুখে শান্তিতে বাস করিতেছিল; কিন্তু এক শ্রেণীর খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের কাছে এই শান্তি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টিয়ান ধর্মচর্চায় মুসলমানেরা বাধা দিত না বলিয়া কোনো খৃষ্টিয়ান ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া বাহাদুরী লাভ করিতে পারিতেছিল না। জোর করিয়া মার্টার সাজিবার জন্য অর্থাৎ কোনো প্রকারে একটা ছুতা খুঁজিয়া ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণপাত করিবার গৌরব লাভ করিবার প্রত্যাশায় কয়েকজন পুরুষ এবং রমণী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিনা কারণে এবং অযাচিতভাবে সুলতানের মন্ত্রী কিংবা কাজির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কয়েকজন পুরুষ এবং রমণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগলেন যে, মুসলমান ধর্ম মিথ্যা, মহম্মদ চোর এবং কোরাণের ব্যবস্থা নারকীয়। মন্ত্রী এবং কাজিগণ এই উন্মাদদিগকে অনেক বুঝাইয়া ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সাধু ব্যবহারে আরও উত্তেজিত হইয়া মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যাহাতে প্রাণদণ্ডের নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ বা কারাগারে রুদ্ধ হইবার পর এই উদ্‌ভ্রান্তভাব পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজন একেবারে না মরিয়া ছাড়েন নাই। সে-যুগের খৃষ্টিয়ানদিগের পক্ষে পরবাদসহনীয়তা অসহ্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কৌতুকাবহ কথা বলিতেছি। মুসলমানেরা প্রতিদিন যত্নপূর্বক মুখ ধুইত এবং দাঁত পরিষ্কার করিত, হাত-পা না ধুইয়া মসজিদে নেমাজ পড়িত না এবং আহারের পর সর্বদাই মুখ ধুইত; যাহা কিছু মুসলমানেরা করিত, তাহারই উল্টা অনুষ্ঠান করিতে হইবে বলিয়া এই সকল পরিচ্ছন্নতার বিরদ্ধেও কয়েকজন পুরুষ পাদ্রী এবং চিরকুমারী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মনের পরিচ্ছন্নতাই যে আসল পরিচ্ছন্নতা, এ-কথা কেহ অস্বীকার না করিলেও ঐ ভাল কথাটির ধুয়া ধরিয়া অনেক খৃষ্টিয়ান জলসংযোগের পরিচ্ছন্নতা জিদ করিয়া পরিহার করিয়াছিল। একজন ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা খৃষ্টিয়ান নারী স্পর্ধার সহিত মুসলমান মৌলবীদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ষাট বৎসর ধরিয়া দাঁত পরিষ্কার করেন নাই কিংবা গায়ে জল দেন নাই। স্পেনদেশে খৃষ্টিয়ান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইবার পর ইংলণ্ডের রাণী মেরীর স্বামী ফিলিপ কর্ডোভা নগরের বহুসংখ্যক স্নানাগার মুসলমান কুসংস্কারের চিহ্ন মনে করিয়া একেবারে ধ্বংস করিয়াছিলেন।

প্রাচীন সভ্যতা (১৯১৫), ইউরোপে সারাসেন সভ্যতা

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

অম্বরচুম্বিত কৈলাসশৃঙ্গে শরতের প্রথম চন্দ্রকিরণ শত শত শিলাখণ্ডে কিশোর সুবর্ণতনু বিস্তৃত করিয়া হরপার্বতীর পদসেবা করিতেছিল। হরজটানিঃসৃতা শুভ্রফেনাবগুণ্ঠিতা আকাশবাহিনী গঙ্গা ঈষৎকম্পিত পার্বতীর বায়ুর স্পর্শে নাচিতে নাচিতে উত্তরদিকে শিখর হইতে শিখর ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে যোগমগ্ন ঋষিগণের আশ্রমে যাইতেছিল। বিমল আকাশ। শিশিরস্নাত শত ফুলের পরিমল বহিয়া প্রকৃতি মহেশ্বরের পূজা করিতেছিল। বিশ্বনাথের অর্ধনিমীলিত নেত্র। গৌরী অর্থ অঞ্চল পাতিয়া স্বামীপদতলে সুষুপ্তা।

মহেশ্বরের বসতবাটী কৈলাসের মধ্যভাগে। অত্যুচ্চ শিখরে তিনি কেবল যোগাসনে বসিয়া থাকেন। বাটীর মধ্যে কেবল দুইটি ঘর। একটি ঘরে জয়া বিজয়া শুইয়া থাকে। অন্য ঘরে গৌরীর পুতুলে সজ্জিত প্রকাণ্ড বেদী বা মঞ্চ। গৌরী চিরকালই বালিকা, অতএব তিনি পুতুল খেলিয়া থাকেন। এই খেলার সময় মহাদেব ঘুমাইয়া পড়েন। খেলা সাঙ্গ হইলে গৌরীও ঘুমাইয়া পড়েন। তখন জয়া বিজয়া চলিয়া যায়। বেদীপার্শ্বে সুবর্ণপ্রদীপ সারানিশি জ্বলিয়া থাকে।

বহির্বাটী প্রায় শ্মশানের মত। ভাঙ্গা ঘরের সম্মুখে ষাঁড় শুইয়া থাকে। চতুর্দিক আবর্জনায় পরিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। ভাঙ্গা ঘরের মধ্যেই সর্পের বিবর। তন্মধ্যে গোটাকতক পুরাতন সর্প বাস করে; অবশিষ্টগুলি জটার মধ্যেই থাকে। প্রস্তরের দেয়ালে পেরেক ঠুকিয়া শিঙ্গা ডম্বরু প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত। দক্ষিণ কোণে ত্রিশূলটা হেলিয়া থাকে। বিখ্যাত ত্রিপুরাসুর-বধের পর ত্রিশূল আর ব্যবহৃত হয় নাই, সুতরাং তাহার আগাগোড়া মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ। একটা চারি ইঞ্চি পেরেকের উপর সিদ্ধির ঝুলি লম্বমান, এবং গৃহের মধ্যে সুবিস্তৃত ও কুঞ্চিত— উভয় প্রকারের বাঘছাল।

গৃহের অনতিদূরে নিম্ববৃক্ষ। বৃক্ষতলে নন্দী শুইয়া থাকে এবং ভৃঙ্গী বৃক্ষের উপর থাকিতে ভালবাসে। কিছু দূরে কার্তিকের ব্যারাক। ময়ূরের দৌরাত্ম্য রোধ করিবার জন্য নন্দী একটা সপ্তহস্তপরিমিত আকন্দের বেড়া দিয়াছিল; তাহা কালক্রমে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।... গণেশ উপবনে বেদপাঠ করেন; সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ...

ঘটনার দিনে হরপার্বতী গৃহ ছাড়িয়া সর্বোচ্চ শিখরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আগামী শারদীয় মহোৎসবে দলবল সহিত ভগবতী মর্তে আগমন করিবেন, তাহা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। নন্দী ডাকিল, "ভৃঙ্গী!" ভৃঙ্গী বলিল, "হুঁ!" নন্দী বলিল, "দাদা ও দিদিবাবুদের নামে নোটিশ লিখিয়া ফেল।"

ছোট ছোট গল্প (১৯১৫), শারদীয় দুর্ঘটনা

(মুন্সী) আবদুল করিম

বর্তমান কালে হিন্দু-মুসলমানে পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ভাবই থাকুক না কেন, প্রাচীনকালে তাঁহাদের মধ্যে একত্র বাস নিবন্ধন, পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও সহানুভূতি যে অত্যন্ত প্রবল ও গভীর ছিল, পুরাবৃত্তের আলোচনা দ্বারা তাহার অনেক নির্দশন পাওয়া যায়। তাঁহারা তখন পরস্পর ভিন্নধর্মাবলম্বী হইয়াও একে অন্যের আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদাদির অনুকরণ বা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তৎকালে হিন্দুগণ মুসলমানের কোন কোন ধর্মবিশ্বাসকে কিরূপে আপনাদের স্বজাতীয় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা অধুনা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা সময়ে সময়ে দেশের শান্তিভঙ্গ হইলেও তখন জনসাধারণের মধ্যে যে একটা নিবিড় শান্তি ও প্রীতির ভাব এবং সহানুভূতির ভাব হইতেই পারে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারতার ভাব আসিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহারই ফলে একদিন হিন্দুসমাজে হিন্দুর মনসা পূজা ও কাত্যায়নীর ব্রত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই উদারতা ও সুহৃদ্ভাবই এক সময়ে হিন্দুসমাজকে মুসলমানের মসজিদ-দরগাহের প্রতি ভক্তি ও মুসলমানের পীর আউলিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রণোদিত করিয়াছিল। আবার সেই উচ্চ উদারতা ও সম্প্রীতির ভাবই একেশ্বরবাদী মুসলমান কবিগণকে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় এবং সৈয়দ জাফর ও মির্জা হোসেন আলিকে কালী-মাহাত্ম্য রচনায় এবং গাজী দরাফকে গঙ্গাপূজায় প্রবর্তিত করিয়াছিল। তখন উভয় জাতির আচার ব্যবহার পরস্পরের মধ্যে এতই পরিগৃহীত হইয়াছিল যে, যদি আজ পর্যন্ত সেই ভাব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া অসিত, তবে এতদিনে যে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম বিষয়ে এত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া এক মহামিলনভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু হায়! তো হি নো দিবসা গতাঃ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ একদিন বড় সাধে যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কালের ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া তাহা একেবারে চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিয়াছে। পরস্পর শত্রুভাবপন্ন থাকিয়াও হিন্দু-মুসলমান এক সময়ে অলক্ষ্যে এক মহামিলন-পথের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, আর আজ উভয়ে এক অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত সত্যনারায়ণের পুঁথির ভূমিকা (১৯১৫)

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রজতবর্ণ, মুখ রক্তকমলবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় মণিগোলকবৎ উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার খুরগুলি যেমন লাক্ষাসংযোগে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহার পুচ্ছ হইয়াছিল চমরী-পুচ্ছের ন্যায়, শরীর হইয়াছিল অশ্বশাবক-প্রমাণ। তিনি 'ন্যাগ্রোধমৃগরাজ' নাম গ্রহণ করিয়া পঞ্চশত মৃগসহ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। অনতিদূরে তাঁহারই ন্যায় হেমবর্ণ আর একটী মৃগেরও পঞ্চশত অনুচর ছিল; তাঁহার নাম ছিল 'শাখামৃগ'।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন; মৃগমাংস না পাইলে তাঁহার আহার হইত না। তিনি প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী বহু প্রজা সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন। ইহাতে তাহাদিগের সাংসারিক কাজকর্মের এত ব্যাঘাত হইত যে, শেষে জ্বালাতন হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল: "চল, ভাই, রাজার উদ্যানে মৃগদিগের আহারার্থ তৃণ রোপণ এবং পানার্থ জলের আয়োজন করি। তাহার পর আমরা বন হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া উদ্যানের ভিতর পুরিব এবং রাজাকে সমস্ত অবরুদ্ধ মৃগ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।"

ইহা স্থির করিয়া তাহারা রাজোদ্যানে তৃণ রোপণ ও কূপ-পুষ্করিণী খনন করিল এবং মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে একসঙ্গে মৃগান্বেষণে বাহির হইল; তাহারা বনে প্রবেশ করিয়া এক যোজন বেষ্টন করিয়া ফেলিল; ন্যাগ্রোধমৃগ এবং শাখামৃগ উভয়েরই বিচরণক্ষেত্র ঐ চক্রের মধ্যে পড়িল। অনন্তর বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখিতে পাইয়া বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির উপর মুদ্গরের আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে মৃগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন ঐ সকল লোকে তরবারি, শক্তি, ধনুর্বাণ প্রভৃতি আস্ফালনপূর্বক বিকট শব্দ আরম্ভ করিল এবং মৃগগুলিকে তাড়াইয়া উদ্যানের অভিমুখে লইয়া চলিল। উদ্যানের দ্বার পূর্ণ হইতেই উন্মুক্ত ছিল। ভয়বিহ্বল মৃগগুলি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পর লোকে অর্গল দিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

এইরূপে বহু মৃগ সংগ্রহপূর্বক তাহার ব্রহ্মদত্তের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়া আমাদের কার্যহানি করেন। আজ আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করিয়া রাখিলাম। এখন হইতে ঐ সকল বধ করিয়া ভোজন করুন।"

জাতক, (প্রথম খণ্ড) (১৯১৬), ১২, ন্যাগ্রোধমৃগ-জাতক

রামপ্রাণ গুপ্ত

অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে হিন্দু সৈন্যের সমস্ত পরাক্রম ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। রাজকুমার বীরনারায়ণ শত্রুহস্ত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতে আহত হইলেন। তেজস্বিনী রাণী প্রাণাধিক পুত্রের তাদৃশ বিপদাপন্ন অবস্থা দেখিয়াও অবিচলিত রহিলেন; আহত পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিয়া অমিত পরাক্রমে শত্রু সৈন্য মন্থন করিতে লাগিলেন। তদীয় সৈন্যগণ রাজকুমারকে আহত দেখিয়া নিরুৎসাহ হইল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাণী দুর্গাবতী এই ভাগ্যবিপর্যয়েও অবিচলিত রহিলেন, কেবলমাত্র তিনশত সৈন্য লইয়া পরমোৎসাহে অসমসাহস সহকারে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিছুতেই একপদ পশ্চাৎপদ হইলেন না। শত্রুহস্ত-নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল, তিনি স্বহস্তে ঐ শর উত্তোলন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার একাংশ চক্ষুর অভ্যন্তরে ভাঙ্গিয়া রহিল। ইহার পর আর একটি শর আসিয়া তাহার গ্রীবাদেশে বিদ্ধ হইল। এই উভয় স্থানে যন্ত্রণায় তাঁহার নিকট চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে একপার্শ্ব হইতে অপরপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। জয়াশা তিরোহিত হইল। একজন বিশ্বস্ত পরিচারক তাঁহাকে রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন, "আমরা জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া কি আত্মসম্মানও বিসর্জন করিতে হইবে? আমরা এতদিন যশঃ ও মর্যাদা লাভ জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছি; এখন কি ঘৃণ্য জীবনের জন্য সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত যশঃ ও মর্যাদা পরিত্যাগ করিব? যদি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার বর্শার আঘাতে আমার জীবনান্ত কর; তাহা হইলে আমাকে আর আত্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না।" রাণীর বাক্যে পরিচারক অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। এদিকে শত্রুকুল তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন তেজস্বিনী রাণী দুর্গাবতী শত্রুহস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কায় সহসা পার্শ্ববর্তী পরিচালকের কোষ হইতে তরবারি গ্রহণ করিয়া স্বীয় হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন; তাঁহার দেহ ভূতলে পতিত হইল।

ভারত-ললনা (১৯১৬), দুর্গাবতী

রাণীর যখন স্বামী মরিল, তখন তাহার মাথা-ছাপান ঋণ এবং পূর্ণ দশমাস গর্ভ...। সৎগোপের কন্যা রাণীর বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর...। এই কাঁচা বয়সে সে বিধবা হইয়া সংসার অন্ধকার দেখিল। তাহার স্বামী মাধব ঘোষ তাহাতে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া যখন ঘরে আনিল, তখন তাহার বয়স দশ বৎসর এবং মাধবের বয়স পঁয়তাল্লিশ। অনেকটা পিতা-পুত্রীর বয়সী এই নবীন দম্পতি, কিন্তু তাহাতে একটুও নিরুৎসাহ হইল না। সৎশিক্ষার গুণে রাণী তাহার প্রৌঢ় স্বামীকেই ভয় ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল; প্রেম জিনিসটাই তখনও তাহার হৃদয়ের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া মুদি মাধব কিন্তু অনেক অধিক স্ত্রৈণ হইয়া উঠিল, কারণ লোকের নিকট সে বলিত, "ছেলেমানুষ বৌ, এই বয়সেই ঘা খেয়েছে, আদর-যত্ন ত আর অভাগিনী পায় নি।" এবং এই ওজুহাতে সে সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের সওদা করা বন্ধ করিয়া আপন কুটীরাভিমুখী হইত।

ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহ ও বালিকার বিরক্তির মধ্য দিয়া এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর নদীর স্রোতের মতই দ্রুত ও একটানা বহিয়া গিয়াছে; মাধবের নিকট সময়টা যেন বড় বেশী দ্রুত বহিয়া গিয়াছিল, কারণ বাসনা তখনও তাহার অতৃপ্ত, এবং দিন অতীতপ্রায়। এমনি অতৃপ্তির আগুন বুকে লইয়াই মাধবকে পরলোকের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল; স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পায় নাই। বোধহয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে দশ বৎসরের একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার এই যৌবন উদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় তাহার এই পাণিপীড়ন ব্যাপারের জন্য বেচারার মনে একটু অনুশোচনাও জাগিয়াছিল...।

যাহা হউক, স্বামীর সৎকার কোনরূপ সারিয়া আসিয়াই রাণীকুটীরের মাটির মেঝেয় পড়িয়া তাহার স্নেহময় প্রৌঢ় স্বামীর জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল; কি যে তাহার কর্তব্য, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না।

বেচারা কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া কাঁদিবার অবসরও অধিকক্ষণ পাইল না; দুই-তিনজন পাওনাদার আসিয়া তাহার দাওয়ায় জাঁকিয়া বসিল এবং বলিয়া দিল, যতক্ষণ তাহাদের প্রাপ্য টাকার একটা বিধিব্যবস্থা না হইতেছে, ততক্ষণ তাহারা কোনমতেই দাওয়া ছাড়িয়া উঠিবে না।

অর্ঘ্য (১৯১৬), মায়ের প্রাণ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি-উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারি। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার হৃদয়ে ছিল যে, যে-জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে-জাতি তত উন্নত ও অক্ষম। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে-সম্পদ থাকিলে, যে-শক্তি থাকিলে মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে-সম্পদ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসীগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে! কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা! কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালা ভাষায় সর্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না! আজ ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয় যে, সে-সুদিন আসিয়াছে, আমরা সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্তমান! একদিকে দেশের যাঁহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থী যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষারও আলোচনা করিতেছেন; আর দুদিন পরে যাঁহারা ইচ্ছা করিলে তর্জনীলেহনে দেশের লোক-মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গ ভাষার চর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে! শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে! আর ঐ দেখ, অন্যদিকে যাঁহাবা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।

জাতীয় সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯১৬)

(সৈয়দ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী

যখন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি নগরে. দুর্গে ও শৈলশৃঙ্গে ইসলামের অর্ধচন্দ্র-শোভিনী বিজয়-পতাকা গর্বভরে উড্ডীয়মান হইতেছিল, যখন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রখর প্রভায় বিশ্বপূজ্য মুসলমানের অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাব দিক্‌দিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত করিতেছিল, যখন মুসলমানের লোক-চমকিত সৌভাগ্য ও সম্পদের বিজয়ভেরী জলদ মন্দ্রে নিনাদিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ভীত, মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিতেছিল, যখন মুসলমানের শক্তি-মহিমায় অনুদিন বিবৃদ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যে, কৃষি ও কারুকার্যে ভারতভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং ঋদ্ধি-শ্রীতে বিমণ্ডিত হইতেছিল, যখন প্রতি প্রভাতের মন্দ সমীরণ কুসুম-সুরভি ও বিহগ-কাকলীর সঙ্গে মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দ সংবাদ বহন করিয়া ফিরিতেছিল, যখন মুসলমানের সমুন্নত শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জিত রুচি ও নীতিতে ভারতের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছিল, যখন ব্রহ্মতেজঃ-সন্দীপ্ত দরবেশদিগের সাধনায় ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যের নির্মল কৌমুদীরাশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী ছায়ায় সমাবৃত ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের হৃদয়ে এক জ্যোতির্ময় অধ্যাত্ম রাজ্যের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছিল, যখন মুসলমানের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, উদার হৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব-উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি, জ্বলন্ত চক্ষু, দোর্দণ্ড প্রতাপ, প্রমুক্ত করুণা, নির্মল উদারতা মুসলেমেতর জাতির মনে বিস্ময় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিতেছিল... যখন বীরপুরুষ দায়ুদ খাঁ সুজলা সুফলা হিন্দুস্তানের রম্য-উদ্যান-রঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌরব-স্পর্ধিনী গৌড় নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন— সেই সময়ে একদিন বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাদশমীতে রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শ্রীপুর ও খিজিরপুরের মধ্যবর্তী রাস্তার এক চটীতে কতকগুলি রক্ষীসহ একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল।

রায়-নন্দিনী (১৯১৬), প্রথম পরিচ্ছেদ: মন্দিরে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কতকগুলা ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু একটা অজানা গোছের থাকে— এ সংস্কার হাড়ে মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড় মাস আছে, ততক্ষণ সেও আছে— তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা বাতাসটা শুধু ধুলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয় ত জানেন না যে, মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশে পাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে...। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশি করয়িা গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম, ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়...। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমরা ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে তুষার-কণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ-নিশ্বাস যে-নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, এক ফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্যন্ত নাই— কেবল হাড়ে আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ-রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশে-পাশের হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা নিশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (১৯১৭), ৮

কুলদারঞ্জন রায়

এক সময়ে কৃষ্ণ তাঁহার রাণী সত্যভামাকে লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রের পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া অতি সম্মানের সহিত পূজা করিলেন। কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দনকাননে বেড়াইতে গেলে পর, পারিজাত ফুলের গাছটি দেখিয়া সত্যভামার বড়ই লোভ হইল। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি না বলিয়া থাক যে, জাম্ববতীর চাইতেও আমাকে বেশী ভালবাস? সে-কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার জন্য এই পারিজাত দ্বারকায় লইয়া চল। গাছটি আমাদের বাগানে পুঁতিয়া রাখিব এবং প্রতিদিন ইহার মঞ্জরী লইয়া খোপায় পরিব।" সত্যভামার কথায় কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পারিজাত বৃক্ষটি তুলিয়া গরুড়ের উপর রাখিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া নন্দনকাননের প্রহরিগণ বলিল, "ওহে কৃষ্ণ! এটি শচী দেবীর অতি আদরের গাছ; তুমি কেন ইহা চুরি করিতেছ? এই সংবাদ পাইলে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। তিনি যদি বজ্র হাতে লইয়া দেব-সৈন্যগণের সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তোমার আর রক্ষা নাই। অতএব পারিজাত হরণ করিয়া দেবতাদিগের সহিত বিবাদ করিও না।"

প্রহরীদিগের কথায় সত্যভামার অত্যন্ত রাগ হইল; তিনি বলিলেন, "বটে! পারিজাতের শচীই বা কে, আর ইন্দ্রই বা কে? সমুদ্রমন্থনে যদি উঠিয়া থাকে, তবে ত এটা সকলেরই সাধারণ ধন; একা ইন্দ্রই বা কেন ইহা ভোগ করিবেন? শচী যদি মনে করেন যে, মহা ক্ষমতাশালী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্বামী সুতরাং পারিজাত তাঁহারই প্রাপ্য, তবে তাঁহাকে গিয়া বল যে, কৃষ্ণ তাঁহার পত্নী সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ লইয়া যাইতেছেন; যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে বাধা দিন!"

প্রহরিগণ শচীকে গিয়া সমস্ত কথা জানাইল। পৃথিবীর মানুষ কৃষ্ণ আসিয়া ইন্দ্রের নন্দনকানন হইতে পারিজাত হরণ করিয়া লইবে, এত বড় আস্পর্ধা! এত অপমান শচী সহ্য করিবেন কেন? শচীর উৎসাহবাক্যে ইন্দ্র তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন: কৃষ্ণকে সাজা দিয়া পারিজাত ফুলের গাছটি কাড়িয়া লইতেই হইবে। বজ্র হস্তে ঐরাবতে চড়িলেন, সমস্ত দেবসৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া "মার! মার!" শব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলে পর সেখানে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পুরাণের গল্প, প্রথম খণ্ড (১৯১৭), পারিজাত হরণ

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

বাড়ীতে একটি পুরাতন ভৃত্য ছিল, দীনু।

তাহার নাম দীননাথ কি দীনেশ কি দীনদয়াল অথবা দীনশরণ, তাহা কেহ জানিত না। বয়োবৃদ্ধেরা ডাকিতেন দীনু, বালক ও যুবকেরা ডাকিত দীনুদা কি দীনুকাকা বা ঐকরমই একটা কিছু।

সে বিশ্বাসী, সরল, প্রভুভক্ত। কর্তার আমলের লোক। পঞ্চাশ বৎসরের উপর এ-বাড়ীতে চাকরী করিয়া এখন সকল পরিশ্রমসাধ্য কার্য হতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। তবু একটা কাজ তাহার ছিল; সেটি হইতেছে, বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলির তত্ত্বাবধান করা। দীনু এ-বাড়ীতে প্রথম আসিয়া যাহাদের কোলে করিয়াছিল, আজ তাহাদেরই ছেলেমেয়েদের কোলে করিতেছে, এবং এই দ্বিতীয় দলের ছেলেমেয়ের মধ্যে যাহারা বহুদিন পূর্বে দীনুর কোল ছাড়িয়াছে এবং যাহাদের বিবাহও হইয়াছে, দীনু এমন আশাও রাখে যে, তাহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও খেলা করিয়া যাইতে পারিবে।

সূর্যের শেষ রশ্মি যখন মায়াতুলিকায় স্পর্শ দিয়া পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিত, তখন দীনু ছেলেমেয়েগুলিকে ডাকিয়া একত্রিত করিত। তাহাদের হাত-মুখ ধুয়াইয়া মুছাইয়া দিয়া খোলা ঝুল-বারান্দার উপরে তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া পড়িত। দীনুদা এখনই এই ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়া যে তাহাদিগকে এত অজ্ঞাত মায়ারাজ্যের সীমারেখার কাছে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই মনে করিয়া শঙ্কাজড়িত পুলকে ছেলেমেয়েগুলি শিহরিয়া উঠিত। সেই মায়ারাজ্যের রাজপুরীর মধ্যে শুধু এক রাজপুত্রেরই প্রবেশাধিকার রহিয়াছে, এবং সেই রাজপুরীর মধ্যে এক রূপসী রাজকন্যাকে সোনার কাঠির স্পর্শে জাগাইয়া এক দুর্ধর্ষ অশ্ববরের পৃষ্ঠে টানিয়া তুলিয়া লইয়া রাজপুত্র সেই যে কখন জ্যোৎস্না-পুলকিত নীলাকাশের মধ্য দিয়া ছিন্নমেঘের ছায়ায় ছায়ায় বিপুল বেগে কত রাজ্য, কত নদ-নদী, পর্বত-কান্তার পার হইয়া স্বরাজ্যাভিমুখে চলিয়া যাইবে— তাহারই অপেক্ষায় ছেলেমেয়েগুলি পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত-ভাবে বসিয়া রহিত।

বিল্বদল (১৯১৭), দীনু, ১

যতীন্দ্রনাথ পাল

মায়ের আদরের, পিতার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথের গুণ যতই থাক, লোকটা বড় খামখেয়ালি ছিল। খেয়ালের বশে এমনি সহসা এক একটা কাজ করিয়া বসিত যে, নির্বোধ আখ্যাটা যেন তাহার কেনা হইয়া গিয়াছিল। কাজ এলোমেলো করিতে তাহার জুড়ি পাওয়া দুষ্কর। দশজনে মিলিয়া হয়তো একটা কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, ঠিক সেই সময় যদি কোন ক্রমে নরেন্দ্র আসিয়া তাহাতে যোগ দিল, অমনি সমস্ত কাজ একেবারে এলোমেলো হইয়া যাইত। পাঠশালা হইতে স্কুল, স্কুল হইতে এক্ষণে যে কলেজে পড়িতেছে, কিন্তু সে তাহার নির্বোধ আখ্যাটা এ-পর্যন্তও ঘুচাইতে পারে নাই। পঙ্কজিনী দিনরাত গুছাইয়া উঠিতে পারিত না। হয়তো পাঁচ মিনিটও হয় নাই পঙ্কজিনী প্রায় দু ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিয়া তাহার গৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আসিয়াছে, আর যেমনই নরেন্দ্রনাথ একবারমাত্র তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, আর অমনি যেই কে সেই। এটা টানিয়া ওটা নাড়িয়া, বিছানা ধামসাইয়া পুস্তক ছড়াইয়া ঘরখানাকে এলোমেলো না করিয়া সে যেন সুস্থির হইতে পারিত না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আকাশ তারার মালা পরিয়া অন্ধকারের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ তাহার পড়িবার ঘরের ভিতর একখানা সোফার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। প্রায় এক ঘণ্টার উপর সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তখন পর্যন্ত গৃহের একটি জিনিষও স্থানচ্যুত হয় নাই। 'বর্ণপরিচয়ের' সুবোধ বালক গোপালের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া ছিল। এতটা সুবোধ হইবার একটা কারণও ছিল: আজ কয়েকদিন হইতে তাহার বিবাহ লইয়া একটা মহা গোল উঠিয়াছে...

নরেন্দ্রনাথ একমনে নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছিল. সহসা চুড়ির শব্দে সে মস্তক তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। দেখিল, হাসিতে হাসিতে পঙ্কজিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ কবিতেছে। এই মেয়েটাকে লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে।

কালের কোলে (১৯১৭), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

ষাট বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মবিবাহ-বিধি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'তিন আইন' পাশ হইল বটে, কিন্তু এই আইন সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। বস্তুত তিন আইন সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কেহই সন্তুষ্ট নহে। তিন আইন সংশোধন করিবার প্রস্তাব বারংবার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ-যাবৎ ফল কিছুই হয় নাই। তিন আইন সংশোধনের অপেক্ষা ব্রাহ্মবিবাহ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, এখন সেই চেষ্টা করাই আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা এ-সম্বন্ধে একমত হইলে কার্যটি অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে...

আদি ব্রাহ্মসমাজ তিন আইন স্বীকার করিতে পারেন। বস্তুত এই তিন আইনই একদিন আদিসমাজের সহিত অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘটাইয়াছিল এবং এখনও আদিসমাজকে অন্য দুই শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই তিন আইনের কঠিন ব্যবধান দূর করিতে পারিলে আদি সমাজের সহিত মিলনের বাধা ঘুচিয়া যাইবে। মতের খুঁটিনাটি পার্থক্য সত্ত্বেও তিন শাখার মধ্যে গভীরতর ঐক্য রহিয়াছে। বর্তমান কালে সকলেই ইচ্ছা করেন যে, তিন শাখার মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধের ভাব ঘুচিয়া গিয়া সদ্ভাব, সমগ্রতা ও একতার ভাব বৃদ্ধি পায়। ইহা শুধু সামাজিক মিলনের দ্বারাই সম্ভবপর।

ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে সামাজিক সম্মিলন ও যোগস্থাপন করিবার সহায়তা করিবে, এই কারণেই আমরা নূতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী...

তিন আইনের অন্তরাল দূর হইলে বৃহত্তর দেশীয় ও হিন্দুসভ্যতার ধারার সহিত আমাদের সহজ যোগটিকে রক্ষা করিতে পারিব। সমাজ পরিচালনার ভার আমরা যদি পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণ করি, তবে সামাজিক স্বাধীনতাও ফিরিয়া পাইব। আপনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত করিয়া নিজেকেও ছোট করিব না, ঘরের পাশে চিরস্থায়ী বিরোধেরও সৃষ্টি করিব না। নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের যেখানে কল্যাণশক্তি, সেই সমাজকে রক্ষা করিব; পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া ত্যাগ না করিয়া, কাহাকেও দূরে না সরাইয়া, সকলকেই স্বীকার করিয়া সকলকে গ্রহণ করিয়া একটি বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার যে-চেষ্টা ভারতবর্ষ চিরকাল করিয়া আসিয়াছে, সেই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কার্যে সহায়তা করিব। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার চেষ্টার মধ্যে এত বড় সূচনাই নিহিত রহিয়াছে, এ-কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না, ইহাই আমাদের শেষ কথা।

ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি (১৯১৭)

চিত্তরঞ্জন দাস

আজ পূর্ববঙ্গ শ্মশান— গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ। প্রেতের মত আমরা কয়টি আছি। তবু এই আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না। কীর্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্মদা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আবার গরজি আস্ফালন করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়ে জল নাই। যে-মহাবীর্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়-বঙ্গ একদিন প্রয়াগ পর্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যে-কেন্দ্র হইতে একদিন বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে-কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছে, এই সেই ভূমি। এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের আশিসমন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এ সেই দেশ। সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্য-লক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে-ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্ন-বিছিন্ন মেঘান্ধকারে সে-সব কোথায় মিলাইয়া গেল। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজ গৃহে পরান্নভোগী, নিজ গ্রামে চিরপরবাসী, জীবন-মরণের সন্ধির মধ্যে না-বাঁচা না-মরা হইয়াছি। কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব? কবির সে-কণ্ঠ আমার নাই; তাহা হইলে আজ শুনাইতাম— এই অরণ্যানীমুখরিত শ্যাম-তমাল-দ্রুম-সুশোভিত দেশের রূপের কথা, শুনাইতাম— এই অতল-তলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত; শুনাইতাম— অরণ্যের তমসাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদীতলে ও ভূগর্ভে মহাসমাধিতে লীন কি কীর্তি, কি বিজয়-কাহিনী! কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস, কি করুণ কাহিনী এই কীর্তিনাশার!... হে বাঙ্গালার সন্তান, আজ প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত সে-সাম্রাজ্য নাই, সে-গৌরবস্মৃতি আছে; সেই স্মৃতিই আজ আমাদের পুণ্যকথা, সেই পুণ্যকাহিনী আজ যদি আমাদের আত্মস্থ করিয়া দেয়, যদি এই অসীম জলরাশির বুকে তেমনি করিয়া আবার পাল তুলিয়া জীবন-যাত্রায় যাত্রাগান গাহিতে পারি।

দেশের কথা, স্বাগতম্

অপূর্বমণি দত্ত

কথাটা যে বাস্তবে পরিণত হইবে, তাহা কি কেহ ভাবিয়াছিল? হঠাৎ একদিন হরমোহন নিরুদ্দিষ্ট হইল। মাতা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইলেন; ভগিনী ভাবিলেন, মাথা-খারাপ মানুষ, হয়ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে খোঁজ করা হইল, কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলিল যে, তাহারা কোন খবরই রাখে না। হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া রাস্তার চতুষ্পার্শ্বে ট্রামের থামে আঁটিয়া দেওয়া হইল, বেঙ্গলী ও হিতবাদী উভয় পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কিন্তু তিনদিন চারদিন করিয়া এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তথাপি কোন উদ্দেশ্য মিলিল না। মাতা জোড়করে কালীঘাটে পূজার মানত করিলেন, সর্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন, তথাপি হরমোহনের সন্ধান মিলিল না।

যে যাহা-ই বলিল, তাহা-ই করা হইল, কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি রহিল না। এক জ্যোতিষীর নিকট গণনা করান হইল; তিনি সর্বশেষ গণনা করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে হৃষীকেশে সন্ন্যাসী সাজিয়াছে।"

হরিদ্বারে এক পরিচিত ব্যক্তি রেলে কাজ করিতেন। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হইল, চিঠিও লেখা হইল। এক সপ্তাহ পরে তিনি উত্তর দিলেন যে, সেখানকার সন্ন্যাসী-সাগর মন্থন করিয়া হরমোহন রূপ রত্ন উদ্ধার করা একান্তই দুরাশা।

পনের দিন পরে বোম্বাই হইতে এক পত্র আসিল। মাতাকে অশেষবিধ সান্ত্বনা-বাক্য দিয়া শেষে হরমোহন লিখিয়াছে যে, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, আংটি প্রভৃতি যাহা কিছু কিছু ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া, এবং অন্য উপায়ে চেষ্টা করিয়া যাহা কিছু অর্থের সংস্থান হইয়াছে, তাহাতে সে ডেক-প্যাসেঞ্জার হইয়া বিলাত রওনা হইল। চিন্তার কিছুমাত্র কারণ নাই, অল্পকাল মধ্যেই সে মানুষ হইয়া ফিরিবে।

হতভাগিনী মাতা যখন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্র পাইলেন, তখন হিসাব করিয়া দেখা দেল যে, সপুত্র জাহাজ তখন আরব্য-সাগরে। বাটীতে মহা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

অভ্রপুষ্প (১৯১৭), প্রায়শ্চিত্ত, ২

নিম্নে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার জায়গা। বোঁচকা, বুঁচকি, ট্রাঙ্ক, বিছানা, ঝুড়ি, হাঁড়ি, টিনের কানাস্তারা প্রভৃতি বহুবিধ মালের সহিত মানুষের ঠাসাঠাসি। কেহ বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা মাচায় বসিবার জায়গা না পাইয়া ট্রাঙ্কের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। কোথাও কোন রমণী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া রোদনপরায়ণ শিশুকে থামাইবার প্রয়াস পাইতেছে। পুরুষ আরোহীদের মধ্যে কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ ঢুলিতেছে। কেহ সিগারেট ধরাইতেছে। কেহ বিড়ি টানিতেছে। কেহ বা ডেকের তক্তা বাজাইয়া বাজখাই সুরে রাগিণী আলাপ করিতেছে। কোথাও জেলেদের বৃহৎ চুপড়ীর গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও বা কাহার মৃন্ময় তৈলপাত্রটি ভাঙ্গিয়া তৈলে ডেক ভাসিয়া গিয়াছে। মালিক পার্শ্বস্থ আরোহীর প্রতি অসাবধানতার আরোপ করিয়া তুমুল কলহ করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু পারে তেল চাঁচিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। কোথাও দুইজন পাইকার পাটের দর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। কোথাও বা দুই বৃদ্ধ "জিনিসপত্রের দর ক্রমশঃ আগুন হইয়া উঠিতেছে" এই মন্তব্যে এক মত প্রকাশ করিতেছে। "তুমি ত ভারি মজার লোক হে— গোটা জাহাজখানা কি রিজার্ভ করে নিয়েছ নাকি?" "আ মরণ মিনসে চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? ছেলেটার গায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছ?" "আহা চটেন কেন? কতজনের মামলা, একটু রয়ে-সয়ে সকলকেই নিতে হয়।" ইত্যাকার বহুবিধ ধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

সীতাপতি হিরন্ময়ের হাত ধরিয়া অতিকষ্টে একটু পথ করিয়া জাহাজের কলের নিকটে গেল। কিন্তু বহুক্ষণ আর কল দেখা হইল না। জাহাজ বাজিৎপুর ঘাটের নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে নামিবার জন্য চাঞ্চল্য ও হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে জাহাজখানি তীরের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। জেটি নাই। দুইখানি অতি সরু তক্তা জাহাজের উপর হইতে ডাঙায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। তাহা অবলম্বনে অতি ক্লেশে আরোহীরা তীরে উঠিতে লাগিল। ঠেলাঠেলিতে দুই-একজন জলে পড়িয়া গেল। সেখানে অল্প জল। বিশেষ আঘাত লাগিল না বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গ জল ও কর্দম-সিক্ত হইয়া গেল।

ঘাটে হ্যাটকোট-পরা একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পিছনে দুজন পাহারাওয়ালা। হিরণ্ময় তাঁহাকে দেখিয়া সীতাপতিকে বলিল, "ঐ যে বাবা।"

অভিমানিনী (১৯১৭), দ্বিতীয় খণ্ড: মেঘ, প্রথম পরিচ্ছেদ

(মোহাম্মদ) হেদায়েতুল্লা

বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত অহিন্দুর সম্বন্ধ ও সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে অকৃত্রিম আন্তরিকতার যে চির-অভাব রহিয়া যাইতেছে, তাহা বিধাতার অভিসম্পাত না সমাজধর্মরক্ষণপ্রয়াসী ব্যবহারপ্রবর্তকগণের অতিশয়িতার পরিণাম, ইহা মীমাংসা করিবার জন্য আকুল আগ্রহ সহকারে মনসংযোগ করিয়াও সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। আমার লক্ষ্ণৌবাসের পর অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম, ইহা ভগবানের অভিসম্পাত নহে, মানুষের অমানুষিক অনুশাসন। এতদঞ্চলে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর মত ঘৃণিত নাসিকাকুঞ্চন নাই, সৌহৃদ্যে গভীরতা আছে, জাতিধর্মনির্বিশেষে আত্মীয়তা স্থাপনের কোনও অন্তরায় নাই। তাই আমার স্বদেশীয় পরিচিতবর্গকে সর্বরকমে ছাপাইয়া এক বিদেশী আমার একান্ত আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার নাম জীওনলাল। হিন্দুস্থান ও হিন্দুস্থানীর দিকে এতটা টানের একটা প্রত্যক্ষ হেতু রহিয়াছে, হয়ত অনেকে এইরূপ মনে করিবেন, কিন্তু স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি: নিরপেক্ষ বিচার আমরা এই উক্তির সমর্থন করিবেন।

জীওনলাল সকল কথাই জানিত। তাহার নিকট গোপন-প্রয়াসকে আমি আত্মপ্রবঞ্চনা বলিয়া মনে করিতাম। আমাদের সঙ্কল্প তাহার নিকট স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে সে সমর্থন করিয়া বলিল, ইহা শুধু মঙ্গলজনক নহে, আমার কর্তব্যেরও অন্তর্ভুক্ত। সে আমাদের অন্তরের দিকটা বিস্তারিত ও স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "তোমরা যে এরি মধ্যে একটা রোমান্স গড়িয়া তুলিয়াছ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম না।"

আগ্রহ সহকারে সে সকল বন্দবস্তের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল। আমার সহায় সম্পর্কে জীওনলালের একাগ্রতা নিতান্ত স্বাভাবিক হইলেও তাহার সকৌতুক তৎপরতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। যাহা কিছু অসুবিধার আশঙ্কা ছিল, তাহা অপসারিত হইয়া গেল। কাজেই ব্যাপারটা সকল প্রকারে তাহার উপর সমর্পণ করিয়া দিয়া নিরস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলাম। ধর্ম ও শাস্ত্রসম্মতরূপে কার্য নির্বাহ করিতে হইলে যাহা যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহার আয়োজনভারও সে সমস্তই গ্রহণ করিল।

একটা কথা লইয়া জীওনলালের সহিত আমার তুমুল বাদানুবাদ লাগিয়া গেল: বিজলির আদিম দুর্ভাগ্যের কথা অব্যক্ত রাখিতে সে দৃঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিল।

প্রদীপ ও চেরাগ (১৯১৭), প্রদীপ ও চেরাগ, ৮

(মোহাম্মদ) লুৎফর রহমান

আমি জাগিয়া ছিলাম, আমার বড় ঘুম হইত না। ধীরে ধীরে রাত্রির নিস্তব্ধতা বাড়িয়া উঠিল। নিশীথের গাম্ভীর্য ও বাতাসের শন্ শন্ শব্দ আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আমি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলাম। ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। আমার বক্ষ এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতির ইচ্ছায় কাঁপিতে লাগিল। আমি বিলাসের শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম। বিলাস সেই বালকের নাম।

বিলাসের বুকের একেবারের স্পর্শ, তাহার ওষ্ঠের একটিমাত্র চুম্বন— আর কিছু না। হায়! তখন বুঝিতে পারি নাই, একটা চুম্বনে সহস্র চুম্বনের বাসনা লুকানো আছে। বক্ষের স্পর্শের সহিত আরও অনেক কিছু মাখানো জড়ানো আছে।

ভগবান জানেন, তখনও আমি পবিত্র। আমি শুধু একটা স্পর্শ চাহিয়াছিলাম, আর কিছু নহে। ধীরে ধীরে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। সে বিভোরে নিদ্রিত। হরি হরি! বিলাস কত সুন্দর! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য বিলাসের মাঝে। মনে হইল, সে এইমাত্র স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। আমি জগৎ-সংসার ভুলিতে পারি— ঈশ্বর চাই না, পুণ্য চাই না, শুধু বিলাসের বুকের একটু স্পর্শ চাই, তাহার ওষ্ঠের একটা চুম্বন।

আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নিদ্রিত বিলাসকে বাহুবদ্ধ করিলাম। সে চমকিত হইয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম। চন্দ্রালোকে ঘর প্লাবিত— সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে, সে অসাড়, নিস্পন্দ ও নির্বাক হইয়া গেল।

আমি তাহাকে ব্যাকুল আগ্রহে বুকে তুলিয়া লইলাম। আমি অনির্বচনীয় আবেগে তাহার ওষ্ঠের সহিত আমার ওষ্ঠ সংযোগ করিলাম। সে কি-অপরিসীম সুখ! সে কি-স্বর্গীয় মহানন্দ! একটিবারের স্পর্শ! তাহাকে বুকে লইলাম, কিন্তু মুক্ত হইবার বাসনা হয় কই? একটি চুম্বন! কিন্তু কই, ওষ্ঠ তো আর উঠাইতে ইচ্ছা হইল না। আমি অবশ্য ও চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িলাম! কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম, এমনই চৈতন্যহীন অবস্থায় প্রায় এক প্রহরকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আমি আকুল আগ্রহে বিলাসকে আবার বুকে তুলিয়া লইলাম। তাহাকে বুকের ভিতর পিষিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছিল। তাহাকে সকল কথা ভুলিয়া সহস্রবার চুম্বন করিলাম। তাহাকে সহস্রবার বক্ষে স্থাপন করিলাম। কিন্তু বাসনার তো নিবৃত্তি হইল না। ইত্যবসরে আমরা বিবসন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সরলা (১৯১৮), তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলায় বসিয়া মুরলীমোহন অনুতাপের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতেছিল, প্রবাদ আছে, সে-বৃক্ষটি ব্রহ্মদৈত্য-আশ্রিত। অন্যদিন সন্ধ্যার পর একেলা নির্জন নদীসৈকতে বসিয়া থাকিতে বলবান মুরলীমোহনেরও প্রাণে ভীতিসঞ্চার হইত, সন্দেহ নাই। আজ কিন্তু তাহার জীবনে অবসাদ আসিয়াছিল। সারাদিনের ভীষণ মানসিক সংগ্রামে যুবক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হৃদয়ে আর উত্তেজনা ছিল না, বৈরীনির্যাতনের কঠোর স্পৃহায় এখন আর তাহার বাসনারাশি তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিল না। কেবল একটা অনুতাপের যন্ত্রণা এক-একবার তাহাকে বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা দিতেছিল।

ভীষণ অনুতাপ— তবে পাপ করিয়া লোকে যে অনুতাপ সহ্য করে, মুরলীর অনুতাপ সে-শ্রেণীর নহে। তাহার অনুতাপ হইতেছিল দুর্বলতার জন্য, কাপুরুষতার জন্য। ধনপতি সিংহ তাহার মাতার অবমাননা করিয়াছিল, তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে জুয়াচোর বলিয়াছিল। মুরলী স্বকর্ণে সে-কথা শুনিয়া কেন তখনই তাহার মুণ্ডুপাত করে নাই? সে-সুযোগ গিয়াছে, তাহা তো আর ফিরিবে না। দুর্বৃত্ত তাহাদিগের ভদ্রাসন হইতে তাড়াইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে হলাহল ছড়াইয়া গিয়াছিল। কেন সুবিধা পাইয়া সে নিজ হস্তে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করে নাই, যুবক সারাদিন কেবল তাহাই ভাবিতেছিল।

মানুষ চিন্তাশীল জীব, কিন্তু সাধারণ লোক কতক্ষণ এক চিন্তা করিতে পারে? মুরলীমোহনের অবসাদ আসিয়াছিল। সে নির্জন ভাগীরথী-তীরে বসিয়া জাহ্নবী-সলিলে জ্যোৎস্নাকিরণের সন্তরণ দেখিতেছিল। তালে তালে জলের উপর তিনখানি তরণী নাচিতেছিল। সে সেই দিকে চাহিয়াছিল।

শারদীয়ার ষষ্ঠী। প্রভাতেই দেবী-অর্চনা। উদ্যমপুর আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। গ্রামে চণ্ডীদেবীর মন্দিরে নহবৎ বাজিতেছিল। বেহাগের করুণ তান মুরলীর কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। সকলেই আনন্দে বিভোর, কেবল তাহারাই দুঃখমলিন— নৃশংস উত্তমর্ণের পৈশাচিক ব্যবহারে জর্জরিত। অনশনে প্রাণ ত্যাগ না করিয়া কেন তাহার পিতা এমন নৃশংসের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুরলী তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

হিসাব-নিকাশ (১৯১৮), প্রথম ভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদঃ তরুণ স্বামী

শ্রীপতিমোহন ঘোষ

যে-রূপ লইয়া দামিনীর বাঙ্গালীর ঘরে মেয়েজন্ম লওয়া উচিত ছিল, তাহা সে লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যে-পরিমাণ অর্থে সে বিকাইতে পারিত, এমন কিছু সম্বল লইয়া পিতৃগৃহের পুণ্যতীর্থে দুধসাগরের কোলে লক্ষ্মীটির মত উদয় হতে পারে নাই।

তাই তাহার জন্মবাসরে সীমন্তিনীরী যখন মঙ্গলশঙ্খ লইয়া হুলুধ্বনি দিতেছিল, তখন তাহার মা সূতিকাগৃহ হইতেই এমন চাঁদপানা মেয়েটির দিকে চাহিয়া হাত-নাড়িয়া বারণ করিয়াছিলে, বলিয়াছিলেন, "কাজ নাই! এ তো একটা আশা লইয়া আসিতে পারে নাই— এ যে আসিয়াছে কন্যাদায় লইয়া!"

তথাপি কিন্তু সে আসিয়াছিল পিতার কন্যা হইয়া। যাহা তাহার পাওয়া উচিত ছিল, তাহার অতিরিক্তই সে পাইয়াছিল। পিতা তাহার মাতৃহারা কন্যার সমস্ত অভাব ও বেদনা আপনার মাথায় তুলিয়া বক্ষের কাছেই এক নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য শারদাগমনে দামিনীর দিদি স্বর্ণলেখা যখন স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিত, তখন বলিত, "বাবা দামিনীর জন্যই আপনার পনের আনা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আমাদের জন্য এক আনা রাখিয়াছেন মাত্র!"

ভবনাথবাবু হাসিতেন, বলিতেন, "তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, মা; তাছাড়া ওর আড়াই বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। আমাকে যে ওর মা হয়েও সময়ে সময়ে খোঁজ নিতে হয়, স্বর্ণলেখা।"

স্বর্ণ পিতার হৃদয় বুঝিত, তাই ভগিনীটিকে বাহিরে বাহির করিয়া 'কনে' দেখাইবার দিন যে-পরিমান চিন্তা ও উদ্বেগ তাহার পিতার মস্তিষ্কেও প্রবেশ করে নাই, সে-পরিমাণ চিন্তা ও উদ্বেগে স্বর্ণ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যত রকম উদ্যোগ-আয়োজন ও খাবার-দাবারের যোগাড় করিতে হয়, স্বর্ণ তাহার কিছুই বাদ রাখে নাই। ভগিনীটিকেও ঘসিয়া মাজিয়া সাজাইয়া গোজাইয়া যতদূর মোহিনী রূপে দাঁড় করানো যাইতে পারে, তাহা ত্রুটি রাখে নাই। কপালে টিপ, গালে পাউডার বা ব্লুম-অব-রোজ, হাতে মেহেদির পাতলা ছোপ— কিছুই সে বাদ দেয় নাই। কিন্তু হইলে কি হয়. সবার উপর অদৃষ্ট যে বলবত্তর: মেয়ে দেখিয়া দুই এক জনের পছন্দ হইল যদিবা, কিন্তু টাকার অঙ্কে কম দেখিয়া কোন বরেরই পিতৃকুল মাতৃকুল সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

স্বয়ম্বরা (১৯১৮), ১

প্রিয়ম্বদা দেবী

অন্তা ছুতোর। বাপমায়ে নাম রেখেছিল অনন্তপ্রসাদ, পাড়াপড়শীর অনুগ্রহে সে-নাম হয়ে দাঁড়াল অন্তা। শুধু তা-ই নয়, ডাকনামও একটি জুটে গেল সবাই তাকে ডাকত 'কালো জাম' বলে। ছুতোর মশায়ের কালো রঙের নাকের ডগাটুকু রাঙ্গা হবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু পারে নি— জাম পাকিলে কিংবা টিকেয় আগুন ধরালে যেমন লালের আভা দেখা দেয়, সেই রকমটি হয়েছিল আর কি! সেদিন অন্তার হাতে কাজ ছিল না, দোকানে খুঁজে দেখল বেশ একখানি চৌকোষ কাঠ কোথায় অনাদরে পড়ে আছে। কাঠখানি হাতে করে তুলে নিয়ে ভাবলে, কুঁদে চড়িয়ে তারপর তার উপর খোদাই কাজ করে সুন্দর সুন্দর খাটিয়ার পায়া গড়বে। অন্তা ছিল কাজের লোক; মনে যদি কিছু হত, সেটি করতে দেরী হত না। কাঠখানি তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে যেমনি র্যাঁদা দিয়ে চেঁচে সমান করতে গেছে, অমনি কাঠের মধ্যে হতে পিঁ পিঁ করে কে যেন কেঁদে উঠল। প্রথম অতটা কান করে নি, ছুতোরের দোকানে ছুঁচো-ইঁদুরের বসতি, কে কোথায় কখন কিচি মিচি করে উঠছে তার ঠিক কি? আবার র্যাঁদা জোরে চালালে এবারে আর পিঁ পিঁ না, একেবারে কুঁকিয়ে কান্না: "ওগো দোহাই তোমার, ছাল ছুলে নিয়ো না! গেলাম গো, গেলাম গো!" অন্তা ছুতোর তো আকাট, একেবারে কাঠটাই ছুঁড়ে ফেলে ঘরের অন্য কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। মনে মনে রামনাম স্মরণ করে খানিকটা দম নিয়ে আবার ভাবলে, "দূর হ'ক ছাই! কাঠের ভিতর কি মানুষ আছে, না থাকতে পারে? আবার কাজে লাগা যাক!" এবারে সে ভারী সাবধানে আস্তে আস্তে কাঠখানি চাঁচতে লাগল— এমন সময় শুনলে কে যেন হাসতে হাসতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, "ওগো কর কি? কাতুকুতু দাও কেন? বেজায় সুড়সুড়ি দিচ্চ যে! আমার হাসিতে নাড়ী ছিঁড়ে আসছে!" এবারে অন্তা একেবারে ধড়াম করে ভূঁয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ল, মাথায় যেন তার বাজ পড়েছে। যখন চোখ খুললে, দেখলে, ঘরের মেজেয় বসে আছে। ঠিক এই সময় কে কেন দুয়োর ঠেলা দিলে। অন্তা কাঁপতে কাঁপতে বললে, "কে?" উত্তর শোনা গেল, "আমি গুপে।"

পঞ্চুলাল (এক)

যখন কনভেন্টে পড়িতে যাইতাম, সেখানকার সুসংযত শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থিত শিক্ষাদান আমার বালিকা-হৃদয়কেও বিস্মিত করিয়াছিল। সেখানকার সেই উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী-মধ্যে কে যেন আর একখানি জগৎ— আমাদের এই ধুলিরৌদ্র-মলিন ঝঞ্ঝাবাত্যা-পীড়িত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন— প্রশান্ত শান্তি ও অচ্ছেদ্য প্রেমের দ্বারা নির্মাণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী যাঁহারা, তাঁহারা যেন সে শান্তিরাজ্যের দেবতা। এমন নিঃস্বার্থ, পবিত্র, উৎসর্গিতজীবন জগতে অল্পই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের ঘরেও এ-সব পুণ্য-প্রতিমার অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের উদারতা ও উৎসর্গ এমন বিশ্বব্যাপী হইতে সুযোগ ও সাহায্য পায় না, তাই তাহা ইহা অপেক্ষা কতকটা যেন সীমাবদ্ধ...

আমাদের সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী কুমারী গ্রেস্ আমার নিকটে একটি জটিল রহস্যের মতই অবোধ্য ছিলেন। আমাদের তপস্বিনী উমার ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত সুন্দর তরুণ মুখখানি এবং যৌবনের পূর্ণ বিকশিত ঢল-ঢল লাবণ্য যদিও কঠোর তপস্যায়, উপবাস-ক্লেশে এবং বিশ্রী পরিচ্ছদ ও মাথার পুরু কাপড়ের অবগুণ্ঠনের দ্বারা যথেষ্ট পরিমানে শ্রীহীন ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল, তবুও ভস্মে যেমন আগুনের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, তেমনই সেই পাদচুম্বিত প্রকাণ্ড মোটা কাপড়ের সুদীর্ঘ পোষাকে তাঁহার সাধারণ-দুর্লভ আশ্চর্য সৌন্দর্যকে কোনমতেই লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইত না। তা তিনি নিজেও বোধ হয় সে-কথা ভাল রকমই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার সূক্ষ্ম গোলাপী ওষ্ঠপ্রান্ত মধুর হাস্যচ্ছটায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই সুগভীর গাম্ভীর্য দ্বারা তিনি তাহাকে নির্দয় ভাবে চাপিয়া ফেলিতেন। তাঁহার সুসংযত স্বল্পভাষা যদি কোনদিন একটুখানি অসংযত হইবার উপক্রম করিত, অমনি চকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া লইতেন। এমন কি, যখন আমার প্রাত্যহিক অভিনন্দন ফুলের তোড়াটি তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতাম, 'সুপ্রভাত' জানাইবার সময় তাঁহার কণ্ঠে এমন একটি মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠিত, তাঁহার কোমল হাতখানির স্পর্শ এমন একটি অপ্রকাশ্য স্নেহে আমার অঙ্গে অঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল যে, আমি তাঁহার পানে বিস্মিত কৃতজ্ঞ দৃষ্টি না তুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। দেখিতে পাইতাম: যদি সেই সময় তাঁহার নীলকান্ত মণিপ্রভ দুটি চোখ আমার প্রতিচ্ছায়ায় ঈষৎ কৃষ্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির গাম্ভীর্যাবলম্বন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত মর্যাদার সহিত সস্নেহে বলিতেন, "আজ তুমি খুব সকাল সকাল এসেছ!"

দান, ১

নরেন্দ্র দেব

দীনু যেদিন স্ত্রীর প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও দাদার বিনানুমতিতেই পৃথক হইয়া গেল, স্নেহশীল বৃদ্ধ রাধানাথের অভাব-ঝঞ্ঝাহত বুকখানা সেদিন সেই কঠিন আঘাতে চুরমার হইয়া গেল। দেহের খানিকটা হঠাৎ কোথাও ধাক্কা লাগিয়া প্রবল ঘর্ষণে চিরিয়া গেলে তীব্র যন্ত্রণার সহিত তাহা হইতে যেমন ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়ে, রাধানাথের চক্ষের জল সেদিন তেমনিই যাতনার সহিত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রাধানাথের স্ত্রী ক্ষান্তমণি আপন বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চুপ কর! কেঁদে আর কি হবে? বেটাছেলে যদি মেগের বশ হয়, তবে কি তার আর বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল থাকে গো? রাঙা-বৌ আনব প্রিতিজ্ঞে করে বসেছিলে— অতগুনো টাকা মহাজনের কাছে হাওলাতে করে পণ দিয়ে শেষে কোন্ এক হা'ঘরের মেয়ের কটা চামড়া দেখে বৌ করে নিয়ে এলে! ছোটলোকের মেয়ে সেয়ানা হয়ে তোমার হাতে-গড়া সংসারটা ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল! বেশ হয়েছে: তুমি যেমন অবুঝ মানুষ, তেমনি তোমায় জব্দ করে গেল ঐ চাষার মেয়ে এসে। সেই বিয়ের সময়েই তখন এই মান্‌কের মা দশবার করে বলেছিল, 'হ্যাঁ গা, টাকা পয়সা হাতে নেই, ধার-কর্জ করে এত সব করা কেন?' তা সে-কথা তখন কানেই নিলে না!" স্ত্রী কথায় এই আঘাতের বেদনার মধ্যেও রাধানাথের হাসি আসিল। রাধানাথ বলিতে লাগিল: "মান্‌কের মা, সেদিন তুই কোথায় ছিলি রে, সেই তিরিশ বছর আগে যেদিন মুহূর্ষু বাপ আমায় তাঁর মরণশিয়রে ডেকে সাত বছরের দীনুকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলে যান, 'দেখিস, বাবা! আমার দীনু যেন না কষ্ট পায়; বেচারী জন্মাবধি মা-হারা; ভাইটিকে তোর সাধ্যমত যত্ন করিস, রাধু!' তখন আমার বয়েস কত, জানিস, মান্‌কের মা? সবে ষোল-সতের বছর!"

বোঝাপড়া, বোঝাপড়া (১৯১৯), ১

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার নাম বংশষষ্টি। সেনেদের সুঁড়োর বাগানবাড়ির এঁদো পুকুরের পাড়ে আমার জন্ম। এক ঝাড়ে আমরা সাতটি ছিলাম, তন্মধ্যে আমি কনিষ্ঠ। নিশ্চিত পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে কিংবা কোন দেবতার অভিসম্পাতে আমার এই বংশপ্রাপ্তি; নহিলে কেন অপরাধী স্কুলের ছাত্রের ন্যায় খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দিবারাত্র কেবল একই চিত্র দেখিব? যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতাম, বাগানে শ্যালকাঁটা, সাঁইকাঁটা, বিচুটির জঙ্গল— মধ্যে মধ্যে দুই-একটি সুগন্ধী পুষ্পতরু; পুকুরের আধ-ইঞ্চি পুরু পানা, তদুপরি লালা সাদা হেলা শালুক ও পদ্ম ভাসিতেছে; ঘাটে ভাঙ্গা ধাপে প্রক্ষিপ্ত বাসন-সামগ্রী, পার্শ্বে কর্দমলিপ্ত শালপত্র হস্তে সুন্দরী যুবতী; নিশাকালে উর্ধ্বে রজতশুভ্র শশধর, নিম্নে পদতলে শৃগালের সম্মিলন ও কোলাহল। এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমি উর্ধ্বে বাড়িতেছিলাম।

এমন সময়ে একদিন দা হস্তে নিধিয়া মালী আসিয়া দুই চারি কোপে আমাকে শাপবিমুক্ত করিল; শ্রীবিষ্ণুর হস্তে দশাননের অথবা নৃসিংহর হস্তে হিরণ্যকশিপুর যেরূপ সদ্‌গতি-লাভ হইয়াছিল, উড়ে মালীর শ্রীহস্তে আমারও সেইরূপ সদ্‌গতি-লাভ হইল। আমি ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন ছিলাম, সেইজন্য মালীপ্রবর অনেকদিন যাবৎ আমাকে জলে চুবাইয়া রাখিল, তৎপরে অগ্ন্যুত্তাপদানে এবং তৈলমর্দনে আমাকে সোজা এবং শক্ত করিয়া শৃগাল-তাড়নোপযোগী করতঃ তাহার গৃহকোণে আমার স্থান নির্দেশ করিল।

একটিমাত্র ঘর, গোময় প্রলেপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ঢেঁকি, একটি উনান, একটি তক্তাপোষ, শিকেয় টাঙ্গান কতকগুলি হাঁড়ি এবং বৃহৎব্যাপার একটি স্ত্রীরত্ন। এইখানে চিরাগত প্রথা অনুসারে মালিনীর একটু রূপ বর্ণনা আবশ্যক। দীর্ঘায়ত বপু, মুখে ডায়মণ্ডকাটা বসন্তের দাগ, বামপদে গজেন্দ্রচরণ-দর্পহারী প্রকাণ্ড গোদ, নাকে সুদর্শন-চক্র ঝুলিতেছে, রঙ— ভীমরুলের উপর বোলতার উপবেশন যদি কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন, তবে তদ্রূপ হরিদ্রারসসিক্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, এবং রসনা প্রতিক্ষণ দংশনে উদ্যতা। অরণ্য সঙ্কটে মৃগশিশুর ন্যায় নিধিয়া যেন সর্বদাই ভীত ত্রস্ত।

চিত্রালি (১৯১৯), লাঠির কথা

প্রমথনাথ বসু

ছয় বৎসর বয়সে নরেন্দ্র একখানি কোরা ধুতি পরিয়া কোমরে খাঁকের কলম ঝুলাইয়া মাদুর বগলে পাঠশালায় গেলেন। কিন্তু দুই-চারদিনের মধ্যেই এমন গুটিকতক অভিধান-বহির্ভূত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন যে, পিতামাতা আর তাঁহাকে ওরূপ শিক্ষালয়ে যাইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। পাঠশালা ছাড়াইয়া এক গুরুমহাশয়ের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার সমর্পিত হইল। পাঠাশালাটি কিন্তু নরেন্দ্রের বড় ভাল লাগিয়াছিল...

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে নেতৃত্বের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। সমবয়স্ক দিগের সহিত খেলায় তিনি রাজা সাজিতেন। ছুটিতে ছুটিতে পূজার দালানের সর্বোচ্চ সোপানে গিয়া বসিতেন। নীচের সিঁড়ির দিকে দেখাইয়া আর-দুজন সঙ্গীকে বলিতেন, "তুমি হচ্চ রাজমন্ত্রী আর তুমি সেনাপতি। যাও, ওখানে দাঁড়াও।" তাহারা নীচের সিঁড়িতে সভাসদগণের আসন নির্দিষ্ট ছিল। তারপর দরবার আরম্ভ হইত। কর্মচারীরা একে একে ভূম্যবলুণ্ঠিত শিরে তাঁহাকে প্রাণিপাত করিয়া দাঁড়াইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "মন্ত্রি! রাজ্যের সংবাদ কি? প্রজারা বেশ সুখে আছে ত?" মন্ত্রীমহাশয় কখনও বলিতেন, "আজ্ঞে হাঁ, প্রজারা পরমসুখে আছে"; কখনও বা বলিতেন, "না, মহারাজ, একজন দস্যু বড় উৎপাত করিতেছে!" তখন সেই অপরাধী দস্যুকে বিচারার্থ সভামধ্যে আনা হইত। যথারীতি বিচারান্তে সম্রাট আদেশ করিতেন, "রক্ষিগণ, শীঘ্র দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর!" অমনি রক্ষীবেশধারী দশ-বারজন বালক সেই অপরাধী দস্যুকে বধ্যভূমে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইত, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ না করিয়া তীরবেগে দত্তবাড়ীর সদর দরজার দিকে ছুটিত। ক্রুদ্ধ রক্ষীদলও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইত। দুপুরবেলা, বাড়ীর সকলেই ঘুমাইতেছে। দেউড়ির ভৃত্যেরাও নিদ্রিত। তাহাদের নিদ্রাচ্ছন্ন দেহের উপর দিয়া সশব্দে পলাতক অপরাধী ও রক্ষীর দল দৌড়াইত। তাহারও চমকিত হইয়া উঠিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 'দুর্বৃত্ত বালকদের' শাস্তিবিধানের জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইত, কিন্তু বালকদিগের সহিত দৌড়ে না পারিয়া শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিত। বালক নরেন্দ্র স্বস্থানে বসিয়া কৌতুক দেখিতেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেন, বোধ হয় ভাবিতেন: তাহারা তাঁহার কি করিবে? তিনি হচ্ছেন সম্রাট— দিন-দুনিয়ার মালিক।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৯১৯), শিক্ষারম্ভ

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সই, এ কি হল? তোমার চিঠিগুলো আজকাল যা পাচ্ছি, ঠিক যেন বোশেখের রোদে-পোড়া শুঁকনো পাতা! সেগুলো দেখে আমার চোখে জল আসে। এত হাসি, এত ফূর্তির তরঙ্গ— হায়! সে সব গেল কোথা? তিন-সত্যি করেছ, তোমাদের বাড়ির সামনের সেই মানুষটির কথা আর লিখবে না; সেই সত্য রক্ষা করতে গিয়ে তোমাকে যে কতটা সইতে হচ্চে, তা তোমার চিঠির চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তবু আমি চুপ করে আছি। তাতে তুমি হয়ত ভাবছ, আমি পাষাণী! আমি পাষাণীই বটে। আমি ইচ্ছে করেই তার কথা লেখা তোমায় বন্ধ করিয়েছি। কি হবে মিথামিছি এই মনের আগুন জ্বালিয়ে? এ শুধু জ্বলে খাক্ করবে বই তো নয়। তাই এতে আমি ইন্ধন জোগাতে চাই না...

এ-সব কথা হয় ত তোমার ভালো লাগবে না; কারণ এখন তুমি একটা স্বপ্নের দিন কাটাচ্ছ। কিন্তু জেনো, এ-স্বপ্ন একদিন হঠাৎ চিরদিনের মতো ভেঙে যাবে! তখন সমস্ত জীবনটা হায়-হায় করতে হবে; নিরুপায়ে মুখ বুজে সেই দুঃখ সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকবে না। তখন বুঝতে পারবে, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ বলে কতটা অসহায় তুমি! তোমার জীবনের মরণ-বাঁচনের উপর তোমার কিছুমাত্র হাত নেই; তুমি শুধু কলের পুতুলমাত্র; যে-দিকে ফেরাবে, সেই দিকে ফিরতে হবে— তাতে যদি তোমার বুকের শির ছিঁড়ে রক্ত ছুটতে থাকে, তার দিকে কেউ চেয়ে দেখা-ও দরকার মনে করবে না।

তোমার ঐ সামনের মানুষটি তোমার মনের মধ্যে কতখানি প্রবেশ করেছে, তা আমি জানি না, কিন্তু যখন একবার দরজা খুলে দিয়েছ, তখন আর রক্ষে নেই! হয় ত চিরদিনের মতো সেখানে সে রয়ে গেল। এর পর আর-কেউ যখন বাজনা বাজিয়ে নিশেন উড়িয়ে তোমার জীবন দখল করতে আসবে, তখন মনের মধ্যে কী বিপ্লব কাণ্ড বেধে যাবে, বুঝতে পারবে। বিদ্রোহী মন দিন-রাত ভিতরে-ভিতরে শুধু ফুঁসে-ফুঁসেই মরবে। এ ছাড়া তার আর-কোনো জারি-জুরি চলবে না। তাই বলি, যদি এখনো সময় থাকে ত মন ফিরিয়ে নাও।

মনে-মনে (১৯১৯), সইয়ের চিঠি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথমাপত্নী-বিয়োগের পর, পুত্র কমলকুমার বর্তমান স্বত্ত্বেও যখন নবীনদাস আবার দারপরিগ্রহ করিলেন, তখন আত্মীয় প্রতিবেশী সকলেই কিছু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিল...। আবার সেই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর উপর সমস্ত ন্যস্ত করিয়া নবীনদাস যখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন, তখন লোকের বিস্ময়ের মাত্রাটা কিছু অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষ চিরকালই আদরণীয়া হইয়া উঠে, এ-ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না বলিয়া কেহ কেহ আশ্বস্ত হইতে চাহিলেও, যাহারা নবীনদাসকে ভালরূপে চিনিত, তাহারা কিন্তু এ-কথাটার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। তবে নূতন গৃহিণীর নিপুণ হস্তচালনায় সংসারে যখন একটা নূতন ভাবের সমাবেশ হইল, তখন সকলের দৃষ্টি নবাগতার উপর পড়িয়া তাহার মধুর স্বভাবের সহিত পরিচিত হইবার জন্য একটু বেশী হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল।

সপত্নীপুত্র কমলকুমারের উপর নবাগতার অপার স্নেহের ভাব দেখিয়া নানা ছলে পরীক্ষায় কেহই সেটাকে কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়া অন্তরে অনেক আস্ফালন করিলেও মুখে তাহার নিন্দাবাদ করিতে সাহসী হইতে না। এমনি করিয়াই দিন কাটিতে লাগিল।

পিতার চেষ্টায়, শিক্ষকের উপদেশে, প্রতিবেশীর টিটকারিতে কোন রকমেই যখন কমল বাণীর সহিত সৌহার্য্য স্থাপন করিতে পারিল না, তখন কিন্তু তালটা পড়িল সেই নবাগতা গৃহিণীর ঘাড়ে। তাহাকে মুখ বুজিয়া সকলি সহ্য করিতে হইল, কারণ সকলের নিকটে এক কথা: "আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা নূতন মা একেবারে খেয়ে দিয়েছেন!..."

মূর্খ হলেও বিয়ের আটক হয় না— যদি বাপের কিছু পয়সা থাকে। কমলেরও বিবাহের বাকি রহিল না। সুন্দরী পুত্রবধূ পাইয়া নূতন মা আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দিন রাত ছবির মত তাহাকে সাজাইয়া ঘরে তুলিয়া রাখিতেই তাহার খেয়াল হইয়াছিল।...

বধূর কিন্তু সংশাশুড়ীব দেওয়া এত যত্নেও মন উঠিল না।

স্নেহের বাঁধন (১৯১৯), ১

চকিতাকে মঠ থেকে সরিয়ে ফেলা-ই তাঁরা স্থির করলেন। আগুন নিয়ে খেলা করবার দরকার কি? এ-কথা যখন শুনলাম, তখন একটা মস্ত বড় আরামের নিশ্বাস ফেলতে ভারি সাধ হল। ফেলতে গিয়ে দেখি, ফেলা যায় না— পাঁজরের নিচে কোথায় যেন একটা কাঁটার মত ব্যথা লেগে রয়েছে!

কিন্তু এ-কথা কাউকে জানতে দিলাম না। গায়ত্রীর ছবিখানা খুব করে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। মনের মধ্যের ছবিখানাকে— যার কথা আমারই ভাল করে জানা ছিল না— মঠের কাজকর্ম, ধ্যান-ধারণার নির্মাল্যের নিচে পূজা-প্রতিষ্ঠার ঘটের মত চাপা দিতে লাগলাম।

কাশী কি প্রয়াগে, অনাথ-আশ্রম কি সেবাশ্রমে— ঠিক বলতে পারি নে, ঐ রকম কি একটা নাম— চকিতাকে গুরুদেব নিয়ে চলে গেলেন। আমাদের ব্রহ্মচারীর পুরোনো জীবন আরম্ভ হয়ে গেল।

জলের উপর প্রতিবিম্বের পাকা ছাপ যেমন কিছুতেই পড়ে না— জিনিসটা সরে যাওয়া মাত্র যে-কে সেই, আমাদের মনটাও নিমেষে ধুয়ে-পুঁছে আবার তেমনি উজ্জ্বল চকচকে হয়ে উঠল। আবার তেমনি করে পুবের আকাশে সূর্য উঠতে লাগলেন, তেমনি করে আমাদের বেদ-গাথায় আকাশ ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমরা আবার ফুল তুলতে লাগগাম, মালা গাঁথতে বসলাম। স্বামীজীর মুখ থেকে বর্ষার মেঘের মত গাম্ভীর্য কেটে গিয়ে শরতের নীল, নির্মল আকাশের প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠল।

এক বছর পরে, গ্রীষ্মের স্তব্ধ দুপুরে, উত্তরের ঘরে প্রকাণ্ড কাঁচের জানালাটা খুলে দিয়ে আমি আবার ছবি আঁকতে বসেছি। প্রখর রোদ থেকে বাঁচবার জন্য পাখিগুলো গাছের ঘন পাতার মধ্যে মাথা গুঁজে মন্দ-মন্দ শব্দ করছে। অদূরে বকুল গাছের চূড়ায় একটা কোকিল বসে স্বরগ্রাম সাধছিল। ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কে একজন তার বিকৃত অনুকরণ করে তাকে চটিয়ে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে, আমার ছবির উপর অনেকখানি ছায়া ফেলে, কে আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। ছবি থেকে মুখ তুলে তাকে দেখবার ফুরসৎ ছিল না। বললাম, "আঃ, আড়াল করিস নে, চন্দ্রনাথ; সরে দাঁড়া, ভাই।"

কালো মেঘকে যেমন করে টুকরো-টুকরো করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি করে আমার ঘরের নিস্তব্ধতাকে হাসির উচ্ছ্বাসে খণ্ড-খণ্ড করে দিয়ে, সে হেসে বললে, "ফিরে দেখ— আমি চন্দ্রনাথ নই, আমি চকিতা!"

বৈরাগ-যোগ (১৯১৯), ৫

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া যাবজ্জীবন জীয়ন্ত কবরস্থ থাকিবার হুকুম একদিন আসিয়া পড়িয়া আমার মরণের-পথ-চাওয়া নিঃশেষ করিয়া দিল। তখন আবার পট-পরিবর্তন হইয়া আন্দামানী আসরে জীবনের অভিনব দুঃখ-বিচিত্র খেলা আরম্ভ হইল। সুখকে চাহিয়া, সুখের ঘরে যে বাসিন্দা, তাহার মাথায় অতর্কিত সর্বনাশা দৈবদুর্বিপাক আসিলে বুঝি বড় বাজে, সমস্ত অন্তরাত্মা সুখের অভাব-জনিত দুঃখে হাহাকার করিয়া উঠে। আমাদের বিপদটা কিন্তু ছিল ডাকিয়া-আনা বিপদ, খাল কাটিয়া গাঙ্গের কুমীর ঘরে তোলা গোছের কাণ্ড। যত বড়ই বেদনা হউক, তাহা যদি যাচিয়া-বরণ-করা বেদনা হয়, তাহা হইলে তাহার অর্ধেক ব্যথা গায়ে বাজে না, দুঃখের কষাঘাতে কেবলি হাসি পায়। প্রেমের পথের কাঁটা যত ফুটে, যত কষ্ট দেয়, ততই সুখ; কষ্ট না পাইলে যেন সে সুখের মেলা জমজমেই হয় না। তবু দুঃখ দুঃখ তো— তাই কতকটা যন্ত্রণা হইত বই কি; আমরা ঢাল তলোয়ারহীন দেশোদ্ধার-নিধিরাম সর্দার হইলেও রক্তমাংসের মানুষ তো।

দুঃখ ছিল অনেক। তাহার মধ্যে প্রথম প্রথম সঙ্গীর অভাবই ছিল সবার অধিক দুঃখ। কড়া হুকুম ছিল: এক ব্লকে কাছাকাছি থাকবে বটে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না। একসঙ্গে চলা-ফেরা আহার-বিহার, অথচ কথা বলিতে না পারিয়া অন্তরাত্মার যে কি ক্ষুব্ধ হাহাকার! একটু আধটু নলচে আড়াল দিয়া চোখ ঠারাঠারি ও চুরি-করা আলাপ, তাহাতে দুঃখ বাড়িত বই কমিত না: অবৈধ আলাপে একটু অমনস্ক দশায় কাহাকেও ধরিতে পারিলেই খোয়েদাদ চাচার হাঁক উঠিত: "এই বাঙ্গালী, থোড়া শরম কর।"

...আহার করিতে হইত নিতান্তই কর্তব্যবোধে ও ক্ষুধার তাড়নায় এবং সেইহেতু আহারের পরিমাণ যেরূপ মিতাচারে দাঁড়াইল, তাহা যোগীজনবাঞ্ছিত— এ-দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতে নিতান্তই আবশ্যকীয় শিক্ষা। ব্রাহ্মণের গরু শুনিয়াছি খায় কম, কিন্তু গোবর ও দুধ দুইই বেশি পরিমাণে দেয়; আমাদেরও হইল এই গো-ব্রাহ্মণের অবস্থা: কয়েদী খায় কম, খাটে চতুর্গুণ। নিত্য এক বেলার আহার্যের পরিমাণ এই প্রকার: চাউল ছয় আউন্স, রুটির আটা পাঁচ আউন্স, ডাল দু আউন্স, তরকারি এক আউন্স। এখানে চিড়া মুড়কির একদর, গুরু-ভোজী আধমোনী-কৈলাস ও আমার মত কৃশ গঙ্গাফড়িং উভয়ের জন্য ঐ পরিমাণে আহারের ব্যবস্থা।

দ্বীপান্তরের কথা (১৯২০), দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: আত্মকথা

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকার যখন যাত্রীর মনকে নিরাশায় গাঢ় আঁধারে ছাইয়া ফেলে, তখন পুব আকাশের ললাটে একটি ছোট শুকতারা কি তার ক্ষীণ আলোকে সেই পথিকের কল্পনার আশার তরুণ অরুণচ্ছবি আনিয়া দেয় না? ছাত্রগণ, বাঙ্গালার আকাশভালে যখন তোমাদের মত এতগুলি শুকতারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন কেন না আমাদের চোখ আমাদের জাতীয় জীবনের সুপ্রভাতের ভাবী আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? তোমাদের অধ্যয়ন-ক্লিষ্ট মুখে গৌরবের ভাব, তোমাদের চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটে মহত্ত্বের রেখা, তোমাজের জাগরণ-ক্ষীণ চোখে প্রতিভার আলো, তোমাদের কষ্ট-সহিষ্ণু শরীরে সাধনার চিহ্ন— এ-সব দেখিয়া মনে হয় তোমরা কোন অতীত যুগের রাজপুত্রের ন্যায় তোমাদের জন্মভূমির বহু যুগের দৈন্য ও পরতন্ত্রার বেড়ী ভাঙ্গিয়া, তাহাকে মহত্ত্ব ও স্বতন্ত্রতার উন্মুক্ত রাজ্যে রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

কেবল পশুবলে জগতের কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই। কেবল অর্থ-বলে কেহ বড় হয় নাই। জগতের জাতীয় মণ্ডপে উচ্চাসন পাইতে গেলে চাই মস্তিষ্কের বল, যাহার বিকাশ সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে, আর চাই মনের বল, যাহার প্রকাশ চরিত্রে ও ব্যবহারে। বাঙ্গালার রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বাঙ্গালীর মণীষার পরিচয় গর্বিত পাশ্চাত্ত্য জাতিকে দিয়াছেন। কিন্তু দুই-একটি কোকিলে কি বসন্তের সৌন্দর্য আনিতে পাবে? চাই আমরা সহস্র কোকিলের কলতান, যাহা জগতের শীতস্তব্ধ বসন্ত-যৌবনের অনন্ত উজ্জ্বল মধুর ভাব জাগাইয়া দিয়া বিশ্ববাসীর অনিচ্ছুক কর্ণকে ভারতের দিকে উৎকর্ষ করিবে। ভবিষ্যৎ ভারত অতীত ভারত অপেক্ষা বৃহৎ, মহৎ ও উজ্জ্বল হইবে। ছাত্রবন্ধুগণ, তোমরা ভুলিও না: এই গুরু কার্যের ভার তোমাদেরই উপর ন্যস্ত।

আমি এ-স্থলে অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল সাহিত্যের কথা বলিব। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে: জাতীয় উন্নতি সাহিত্যের উন্নতির চিরসাথী...। নাই থাক আমাদের বাহুবল, নাই থাক আমাদের ধনবল! যদি আমাদের সাহিত্যশক্তি থাকে, তবে তাহা আলাদীনের প্রদীপের ন্যায় নিমেষে আমাদের ঈপ্সিতকে আমাদের পদতলে আনিয়া দিবে।

জাতীয় উন্নতির জন্য, জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, অন্য সভ্য জাতির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আমাদের সাহিত্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইবে।

ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ (১৯২০)

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

জন্মাবধি বাপ-মা কখনও দেখি নি, অথবা দেখে থাকলেও অজ্ঞান-শৈশবাবস্থায় দেখেছি বলে তাঁদের কথা মনে নেই। কলকাতায় যে-বাসায় থাকতুম, সে-বাসা আমার খুড়োর। খুড়োমহাশয় লাট-দফ্‌তরে চাকুরী করতেন, তাঁর অনেকগুলি পোষ্য ছিল, তন্মধ্যে আমিও একটি। তবে দুঃখের বিষয় আমি কু-পোষ্যের দলে প্রধান ছিলুম। আমি খুড়িমার খোকাখুকিদের ঘাড়ে নিয়ে বেড়াতুম, সেই বালককালেই তাদের ধুইয়ে পুঁছিয়ে কাঁধে নিয়ে ইস্কুলে দিয়ে আসতুম, আবার টিফিনের সময় জল খাইয়ে আসতুম এবং ছুটীর পর ধরে নিয়ে আসতুম। এটী আমার খাস খিদমৎগারি। এর উপর গোয়ালের গরুটীর জাবনা দেওয়া, গোয়াল নিকান, গরু নাওয়ান, দুধ দোহা ইত্যাদি কাজগুলো আমাকে ভাগে করতে হত। আরও দুটী জ্ঞাতিপুত্র খুড়োমহাশয়ের রাঙ্গাদানা বকড়ী চাল ধ্বংস করত। তাদের মধ্যে একটী খুড়োমশায়ের খাস খানসামাগিরি এবং অপরটী খুড়িমার রান্নাঘরের যোগাড়দাড়ি হইতে আরম্ভ করে কাপড় কাচা বাজার করা ইত্যাদি সকল কাজই করত... খুড়োমশায় মোটা মাহিনা পেতেন শুনেছিলুম, তাই কলকাতা হেন সহরেও তাঁহার গাই-বাছুর ছিল। কিন্তু তাই বলে খুড়োমহাশয় বাজে খরচ করবেন কেন? বিনা মাহিনায় লোক লস্কর মিললে মাহিনা দিয়া লোক রাখাটা অপব্যয় নয় কি? বিশেষতঃ খুড়োমহাশয়ের লোক রাখবার ইচ্ছা থাকলেও খুড়িমা রাখতে দেবেন কেন? আর খুড়িমার মন সরলেও মামুজী লোক রাখবার মাহিনা দেবেন কেন? খুড়োমহাশয়ের রোজগারপত্র ত সব মামুজীর— অর্থাৎ খুড়িমার সহোদর মহাশয়ের— হস্তেই ন্যস্ত হইত, খরচপত্র মামুজী বুঝে সুজে করতেন। কাজেই সংসারের কাজ ভাগাভাগি করে, কু-পোষ্যদের স্কন্ধেই দেওয়া হয়েছিল। আর আমরাও তাতে সন্তুষ্ট ছিলুম, বিশেষতঃ জ্ঞানসঞ্চারবধি খিদমৎগারি করতে করতে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম। তবে একটা বিষয়ে সদাই গুরু গুরু প্রাণ কাঁপত। মামাবাবুর রাঙ্গা চোখের কথা মনে পড়লে প্রাণ উড়ে যেত।

বাদশা পিরু (১৯২০), ২: বাদশা পিরুর খাস-দফ্‌তর

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রিয়নাথবাবু প্রাতভ্রর্মণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন।... পথে আসিতে আসিতে দেখিলেন, একস্থানে একটি ছোটখাটো জনতা। কলিকাতা আজব শহর; ইহাতে একদিনও হুজুকের অভাব নাই। সেইজন্য সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিয়াই আপন মনে চলিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু জনতার নিকটবর্তী হইতেই মেয়ে-গলার গান শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে নুপূরধ্বনি, হারমোনিয়ম ও বেহালার সঙ্গত। এত প্রভাতে রাস্তায় কিসের মজলিস দেখিবার জন্য একটু আগ্রহ হইল। ভিড়ের মধ্যে যাইয়া দেখিলেন দুটি লোক, পরনে কাপড়-চোপড় হিন্দুস্থানীর মত, বেহালা ও হারমোনিয়মের সঙ্গত করিতেছে; আর একটি পনের-ষোল বৎসরের মেয়ে নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতেছে। প্রিয়নাথবাবু সমস্তটা শুনিতে পান নাই; যেটুকু শুনিলেন, তাহা তাঁহার নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিল। গাহিতে গাহিতে মেয়েটি একটি 'চটা-উটা' এনামেলের ডিসে পেলা সংগ্রহ করিবার জন্য দু একজনের নিকটে গেল। লোকগুলি এতক্ষণ হাঁ করিয়া গান শুনিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল যে, এই গান শুধু শুনাইবার জন্য নহে, তখন একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। মেয়েটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রিয়নাথের নিকটে আসিতেই তিনি পকেট হইতে কিছু বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে হাত আর বাহির হইল না।

মেয়েটি দেখিতে কৃশ, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক সৌন্দর্য। রঙ সম্পূর্ণ গৌর নহে, একটু— কিন্তু খুব একটু— শ্যামের দিক টান আছে। মুখখানিকে বিশ্লেষণ করিয়া কৃত্তিবাসের মত কেহ সেই রূপ বর্ণনা করিতে পারিবে না। কেননা সে-মুখের কোন বিশিষ্ট অঙ্গকে সুন্দর বলিতে না পারা গেলেও সবগুলির সমঞ্জস সহযোগে এমন একটি শ্রীর আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাকে সৌন্দর্য আখ্যা দিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যাহাতে প্রিয়নাথের দৃষ্টি আবদ্ধ ও হস্ত গতিহীন হইল, সেটি তাহার মুখশ্রী নহে, এই মুখশ্রীর উপরে, মেঘের চারিধারে সান্ধ্য সূর্যকিরণের জ্বলন্ত পাড়ের মত, যে একটা বিষণ্ন হাসি ছিল, সেইটি। প্রিয়নাথ তাহার দিকে চাহিতেই মেয়েটির করুণ দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইল। তিনি কয়েক মিনিট তাহার দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর যেখানে সেই বাজিয়ে লোক দুটি বসিয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তোমরা আমার বাড়ীতে গাহিবে?"

নাচওয়ালী (১৯২০), নাচওয়ালী, ১

বিজয়রত্ন মজুমদার

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী; তাহার নাম বারুণী নহে, কাজেই বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই; আর জলতলস্থ সোপানে যে-একটি গৌরাঙ্গী কিশোরী— হাঁ, কিশোরী বৈ কি, যেহেতু বাঙ্গালা দেশে দশ বছরের মেয়েকেও বালিকা বলিতে আমি একান্তই নারাজ— গাত্রমার্জনা করিতেছে, সে রোহিণী নহে; তাহারও রূপ বর্ণনা করিতে আমি ইচ্ছুক নহি? কাল অপরাহ্ন। অনেকগুলি প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা সাময়িক কার্য সম্পন্ন করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র এই কিশোবীই জলে বসিয়া আছে।

তাহার নাম হিন্দোল। নামটি একটু উদ্ভট, কিন্তু আমরা নাচার। নামটি পরিবর্তিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র সহজ নাম দিতে পারিলে সকল দিকেই সুবিধা হইত, কিন্তু কিশোরীর আপত্তি থাকিতে পারে। শুধু কিশোরীর কেন? বোধ করি কেহই এ-প্রস্তাব সমর্থন করিবেন না।

হিন্দোল কিয়ৎক্ষণ জলে বসিয়া থাকিয়া পরে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে পটু, পরপার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। আরও ডুব দিল, মাঝখানে ভাসিয়া উঠিল, সেখান হইতে আবার ডুব দিল, একেবারে সোপানে আসিয়া উঠিল। এই সময়ে আপন মনে সে হাসিয়া ফেলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, বিকালে মাথা ভিজিয়াছে, মা-র কাছে আজ লাঞ্ছনা আছে! তারপর গামছাখানি নিংড়াইয়া বেশ করিয়া মাথা মুছিতে লাগিল। দুই-তিনবার মুছিয়া ঝাড়িয়া চুলগুলি জড়াইয়া কবরী আকারে বাঁধিয়া ফেলিল। আবার হাসিল। ইহার অর্থ বস্তুতঃ— আজ তোমাকে ধরতে দিচ্ছি নে, মা! বৃহৎ পিত্তল কলস পূর্ণ করিয়া কক্ষে লইয়া উঠিয়া পড়িল। দু'তিনটি সোপান উঠিয়াই সামনের দিকে চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দোলের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, মেয়ে মান্‌সের ঘাটে ছোঁড়াটাকে নির্লজ্জভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার তীব্র রসনা লক লক করিয়া উঠিল। প্রথমতঃ সে হঠাৎ নত হইয়া সিক্ত বসনাদি যথাবিন্যস্ত করিয়া লইয়া যেমন অপরিচিত নির্লজ্জের পানে চাহিবে, অমনি পা পিছলাইয়া সকলস আছাড় খাইয়া পড়িল। আমাদের কল্পিত গোবিন্দলাল ক্ষিপ্র গতিতে লাফাইয়া পড়িয়া কিশোরীকে ধরিয়া ফেলিল। কলস জলে পড়িয়া ভাসিতে লাগিল।

আঘাতের প্রথম বেগটা কমিতে হিন্দোল বলিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও!"

স্বপ্ন-পরিণীতা (১৯২০), প্রথম পরিচ্ছেদ: সাক্ষাৎ

জহান-আরা অন্তঃপুর-সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যাপারে ছায়ার মত তাহার মাতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। মাতা ও কন্যা মুহূর্তের জন্যও পরস্পরের সঙ্গবিচ্যুত হইতেন না; কিন্তু কুটিল কাল সে-নিবিড় স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল; ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন সম্রাটের হৃদয়ে অনির্বাণ শোকবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মুমতাজের অম্লান জীবনতাপ চিরনির্বাপিত হইল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার তিন-চার বৎসর মধ্যেই প্রণয়িনী জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া সম্রাট হৃদিভঙ্গে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে সপ্তাহকাল তিনি কোনরূপ রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। চিরসন্তপ্ত ভূপতি চিরদিনের জন্য রঙ্গীন পরিচ্ছদ, সুগন্ধ ও মণিমুক্তা ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিলেন; তাঁহার আমোদ-প্রমোদ উৎসব-আনন্দ সমস্তই প্রতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর সঙ্গে চিরসমাধিলাভ করিল; বাৎসরিক অভিষেক-বাসরে ও জন্মদিন-উৎসবে নৃত্যগীতাদির চিরানুষ্ঠান পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। শাহ্‌জহানের পক্ককেশ-বিরল শ্মশ্রুও যেন অনতি-বিলম্বে শোক-পরিচ্ছদ শুভ্রবেশে ধারণা করিল। অকালবৃদ্ধ ভূপাল যখনই পত্নীর সমাধি-সন্দর্শনে যাইতেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া অজস্র স্রোত প্রবাহিত হইত। সে-অন্তঃপুর মোগল-বাদশাহ্‌গণের ভোগসুবিধাবিলাসের আনন্দনিকেতন, তথায় আসিলে ভূপতির বিধুর হৃদয় অধিকতর আতুর হইয়া উঠিত। হায়! ভূতলে সেই ভূস্বর্গ বিরাজ করিতেছে, কিন্তু তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আজ কোথায়? সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, উৎসবে ব্যসনে চিরসঙ্গিনী চিরমমতাময়ী মুমতাজ। সম্রাটের কাতর চক্ষু হারেমে আসিয়াই সেই হৃদয়বিকাশী হাসির অন্বেষণ করিত, এবং সেই বাঞ্ছিত মুখের অদর্শনে তাঁহার বঞ্চিত হৃদয়ে যে হাহাকার উঠিত, অজস্র অশ্রুপাতেও তাহা শান্তি হইত না। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিতেন, "হায়! কাহারও মুখমণ্ডল আমাকে এখন আর আনন্দ দান করে না।" শাহ্‌জাহানের অপর দুই পরিণীতা পত্নী ছিলেন সত্য, কিন্তু সে-বিবাহের মূলে রাষ্ট্রনৈতিক কারণ নিহিত ছিল, তাহা প্রেমপরিণয় নহে। মুমতাজ-মহল সম্রাটের হৃদয়ের যে-স্থল অধিকার করিয়াছিলেন, সেখানে অপর কাহারও আসন ছিল না। ভারতপতির এই বিনিদ্র বেদনা বুঝিয়াছিলেন কেবল মাতৃহারা জহান-আরা। পিতার এই নিদারুণ শোকে মমতাময়ী দুহিতা সান্ত্বনাদায়িনী জননীর পদ গ্রহণ করিলেন।

জহান-আরা (১৯২০), প্রথম পরিচ্ছেদ, মুমতাজ-বিয়োগে

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নদীর ধারে থানা-ঘর। ঘরখানি ছোট, কিন্তু দারোগা আছে আড়াই: বড়, ছোট ও জমাদার। বড় বনমালীবাবু বিচক্ষণ হইলেও বড় একটা উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহার দয়ার শরীর, পরকে পীড়ন করিয়া টাকা লইতে তিনি জানিতেন না। পরের কান্না দেখিলে তাঁহার কান্না আসিত। ছোট যতীনবাবু একেবারে উল্টা। পরের কান্না দেখিলে তাঁহার আনন্দ হইত। মফঃস্বলে যখন যাইতেন, তখন প্রজাদের না কাঁদাইয়া তিনি ফিরিতেন না। পরের অশ্রু তাঁহার প্রিয় ছিল। আড়াই নম্বরের জমাদার সাহেব, কড়াই ডালের বড়ী বিশেষ— ঝোলে ঝালে অম্বলে সবতাতেই থাকতেন। যতীনবাবুর সঙ্গে মফঃস্বলে গেলে গরীবদের উপর খুবই তর্জনী-গর্জন করিতেন, আবার বনমালীর সঙ্গে গেলে গরীবদের দুঃখে অশ্রুমোচন করিতেন।

থানা-ঘর হইতে কিছু দূরে একখানি ছোট চালাঘর ছিল। সেখানিও নদীর ধারে। খুব নিকটে লোকালয় নাই, একটু দূরে রেজেষ্ট্রী আফিস ও বাবুদের বাসা। এই চালা-ঘরখানি নির্মিত হইয়াছিল অন্তরীণের বাসের জন্য। অন্তরীণ— না বন্দী, না স্বাধীন— ত্রিশঙ্কুর ন্যায় আকাশ-পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। পুলিস-কর্মচারীরা ইচ্ছা হইলে যাহাকে তাহাকে ধরিয়া অন্তরীণ করিতে পারিতেন। তাহার বিচার হইত না, তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রমাণ লইতে হইত না— তাহাকে মাতৃক্রোড় হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া দূরদেশে চালান করা হইত। তবে সরকার তাহাকে মাথা গুঁজিবার স্থান দিতেন, পেট ভরিয়া খাইতেও দিতেন। স্বেচ্ছামত গ্রামের ভিতর বেড়াইতে দিতেন, দেশে স্বজনদিগকে পত্র লিখতে দিতেন, কাগজপত্র পড়িতে দিতেন; গান-বাজনায় সরকারের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নেশা করিতে দিতেন না।

অন্তরীণের ঘরখানির মেঝে মাটির, দেওয়াল কাঠির, চাউনি খড়ের। লম্বায় আট হাত, চওড়ায় ছয় হাত। ঘরের সামনে একটুখানি দাওয়া, তাহারই একাংশ ঘিরিয়া রন্ধনশালার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরখানি বর্তমানে খালি ছিল না; হতভাগ্য ললিতকুমার মিত্র তথায় বাস করিত।

অন্তরীণের বধূ

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

অধিকাংশ মা-বাপের বিশ্বাস মেয়েকে বড় ঘরে দিতে পারিলে শুধু মেয়ের নয়, মেয়ের সঙ্গে মা-বাপেরও সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, ইহা শিবু ঠাকুরের প্রতিবেশী হরিশ চাটুয্যে সেই দিন বুঝিতে পারিলেন যেদিন তিনি মেয়েকে দেখিতে গিয়া তাহার অস্থিচর্মসার দেহ দর্শনে শিহরিয়া উঠিলেন। তেমন সোনার প্রতিমা নলিনী— তাহার সেই নধর কান্তি, সেই সৌকুমার্য কোথায় গেল? মেয়েকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মেয়ে শুধু কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। তারপর অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পর সে যাহা বলিল, তাহার মর্ম এই যে, রাজা-জমিদারের ঘরে, যেখানে দুই বেলা দুই শত পাতা পড়ে, অতিথি আগন্তুক ভিখারী পেট পুরিয়া খাইয়া দাতার জয়গান করিতে থাকে, সেখানে শুধু বধূদিগের উদর-পূরণের কোন ব্যবস্থাই নাই। মা-বাপ তাহাদিগের খোরাক পোষাক যোগাইতে বাধ্য, কেননা জমিদারের ঘরে মেয়ে দিয়া তাহারা কৃতার্থ হইয়াছে। যে সকল অকৃতজ্ঞ মা-বাপ এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিবে, তাহাদের এই দুষ্কর্মের অশুভ ফল মেয়েকেই ভোগ করিতে হইবে...

বড় ঘরের এই বড়মানুষী কেতা শুনিয়া হরিশ চাটুয্যে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দুঃখিত চিত্তে বৈবাহিকের নিকট গিয়া কন্যার দুঃখ জ্ঞাপন করিলে বৈবাহিক জমিদারী চালে বুক ফুলাইয়া বড়মানুষী কেতা যে অন্যের পক্ষে বুঝিয়া লওয়া দুঃখসাধ্য— ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। দরিদ্র হরিশ চাটুয্যে সেই দুর্বোধ্য বড়মানুষী কেতা বুঝিতে অশক্ত হইয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেন, এবং অনেক স্তব-স্তুতি দ্বারা বৈবাহিককে প্রসন্ন করিয়া কন্যাকে একবার স্বগৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর বৌ দরিদ্র বাপের ঘরে গেলে তাহাতে বড়লোকের মর্যাদাহানি হইয়া থাকে, এই অজুহাত দেখাইয়া অনুমতি দিতে পারিলেন না। অগত্যা কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে হরিশ চাটুয্যে ঘরে ফিরিলেন।

সতী-সাবিত্রী (১৯২১), ৯

ইন্দিরা দেবী

বিবাহের পর দুই বৎসর বড় সুখেই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত, পৃথিবী বুঝি শুধু আনন্দের রাজ্য। ইহার কোনখানে কোন অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, বেদনা, কোন মলিনতা নাই, নিজের সৌভাগ্য-গর্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পদেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্মে সদানন্দময়ীর আর সে আনন্দাভাব নাই। মিছিমিছি হাসি-খেলায় আর সে ছেলেমানুষী করে না। কারণে অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্নিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজে মৃত্যুকামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ভূতে বাসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তনাশ ও মনের স্ফূর্তি-বিধানের জন্য কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে-নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অসংযত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অণিমার অনুনয়, অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন কিছুতেই আর তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না, বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রী অল্পবুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষে, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে তাহাকে "আহা বেচারি" এইরূপই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রী প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লেখার তুলিকাতে আঁকিয়া তুলে স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্র-বৃষ্টির মধুর অভিনয়, মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য আদিত্যকে ব্যথা না দিয়া এখন আনন্দই দেয়। কখনও অত্যাধিক যত্নসোহাগে, কখনও বিরক্তি-তাচ্ছিল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারীহৃদয়ের গোপন মাধুর্য, প্রতারিতার মর্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া যে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

মাতৃহীন (১৯২১), লেখকের বিপত্তি

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রসাদপুর নামক এক জনবহুল নগরের রাজপথ দিয়া দুইটা যণ্ডাকৃতি কসাই একটি গাভীকে মারিতে মারিতে টানিতে টানিতে লইয়া যাইতেছে। মর্মভেদী আর্তস্বরে গাভী চীৎকার করিতেছে, আর সকরুণ দৃষ্টিতে পথিকদের প্রতি চাহিতেছে— উদ্ধারলাভের আশায়। লোকও চলছে অনেক, দেখছে, শুনছে, বুঝছে, কিন্তু কথা কচ্ছে না, দেখেও দেখছে না। তারা যেন মুক, যেন অন্ধ, যেন বধির।

নিরাশার ব্যর্থতায় অথবা অপদার্থ মানুষের প্রতি ঘৃণায় গাভী ভূমে লুটাইয়া বুঝি আর্ত-ব্যথিত কণ্ঠে বিধাতাকে বারংবার ডাকিতে লাগিল। উপর্যুপরি প্রহারেও যখন গাভী উঠিল না, চলিল না, তখন কসাই দুটো বলপূর্বক রজ্জু আকর্ষণে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। কঙ্করে গাভীগাত্র কাটিয়া রুধির ধারা বহিল।

মানুষ দেখিল এ-দৃশ্য, কিন্তু সে তাহার কার্য করিল না। গাভীর আর্তধ্বনি শুনিল, কিন্তু তাদের নির্জীব হৃদয়ে প্রতিধ্বনি উঠিল না। আপন আপন স্বার্থরাশি লইয়া আপন আপন চিন্তায় যে যাহার আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

সহসা একটা মাতাল টলিতে টলিতে আসিয়া এক হস্তে কসাইয়ের উন্নত যষ্টি ও অপর হস্তে গাভীর রজ্জু ধারণ করিয়া স্ফীতবক্ষে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। বিস্ময়ে পথিকেরা দাঁড়াইল, বিস্ময়ের কসাই দুটো মাতালের প্রতি চাহিল। কিন্তু মাতালের কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই।

বিস্ময়ে কসাই বলিল, "কে হে তুমি পাঁদাড়ের কাঁটা, পাঁদাড় থেকে ছুটে এসে আমাদের বিঁধতে এলে? এ শক্ত হাড়, শক্ত চামড়া, বিঁধবে না! ফিরে যাও; যেখান থেকে এসেছ, সেইখানে ফিরে যাও। নইলে এই লাঠির ঘায়ে গুঁড়িয়ে দেব।"

"তাই দাও, ভাই, তবুও এরূপভাবে নিয়ে যেতে দেব না... তুমি আর এই গাভী একই খোদার সৃষ্ট জীব নও কি? তোমার ত্বক আর গাভীর ত্বক একই উপাদানে গঠিত নয় কি? ঈশ্বরের অংশকণা কি এই গাভীতে নাই? তবে কেন গাভীকে প্রহার ক'রে নির্যাতন ক'রে প্রকারান্তরে তুমি খোদাকে অপমানিত করছ?"

মাতাল (১৯২১), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লচন্দ্র বসু

বেশী দিনের কথা নয়— জমিদার জহরবাবু দুই মাস জ্বর ভোগের পব ক্লান্ত শীর্ণদেহে যে-দিন নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া পার্থিব বিষয়-বৈভবের অসারত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, যে-দিন সর্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন, ক্ষণভঙ্গুর দেহের সঙ্গে সঙ্গে এ-মায়ার সংসার চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, আর সেই নির্দিষ্ট দিনেরও বেশী বিলম্ব নাই— আমি সেই দিনের কথাই বলিতেছি। কন্যা সুষমা তখন যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়া কেবল থমকিয়া দাঁড়ায় নাই; অফুরন্ত হাসি ও পরিপূর্ণ শোভা বক্ষে চাপিয়া একটা অনুপম লাবণ্য লজ্জা-সঙ্কোচের মধ্য দিয়াও শত সহস্র দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া তাহার লবঙ্গলতা দেহখানিকে অবরুদ্ধ গৌরবের গুরুভারে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। জহরবাবু অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিয়া শুনিয়া স্বজনহীন অনাথ অনিলকৃষ্ণের হাতে সুষমার সঙ্গে প্রকাণ্ড বিষয়টা সঁপিয়া দিয়া আজন্মের সাধ দেবমন্দিরের পবিত্র ধূলায় সংসারের কালিমাখা দেহটাকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া অনন্ত পথের যাত্রী হইবার জন্য মনটাকে অনেকটা গড়িয়া তুলিয়াছেন।

দুইটা বৎসর নিরুপদ্রবে নির্ভাবনায় কাটিয়া গিয়াছে। অনিলকৃষ্ণ সম্প্রতি শ্বশুরের আশ্রয়ে আসিয়া দুর্ভাবনাগ্রস্ত তরুণ জীবনটাকে আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া নূতন করিয়া দেখিতে শিখিলেও তবু যেন কিসের একটা অস্বস্তি সময়ে সময়ে তাহার শুভ সাধনাকে নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ঠেলিয়া ধরিতেছে। আর সুষমা? সে তাহার ভালবাসা-পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি শ্যামসুন্দরের মন্দিরে রাখিয়া দিয়া আজকাল স্বামীর ক্ষুধিত কণ্ঠলিঙ্গনের মধ্যে পড়িয়া দোটানা স্রোতে কেবলই হাবুডুবু খাইতেছে। গত দুই বৎসরের কথা বলিতে গেলে সে ত সুখেই ছিল, কোন ভাবনাই তার ভাবিতে হয় নাই। যত গোল বাধাইয়াছে তাহার এই অনুপম অপূর্ব যৌবনশ্রী। সে যে নিতান্ত নিভৃতে, সঙ্গোপনে, হিমান্তে সহসা বনানীর স্মিতহাস্যের ন্যায় সৌন্দর্যসম্ভারে তাহাকে এক নূতন বেশে সাজাইয়া তুলিয়া, লোকের মুগ্ধ দৃষ্টিকে অপলকে বিপুল পুলকে টানিয়া ধরিয়াছে। এ কি বিপদ! তাহার দেহতটে এ-উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস কোথা হইতে আসিল? এ যে কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দে নাচিয়া ছুটিয়াছে! সে যে ইহা চায় না। সুষমা দেবমন্দিরে দাঁড়াইয়া নির্জনে বসিয়া কেবল ইহাই ভাবে। ভাবিয়া ভাবিয়া দিন কাটায়।

বৈরাগী ঠাকুর (১৯২১), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

অল্পবয়সে ভিখারী মণ্ডর পিতৃহীন হইয়াছিল। তাহার পিতার কিছু জমি-জমা ছিল; পিতার মৃত্যুর পর তাহার হিতৈষী জ্ঞাতিবৃন্দ অল্পদিনের মধ্যেই ভিখারীর সে-সকল উপসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাহার জননীরও মৃত্যু হইল। সুতরাং ভিখারীর সংসারবন্ধন আর কিছুই রহিল না। এই সময়ে ভিখারীর বয়স চৌদ্দ-পনের বৎসরমাত্র। নিরুপায় ভিখারী উদরান্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। গ্রামের জ্ঞানীবৃন্দ সকলেই তাহাকে বহুমূল্য উপদেশ দিলেন, কিন্তু এককণা 'দানা' দিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন না।

এই সময়ে গ্রামে সরকারের পক্ষ হইতে জরিপের কাজ আরম্ভ হইল। বিস্তর আমীন সাহেব এই উপলক্ষে গ্রামে আসিয়া বাসা করিলেন। ভিখারী একজনের ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করিল। সেই দিন হইতে সে আমীন সাহেবের সহচর হইয়া নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিতে লাগিল। আমীন সাহেব কিছু দিন পরে তাহাকে 'টিণ্ডালের' কাজে ভর্তি করিয়া দিলেন। ভিখারী মাসে চৌদ্দ-পনের টাকা উপার্জন করিলে লাগিল।

প্রায় দশ বৎসর এই প্রকারে দেশে দেশে ঘুরিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া একদিন ভিখারীর দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। ভিখাবী দেশে আসিয়া দেখিল, সম্পত্তি মধ্যে তাহার পৈতৃক বাসভূমির ভগ্নস্তুপমাত্র পড়িয়া আছে।

কিন্তু এবার ভিখারীর আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। সকলেই শুনিয়াছিল যে, ভিখারী জরিপের কাজে বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়া বাড়ী আসিয়াছে। সকলেই অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে উপদেশ ও উৎসাহ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের আগ্রহ ও উৎসাহে ভিখারী স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করা-ই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিল। বহুদিন অস্থায়ীভাবে জীবনযাপন করিয়া সে একটু শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই পৈতৃক বাসস্থানের ভগ্নস্তূপের উপর ভিখারীর নবগৃহ নির্মিত হইল। স্বজাতি ও কুটুম্ববৃন্দ দয়া করিয়া তাহার 'দহি-চুড়া' এবং 'মাস-ভাত' আহার করিয়া তাহার গৃহপ্রবেশকে গৌরবান্বিত করিয়া দিলেন।

বেহার চিত্র, প্রথম খণ্ড (১৯২১), ভিখারী মণ্ডর, ১

হেমলতা দেবী

শিবনাথ উন্মাদিনী নাম্নী ছোট বোনটিকে এত ভালবাসিতেন যে, সচরার কোন ভাই বোনকে এত ভালবাসেন না। ঠাকুরমার মুখে উন্মাদিনীকে শিবনাথ কিরূপে ভালবাসিতেন তাহা শুনিয়া মনে হয়, যেন এ-সব উপন্যাসের গল্প। উন্মাদিনী শিবনাথের চেয়ে ছয় বৎসরের ছোট। উন্মাদিনী দেখিতে বড় সুন্দর ছিল বলিয়া পিতা আদর করিয়া মেয়েকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকিতেন। শিবনাথ এই ছোট বোনটিকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন, উন্মাদিনীকে একদণ্ড না দেখিলে অস্থির হইতেন। যা কিছু পাইতেন উন্মাদিনীর জন্য আনিতেন। রাত্রে উন্মাদিনীর গলা না জড়াইয়া শুইতেন না। সে শিবনাথকে "পাগ্‌লা দাদা" অর্থাৎ পাগলা দাদা বলিয়া ডাকিত। শিবনাথ কলিকাতায় আসিবার সময় উন্মদিনীকে ছাড়িয়া আসিতে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন; তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল যে "কে তাঁহার বুকে ছুরি বিঁধাইয়া দিল।" ছুটির সময় যখন বাড়ি যাইতেন, তখন হাঁটিয়া অনেক ক্রোশ আসিতেন, ধূলিধূসরিত মূর্তি লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই প্রথম কথা "মা, উন্মদিনী কোথায়?" যদি শুনিতেন পাড়ায় খেলিতে গিয়াছে, তখনই সেই পায়ে সেই ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ছুটিয়া যাইতেন, সে প্রসন্নমূর্তি বোনটিকে কাঁধে করিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ি ফিরিতেন। ভাইবোনের তখন যে কি আনন্দ হইত! সেই উন্মাদিনী, শিবনাথের আদরের বোন উন্মাদিনী, পাঁচ বৎসরের বালিকা বেড়াইতে গিয়া লিচু খাইয়া বাড়ি আসিল, আর উঠিল না, কলেরা হইয়া মারা গেল। শিবনাথের শোক অবর্ণনীয়। তিনি চিরজীবন লিচু খাওয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। কতবার আমাদের বলিয়াছেন, "আমার দুর্গা প্রতিমার মত সুন্দর বোনটি লিচু খেয়ে মারা গেল!" বাল্যকালে শিবনাথ আর উন্মাদিনী প্রতিমা-ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন, উন্মাদিনীকে পালকির ছাদে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন লোকেরা বলিয়াছিল, "পালকির উপরে প্রতিমা দেখিব না ঐ প্রতিমা দেখিব?"

অন্যান্য ভগ্নিদিগকেও শিবনাথ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নিজে বোনেদের বিদ্যালয় হইতে আনিতে যাইতেন; গ্রীষ্মকালে মাটি তাতে বলিয়া কোলে করিয়া বোনেদের আনিতেন। বাঙ্গালীর ঘরে যেখানে একটিমাত্র পুত্র আর চারিটি কন্যা, সেখানে কি এমন হয়?

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত (১৯২১), তৃতীয় অধ্যায়: শৈশব

সীতা দেবী

একদেশের রাজার রাণীর মেয়ের শখ। অথচ মেয়ে আর তাঁর কিছুতেই হয় না। রাজপ্রাসাদে কম করে আটটি রাজকুমার, তাদের চেঁচামেচি আর খেলার চোটে প্রাসাদ সারাক্ষণ গম গম করতে থাকে। রাণীর কিন্তু কিছু ভাল লাগে না, অত যে টাকা-কড়ি, অমন সুন্দর বাড়ি-ঘর, অত বড় রাজ্য, আশ্চর্য সব হীরে-মুক্তোর গয়না, কিছুতেই তাঁর মন ওঠে না। একটি ছোট মেয়ের অভাবে তাঁর সব সুখই মাটি হতে বসেছিল। সকলে উঠে সোনায়-বাঁধানো আয়নায় মুখ দেখেই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে করেন, "আমার এত সুন্দর হয়েই বা কি লাভ? মরে গেলেই সব শেষ! আমার মত দেখতে যদি একটি মেয়ে থাকত, তাহলে মরবার পরও আমাকে লোকে মনে রাখত!" রেশমের শাড়ি কি হীরে গয়না পরতে গিয়েই মনে হয়, "এ-সব কাকেই বা দিয়ে যাব?"

এতদিন ভোরের বেলা উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই রাণী দেখলেন যে, জানালার পাশেই একটি গোলাপ ফুল নিজের রাঙ্গা মুখখানি তুলে ধরে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। তার বুকের মধ্যে এক ফোঁটা শিশির মুক্তোর মত টলটল করছে। রাণী ফুলটির দিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "আমার যদি ঐটুকুও একটি মেয়ে থাকত!"

রাণীর কপাল-গুণে ঠিক সেই সময় সেইখান দিয়ে এক দেবদূত উড়ে যাচ্ছিল। রাণীর কথা শুনে সে একবার ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলে; সুন্দরী রাণী অমন বিষণ্ন মুখ দেখে তার দুঃখ হল; সে বললে, "আচ্ছা তা-ই হবে!" দেবদূতদের ত আর মানুষের চোখে দেখা যায় না; কাজেই রাণী তাকে দেখতেও পেলেন না, তার কথা শুনতেও পেলেন না।

তার পরদিন ভোরে চোখ চাইবামাত্র রাণী দেখিতে পেলেন যে, জানালার উপরে অতটুকু একরত্তি একটি মেয়ে বসে আছে, শিশিরের ফোঁটারই প্রায় সমান। রাণী ত আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাকে তখুনি কুড়িয়ে নিলেন। রাজপ্রাসাদে মহা ধুমধাম লেগে গেল, রাণীর এতদিনকার সাধ পূর্ণ হয়েছে, তাতে সবাই বেজায় খুসি। আট রাজকুমার ছুটে তাদের মায়ের ঘরে এসে হাজির হল, নূতন বোনকে ত দেখা চাই! কিন্তু বোনকে দেখে তাদের কারু পছন্দ হল না; সবাই নাক সিঁটকিয়ে বলে উঠল, "এ রাম, এতটুকু।"

তিনটি গল্প, শিশিরকণা

প্রবেশদ্বারের সম্মুখে গলির উপর কাশ্মীরী বারান্দা ঝুঁকিয়া আছে। ইহা একটু নূতন। আমরা পূর্বাস্যা হইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দক্ষিণে দ্বারে পার্শ্বেই, জলের কল। সেই কলে বঙ্কিমবাবুর খানসামা হুঁকা ফিরাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন?" ভৃত্য উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের কি দরকার? তা তোকে বলিব কি রে? তাহা হইলে তোর কাছে আসিলেই চলিত। মর্, তুই খবর দে!"

মুন্নী আমার জামা ধরিয়া টানিতেছিল এবং মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "কর কি? তোমার সঙ্গে কোথাও আসিতে নাই। এসেই দাদা— চুপ চুপ!" ইত্যাদি।

বঙ্কিমবাবুর খানসামা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শুনিলাম, উপর হইতে কে বলিতেছেন, "আপনারা উপরে আসুন।"

চাহিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের দক্ষিণে দ্বিতলের বাতায়নে এক "শালপ্রাংশু মহাপ্রভু" গৌরবর্ণ সুপুরুষ; তাঁহার ডান হাতে বাঁধা হুঁকা— তামাক খাইতেছিলেন— প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ স্মিতরেখা, উদার ললাটে; তখন কি দেখিলাম, মনে নাই, কিন্তু এখন মনে হইতেছে, কীর্তিকুসুমের মালা নয়, মণীষার বেদী নয়, প্রতিভার কমলাসন নয়, মা-র আশীর্বাদ!...

এই বঙ্কিমচন্দ্র! বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, যাদুকর বঙ্গিম, দোর্দণ্ডপ্রতাপ বঙ্কিম!...

খানসামা পথ দেখাইয়া দিল। বামে উপরে উঠিবার শিঁড়ি। উপরে উঠিলাম। ঘরের মেজের সুচিত্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচীরে অয়েলপেন্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি। কৌচ্, কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত; এক কোণে একটি টেবিল-হারমোনিয়ম। বঙ্কিমবাবু গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর। গায়ে একটি হাত-কাটা জামা। ধুতিখানা কোঁচানো। পায়ে চটী। পরিপাটী পরিচ্ছন্ন। আমরা বাহিরে জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই দিন, সেই প্রথম ভক্তিভরে অবনত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "থাক্, থাক্!"

ইহার উত্তরে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম

(কাজী) নজরুল ইসলাম

এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে-সেবক সৈনিক হতে পারবে; সেবার ভার নেবে নারী, কিংবা সেই পুরুষ যে পুরুষের মধ্যে নারীর করুণা প্রবল। নারীর ভালবাসা আর পুরুষের ভালবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশী। পুরুষের ভালবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহই প্রধান।

দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয় ত মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয়। দেশ চায় সেই পুরুষ, যার ভালবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে, যে দেশকে ভালবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না; যে, দরকার হলে, আঘাতও করবে, প্রতিঘাত বুক পেতে নেবে। বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করা, আঘাত করার পশুত্ব ব পৈশাচিকতাকে যে-অনুভূতি নিষ্ঠুরতা বলে দোষ দেয় বা সহ্য করতে পারে না, সেই অনুভূতিই হচ্ছে নারীর অনুভূতি, মানুষের ঐটুকুই হচ্ছে দেবত্ব। যারা পুরুষ হবে, যারা দেশ-সৈনিক হবে, তাদের বাইরের ঐ পশুত্বের বা অসুরত্বের বদনামটুকু সহ্য করে নিতে হবে। যে-ছেলেরা মনে সেবা করবার, বুকে জড়িয়ে ধরে ভালবাসার ইচ্ছাটা জন্মগত প্রবল, তার সৈনিক না হওয়াই উচিত। দেশের দুঃখ-মোচন, আর্ত-পীড়িতদের সেবার ভার এই সব ছেলেরা খুব ভাল করেই করতে পারবে। যেমন উত্তর-বঙ্গের বন্যা-পীড়িতদের সেবা-সাহায্য। বাংলার ত্যাগী ঋষি প্রফুল্লচন্দ্র আজ মায়ের মমতা নিয়ে দুহাতে অন্নবস্ত্র বিলোচ্ছেন, এ-রূপ জগদ্ধাত্রীর, এ-রূপ অন্নপূর্ণার, এ-রূপ, এ-মূর্তি তো রুদ্রের নয়; প্রলয়ের দেবতার চোখে এমন মায়ের করুণা ক্ষরে না। এই যে হাজার হাজার ছেলে এই আর্তদের সেবার জন্য দুবাহু বাড়িয়ে ছুটেছে, এ-ছোটা যে মায়ের ছোটা, এ-করুণা, এ-সেবাপ্রবণতা নারীর, দেবতার। আমরা এঁদের পূজা করি, কিন্তু এতে তো দেশের বাইরের মুক্তি-স্বাধীনতা আনবে না।

রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা; তাঁদের পূজার জন্য বাংলার চোখের জল চিরনিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে-পুরুষ এসেছিল— বিবেকানন্দ; সে-সেনাপতির পৌরুষ-হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।

রাজবন্দীর চিঠি (১৯২২), আমি সৈনিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকা ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানালায় জানালায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।"

ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে, অন্ধকারে দেখা গেল না; পিছনের পথে কী ছিল, কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

লিপিকা (১৯২২), সন্ধ্যা ও প্রভাত

গোকুলচন্দ্র নাগ

পশ্চিম আকাশে, ধূসর মেঘের আবরণের ভিতর দিয়ে, নির্বাণ-উন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটির মত দিনশেষের ম্লান আলো শ্বেতকরবীর পাপড়ির ওপর বারিবিন্দুগুলির সঙ্গে মিশে, লক্ষ চুনী-পান্নার মতই পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে, যেন প্রিয় বিরহিনীর অশ্রুকণা। পুরবী রাগিনীর মীড়ের মত সে-আলো বেণুকুঞ্জে কেঁপে কেঁপে লুটিয়ে পড়ছে। সে আলোক-সঙ্গীত, রুদ্ধ ঘরের আগল ভেঙে আমায় বাইরে নিয়ে এল।

আমার জীর্ণ মলিন বসনখানি এ কোন অপূর্ব রঙে রঙিন হয়ে উঠল! এ-রঙিন আলোকে স্নান করে আমার কি হবে? এখনি যে অন্ধকারের সমস্ত কালি আমার দেহে মাখা হয়ে যাবে। কালোর বুকেই যে আমার ঠাঁই! আমার বুক-জড়ান কালো, আমার অনিদ্র আঁখির ঘুম-পাড়ান অঞ্জন— ঐ তো আমার সব। তবু আজ এই আঁধার সাগরের কূলে দাঁড়িয়ে, আলোর মাধুরী দেখবার জন্যে আমার চোখ-দুটি জলে ভরে উঠছে কেন? মুমূর্ষুর কানে নবজীবনের আশার বাণী শুনিয়ে প্রকৃতির এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

প্রভাতে, মল্লিকার নির্মাল্যখানি হাতে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম, সে কি-তীব্র আনন্দের আবেগে আমার হৃদয়খানি মাতাল হয়ে উঠল! নবরবি-কিরণের প্রথম চুম্বনে আমার দেহ যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল।

প্রাণপণ শক্তিতে হাত দুখানি তুলে আমার মালাখানি কার গলায় পরিয়ে দিতে গেলাম? কার স্নিগ্ধ বাহুবন্ধনে আশ্রয় নেবার জন্যে আমার শ্রান্ত মাথাটি ধীরে ধীরে নত হয়ে পড়ছিল! কে সে?

আমার বরণমালা যেখানে এসে পড়ল, সে তো আমার প্রিয়ার পুষ্পপেলব কণ্ঠ নয়— সে যে তড়িৎশিখা! আমার মাথাটি যেখানে গিয়ে ঠেকল, সে তো তার স্নেহকোমল বক্ষ নয়— সে যে বজ্রকঠিন পাষাণ-প্রাচীর!

কোথা হতে দারুণ ঝঞ্ঝা উন্মত্ত আবেগে ছুটে এসে আমার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। ঐ যে মরণ-কলরোল, সহস্র ব্যথিতের বুক-ভাঙা আর্তনাদ আমার চারিদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, ওরই মাঝে কি আমার প্রিয়ার মধুর বাণী লুকান আছে? যে-দারুণ আঘাতে আমার হৃদয়খানি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, সে কি আমার প্রিয়ার স্পর্শ?

কোথায় গেল আমার নব মল্লিকার মালা? ঘূর্ণি হাওয়ার আবর্তের সঙ্গে পথের ধূলার মতই কোথায় ভেসে গেছে— কে জানে!

রূপ-রেখা (১৯২২), শিশির

নবকৃষ্ণ ঘোষ

সে-সময়ে বঙ্গভঙ্গ-জনিত আঘাতের প্রতিঘাতে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে এসে স্বদেশী বয়কটের আন্দোলন খুব জোরে চলিতেছিল।

দেবরাজপুরের জমিদার-বাড়ীতে সেদিন মহা সমারোহের বিবাহ। রাজা শিবরতন মিত্রের একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ। শিবরতন নামজাদা রাজা। স্বদেশী বয়কট তাঁহার জমিদারীতে মাথা তুলিতে পারে নাই, সেই-হেতু রাজা-মহারাজ-মহলে তাঁহার অশেষ খ্যাতির। এমন কি এম. এ., বি. এল. পাশ-করা তাঁহার একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রনাথকে ঐ স্বদেশী রোগে ধরিয়াছে জানিয়া তিনি এরূপ কঠোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে পুত্র একেবারে হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল, তিনি পুত্রকে ত্যাজ্য করিয়াছিলেন; পুত্রও অম্লান বদনে পিতার সেই আদেশ, সেকালের রামচন্দ্রের মত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। ঘটনাটা অল্পদিন পূর্বেই হইয়াছিল বলিয়া সেই বিবাহ-উৎসবের বাঁশীর সুরের ভিতর দিয়া কি যেন একটা করুণ রাগিনী বাজিয়া উঠিতেছিল, আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হাহুতাশ বহিয়া যাইতেছিল। আত্মীয়স্বজনে শিবরতনের পত্নীকে ভাগ্যধরী বলিতেছিল, কারণ তিনি দুই বর্ষ পূর্বে ইহলোকত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রিয়পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ সহিতে হয় নাই।

ঠাকুরদালানে বিবাহ হইতেছিল। শিবরতনের এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভবশঙ্কর কন্যা-সম্প্রদান করিতেছিল। দ্বিতলের ছাদে পংক্তিভোজন হইতেছিল এবং উঠানেও উহার উদ্যোগ হইতেছিল।

শিবরতন দ্বিতলের বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধব ও মোসাহেব পরিবেষ্টিত হইয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া আলবোলায় তামাকু টানিতেছিলেন; একে স্থূলকায়, তাহার উপর সেদিন তাঁহাকে একটু অতিরিক্ত চলাফেরা করিতে হইয়াছিল, কাজেই তিনি কিছু 'কাবু' হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময়ে কয়েকজন প্রতিবাসী কন্যাযাত্রীকে সেই বৈঠকখানার সম্মুখের বারান্দা দিয়া ভোজনান্তে যাইতে দেখিয়া শিবরতনকে জনৈক পারিষদ তাহাদের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে ভট্চাজ, খাওয়া-দাওয়া হল কেমন?"

ভট্টাচার্য উত্তর দিল, "খুব হয়েছে মশায়; ভরপুব হয়েছে।"

শিবরতন কহিল, "তবু জিনিসপত্তরগুলো হয়েছে কি রকম?"

আশার আলো (১৯২২), ১

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়া একটা আমি তখন রাগে তিনটা হইয়া ফুলিতেছিলাম। এত রাগ হইতেছিল বাবার উপর! আমার রূপের স্তব, আমার বাবার অতুল ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া শুনিয়া আমার এমনই ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, এই ছাড়া পৃথিবীতে আর যে অন্য কথা থাকিতে পারে, তাহা চট্ করিয়া মনে হইত না। আমাকে সর্বস্ব পণ করিয়া লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইবার ত লোকের অভাব হইত না। তথাপি বাবা কেন ঐ অহঙ্কারী লোকটার নিকট খাটো হইতে গেলেন? বাবা যে রাগের বশে বিজয়বাবুর মামাকে দুটা বেশ শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি খুসীই হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তিনি যেন গিয়া কথাগুলা গরম গরমই তাঁহার ভাগিনেয়কে বলেন। কিন্তু এ-মামাটির প্রকৃতি এতই অদ্ভুত যে, খারাপ জিনিষগুলি তিনি নিজেই হাসিমুখে পরিপাক করিয়া লন; অপরের জন্য তাহার একটা কণাও রাখিয়া দেন না। তাই বিজয়বাবু বাবার কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না; নিজের অহঙ্কারেই মত্ত রহিলেন। পরদিন বিজয়বাবু আমাদের ওখান হইতে চলিয়া আসেন।

সত্য সত্যই সে-সময় মনটা ক্রোধে আক্রোশে যেন ফাটিয়া যাইতে ছিল। লোকটা যদি আর দিন কতকও ওখানে থাকত ত কাহাকেও দিয়া দুটা রূঢ় কথা শুনাইয়া দিয়া হয় ত একটু শান্তি পাইতাম। বিজয়বাবুর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ জন্মে নাই। তাঁহার কথাও আমি ভাবি নাই। মা বাবা যে তাঁহাকে জামাতা করিতে পারেন, এ-কথাটাও মনে উদয়ও হয় নাই। আর কে একজন 'স্টেট-স্কলারশিপ' লইয়া বিলাত যাইতেছেন, বা ইংরাজি সাহিত্যে সে খুব ভাল জানে, ইহাতে কোনো সুন্দরীর যে কিছু লোভ হইবার কথা, তাহা আমি মনেই করি না। কিন্তু আমাকে যে কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, এ কথাটা আমি কোনদিন মনে করিতে পারি নাই। যে-প্রত্যাখ্যানটা বাপের পয়সা থাকিলে কালো মেয়ের ভাগ্যেও বড় একটা ঘটে না, তাহা আমার অনিন্দ্য রূপ ও পিতার অগাধ ঐশ্বর্য লইয়াও সহ্য করিতে হইল! সে-অপমানের আঘাতটা বড়ই লাগিয়াছিল। হয় ত এই লইয়া জীবনে একটা দাগা থাকিয়া যাইত; এমন সময় আমার হৃদয়-গগনে 'বিমল চন্দ্রের' উদয় হইল। রূপে গুণে অনুপম মনের মত স্বামী লাভ করিয়া আমি পূর্বকথা ভুলিয়া গেলাম।

তারপর দশ বৎসর পরে এই দেখা!

কালো বউ (১৯২২), ১

সরসীবালা বসু

স্ত্রীর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ক্রমেই তাঁহার হুঁকার টানের বেগ কমিয়া আসিতেছিল; কথা শেষ হইবামাত্র ঠক করিয়া হুঁকাটি হুঁকাদানের উপর বসাইয়া রাখিয়া রুক্ষ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা বলে কি তোমরা চাও যে মেয়েটার গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিই? রাতদিন তোমাদের টিকটিকিনির জ্বালায় বাড়িতে তিষ্ঠুনো আমার দায় করে তুললে, দেখছি!" স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি স্বামী যে সহসা একটা উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন, সরোজিনী তাহা মোটেই মনে করেন নাই, সুতরাং সকালবেলা আর কথা না বাড়াইয়া তিনি আপনার কাজে চলিয়া গেলেন। বুড়ি যেখানে বসিয়া সূচ-সূতা লইয়া মালা গাঁথা সুরু করিয়াছিল, সেখান হইতে পিতার তীব্র কণ্ঠের ভাষা স্পষ্টই শুনা গেল; একটু আগে যে-তরুণ মুখের দীপ্তি সদ্য-আহরিত শিউলি ফুলগুলির মতই সরস মাধুর্যে পরিপূর্ণ দেখাইতেছিল, চকিতে তাহা মিলাইয়া গিয়া বিমর্ষ ভাব সেই ফুল্ল মুখখানিকে মলিন করিয়া তুলিল। সেই সময় ঠাকুরমা নিদ্রাভঙ্গে তুলসীমূলে প্রণাম করিয়া চৌকাঠে জল দিতে আসিলেন। নাতিনীকে নতমুখে মালা গাঁথিতে দেখিয়া কহিলেন, "ঐ মালা গাথা-ই তোর সার লো! কার গলায় যে দিবি, তা জানি না; তোর মত অপ্সরীর জন্মে কোন্ কার্ত্তিক যে ময়ূরে চড়ে আসবেন, তা মা কালীই জানেন।"

বুড়ি ম্লানমুখে হাসি টানিয়া কহিল, "তোমারই গলায় দেব, ঠাকুরমা; দিব্যি মানাবে, রঙে রঙে মিলে যাবে!"

ঠাকুরমা কহিলেন, "সত্যিই বয়েসকালে এই শুক্নো চামড়ার রঙ ফুলের রঙেরি মতন ছিল লো। এখনো যা আছে, তা যদি তোর চামড়ায় খানিক লাগাতে পারতাম তো কাজ হত! তা তো আর হবার নয়। এখন একটা কাজের কথা বলি, শোন্: এ-বছর বোশেখ মাসে রোগে পড়ে শিবপুজোর তো উদ্‌যাপন করতে পারলি না— তা ঘর বর মিলবে কোত্থেকে? আর সাতদিন বই সংক্রান্তি আসছে; এই সংক্রান্তি থেকে বারোমেসে শিবপূজোর ব্রত নে দেখি; তবে যদি মহাদেবের দয়া করে থুবড়ির প্রতি মুখ তুলে চান! তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে, আর বাপ-মার মুখে তোর স্বচ্ছন্দে ভাতের গরাস উঠছে!"

আহুতি (১৯২২), ১

তখন মা জানকী পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদতে কাঁদতে শিরে কঙ্কণাঘাত করতে লাগলেন। শেষে কেঁদে কেঁদে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন ঠিক করলেন যে, আশ্রম ত্যাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে যাবেন। মেয়েমানুষের মন— অভিমান হলে ত আর রক্ষা নেই। লক্ষ্মণ যখন একটু সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে বেরিয়েছেন, আর রামচন্দ্র ধ্যানস্থ হয়ে তামাকু সেবন করছেন, তখন তিনি গয়নার পুঁটুলিটি বগলে ক'রে আশ্রমের খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। একে জঙ্গল, তায় রাত, তার ওপর স্ত্রীলোক। রাস্তা ভুলে তিনি উত্তর দিকে না গিয়ে একেবারে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধ'রে রাবণ রাজার মুল্লুকে গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে পাসপোর্ট নেই। সুতরাং রাবণ রাজার প্রহরী তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে একেবারে অশোক বনের অবলা-ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে হাজির।

এদিকে রামচন্দ্রের মনে একটু চা খাবার অভিলাষ উদয় হওয়ার যখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল, তখন তিনি দেখলেন যে, জানকীও আশ্রমে নেই, আর উনুনেও আগুন দেওয়া হয় নি। হাহাকার ক'রে তিনি আর্যসম্মত প্রথায় ভূমিতলে মূর্ছা গেলেন। লক্ষণ ফিরে এসে যখন মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে রামের মূর্ছাভঙ্গ করলেন, তখন রামচন্দ্র লক্ষণের গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ভাই লক্ষ্মণ রে, সীতা-বিহনে এই বয়সে বুঝি বা আমার বল্কল পরতে হয়। হয় তুই সীতাকে খুঁজে এনে দে, নয় ত আমার আর একটা বিয়ের জোগাড় কর্।" লক্ষ্মণ আর্যপুত্রকে এই রকম বিহ্বল দেখে হনুমানকে স্মরণ করলেন। হনুমান এসে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই, আমি এখনি এর ব্যবস্থা করছি।"

হনুমানের যে কথা সেই কাজ। তিনি তড়াক ক'রে গন্ধমাদন পর্বতের উপর চ'ড়ে দূরবীনে স্বর্গ মর্ত পাতাল তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন যে, রাবণ রাজার অবলা-ব্যারাকে চেড়ী-পরিবৃতা হয়ে মা জানকী "হা আর্যপুত্র, হা নাথ" ব'লে বুক চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন, "আর আমি বাপের বাড়ী যাব না, আর মাছ খেতে চাইব না!"

উনপঞ্চাশী (১৯২২), আসল রামায়ণ

সুরেশচন্দ্র নন্দী

ওমর খৈয়াম নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির বিবিধ প্রয়োজনীয় ও নয়নাভিরাম রূপরাজির মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিতেন— এত সুন্দর ও প্রয়োজনীয় যে, তাহার মধ্যে অপর উদ্দেশ্যও নিহিত না থাকিয়া পারে না; অথচ তাহারা এতই বিচিত্র যে, মানব-চিত্তের ধারণাশক্তি উহাদিগকে আয়ত্ত করিতেও অক্ষম। বিকশিত গোলাপগুচ্ছ, বীণাকণ্ঠ বুলবুল, নদীতটস্থিত উদ্যান, বহু সন্তানের গরীয়সী জননী ধরিত্রী, গর্জনালোড়িত সাগর, সীমাহারা নীলাকাশ, অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং— সর্বশেষ— মানব স্বয়ং, এই সমস্তই এমনি একটি নিগূঢ় অস্তিত্বের আভাস প্রদান করিতেছে যাহা সমস্তকেই ভরিয়া রাখিয়াছে, সমস্তকেই এক সম্বন্ধসূত্রে বাঁধিয়াছে। কি-উদ্দেশ্যে-আরোপে অনভ্যস্ত সুফী-পদ্ধতির প্রতিকূলে ওমর এ-সমস্তের অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন. একটি উদ্দেশ্যময় পরিকল্পনাকে হিসাবের ভিতর ধরিতে পাইবার আশা রাখিয়াছেন এবং সেই গূঢ় অভিসন্ধি ব্যক্ত করিবার জন্য বারংবার ভগবানের উদ্দেশ্যে দরবারও করিয়াছেন। মানুষের অসম্পূর্ণ শক্তি যে পরিণতিসম্ভাবনাহীন বীজের অনুরূপ হইতে পারে, এরূপ ধারণা তিনি করিতেই পারিতেন না। মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি উচ্চ ও পবিত্র হয়, তবে চিরন্তন ঐশী নিয়ম কেন না তৎসমূহের উপযোগী করিয়া সংঘটিত হইবে! কিন্তু জীবনে তিনি কি দেখিতে পাইতেছেন? জগতে কে যেন তাঁহাকে ছুট করাইয়া আনিল, আবার ছুট করাইয়াই জগতের বাহির করিয়া দিল— তাহাকে পছন্দ-অপছন্দের কোনো অবকাশই দিল না; তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনখানির অভিপ্রায় স্পষ্ট হইতে না হইতেই জগৎ-জীবন হইতে তাঁহাকে ছিঁড়িয়া ফেলা হইল! কখনও আপনার দৌর্বল্যের কখনও বা শক্তির অনুভূতি ঘটিতেছে, অথচ এই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের অধিকার থাকার সহিত ভগবৎ মর্যাদার যোগাযোগটি বুঝিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা কাতর। ফলে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের ভিতর মারাত্মক অপূর্ণতাই তিনি দেখিতেছেন, তবু এইটুকুই বুঝিতেছেন না যে, নিজে সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী না হইলে এরূপ অসম্পূর্ণতার অভিযোগ অসঙ্গত; যেহেতু সীমাবদ্ধ মানব কেমন করিয়া সীমাতীতের ধারণা আশা করিতে পারে? তবে, ঐশী নিয়মের কাল্পিত ত্রুটির বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি-প্রকাশের ভিতর কোনরূপ অশ্রদ্ধ বা রুক্ষ নাস্তিকতার যে আভাসমাত্রও নাই, এইটুকুই ওমর খৈয়ামের বৈশিষ্ট্য।

ওমর খৈয়াম (১৯২২), একাদশ পরিচ্ছেদ: কবি ওমর খৈয়াম

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল; ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি, অমনি রুমালটা বলল, "ম্যাঁও।" কি আপদ! রুমালটা ম্যাঁও করে কেন?

চেয়ে দেখি, রুমাল তো আর রুমাল নেই. দিব্যি মোটা-সোটা লাল টুকটুকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট প্যাট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, "কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।"

অমনি বেড়ালটা ব'লে উঠল, "মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।"

আমি খানিক ভেবে বললাম, "তাহলে তোমায় এখন কি ব'লে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও; আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।"

বেড়াল বলল, "বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।" আমি বললাম, "চন্দ্রবিন্দু কেন?"

শুনে বেড়ালটা, "তাও জানো না?" ব'লে এক চোখ বুজে ফ্যাচ ফ্যাচ ক'রে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললাম, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

বেড়াট খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে— চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা— হল চশমা। কেমন, হল তো?"

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই রকম বিশ্রী ক'রে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ হুঁ ক'রে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব'লে উঠল, "গরম লাগে তো, তিব্বত গেলেই পার।" আমি বললাম, "বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না!"

বেড়াল বলল, "কেন, সে আর মুশকিল কি?"

আমি বললাম, "কি ক'রে যেতে হয় তুমি জানো?"

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, "তা আর জানিনে? কলকাতা, ডায়মণ্ড-হারবার, রানাঘাট, তিব্বত— বাস! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ; গেলেই হল।"

হ য ব র ল (১৯২৩)

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

কুলীদের সঙ্গে তক্‌রার মিটাইয়া আহারের উদ্‌যোগ করা যাইতেছে এমন সময় কেশবিহীন, কুমণ্ডুল হস্তে, গেরুয়া-পরিহিত, দীর্ঘাকার, সহাস্যবদন এক সাধু এই পথে টিহরী অভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছে দেখিলাম। সাধুকে আমরা ডাকিতে কাছে আসিয়া বসিল। টিহরী ছাড়িবার পর রাস্তায় দুই-চারিজন পাহাড়ী স্ত্রী ও পুরুষ ছাড়া আর-লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; সাধুকে পাইয়া আমরা তাহাকে নানান প্রশ্ন আরম্ভ করিলাম। সাধু বলিয়া ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া তাহার সহিত আলাপ করি নাই। আজকালকার ইংরাজী-শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবকের সাধুদের উপর যে-অবজ্ঞার ভার আসিয়া পড়িয়াছে, আমরা সে-ভাবের হাত এড়াইতে পারি নাই। আমাদের বিশ্বাস: গেরুয়াধারী সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে অধিকাংশই ভণ্ড ও জুয়াচোর, পেটের দায়ে সাধু সাজিয়া লোক ঠকাইয়া জীবিকা উপার্জন করে। সাধারণতঃ কলিকাতায় বা অপর শহরে ভিক্ষাজীবী যে-সকল সাধু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে উক্তরূপ ভাব হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। আমরা তাহাকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিয়া কিছু আমোদ পাইবার জন্য তাহার সহিত কথাবার্তা সুরু করিলাম, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে কলিকাতার ছাই-মাখা পরচুলধারী শঙ্খ-নিনাদকারী ভিক্ষুক-সন্ন্যাসীর মত মনে হইল না...। লোকটি যেরূপ আগ্রহের সহিত হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বর্ণনা করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। এই হিমালয়ের পথের কষ্ট সহ্য করিয়া যে এরূপ প্রফুল্ল থাকিতে পারে ও এই সব দৃশ্য দেখিবার জন্য যাহার এত আগ্রহ, তাহাকে মনে মনে সাধারণ জটাধারী অপেক্ষা উচ্চে পদ দিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের 'বয়' মটনের সিদ্ধ পা বাহির করিয়া ফেলিল; তাহা দেখিয়াই সাধুটি বিদায় লইলেন। আমার তাহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য কিছু পয়সা দিতে চাহিলাম, কিন্তু আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত আত্মগরিমাকে যথেষ্ট আঘাত করিয়া সে বলিয়া গেল, পয়সায় তাহার আবশ্যক নাই, ভিক্ষা তাহার বৃত্তি নহে। সাধু-সন্ন্যাসী যে পয়সা দিলে লইতে চাহে না, তাহা আমি এই প্রথম দেখিলাম।

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী (১৯২৩), টিহরী হইতে ভরলানা

চরণদাস ঘোষ

অমল এতক্ষণ যে-অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিল, বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহা অবিকল মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। তাহার পিতার তখন আর কিছুই ছিল না, ছিল কেবল শীর্ণ কলেবরখানি; তাতে মাংসের লেশমাত্র ছিল না, শুধু কয়েকখানি ঢেউ-খেলান স্পন্দিত হাড়মাত্র বৃদ্ধের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছিল। অমলকে দেখিয়া বৃদ্ধ চিনিতে পারিলেন না; একজন প্রতিবেশী তাঁহাকে অমলের আসার কথা জোর গলায় বলায় বৃদ্ধ একবার তাঁহার স্নেহের দুলালের পানে চাহিলেন। অমল দেখিল, সে-দৃষ্টিতে ব্যগ্রতা নাই, জ্যোতিঃহীন মুখখানির উপর এক ঔদাস্যের ছোপ লাগিয়া রহিয়াছে। যে-পিতা একদিন পুত্রকে দেখিবামাত্র পুলকে আত্মহারা হইতেন, ভগবানের কাছে আশীর্বাদধূলি ভিক্ষা করিয়া লইয়া পুত্রের মাথায় নিয়তই তুলিয়া দিতেন, যে-পিতা আর-একদিন 'জমিদারে পিতা' হইয়া পুত্রকে কত মানসম্ভ্রম দেখাইয়া চলিতেন, সেই চিরপরিচিত অমলের পিতা কি এই! ইনি যে কোন্ সমাধিপ্রাপ্ত উদাসীন যোগী-ঋষি! পিতার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়াই অমলের চোখ দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। অমল পিতার বিছানার পাশে বসিয়া ডাকিল, "বাবা!" স্বর শুনিয়া বৃদ্ধ যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন, চাহিয়া দেখিলেন: পায়ের গোড়ায় অমল। বলিলেন, "কেন, ফেলতে এসেছিস?" তাঁহার অন্তঃস্থল-মর্মস্থল সেই মুহূর্তে অভিমানে ভরিয়া উঠিয়াছিল। অমল আর জবাব দিবে কি? সে নতমুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিছানার কাছে, পায়ের তলায় বুকের মাণিককে সে-রকম অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধের রাগ-অভিমান আবার তখনি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাঁহার কোটরাগত চোখ দুটি জলে পুরিয়া উঠিল। তিনি আস্তে আস্তে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া পুত্রের মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, "অমল, বাবা! আমার কি হয়েছে, দেখ্। আমি আর বাঁচব না।" বলিয়া গায়ের জামা খুলিয়া তাঁহার অস্থিচর্মসার বুকখানি দেখাইলেন। অমল আর বলিবে কি? শুধুই তাহার অন্তরের উচ্ছ্বাস চোখ দিয়া উপছাইয়া উপছাইয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, "কাঁদিসনে; যা, কাপড়-চোপড় ছাড়্। বৌমা ভাল আছেন তো?" তৎপরে একজন প্রতিবেশীকে বলিলেন, "তোমরা আর আমার অমলকে দুটো ভাত দিয়ো— কাল বৌমাকে নিয়ে আসব।"

সুহাস (১৯২৩)

লীলা দেবী

গৃহস্থের ঘরে কর্মের অভাব হয় না সত্য; কিন্তু হতভাগ্য দগ্ধললাটে যেদিন হইতে বিধাতা বৈধব্যদুঃখের দুরপনেয় কালিমা পরিলেপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই যে তাহাকে সকল কার্যের অধিকার হইতেই বিচ্যুত করিয়াছেন!

সেই অবধি অপত্যহীনা বালবিধবার নিজের সংসারের কাজ তো নিশ্চিহ্ন-রূপেই ধুইয়া মুছিয়া ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পরেও তো সে ভাসুর ও জায়ের সংসারে তংাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া নানা কার্যেই ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু প্রাক্তন যে তাহাতেও বাদ সাধিলেন! তাহার মত অলক্ষ্মী দুর্ভাগিনীর হাতে কাজের ভার দিয়া সংসারের মঙ্গলামঙ্গলকে নিশ্চিতরূপে এড়াইয়া চলিতে কোনও গৃহিণীই পারেন না। তাহা ছাড়া জায়ের নিজের সংসার নিজে করিয়া যত সুবিধা সঙ্কুলান হয়— হাজার আপনার হইলেও— পরের হাতে কি ঠিক সেই কাজটি হইয়া থাকে? আর বেঠিক না হইলেও যাঁহাদের সংসার, তাঁহাদের যে কিছুতেই সেটিকে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সেই সকল অনধিকার কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নিত্যনূতন অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ যতদিন শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের শোকাতুর জীর্ণ দেহমন লইয়া তাহার সেবায় সে এমনিভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল যে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রির অবসরে যখন সে উপাধানে ক্লান্ত মাথাটি রাখিত, তখন একটা সুবিমল আত্মপ্রসাদের সুগভীর শান্তিতে এমনই ঘুমাইয়া পড়িত যে, কোথা দিয়া যে এত বড় রজনীর প্রহরগুলা মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া যাইত, তাহা সে ভাবিতে যাইয়া নিজের মনেই স্বস্তির হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। কিন্তু পিতৃমাতৃতুল্য সেই দুইটি নরনারী যেদিন তাহাকে অকূলে ভাসাইয়া তাহার ভক্তিপ্রণোদিত সেবাযত্ন অগ্রাহ্য করিয়া অন্য কোনও উচ্চলোকে চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে ধ্রুবার পক্ষে তাহার নিজের ব্যর্থ দেহমনটাকে ক্রমাগত অনুদ্দিষ্ট বিফলতার সহিত টানিয়া টানিয়া বেড়ান যেন একেবারেই তাহার সামর্থ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই কোনরূপ দায়িত্বহীন, কর্মহীন, অবলম্বনহীন জীবনটা কেবলমাত্র নিদ্রা, ভোজন ও পরচর্চারূপ খোস গল্পে কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছিল না।

ধ্রুবা (১৯২৩), প্রথম পরিচ্ছেদ

বিপিনবিহারী গুপ্ত

আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আচার্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়ের মুখ হইতে পুরাতন কাহিনী শুনিবার জন্য তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া কুশল-প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন: "এখন আর আমি সকালে-সন্ধ্যায় বেড়াইতে পারি না; শরীর বড় দুর্বল। তুমি আমার কাছে আমাদের দেশের পুরাতন কথা শুনিবার ইচ্ছা কর; কিন্তু আমি কখনও বাহিরে কাহারও সঙ্গে মিশি নাই, বিশেষ কিছু বলিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না; তবে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে যে খুব বেশী পরিবর্তন হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি।

"তখন একান্নবর্তী পরিবার খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। ভাই-ভাই যে শুধু একত্র থাকিত, তাহা নহে; বেশ সদ্ভাবে থাকিত। প্রীতির বন্ধন বাস্তবিক খুব শক্ত ছিল। পরস্পর কলহ করিয়া আদালতের আশ্রয় লওয়া কাহারও কল্পনায় স্থান পাইত না। বিষয়সম্পত্তি লইয়া যেদিন প্রথম আদালতে মোকদ্দমার কথা শুনিলাম, সেদিন আমার প্রাণে যে কি আঘাত লাগিল, তাহা তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। আমারই আত্মীয়দিগের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছেদ প্রথম দেখিলাম।"

আচার্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আস্তে আস্তে ইংরেজি ভাষায় তিনি এই পুরাতন সমাজের অবস্থার বিবৃতি করিতে লাগিলেন, কারণ আমাদের কথোপকথনের প্রারম্ভেই মিঃ এণ্ড্রুজ আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মিঃ এণ্ড্রুজও নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: "আপনার পিতামহকে মনে পড়ে কি?"

আচার্য মহাশয় বলিলেন, "মনে পড়ে বৈ কি! আমি তখন ছয়-সাত বছরের ছেলে ছিলাম। সে-বয়সে তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোনও নিজের অর্জিত জ্ঞান নাই; তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত যাহা কিছু জানি, তাহার অধিকাংশ পরের নিকট হইতে শোনো। তিনি ইয়োরোপে গিয়া ফরাসী অভিজাতবর্গের মধ্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বিলাসিতা আমাদের দেশের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে খুব বেশী ছিল। বড়লোকদের যেন একটা ধারণা ছিল যে, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া খুব খরচ করিতে পারিলেই সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। কে কত বেশী খরচ করিতে পারে, এই লইয়া যেন পরস্পরের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।"

পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২৩), ১৪

কামিনী রায়

রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি, নারীজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ— এ-সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল যেন বাছা বাছা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেইজন্য ভাব জমাট হয় না, ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্টি ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না।

...কেহ হয়তো মনে করিবেন, আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা, গীতরচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহার লেখনীস্পর্শে শুষ্ক বিষয়ও সরস ও মধুর হয়; যাহা কিছু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়, সঙ্গীতের রূপ ধারণা করে। কিন্তু গীতিরচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্য সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে-রুচির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 'স্কুলের' প্রবর্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিরিস্রোতের কল-কল ধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণের ক্ষণি খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশে, এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য, তাহারও ভুল নাই; কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা— এই সকল দিয়া যে মানবজীবন, তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে, এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।

(মন্মথনাথ ঘোষকে প্রেরিত চিঠি) ১৯২৩

(এম.) মনির হোসেন

গম্ভীর নিশীথে ছাদের উপর বসিয়া দুলিয়া সেতারে গুঞ্জন তুলিতেছিল। আহ্সানের সুকণ্ঠোত্থিত পারসী গজল দুলিয়ার সঙ্গীতকে নবীন মাধুর্যে ভরিয়া দিতেছিল। বিশ্বপ্রকৃতি স্তব্ধ, নিশ্চল। চাঁদ ষোল কলায় সজ্জিত হইয়া দু-একটি তারকাকে সঙ্গে লইয়া কোন দয়িতের সন্ধানে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে তখন মাঝ-গগনে উপস্থিত হইয়াছে। তরল জ্যোৎস্নায় বোনা ওড়নায় সর্বাঙ্গ মুড়িয়া গ্রামখানি সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পুষ্পোদ্যান হইতে ফুলের সুবাস অবিশ্রাম ভাসিয়া আসিতেছিল।

কিছুকাল পরে আহ্সান চুপ করিল। ভাব-বিমুগ্ধা দুলিয়া সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া একমনে সেতার বাজাইতে লাগিল। সঙ্গীতচাতুর্যে বিস্মিত আহ্সান ভাবিল, দুলিয়া এমন করিয়া বাজাইতে শিখিল কোন্ সাধনাবলে?

দুলিয়ার সঙ্গীত প্রকৃতির প্রাণও যেন স্পর্শ করিয়াছে। ঝঙ্কারের প্রতি মূর্ছনার সঙ্গে ঘাটলার পাশের কামিনী গাছটি হইতে ঝুর ঝুর করিয়া ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল। আহ্সান লক্ষ্য করিল, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়ার অন্তরে লুকানো জমাট-করা ক্রন্দন যেন দ্রব্য হইয়া বাহিরে আসিতেছে। ব্যথিত আহ্সান কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "দুলিয়া!" স্বপ্নালোক হইতে যেন দুলিয়া উত্তর করিল, "ভাই সাহেব?"

"তোর দুঃখ কিসের, দুলিয়া?" এ-কথার কোন উত্তর না দিয়া দুলিয়া উদাসভাবে আহ্সানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুলিয়ার দুঃখই বা কিসের, আর সে এত কাঁদেই বা কেন, আহ্সান যে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, তাহা নহে। তিন বৎসর অতীত হইয়া গেলেও আজ আহ্সানের যে সে-বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, তাহা নহে। তিন বৎসর অতীত হইয়া গেলেও আজ আহ্সানের সে-কথা স্পষ্ট মনে পড়িল: তাহার বাপজানের সঙ্গে কি নিয়া অ বনিবনা হওয়ায় দুলিয়ার বাপ— তাহার ফুফা পিয়ারা সাহেব— কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিশাযোগে এ-বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কন্যাশোকে কাতর রহিম খাঁ জামাতা নিরুদ্দেশ হইবার পরে যে-কয়েক দিন জীবিত ছিলেন, সর্বদা পুত্রের হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়াছেন, "দেখ্ জামাল, দুলীর বাপের সন্ধান নিস্— ওকে যেন ঠকাস নি!" বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে পিয়ারা সাহেবের খোঁজ করা দূরের কথা, ও-নামে যে এ-বাড়িতে কেহ বাস করিত, তাহা সকলের মন হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া জামাল খাঁ কড়া হুকুম জারী করিয়াছেন, পিয়ারা সাহেবের নাম যেন গ্রামের কেহ মুখেও না আনে।

অপরিচিতা (১৯২৩), ২

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালের অবস্থা বড়ই সুখের ছিল কল্পনা করিয়া লইয়া ইহার পোষক প্রমাণস্বরূপ বলিবেন: ধরুন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দৃষ্টান্ত: ভূস্বামী-দত্ত সামান্য জমি ও স্ববৃত্তি তাঁহার সম্বল ছিল; উদরান্নের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে হইত না, চাকরীর নিমিত্ত ছুটিয়া বেড়াইতেন না। একান্নবর্তিতার গুণে আত্মীয়স্বজনেরও পালন হইত; অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার চলিত; ছাত্র-পোষণ করিতেন, আশ্রিতকে অন্নদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জমিতে ধান, অন্য শস্য ও কাপাস হইত; তরিতরকারীও বাটিতেই প্রায় জন্মিত; ঘৃত-দুগ্ধের অভাব ছিল না। মোটা ভাত ও মোট কাপড়ের কষ্ট ছিল না। কায়স্থের কথায় পাটোয়ারি হইতে উধ্বর্তন কর্মচারী পর্যন্ত সকলের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দেখাইয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমর্থন চলিবে। কিন্তু সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিষয়ে এই সমালোচক কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন না। ভদ্রলোক সুখে থাকিলেই দেশের অবস্থা ভাল হইল! সেকালের শিল্প বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত লোকের কষ্ট ছিল না, ইহা বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা নিজ নিজ পরিশ্রমজাত দ্রব্যের বিনিময়ে সুলভে শস্য পাইতে পারিত। কিন্তু কৃষিজীবী লোকের বেলায় আর সে-কথা বলা চলিবে না। কবিকঙ্কণের আত্মকথায় দেখা গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মণেরও সর্বথা সুখ ছিল না। কাব্য-কথিত ভাঁড়ু দত্তের শ্রেণীর কৃপা-ভিক্ষার্থী কায়স্থও অনেক ছিল; ঔষধের-থলি-বগলে বৈদ্যরাজ সম্বন্ধেও ঐ কথা। উচ্চজাতির স্বাচ্ছন্দ্য ছিল স্বীকার করিলেও কৃষক এবং শ্রমজীবীর যে সুখ ছিল, ইহা কেহই প্রমাণ করিতে পারিবেন না। যে-কালে টাকায় পাঁচ মণ ধান্য বিক্রী হইত, সাধারণ শ্রমজীবীর মজুরী চার পয়সারও কম ছিল, তখন তাহারা বস্ত্র ও গৃহের উপকরণ যে ভাল করিতে পারিত, তাহা বলা চলে না। বাস্তবিক বিদেশীরা আসিয়া এই শ্রেণীর লোকের কষ্টই দেখিয়াছেন।

মধ্যযুগে বাঙ্গালা (১৯২৩), ষোড়শ অধ্যায়: সাধারণ অবস্থা

বিভূতিভূষণ ভট্ট

বয়স বেড়ে যাচ্ছে, রাজার দাড়িতে পাক ধরেছে, রাণীর চুলে আর তেমন ফণীর মত বেণী হয় না। তবুও একটি নধর শিশুর দেখা নেই। এত বড় রাজ্য, এত ঐশ্বর্য, সবই বৃথা! এমন সময় এক দারুণ সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। সন্ন্যাসী ঠাকুর রাজার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞ করলেন, আর অমনি দেবতার বরলাভ— দশ মাস যেতে না যেতে এক পরমসুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই রাজারাণীর কোল থেকে আরম্ভ ক'রে সারা রাজ্যটা অধিকার ক'রে বসল। কিন্তু অন্নপ্রাশনের সময় আবার সেই দারুণ যোগী এসে এক নিদারুণ কথা বললেন। কি বললেন, শুনুন। বললেন যে, ঐ ছেলের নাকি বড় ফাঁড়া আছে। দশ বছর থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর ফাঁড়া— পঁচিশ বছর পর্যন্ত।

রাজারাণী ত ভয়ে কাঠ। উপায়? উপায়ও হাতে হাতেই ছিল: ছেলেটিকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত সন্ন্যাসী-ঠাকুরের হাতে সঁপে দেওয়া এবং শিশুকলরব-শূন্য সেই বিরাট রাজ্য-মরুভূমিতে স্বামীস্ত্রীতে তৃষিত চাতকের মত বাস করা। রাজারাণী কেঁদেই আকুল। কিন্তু রাণী বুদ্ধিমতী। তিনি ফাঁকি বার করলেন: ''আচ্ছা, দশ বছর পর্যন্ত ত দেখা যাক!''

তা-ই হল। দশ বছর পর্যন্ত সেই রাজকুমার শুক্লপক্ষের চাঁদের মত রাজা-রাণীর অন্তর-বাহির সব আলো ক'রে বাড়তে লাগল। কিন্তু যতই দশম বৎসরটা এগিয়ে আসতে লাগল, ততই একটা বিষম ভয়ে স্বামী-স্ত্রীতে আঁতকে উঠতে লাগলেন। রাজার ছেলের রথে চড়া, ময়ূরপঙ্খী চ'ড়ে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হল, সকলের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ হল, খেলা-ধুলা বন্ধ হল।

রাণী বুদ্ধিমতী; তিনি ভাগ্যকে ফাঁকি দেবার আরও সব ফন্দি বার করলেন... রাজ্যের যত বড়লোকের কুমারী মেয়ে ছিল, তাদের কোষ্ঠী জড় ক'রে তার মধ্য হতে রাজদৈবজ্ঞকে দিয়ে একখানা কোষ্ঠী পছন্দ করলেন। যে-মেয়ের কপালে একেবারে বৈধব্যযোগ নেই এবং কপালে রাজরাণী হওয়া ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই, সেই মেয়েটিকে পছন্দ করা হয় এবং এক মাসের মধ্যেই মহা ধুমধামে নয় বছরের কুমারের সঙ্গে এক চার-পাঁচ বছরের কুমারীর বিয়ে হয়ে গেল।... রাজা হাসলেন, রাণী হাসলেন, মন্ত্রী হাসলেন, পাত্র হাসলেন, কোটাল হাসলেন, সেনাপতি হাসলেন, রাজ্যসুদ্ধ সবাই হাসল। দিন হাসল, রাত হাসল, পথ হাসল, ঘাট হাসল, বন হাসল, উপবন হাসল। সবই হাসল— হাসল না কেবল সেই নয় বছরের রাজকুমারটি।

সপ্তপদী (১৯২৩), প্রেম-সন্ন্যাস

ক্রমে উকিল সাহেবের কাছারির কাজ শেষ হইয়া বাসায় ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল।

এদিকে দিনমণিও সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, কোর্টের দিন নানা রকমের স্বার্থপর লোকগুলো নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ন্যায়কে অন্যায় করিবার অভিলাষে বিচারকের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিবার কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে দেখিয়া মুখ মুচকিয়া বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া এবং ন্যায়-অন্যায়, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সত্য-মিথ্যা, জয়-পরাজয়, ভূত-ভবিষ্যৎ সকলকে উপেক্ষা করিয়া, প্রভুর ইঙ্গিতে অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, স্বর্ণজ্যোতি ছড়াইতে ছড়াইতে পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়া ক্রমশঃ অন্তর্ধান হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই নীল ও লাল সুতায় বোনা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী পরিয়া, নীল রঙের চতুর্দোলা-আরোহণে, ভাব-বিভোর হৃদয়ে সন্ধ্যাবধূ আসিয়া দেখা দিলেন। তাল ও নারিকেল বৃক্ষগুলি দেহরক্ষী সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দলবদ্ধ হইয়া সরস মধুরকণ্ঠে জগৎপাতার মহিমাগীতি গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যারাণীর অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া চলিল। চাঁদ আনন্দে অধীর হইয়া, নববধূর সৌন্দর্যভরা মুখখানি দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, প্রহরী-তালবৃক্ষগণের ফাঁক দিয়া উকিঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং নববধূ-রজনীর বিলম্বে, আগমন-প্রতীক্ষায়, অভিমানে এক-একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। তারাগুলি অবাধ্য বালিকাদলের ন্যায় পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া প্রত্যেকেই আগে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার গুরু গঞ্জনার ভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছে, কখনও বা একটু মেঘের ঝোপ ঝাপ পাইলে তাহার আড়ালে গিয়া লুকাইতেছে।

কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া আনওয়ার আলি খোলা ছাদের উপর আরাম-কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় আকাশ-পানে চাহিয়া ঐ পবিত্র মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া "সোবহান আল্লাহ, বিশ্ব-কারিকর, তোমার কারিগরী কি সুন্দর!" বলিয়া উঠিলেন।

স্বপ্নদৃষ্টা (১৯২৩), তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজশেখর বসু

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে, অন্য জাতির বোধ হয় তত নাই। তথাপি অর্থবিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথর পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণর ভাই ধিরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়— নামের ব্যঞ্জন বা Connotation। যে-সকল নাম অনেক দিন হইতে চলিতেছে, তাহা শুনিলে মনে কোনও রূপ ভাবের উদ্রেক হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়লোক না কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত, সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady-killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধ হয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নাম রূপে গণ্য হইয়াছে; কিন্তু পবননন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালিদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কিন্তু কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে হইবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভাল। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী, কামিনী, সরোজ, শিশির, নলিনী, অমিয় ইত্যাদি নাম পুরুষরা অনেক দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন, এখন আবার কুসুম, মৃণাল, জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামেরই ব্যঞ্জনা লোপ পায় কিন্তু কোমল নারী-জনোচিত নামের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় বাঙালী পিতামাতা পুত্র-সন্তানকে কমলবিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভাল। ঘটোৎকচ বা খড়্গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন, তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিস কোর্টে ওকালতি তাঁহার সঙ্গে সাজে না।

লঘুগুরু, নামতত্ত্ব (১৯২৩)

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দত্তগিন্নী তাঁর শুইবার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। বেলা তখন দেড় প্রহর আন্দাজ হইয়াছে। দত্তমহাশয় ধূলা পায়, ছাতা হাতে, বেকী বেড়া ঘুরিয়া হঠাৎ উঠানের ভিতর দেখা দিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া দত্তগিন্নী চমকাইয়া উঠিলেন, হাতটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, একটা আঙ্গুল একটু কাটিয়া গেল। আঙ্গুলটা আর-এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া গিন্নী বলিলেন, "এ কি, আজই এসে পড়ল?"

দত্তমহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "হাঁ, শালারা সব জোট করেছে, খাজনা দেবে না। তিন দিন ঘোরা-ফেরা ক'রে কিছুই করতে পারলাম না, তাই চ'লে এলাম। দেখি, সান্ন্যালদের সঙ্গে মিলে কিছু করতে পারি কি না।" এই বলিয়া ঘরে বিছানো মাদুরের উপর ছাতাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, চাদর ও গায়ের জামাটা বিছানার উপর ফেলিয়া, তক্তাপোষের উপর বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতে লাগিলেন।

দত্তগিন্নী পিছু পিছু ঘরে গিয়া জামাটা কুড়াইয়া তাহার পকেট হাতড়াইয়া পঁচিশ টাকা সংগ্রহ করিলেন। টাকা কয়টা তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া তিনি ফস করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

গিন্নী বাহির হইয়া গেলে দত্তমহাশয় দরজার কাছে একটু উঁকি মারিয়া দেখিলেন। গিন্নী ততক্ষণে অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া দত্তমহাশয় তাড়াতাড়ি কোমরের কাপড় খুলিয়া একটি গাঁজিয়া বাহির করিয়া এক গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। গাঁজিয়ার মধ্যে প্রায় এক শ খানেক টাকা ছিল।

তারপর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক সাজিতে লাগিলেন। তামাকে আগুন ধরাইয়া দাওয়ার উপর কল্কেটা রাখিয়া তিনি হুঁকার জল বদলাইবার জন্য উঠিতেই তাহার মনে একটু খটকা লাগিল। গিন্নী এই নিশিন্ত মনে কুটনা কুটিতেছিল, হঠাৎ লাউটাকে আধ-কোটা অবস্থায় রাখিয়া উঠিয়া নিরুদ্দেশ হইল কোথায়?

সন্দিগ্ধ চিত্তে হুঁকাটা হাতে করিয়া তিনি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাড়ীর পিছনে বেকী বেড়ার আড়াল হইতে ফিসফিস শব্দে কথা শুনিতে পাওয়া গেল। দত্তমহাশয় নিঃশব্দে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। বেড়ার আড়ালে কি ছিল, স্পষ্ট দেখা গেল না; কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে দত্তমহাশয় একেবারে ফোঁসফোঁস করিতে লাগিলেন।

দত্তগিন্নীর ব্যাপারটা এই। যাহাকে বলে স্বভাব-চরিত্র। সেটা ভাল নয়।

গ্রামের কথা (১৯২৪), দত্তগিন্নী

দিন যায়। রাজকুমার একদিন এক রথে চড়িয়া নগরের বাহিরে বেড়াইতে গেলেন। পথে তিনি দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় শত-শত লোক জমা হইয়াছে। তাহাদের ধারণা, সেই বটগাছে এক দেবতা বাস করেন। তাঁহার খুব প্রভাব: পূজা দিয়া তাঁহার কাছে যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। লোকেরা এই ভাবিয়া ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি কাটিয়া দেবতার পূজা দিতেছে ও মানত করিতেছে। আর ছেলেমেয়ে ধনমান ইত্যাদি, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই চাহিতেছে। রাজকুমার ইহা দেখিয়া রথ হইতে নামিলেন। নামিয়া গাছতলায় গিয়া ফুল-চন্দন ধূপ-ধূনায় ঐ সব লোকেরই মত পূজা করিলেন। তারপর বটগাছকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর মাসে মাসেই তিনি ঐ বটগাছ-তলায় আসিয়া পূজা করিয়া যাইতেন।

কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইলে রাজকুমারই রাজা হইলেন। তিনি রাজ-সিংহাসনে বসিয়া যতদূর পারা যায় ধর্মের সহিত রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার মন হইতে কিন্তু ঐকথাটা চলিয়া যায় নাই: জীববধ করিয়া পূজা করাটা রাজ্য হইতে তুলিয়া দিতে হইবে। একদিন তিনি রাজ্যের মন্ত্রী আর বড় বড় লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা জানেন কি, কিরূপে আমি এই রাজ্য পাইয়াছি?... আপনারা হয়তো দেখিয়া থাকিবেন, আমি মাঝে মাঝে ঐ বটগাছের দেবতাকে পূজা করিতাম, জোড় হাতে প্রণাম করিতাম!" সকলে বলিলেন, "হ্যাঁ, মহারাজ, আমরা তাহা দেখিয়াছি।" রাজা বলিলেন, "আমি সেই সময় দেবতাদের নিকট মানত করিয়াছিলাম, আমি রাজ্য পাইলে তাঁহার পূজা দিব। আমি ঐ দেবতার অনুগ্রহে রাজ্য পাইয়াছি। আমাকে তাঁহার পূজা দিতে হইবে, অতএব আপনারা তাহার আয়োজন করিয়া দিন!... আপনারা ভেরী বাজাইয়া নগরে ঘোষণা করিয়া দিন যে, আমাদের মহারাজ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন ঐ বটগাছের নিকট তিনি মানত করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন মহারাজ হইবেন, তখন তাঁহার রাজ্যের এইরূপ এক হাজার লোকের রক্তমাংস ও হৃৎপিণ্ড দিয়া ঐ দেবতার পূজা দিবেন, যাহারা জীবহিংসা করে, চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, অথবা এই রকম আর সব খারাপ কাজ করে। এইরূপে পূজা করিয়া তিনি তাঁহার মানত শোধ করিবেন।"

মন্ত্রীরা রাজার আদেশ ঘোষণা করিয়া দিলেন; ফলে এই দাঁড়াইল যে, রাজার মানত আর শোধ হইল না।

সেকালের কাহিনী (১৯২৪), ১০, দেবতার মানত

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্বে কত শত বৎসর আমরা মাতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। মা যে আমাদের অন্তরে থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে মঙ্গলের পথে চলিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ-উপদেশ দিয়াছিলেন, অমঙ্গলের পথে অসত্যের পথে চলিবার নিষেধবাণী আমাদের অন্তরে নিয়তই দিতেছিলেন, সে আদেশ-উপদেশ সে নিষেধবাণী আমরা অবহেলা করিয়া শুনি নাই, শুনিতে চাহি নাই। এই যে তিনি আমাদের সম্মুখে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছেন, এই যে চন্দ্রসূর্যের ভিতর দিয়া তাঁহার জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রতিদিন দিনে-নিশীথে আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই যে বাতাসের ভিতর দিয়া তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যক্ষ মূর্তিতে প্রতিমুহূর্তে আমাদের গাত্র স্পর্শ করিতেছে, এই যে সর্বংসহা ও বিশ্বধারিণী ধরণীতে তাঁহার স্বপ্রকাশ মাতৃমূর্তি জীবন্তভাবে প্রতি নিমিষে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে, আর এই যে ভক্তমণ্ডলীর কমনীয় মুখ-জ্যোতিতে তাঁহার অপরূপ রূপ একবারে সাক্ষাৎ করিতেছি, বর্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্বে তাঁহার এই প্রত্যক্ষ মূর্তি আর কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা আমাদের পরম পিতামাতাকে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম। এমন কি তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া আমাদের অন্তরে সকল অমঙ্গলের নিদান, সকল বিষয় ভাবের আকর, তাঁহার প্রতি একটা বিষম অনাস্থা পোষণ করিয়াছিলাম। সেই অনাস্থা পোষণের কারণ সমগ্র দেশটা বলিতে গেলে এক মহা উষরমূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকে অনাচার, কদাচার, নীচের প্রতি অত্যাচার-অবিচারমূলক উপধর্মের রাশি রাশি কণ্টকময় বিষবৃক্ষ সকল গজাইয়া উঠিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। ধর্মের শক্তিময় আহার পাইবার অভাবে দেশবাসীগণ পূর্ব হইতেই যখন আত্মা ও মনের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া বসিল, তখন সমগ্র দেশ পরাধীনতার হস্তে আত্মসমর্পণ্র করিতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিল না। পরে যখন সর্বাঙ্গীণ পরাধীনতা-লাভের ফলে বিষময় কণ্টকরাশির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দেশবাসীগণ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই পরমদেবতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেই শুভ মুহূর্তে ব্রাহ্মসমাজ সুপ্তোত্থিত সিংহের মহাবল লইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সেই উপধর্মের কণ্টকপূর্ণ গুল্মরাজি ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডবিখণ্ড করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত, অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মায়ের মূর্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি (১৯২৪), চতুর্দশ কথা: মাতৃপূজা

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিকেল বেলাটা বাংলার কুললক্ষ্মীদের প্রসাধনের কাল। ইংরেজ অবলারা এই সময় ঘোড়-দৌড় দেয়, মোটর হাঁকায়, সাইকেল চাপে, ক্লাব করে, নাচে ও নাচায়। সুতরাং মোটমুটি আঁচা যায়, পুরুষ যখন কর্মক্লিষ্ট শ্রান্ত ও অবসন্ন, মেয়েদের তখন স্বভাবতই স্ফূর্তি, আমোদ এবং বাহারের পালা। কবিরা বলেন, পুরুষের ভারাক্রান্ত অবসন্নচিত্তের গ্লানি গলাইয়া দিবার জন্যই প্রকৃতির এই সপ্রেম ভবলীলা। দার্শনিক বলে, প্রকৃতি নির্লিপ্তা এবং কতকটা নির্লজ্জা, নিজের ভোগে উদাসীনা, তাই নিজে ভোগে না, পরকে অর্থাৎ পুরুষকে ভোগায়। উদাহরণ— পুরুষ শ্রীমান মনমোহন, ছোট আদালতের কেরানী: সারাদিন খাটিয়া, সন্ধ্যায় হাঁটিয়া বাটী ফিরিয়া, খাটিয়ায় চিৎপাত হইয়া পড়িল; আর প্রকৃতি শ্রীমতী মনমোহিনী সাজিয়া, গুজিয়া, আলতায় ঠোঁট রাঙ্গাইয়া খোলা ছাদে খোলা হাওয়া খাইতে থাকিল। শ্রীমান পুরুষের চিৎপাতকে কুপোকাৎ করিবার জন্যই শ্রীমতীর এহেন উৎপাত। বিলিতি নিদানের বিধান মানো আর না মানো, প্রকৃতির নিয়ম মানিতেই হইবে।

মিষ্টার এস সি মুখার্জি ওরফে বাবু শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তঃপুরেও বিকেল বেলাটা মেয়েরা এইরূপ পেটেন্ট দাওয়াই তৈরি করেন— একটু বেশী ঝাঁজের, কেননা মুখার্জির অবসাদটা কিছু উগ্রতর।

প্রথম প্রথম শ্রীচন্দ্রের লজ্জাবনতা অবগুণ্ঠিতা বধূ স্বামীর ও শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষার আয়োজনে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু শ্রীশবাবু সেবার সে-ঘোমটা স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া প্রাণের আপশোষ মিটাইলেন। বধূও ক্রমে ক্রমে তাহাতে সায় দিলেন। যে রোগের যে ঔষধ।

মিসেস্ পদবীতে আরূঢ়া হইতে যে-সকল বিশেষ উপসর্গের একান্ত প্রয়োজন, মিঃ মুখার্জির মাষ্টারিতে বধূ শনৈঃ শনৈঃ পাশ করিয়া ডিগ্রিসহ উহাতে বহাল হইলেন। এখন মিসেস্ মুখার্জি উল্টিয়া মিঃ মুখার্জির ত্রুটি সংশোধন করিয়া থাকেন।

আদরিণী ননদিনী মঞ্জুময়ী মিসেস্ মুখার্জীর ছাত্রী।

সাত পাক (১৯২৪), ৫

মনোরমা দেবী

আমার ননদ-দেবর প্রভৃতি সকলেই যে আমায় জ্বালাতন করিত এমন নহে; শ্বশুর-শাশুড়ী কিন্তু আমায় বড় স্নেহের চক্ষে দেখিত না। পিতামাতার আদরে, ছেলেবেলা হইতে বড় কোন কাজকর্ম করিতাম না, সর্বদাই বই নিয়া থাকিতাম; যেখানে ভগবানের সম্বন্ধে কথা বা গল্প হইত, সেখানে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একাগ্র মনে শুনিতাম। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সংসারের নানারূপ জ্বালাতে মন দিনরাত দগ্ধ হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে সংসার হইতে পালাই পালাই মন হইতে লাগিল।... প্রাণের মধ্যে একটা এমন কষ্ট হইত, সর্বদা ভগবানকে মনে পড়িত এবং প্রাণ ভরিয়া ডাকিতাম, "আমায় এ-কষ্ট হইতে উদ্ধার কর!"

সুখে দুঃখে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, জগতে পরের দুঃখকষ্ট কে বোঝে? সকলেই নিজের সুখশান্তি লইয়াই ব্যস্ত। একদিন সাংসারিক কথায় মনোমালিন্য হওয়াতে মনের উপর বড়ই আঘাত লাগিল। মনে হইল, আর সংসারে থাকিয়া কাজ নাই। কিন্তু সন্তানের স্নেহে মন আবদ্ধ, যাইতে পারিল না, মায়ামুগ্ধ মন আবার সংসার করিতে লাগিল।

সেই সময় হইতেই ধর্মভাব অন্তরে জাগিয়া উঠিল। একটা অজানা পথে প্রাণ যাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল, "কোথায় আমার আরাধ্য দেবতা, কোথায় তুমি?" এইরূপ দিনরাত ভগবানকে মনে পড়িতে লাগিল। একদিন রাত্রিকালে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি, সহসা ঘরের মধ্যে নীলবর্ণজ্যোতি গোলাকাররূপে ভাসিয়া উঠিল, তন্মধ্যে দেখিতে পাইলাম ওম্ লেখা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবের যুগলমূর্তি জড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে জ্যোতি বিলীন হইয়া গেল। সেইদিন হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবের মূর্তির উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি উৎপাদন হইল। সেই সময় আমার মেজ ননদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক তীর্থদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার মুখে সাধু মহাত্মাদের কথা শুনিয়া বড়ই সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল। স্নেহময়ী মেজ ননদ আমার ধর্মভাব জাগরূক করিবার সহায় হইলেন। তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন; তাঁহার সহিত আমরাও বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। মদনমোহনদেবের মন্দিরে গিয়া সেই চিরবাঞ্ছিত মূর্তি দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলাম।

নারীকল্যাণ বা আমার জীবন (১৯২৪), প্রথম পরিচ্ছেদ

কাক ও কোকিলের মধ্যে যে কেন এত শত্রুতা, তা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যেন দা-কুমড়ার সম্বন্ধঃ কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। কাক খুব দুষ্ট, কিন্তু-এক সময়ে দুষ্টামি-বুদ্ধিতে কোকিল কাকদেরও হারাইয়া দেয়...

কোকিলেরা যে-রকমে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, তাহা বড় মজার। তোমরা বোধ হয় জানো, আমরা যে-সব চক্চকে কালো কোকিল দেখিতে পাই, তাহাদের সকলেই পুরুষ-কোকিল এবং যাহাদের আমরা তিলে কোকিল বলি, তাহারাই স্ত্রী-কোকিল। স্ত্রী-কোকিলেরা বড় লাজুক। যখন কালো পুরুষ কোকিলেরা কু-উ কু-উ শব্দে গান জুড়িয়া দেয়, তখন তিলে স্ত্রী-কোকিলেরা পাতার আড়ালে লুকাইয়া দিন কাটায়। ইহাদের গলার সুর থাকে না, দেহে রূপও থাকে না। ভাঙ্গা গলায় তাহারা একপ্রকার সে-শব্দ করে, তাহাতে যেন কান ঝালাপালা হয়। যাহা হউক, ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী-কোকিল পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকে, পুরুষ-কোকিল তখন কাকের বাসার কাছে ডালে বসিয়া কু-উ কু-উ করিয়া গান জুড়িয়া দেয়। কাকেরা কি-রকম অদ্ভুত পাখী, তাহা তোমরা জানো। পৃথিবীর কোনো জিনিসকেই তাহারা ভালো করে মনে করে না। ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইলে বা দুজন লোক দৌড়াইয়া চলিলে বা উঁচু গলায় চীৎকার করিলে, তাহাদের মনে সন্দেহ হয়, আর কা-কা করিয়া আরো দশটা কাককে ডাকিয়া একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়। তাই নিজের বাসার কাছেই কোকিলের গান শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারে না, বাসার বাহিরে আসিয়াই কা-কা করিয়া কোকিলকে ডাড়া করে। কিন্তু কোকিল চালাক পাখী--- কাকের ডাড়াতে ভোলে না। কিক্ কিক্ কুক্ শব্দ করিতে করিতে সে আগে আগে উড়িয়া চলে, এবং কাক দূরে থাকে, তখন স্ত্রী-কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া চট্ করিয়া পালাইয়া যায়। কেবল ইহাই নয়; যদি বাসায় ডিম পাড়িবার জায়গা না থাকে, তবে স্ত্রী-কোকিলেরা দুই-চারটি কাকের ডিম মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই খালি জায়গায় ডিম পাড়ে।

পাখী (১৯২৪), কোকিলের দুষ্টামি

সুরুচিবালা রায়

সাড়ে চারটায় বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। বাস্ খানিকটা দূরে থাকিতেই চোখে পড়িল, কি-একখানা বই হাতে বাহিরের বারান্দায় আবার সেই প্রমোদবাবু!... কেন জানি না, কিন্তু ইহাকে দেখিয়া আমার মনটি কোনদিনই খুব সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিত না; বাস্‌টি নিকটে আসিতেই প্রমোদবাবু সরিয়া পার্শ্বস্থিত দাদার ক্ষুদ্র বৈঠকখানাটিতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি প্রতি মুহূর্তেই আমার কেবলই তাঁহার সম্মুখে পড়িবার আশঙ্কা হইতে লাগিল।

বাস্তবিক আমার আশঙ্কাটা নিতান্ত অমূলক হইল না; দোতালায় উঠিবার পথে সহসা সিঁড়ির সামনে সহাস্যবদন প্রমোদবাবু আসিয়া আমায় অভিবাদন জানাইলেন এবং একটা হাস্যজনক গম্ভীরভাবে করজোড়ে বলিলেন, "আমার একটা আর্জি পেশ করতে হবে, হুকুম হোক!"

এই অভিনয়দক্ষ সুন্দরী সুবেশী যুবকটির উপর আমি মনে মনে যতই বিরূপ হই না কেন, প্রতি কথা এবং প্রতি চালচলনে ইহার যে-অদ্ভুত ভঙ্গিমা প্রকাশ পাইত, মনে মনে তাহাকে আমি যথেষ্ট আমোদই উপভোগ করিতাম; হাসিয়া বলিলাম, "কেন, কি চাই?"

উপর হইতে উচ্চধ্বনি শুনিলাম, "যুঁই, এসেছিস? বাঁচিয়েছিস, বাবা! আমার র‍্যাপারটা যে কোন্ ট্রাঙ্কে রেখেছিস, শীগগীর বার ক'রে দিয়ে যা! ওধারে আমার মিটিংয়ের সময় হয়ে গেল; ঘণ্টাখানেক ধরে খুঁজে খুঁজে এক্কেবারে হয়রান!"

আমি হাসিয়া প্রমোদবাবুর পানে চাহিয়া বলিলাম, "আপনি কি বলছিলেন?" এবারে পরিহাস ত্যাগ করিয়া অনেকখানি অনুনয়ের ভাব আনিয়া প্রমোদবাবু বলিলেন, "চল, বায়স্কোপে যাই।"

"বায়স্কোপ?" "হ্যাঁ, আপত্তি আছে কিছু?" "আর কে যাবে?" "আবার কে? তুমি, আমি, আর মাসিমা।" এই তুমি-আমির উপর ইচ্ছা করিয়াই যে-জোরটুকু দিলেন, আমার তাহা ভাল লাগিল না। বলিল, "আচ্ছা, আগেতো উপরে যাই।"

উপরে, সম্মুখের ঘরটিতে পা দিয়াই প্রথমে যে-দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার গায়ের সমস্ত রক্ত নিমেষে মাথায় উঠিয়া পড়িল: আলনার উপর ধোপা-বাড়ির পাট-করা চাদরখানা রাখিয়া দাদা রাজ্যের যত বাক্স ট্রাঙ্ক ব্যাগ খুলিয়া ঘরময় জামাকাপড় ছড়াইয়া চাদর খুঁজিতেছে! পুরুষ-মানুষের চোখ কি ভগবান উল্টা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? আশ্চর্য বটে!

ঝরাপাতা (১৯২৪), ১

হয় ত আপনারা ভাবিয়াছিলেন যে, নবাব-প্রধান লক্ষ্ণৌ সহরে নবাবোচিত সৌজন্য ও আতিথ্যের বিপুল ব্যবস্থা হইবে। সত্য, এককালে লক্ষ্ণৌ নগর প্রচুর সুখ-স্বচ্ছন্দতা, মনোরম সৌজন্য ও অপরিমেয় আতিথেয়তার জন্য সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল; একদিন সচ্ছল-অবকাশ-সাপেক্ষ মধুর সঙ্গীতে এ-দেশ ঝঙ্কৃত হইত; ঐশ্বর্য-পরিপুষ্ট শিল্পকলা এ-দেশে সকলের মনোরঞ্জন করিত; লক্ষ্ণৌর রাজগণ যদিচ কুক্কুট কিম্বা বটের সংগ্রামে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, রাজ্যশাসন বিষয়ে তদ্রূপ দক্ষ ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশই উদারচেতা ও মুক্তহস্ত ছিলেন। মচ্ছিভবনের অধিষ্ঠাতা নবাব আসফদ্দৌলা সাহেবের দানশীলতা এরূপ জনবিশ্রুত ছিল যে, এখনও চৌকের কোন কোন বণিক প্রাতে আপনার বিপণিদ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার পূর্বে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে, "জিসকো ন দে মৌলা, উসকো দে আসফদ্দৌলা" অর্থাৎ যাহাকে ভগবান বঞ্চিত করেন, আসফদ্দৌলা তাহাকেও বঞ্চিত করেন না।

জনপ্রবাদন আছে যে, লক্ষ্ণৌর উদ্যানের অপূর্ব শোভা ও পুষ্পসম্পদ ভূতকালে নন্দনেও এত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, একদা নন্দনের উদ্যানপালক লক্ষ্ণৌর কুসুমসম্ভারের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন; এবং দেবগণের অনুমতিক্রমে কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া মর্তভূমের উদ্যানভূমি লক্ষ্ণৌ নগরে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু অনতিকাল পরে স্বর্গরাজের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন, "দেবরাজ, ক্ষমা করিবেন, আমি আর নন্দনে ফিরিতে পারিব না।" কিন্তু যেদিন হইতে লক্ষ্ণৌর বাদসাহ "ছোর চলে লক্ষ্ণৌ নগীর", যেদিন হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শোষণ-যন্ত্র এ-দেশের বক্ষস্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেদিন হইতে কমলার অনুকম্পা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বিশ্বকর্মাও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার দারিদ্র্য সেই অপহৃত বৈভবের অনুকৃতি মাত্র। 'ভুখা নবাবের' দেশে ভুখা বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণ তাই এত সাজসজ্জাহীন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (১৯২৫)

ইমদাদুল হক

বোগ্‌দাদে এক খলিফা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মনসুর। তিনি কবিতার বড়ই ভক্ত ছিলেন। কবিতা তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, একবার শুনিলেই তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত। মনসুরের এক গোলাম ছিল, সেও কম পাত্র নয় দুইবার শুনিয়া সে কবিতা মুখস্থ করিয়া ফেলিত। আর ছিল এক বাঁদী, সে তিনবার শুনিয়া মুখস্থ করিতে পারিত।

মনসুর কবিতা ভালবাসেন শুনিয়া রাজ্যের যত কবি ভাল ভাল কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিতেন। সেই সব কবিতায় বেশীর ভাগ কেবল খলিফার রূপগুণের প্রশংসাই থাকিত। কে কত বেশী তারিফ করিয়া মনসুরকে খুশী করিতে পারেন, তাহাই লইয়া কবিদের ভিতর দস্তুরমত আড়াআড়ি চলিত। সকলের আশা, খলিফা খুশী হইয়া ভারি রকম পুরস্কার দিয়া ফেলিবেন।

খলিফা কিন্তু বেজায় চালাক লোক ছিলেন। তিনি দেখিলেন, কবির দল যে-রকম লম্বা লম্বা তারিফের কবিতা শুনাইতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে সকলকে পুরস্কার দিতে গেলে দুদিনেই ভাণ্ডার উজাড় হইয়া যাইবে। তাই তিনি এক ফন্দি আঁটিলেন। বলিয়া দিলেন যে, যে-কেহ নূতন কবিতা লিখিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে সেই কবিতার ওজনে খাঁটি সোনা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কিন্তু পুরস্কার পাইতে হইলে একেবারে টাটকা নূতন কবিতা চাই। পুরাতন বাসি কবিতা— অর্থাৎ অপর লোকে জানে এমন হইলে কিছুই পাইবে না।

এই কথা শুনিয়া দেশে যত কবি ছিলেন, ছোট, বড়, মাঝারি, সকলেই খুব ভাল ভাল নূতন কবিতা রচনা করিবার জন্য প্রাণপণে মাথা ঘামাইতে বসিয়া গেলেন। দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। ওজনে ভারী করিবার জন্য খুব মোটা মোটা অক্ষরে, ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিতে লাগিলেন। ক্রমে দেশের যেখানে যত কাগজ ছিল, সব সেই কবিদের নূতন কবিতায় ভরিয়া উঠিতে লাগল। কাগজের টান দেখিয়া দোকানদারেরা কাগজের দাম ডবল, চার ডবল করিয়া তুলিল, তবু কবিরা দেদার কাগজ কিনিয়া অজস্র নূতন কবিতা লিখিতে লাগিলেন...। সকলেই লিখেন আর মনে মনে ভাবেন, এবারে আর পুরস্কার যায় কোথায়! একেবারে টাটকা নূতন কবিতা— ইহার একটি কথাও অন্য কবিতায় নাই। আর ওজন কি! এক-একজন এত লিখিয়া ফেলিয়াছেন, যে দশ-বিশটা উটেও তাহার সমস্তটা বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। ওঃ! কত সোনা পাওয়া যাইবে! কবিদের মন আনন্দে নাচিতে লাগিল। কিন্তু খলিফা সে তাহাদের জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন, বেচারারা তাহা জানিত না।

বোগ্‌দাদী গল্প, কবির চালাকি (১৯২৫)

কাজে-অকাজে গ্রামের শুচিবায়ু গৃহিণীরা পর্যন্ত তাহাকে ডাকিতেন— নাড়ু কুটিতে, খই-মুড়ি ভাজিতে, নারিকেলের তক্তি বানাইতে, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পান সাজিতে, তরকারি কুটিতে এবং সহস্রবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যে কেষ্টর মাকে বাদ দিবার উপায় ছিল না। গ্রামের সমস্ত ভদ্র-গোষ্ঠীর সেও একজন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজে-কর্মে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার পূর্ব ইতিহাস যেন লোকে ইচ্ছা করিয়াই বিস্মৃত হইয়াছিল।

কিন্তু খুব অধিক দিনের কথা নহে, এই সামান্য নারীকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য গ্রামের মহামহিম মোড়লমণ্ডলীর শিখা ও হুঁকা একসঙ্গে সবেগে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা উঠিলেই সতীসাধ্বী গৃহিণীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মৌখিক শতমুখী প্রহারে বেচারাকে জর্জরিত করিতেন; গ্রামের রসিকা যুবতীরা গোপনে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিত। গাঁয়ের গিন্নীবান্নী বউ-ঝি, সমাজপতি ও ছেলে-ছোকরাদের এই নিন্দা সমালোচনা ও রূঢ়বাক্য যখন পল্লবিত হইয়া কেষ্টর মা-র কর্ণগোচর হইত, সে তখন যথাসম্ভব আপনার সামান্য কুটীর-প্রাঙ্গণে আত্মগোপন করিয়া অতীব সঙ্কোচে দিন কাটাইত, পারতপক্ষে কখনই ঘরের বাহির হইত না। কোনও দিক দিয়া কোনও প্রকার বাধা না পাইয়া হতাশ হইয়া নিন্দুকেরা ক্ষান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইল, অন্তত তাহার নিন্দা আর কেহ করিত না, তবু এই প্রৌঢ়া 'বিধবা' নারী তাহার অভ্যস্ত সঙ্কোচটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। শুভ্র বসনখানিতে নিরাভরণ দেহ যথাসম্ভব আবৃত করিয়া মূর্তিমতী ব্যথার মত সে গ্রামের ঘরে ঘরে নিতান্ত প্রয়োজনের কালে বিচরণ করিত। কিন্তু তাহার যত জ্বালা ছিল কেষ্টকে লইয়া। সে মাঝে মাঝে অন্তর্ধান হইয়া গোপন গৃহকোণ হইতে এই প্রৌঢ়াকে টানিয়া আনিয়া গ্রামের পথে বাহির করিয়া দিত; আহারের সময় গৃহে না ফিরিয়া এই অসহায়া নারীকে লোকের দ্বারে দ্বারে, ছেলেদের আড্ডায় আড্ডায় খোঁজ করিয়া ফিরিতে বাধ্য করিত। যখন গ্রামে তাহার সম্বন্ধে নিন্দার বান ডাকিত, সমাজপতিরা মাথা মুড়াইয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যহ নূতন করিয়া রায় দিতেন, তখনও তাহাকে যথেষ্ট সঙ্কোচ লইয়া কেষ্টর সম্বন্ধে তদারক করিতে হইয়াছে। কালপ্রবাহে যে-নিন্দা সমাজ বিস্মৃত হইল, কেষ্টর মা নিজে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই... আপনাকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখিয়াই যে পরের কাজ করিয়া যাইত।

আকাশ-বাসর, কেষ্টর মা (১৯২৫)

মহেশ্বরীর ক্রোড়ে কানাইলাল দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই মহেশ্বরীর গুণে মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রথম এই বাগ্দীর ছেলেকে একান্তরূপে বক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিলেন, তখন একটা অতৃপ্তিও উত্তেজনা বিরাট রূপ লইল না বটে, তবে প্রতেকেরই অন্তর ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। আবার যখন সকলেই দেখিলেন, এই নিষ্কামা রমণী নিজের নিষ্ঠাটুকু পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া নিঃসহায় ছেলেটিকে কেমন মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, তখন আবার অনেকেই আপন আপন মনের গ্লানি ভুলিয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন...

বালকের অজ্ঞতার ফলে মহেশ্বরীর কাজ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত। হয়ত পূজায় বসিয়াছেন— মাকে চমক দিবার জন্য চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া পিছন হইতে সে জড়াইয়া ধরিল। পূজার উপকরণ ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত, স্নান করিতে হইত, আবার পূজায় বসিতে হইত। নানা কাজে প্রায়শঃ এইরূপই ঘটিত। শৈলবালা বিরক্ত হইত, সুখেন্দু ঐ কচি শিশুর উপর তর্জন গর্জন করিতেন। মহেশ্বরী সম্মুখে আসিয়া পড়িতেন। বলিতেন, "এ-খোয়ার আমার। আমি যদি সাতবার ডুব দিতে পারি, তোমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান ভাগে ভাগে থাকুক, কিন্তু প্রেম-প্রণয় স্নেহ-ভালবাসা যেন এক জায়গায় এক হয়ে এক ধারায় মিলে যায়।"

সকলে চুপ হইয়া যাইতেন। আবার বাধিত। লোকে তাঁহাকে ছাড়িয়া কানাইকে লইয়া পড়িত। তিনি যেখানে থাকিতেন, ছুটিয়া আসিতেন। "ওকে ধমকাচ্ছিস? বালকের স্বভাব ত এই। ও কি এই বয়সে তোমাদের মত বুঝে সুঝে চলবে? তবে আর সংসারে ছেলেমানুষের ঠাঁই থাকত না!"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল যখন একটু একটু বুঝিতে সুঝিতে শিখিল, তখন তাহার মনে সর্বদা এই প্রশ্ন উঠিত: কেন সে রান্নাঘরে, পূজার ঘরে ঢুকিতে পায় না? সে ছুঁইলে জলটুকু কেন ফেলিয়া দিতে হয়? কেন তাহার খাওয়া সন্দেশ বলাইকে দিয়ে পারা যায় না? বলাই ছুঁইলে ত কোন জিনিসই ফেলা যায় না। তাহার এঁটো সন্দেশ সে ত বেশ অনায়াসে খায়; তবে তাহার বেলা সবই উল্টা কেন?

বামুন-বাগ্দী (১৯২৫), তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুভাষচন্দ্র বসু

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়াছিল। সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাংলার নরনারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। কি-উপায়ে এই কার্য সুসম্পন্ন হতে পারে, এটাই বাঙ্গালার সর্বপ্রধান সমস্যা...

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছে, এস। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার, তবে তোমরা এগিয়ে এস, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষপর্যন্ত জীবিত থাক, তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশ-সেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহলীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীরসন্তান হও, তবে এগিয়ে এস...

ওগো বাংলার যুবকসম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজ আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যেখানে যে-অবস্থায় আছ, ছুটে এস। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্বগগনে ভারতের ভাগ্যদেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিশর পর্যন্ত আজ জগৎসভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তোমরা কি এখনও মোহাবেশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠ, জাগ, আর বিলম্ব করলে চলবে না! অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিককে গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে-পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনের রাখী পরিধান করে মায়ের মন্দির দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা কর যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘোচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্ব ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।

তরুণের স্বপ্ন, দেশের ডাক (১৯২৫)

দীনেশরঞ্জন দাশ

পার্বতী মন্দিরতলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, দেবতার গৃহপ্রাচীরের গাত্রলগ্ন বনলতার শ্যামল পত্রের উপর সূর্যাস্তের কিরণ-লেখা হরিৎবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের সোপানশ্রেণী বহিয়া মানব-মানবীর যাতায়াতের একটা শৃঙ্খলিত গতিস্রোত দীর্ঘ ও বিচিত্র বর্ণ লইয়া নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে। যে তাহার অঞ্চলের অন্তরালে আবরিত কুসুমগুচ্ছের থলাখানি যুক্ত অঞ্জলির উপর ধারণা করিয়া উচ্চারণ করিল: "দেবতা, তুমি কি সত্যই সুখী?"

পার্বতী সারাদিন ধরিয়া একটি করিয়া ফুল বাছিয়া রঙের পর রঙ মিলাইয়া, কিশলয়ের আস্তরণের উপর ফুল সাজাইয়া একখানি ফুলের থালা প্রস্তুত করিয়াছে। বহুদিন হইতে তাহার মনে হইত, মানুষের দুঃখ দেবতা বুক পাতিয়া লন, কিন্তু দেবতা তাঁহার দুঃখের বোঝা কোথায় রাখেন? তাহার নিজের যাহা দুঃখ ছিল, তাহা সে ভুলিয়া যাইত; দেবতার দুঃখের ভাগ বুকে টানিয়া লইতে চাহিত। এমন করিয়া সে অনেক দুঃখকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, আপনাকে অন্তহীন সুখের প্রলোভন হইতে বাঁচাইয়া দেবতার দুঃখে দুঃখ মিলাইবার পরম শান্তিতে ডুবাইতে পারিয়াছিল।

আজ তাই তাহার মনে হইয়াছিল, এই অর্ঘ্যবিহীন ফুলের থালাখানি দেবতার মন্দিরে স্থাপন করিয়া আসিবে। আরতির পর শূন্য মন্দিরে বসিয়া দেবতা যখন মানুষের নিবেদিত অর্ঘ্যস্তূপের দিকে চাহিয়া থাকবেন, তখন কুসুম-থালিকার উপরও তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে। সেই অবসন্ন অবসরে বুঝি একক নিঃসঙ্গ দেবতার সমস্ত বেদনা তিনি ঐ থালিখানির উপর রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিবেন।

পার্বতী তাহার নিজের মনের মত করিয়াই এ-সকল কথা ভাবিল। আর ভাবিল, একটু দেরী করিয়াই সে মন্দিরে যাইবে। তাই মন্দিরের সোপান-তলে আসিয়াও সেই শূন্য-অবসরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার সম্মুখ দিয়া শত শত মানুষ কি-কামনা বুকে ভরিয়া সে মন্দিরের দিকে চলিয়াছে, তাহা সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। সেই মুহূর্তেই যাহারা মন্দির হইতে ফিরিতেছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, না জানি উহারা কি লইয়া ফিরিল।

মাটির নেশা (১৯২৫, পার্বতী)

ধীরেন্দ্রনাথ পাল

বাবুর নাম প্রণয়ভূষণ, বাড়ী ভাটপাড়ায়, পদবী গোস্বামী, বয়স আন্দাজ চব্বিশ। অঙ্কশাস্ত্রে মমতা না থাকায় তাঁহাকে পাসের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অন্য কার্য না জুটায় অগত্য গ্রন্থকার হইতে হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, "প্রণয়বাবু দ্বিতীয় কালিদাস!" আবার কেহ কেহ বলেন, "প্রণয়ভূষণ বাঙ্গালা ভাষার সপিণ্ডকরণ করিতেছেন!" সে যাহা হউক, আমাদের সে-কথার প্রয়োজন কি? তবে আমরা এই পর্যন্ত জানি যে প্রণয়ভূষণবাবুর সখের গ্রন্থকার-ব্যবসায় লোকসান ভিন্ন লাভ হয় নাই; সুতরাং বলিতেই হইতেছে, প্রণয়ভূষণের পুস্তক বড় অধিক লোকের করস্পর্শ করে নাই; করিলেও পয়সা দিয়া পুস্তক ক্রয় করে নাই। গ্রন্থকার-বৃত্তিতে কিছু হয় না দেখিয়া প্রণয়ভূষণ ক্রমে ভারত-উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন। প্রথমে বৃদ্ধ পিতার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা কিছু কম বলিয়াই বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে অনন্যোপায় দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, বৃদ্ধ নিতান্ত মূর্খ নহে। তিনি বাটী আসিলেন। অনেক কষ্টে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে পিতাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তখন তাঁহার পিতা রামব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "বাপু, তোমার যে এত শীঘ্র জ্ঞানোদয় হইল, ইহাই আমার কালীলাভ; তুমি যে একটা বিধাতা মাগী বে কর নি, ইহাই আমার প্রয়াগ; আর তুমি যে চোখ বুজিতে শিখিয়াও তাহা খুলিতে শিখিয়াছ, ইহাই আমার হরিদ্বার।" পিতা বহুক্ষণ ধরিয়া আব কথা কহেন না দেখিয়া প্রণয়ভূষণ কহিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?" বৃদ্ধ দুই-তিনবার কাসিলেন, তৎপর বলিলেন, "তোমার অতিবৃদ্ধ পিতাঠাকুর যাহা করিয়াছেন, তুমিও তাহাই কর।" সে কি, প্রণয়ভূষণ ভাল বুঝিলেন না; ভাবিলেন, পিতা ব্যাখ্যা করিবেন, কিন্তু বৃদ্ধ আর কোন কথাই না কহিয়া পুঁথি পাঠ করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালীর লীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী দেবী

সুন্দর সুসজ্জিত শয়নকক্ষে সুদৃশ্য মনোহর পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেনিত শয্যায় গীতা শয়ন করিয়া আছে। সে মুদ্রিত নয়নে ভাবিতেছিল, "কই, তিনি তো এখনো এলেন না। হায় ভগবান! আবার স্বামীর এ কি ভাব-পরিবর্তন! যে আমাকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত থাকিতে পারিত না, সেই তিনি আজ প্রায় এক মাস হইল আর ভিতরে আসেন নি, রাত্রিও বাহিরে যাপন করেন! স্বামী, আমি তো তোমাকে ছাড়া শয়নে স্বপনে কিছুই জানি না। আমার জ্ঞানতঃ আমি তোমার প্রতি কোনও অন্যায়চরণ করি নাই; করিলেও তো তুমি আমার সব অপরাধ মার্জনা কর। হে আমার দেবতা! আমার সকল দেবতার সার, তুমি কেন আমার উপর বিরূপ হইলে?"

নরেন্দ্রনাথ প্রায় এক মাস হইল গীতার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। গীতার অশ্রুতে বন্যা বহিলেও নরেন্দ্র তাহার সহিত বাক্যলাপ করে নাই। নরেন্দ্র একজন পাচক রাখিয়াছে, সে দাসীর দ্বারা বাড়ির ভিতর বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, গীতা রন্ধন করিলে সে আর এ-বাড়িতে জলগ্রহণ করিবে না। অগত্যা গীতা পাচক রাখিতে অমত করে নাই, সে তবুও নরেন্দ্রকে আড়াল হইতে দেখিতে পাইতেছে, ইহাই এখন তাহার লাভ। গীতার কত সাধের কত যত্নে রক্ষিত উদ্যানে আগাছা জন্মিয়াছে, তাহারা সযত্ন-সজ্জিত পরিচ্ছন্ন গৃহদ্বার অপরিচ্ছন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গীতা সংসারের কিছুই দেখে না, দাস-দাসীরাই সর্বেসর্বা। গতকল্য রাত্রি হইতে গীতার একটু জ্বর হইয়াছে। সে ক্লান্ত মনে ক্লান্ত দেহে শুইয়া ছিল। সহসা চাকর রঘুয়া আসিয়া বলিল, "মা, বাবু আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন।"

গীতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিল। তাহাতে লেখা আছে: "গীতা, তোমাকে আর কি লিখিব? লিখিবার কিছুই নাই যে। তোমাকে আমি প্রাণাপেক্ষা বিশ্বাস করিতাম, সেই তুমি এরূপ বিশ্বাসঘাতিনী হইবে, তাহা জানিতাম না। যাক্, সে-কথার আর প্রয়োজন কি? তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে লইয়া সুখে থাক। আমি বাঁধা, আমি দূরে চলিলাম, তোমার সুখে থাক— ইহাই প্রার্থনা। ইতি নরেন্দ্রনাথ।"

গীতার কম্পিত হস্ত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল। সে ভাবিতেছিল, ইহা কি সম্ভব? তাহার স্বামী কি তাহাকে কখনও এরূপ অবিশ্বাস করিতে পারে?..." গীতার হৃদয় যেন শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইতে লাগিল। সে রঘুয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়? বাবুকে ডাক।" রঘুয়া বলিল, "বাবু চলে গেছেন।"

বাসর ঘরে (১৯২৫), চার

বীরেন্দ্রকুমার দত্ত

আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। সাত পুরুষেরও অধিক হইতে আমাদের গৃহে টোল চলিয়া আসিতেছে। কত বড়লোক, সুদখোর পেটমোটা মহাজন, তৈলাক্তদেহ জমিদার, উষ্ণীষধারী ব্যাকুব রাজা আমাদের বংশের শিষ্য! পিতৃদেব পণ্ডিতপ্রবর রাসমোহন সার্বভৌমের নাম কে না জানে?

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশ, কিন্তু দরিদ্র নই। কল্যাণপুরের রাজবংশের সঙ্গে আমাদের বংশসৌভাগ্য বিশেষরূপে জড়িত। রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ পিতার মন্ত্রশিষ্য। অর্থাভাব তো নাই-ই, বরং আমরাও সঙ্গতিসম্পন্ন তালুকদার; বৎসরে নানাদিক হইতে হাজার চারি টাকা আয় হইয়া থাকে।

এমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বংশ এ গোঁড়ার দেশেও বিরল। সন্ধ্যা, মন্ত্র, জপ, তপ, ব্রত, পূজা-পার্বণ সকল সময়ই লাগিয়া আছে। পিতৃদেবের প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা। তাঁহার প্রভাবে শুধু আমাদের গ্রামে কেন, পাশ্ববর্তী কয়েক গ্রামেই ব্রাহ্ম-খৃষ্টানী নব্য-মতালম্বীরা এ-পর্যন্ত মাথা উঠাইতেও সাহস পায় নাই।

ঋজু, দীর্ঘদেহ, প্রশান্ত-কপাল, দাড়ি-গোঁফ-কামানো, গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন ভাবোদ্দীপক মূর্তি কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে...

অধিক বয়স পর্যন্ত সুসন্তানের মুখ দেখেন নাই বলিয়া বাবা-মা বিশ্বেশ্বরের কাছে ধন্না দিয়া পড়েন। দেবতা প্রসন্ন হইলেন; শুভক্ষণে নয়নাভিরাম আমি ধবাতলে অবতীর্ণ হইলাম। কাশীর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া আমার নামকরণ হইল কাশীকুমার। কিন্তু হায়! তাঁহারা যদি জানিতেন, এই কাশীকুমার নামে তাঁহাদের পবিত্র বংশে কে জন্মগ্রহণ করিল, তাহা হইলে বোধ হয় তখনি নবকুমারের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেন।

বংশের নিয়মানুসারে পাঁচ বৎসর বয়সেই কলাপাতায় হাতে-খড়ি হইল। তাহার পর যে সাত বৎসর গিয়াছে, তাহার ভিতর গাছে চড়িতে, পাখির বাসা ভাঙ্গিতে, সাঁতার কাটিতে, নারিকেল চুরি করিতে সমবয়স্ক সকলকে পরাস্ত করিয়াছি, কিন্তু লেখাপড়া? ওটা হয় নাই। আমার দোষ? তাহা নয়, দোষ ঐ সংস্কৃত ভাষার ও দোষ তাহার কন্যা বাঙ্গালা ভাষাটার! অর্ধশত অক্ষর তো আছেই, তাহার উপর তাহাদের ঘাড়ে পিঠে লেজে যেখানে সেখানেই বা কত অক্ষর, য-ফলা, ল-ফলা, ম-ফলা, কত কি!

অতি কষ্টে 'দ্বিতীয় ভাগ' শেষ করিয়াছি, অমনি বাবা বলিলেন, "চাণক্য-শ্লোক আর মুগ্ধবোধ মুখস্থ কর!"

ওলট-পালট, কুলাঙ্গার

কিরণশঙ্কর রায়

ক্ষেমী ছিল আমার পিসতুতো ননদ। আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ছিল বারো, তার বয়স পাঁচ। একে তো বয়সে ছোট, তারপর শাসন ও শিক্ষার গুণে তার দেহ-মন বয়সের চেয়েও ছোট মনে হত। আমার পিসশাশুড়ী প্রায় সমস্ত জীবনটাই বাপের বাড়িতেই কাটালেন; ক্ষেমীরও জন্ম হয়েছিল আমার শ্বশুরবাড়িতে এবং এখানেই সে মানুষ হয়েছিল। ক্ষেমীর না ছিল রূপ না ছিল কোন গুণ। রং কালো, মাথায় চিরুণী বড় একটা পড়তই না; হাতের নখগুলি যেমনি বড় তেমনি ধারালো এবং ময়লায় পরিপূর্ণ; কাপড় নোঙরা. হাতে দুগাছা কাচের চুড়ি— এই ত রূপ। গুণেরও সীমা ছিল না: দুবেলা খাবার সময়ে ছাড়া তাকে বাড়িতে দেখা যেত না। কোথায় যে সে ঘুরত, কোন আমবাগানে, কাদের কুলগাছের তলায়, কোন্ অজাত-কুজাতের ঘরে, তা আমরা জানতাম না; এবং জিজ্ঞেস করলেও সে তার কোন জবাব দিত না, তবে মাঝে মাঝে আমটা জামটা সঞ্চয় ক'রে বাড়ি ফিরত। বাড়িতেও তার দুরন্তপনার অন্ত ছিল না। শুনতাম, ক্ষেমী নাকি ঠাকুরঝিদের পুতুল খেলনা চুরি করত, রোদে-দেওয়া কাপড় ছিঁড়ে দিত। শাশুড়ী বলতেন: "ও-মেয়ে ভারি বজ্জাত! ওর পেটে কেবল শয়তানী বুদ্ধি, ও আমার সুরো-নিরোর (ঠাকুরঝিদের) ভাল কাপড়, ভাল জামা দেখলে হিংসেতে জ্বলে!" মনে আছে আমের দিনে ঠাকুরঝিরা আম খেতে বসেছে, আমি জল থালা এগিয়ে দিচ্ছি, শাশুড়ী আম টুকরো টুকরো ক'রে ঠাকুরঝিদের থালায় দিচ্ছেন। ক্ষেমী পাড়া বেড়িয়ে এসে চুপচাপ ক'রে পাশে বসল: তারপর যখন দেখল, তার আম পাবার কোন আশু-সম্ভাবনা নেই, তখন নিজের আঁচল থেকে কাঁচা অর্ধেক-খাওয়া একটা আম বের ক'রে তা-ই খেতে লাগল এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে ঠাকুরঝিদের আম-খাওয়া দেখতে লাগল। ও-পাড়া থেকে বোসেদের বড়বৌ এসেছিলেন, তাঁর মেজ জা-র সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে. সেই কথা বলতে। তিনি বললেন, "হ্যাঁলো, কাকেও কিছু খেতে দেখলে অমন ক'রে তাকিয়ে থাকিস কেন? অমন করতে নেই।" বড় জা বললেন, "ওর স্বভাব ঐ। যে যখন খাবে, ওর ব'সে ব'সে দৃষ্টি দেওয়া চাই, যেন ওকে কেউ কিছু খেতে দেয় না।" ক্ষেমী উঠে বাগানের দিকে চলল। শাশুড়ী ডাকলেন, "ক্ষেমী, আয়, আয়! এই আমটা নিয়ে যা!" ক্ষেমী সেদিকে দৃকপাত না ক'রে ধীরে পাদবিক্ষেপে অন্দরের বাগানের দিকে চ'লে গেল। শাশুড়ী বললেন, "ভয়ানক জেদী মেয়ে! একগুঁয়ের হদ্দ!"

সপ্তপর্ণ, ক্ষেমী

ছাতে এসে এইবার ঘোড়ায় উঠলুম। ভোঁদড়দাদা কিংখাবের সাজ পরানো এক শাদা রামছাগলে চড়ে, রাজচ্ছত্র মাথায় দিয়ে, ঝমঝম করে আমার পাশে এসে ভোঁ ভোঁ করে ভেঁপু বাজিয়ে দিলে।

সেনাপতি সাহেব তার ঘোড়া ছুটিয়ে ছাতের মাঝখানে গিয়ে একটা মস্ত পাঁচরঙা নিশেন নেড়ে চিৎকার করে হুকুম দিলে, "মার্চ!" অমনি চারদিক থেকে কাঁসর-ঘন্টা বাজতে লাগল। মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি করলে, আগে-আগে কাঠবেড়ালীর দল ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চলল, তার পিছনে লাঠি-সোঁটা নিয়ে একদল কুনো বেড়াল মার্চ করে চলে গেল। সবশেষে আমরা...

প্ল্যাটফরমে এসে ঢোকামাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল। বুদ্ধিমন্ত গম্ভীরমুখে ভোঁদড়দাদার কাছে এসে বললে, "মহারাজ, অদ্য আমাদের ট্রেন মিস হইয়াছে।" এই দারুণ সংবাদে আমরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে প্ল্যাটফরমে বসে পড়লুম...।

একদল চীনে-সাহেব প্ল্যাটফরমের নিচে ঠুক-ঠাক করে কি মেরামত করছিল। বুদ্ধিমন্ত তাদের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি বকাবকি করলে...। চীনে-সাহেবেরা ছুটে গিয়ে কারখানা-ঘর থেকে কতকগুলি লোহার চাকা গড়িয়ে এনে প্ল্যাটফরমের দুদিকে দড়াদড়ি বেঁধে বড় বড় পেরেক ঠুকে স্ক্রু কষে দিয়ে বললে, "সব ঠিক হো গিয়া। যাও, অব্ ঘন্টি মারো।" বুদ্ধিমন্ত ছুটে গিয়ে ইষ্টিশানের লোহার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজিয়ে একটা সবুজ নিশান নাড়তে লাগল।

কমলাপুলির প্ল্যাটফরম এতক্ষণ মড়ার মতো লম্বা হয়ে পড়ে ছিল, ঘণ্টার আওয়াজ পেয়ে ধড়ফড় করে জেগে উঠে গড়গড় করে ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে পড়ে ভয়ানক রকম তর্জন তর্জন করে যুগযুগান্তর ছুটে চলল। আমরা যে যার বিছানা পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলুম। দুদিকে কত ফুলের বাগান, কত ধানের আর পাটের খেত, পাহাড়-পর্বত— কত কি দেখতে দেখতে চলেছি।

সুয্যিমামা ঠিক সেই সময় দিনের খাটুনির পর এক ধাপ এক ধাপ করে মেঘের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি যাচ্ছিলেন। আমাদের প্ল্যাটফরমের ভীষণ গর্জন তাঁর কানে গেল, নিচের দিকে চেয়ে মনে করলেন, বুঝি একটা অজগর সাপ তাঁকে গিলতে আসছে। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল, তাড়াতাড়ি একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে একখানা কালো মেঘের কম্বল মুড়ি দিয়ে ফুস করে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। চারদিকে অমনি অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

ভোঁদড় বাহাদুর (১৯২৬)

কিন্তু একদিন, সে-ও খুব বেশী দিনের কথা নয়, এই পূজায় বাঙলায় যে-আনন্দবাজার বসত, বাঙলার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রাসাদে অট্টালিকায়, পর্ণকুটীরে, হাটে হাটে, মাঠে বাটে আনন্দের যে-মেলা চলত, তার তুলনায় আজকালকার উৎসব উৎসবই নয়। সে বড় তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে নদী বক্ষ আলোড়িত ক'রে থেমে গেছে, এখন জেরের হিসাবে গোটাকতক ছোট-খাট ঢেউ ওঠে মাত্র। এখন টাকার দাম ক'মে গিয়েছে, তখনকার চার আনার জিনিষে এখন দেড় টাকা দিতে হয়; ভক্তির গঙ্গায়ও ভাঁটা পড়েছে, স্বল্পে এখন কেউ সন্তুষ্ট নয়, যে-ধরণের নূতন কাপড় নূতন জুতা পেয়ে আমরা ছেলেবেলায় আহ্লাদে আটখানা হয়েছি, এখনকার অনেক চাকরও সে-রকম কাপড় পেলে মুখ সিঁটকায়। তার উপর আবার রেল-কন্‌সেসনে আফিম ধরিয়ে মৌতাত জমিয়ে দিয়েছে; এখন ষষ্ঠীর সকাল হতে না হতেই বাস্তু ছেড়ে অনেক বাঙালী ছুটে বেরোন, অষ্টমীর খিচুড়ীভোগ আনন্দ ক'রে খাওয়ার চেয়ে হাওয়া-খাওয়া এখন তাঁদের বেশী মিষ্ট লাগে; টেলিগ্রাফে মাকে পাঠান বিজয়ার প্রণাম, পরিবারকে আলিঙ্গন।

হায় রে সেকাল! সত্য সেকালের সবই কিছু ভাল নয়, কিন্তু এই পূজার বেলায় সত্যি সত্যিই বলি "হায় রে সকাল!" তখনকার পূজা এক-একটা দিক থেকে দেখলে জাতির প্রাণে এক-একটা ভাব যেন ফুটে উঠেছে দেখা যেত। নবমী পূজার কাদা-মাটিতে আর বিজয়ার লাঠি তরোয়াল খেলাতে বাঙালীর প্রাণের বীরভাব বর্ধিত হয়; আগমনী-গান শুনলে ও অন্তঃপুর পানে চাইলে বঙ্গনারীর প্রাণে মাতৃভাবের যে-মধুর বিকাশ প্রকটিত হয়, আর সদর আপ্যায়নে আদান-প্রদান অন্যকে আনন্দ প্রদান ক'রে নিজে আনন্দিত হবার যে-অতুল সুখ, তা হৃদয়ে অনুভূত হত।

আঃ সে কি আমোদ-ই গিয়াছে! কি সে সব বড় বড় মহানৈবেদ্য সাজানো, ঘড়ি-ঘণ্টা-কাঁসরের কি সে ভক্তিমাখা ঝন্‌ঝন্‌! বাজাতে বাজাতে ঢাকিঢুলিদের উন্মাদ নাচন! ধূপ-ধূনার গন্ধে সুরভিত পল্লীতে পল্লীতে কি যে খাওয়া-দাওয়া, বাঁধা-ছাঁদা! ফলারে ও দক্ষিণায় ব্রাহ্মণের আনন্দ, নূতন কাপড় প'রে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের আনন্দ, নৈবেদ্য বইতে বইতে পাড়ার ছেলেদের ব'কে-ঝ'কে চাকরদের আনন্দ, খোকাকে পোষাক পরিয়ে বাবার আনন্দ... বাড়ী বাড়ী খই-মুড়কী নারিকেল লাড়ু পেয়ে ভিখারীর আনন্দ, বড়বাজারে গাঁট কেটে চোরের আনন্দ...

কৌতুক-যৌতুক (১৯২৬), কৌলিক দুর্গোৎসব

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

দেশত্যাগ করিবার সময় বোম্বাই হইতে জাহাজ গ্রহণ করিয়া ইউরোপ হইয়া আমেরিকা আসি। জাহাজেই অনুসন্ধিৎসু মন অনেক বিষয় অনুকরণ করিয়া ফেলিল, সেইজন্য যখন নিউইয়র্কে অবতরণ করিলাম, তখন আর 'জংলী' নহি। পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, যাহারা স্বাধীন আমেরিকার প্রধান নগর নিউইয়র্কে অবতরণ করে, তাহাদের স্বাধীনতার প্রতিমূর্তির সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। জাহাজে বন্দরের সম্মুখে এই প্রতিমূর্তির কাছে আসিবামাত্র আরোহীরা কোলাহল করিতে লাগিল। এই আরোহীদের মধ্যে ইউরোপের পতিত ও গরীব শ্রেণীর সভ্যের দলই বেশী। তাহাদের কাছে আমেরিকা স্বাধীনতার দেশ, তথায় যাইলে মানুষ স্বাধীনতার বাতাসে নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়, তাহার আত্মা পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং রাস্তায় সোনা কুড়াইয়া পাওয়া যায়! অতএব দীন দুঃখী ঔপনিবেশিকদের কাছে এই প্রতিমূর্তি স্বাধীনতার দেশে অভ্যর্থনাকারী বলিয়া পরিগণিত হওয়া আশ্চর্য নহে। যখন আমি এই প্রতিমূর্তির সম্মুখ দিয়া জাহাজে গমন করি, তখন কত আশা, কত ভরসা ও উদ্যম লইয়া নিউইয়র্কের বন্দরে নামিয়াছিলাম! কিন্তু ছয় বৎসরের পরে আবার যখন সেই প্রতিমূর্তির সম্মুখ দিয়া আমেরিকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তৎকালে মনের ভাব অন্যপ্রকার হইয়াছিল, তখন এই স্বাধীনতার প্রতিমূর্তিকে কুহেলিকা বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমেরিকা ত্যাগ করিবার কালে যখন দেখিলাম নিউইয়র্ক-বন্দরে বৈদ্যুতিক আলোকে চারিদিক ঝলসাইতেছে আর স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি আলোকহস্তে স্বাধীনতার দেশে রাস্তা দেখাইতেছে, সেই সময়ে আমেরিকার ধূলি পা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই মূর্তির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বলিলাম, "হে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি, তুমি শঠ ও প্রবঞ্চক; লোকে তোমাকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করে, তুমি তাহা নহ!" পরে ইউরোপে কোন আমেরিকান বন্ধুর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মূর্তির অন্তর ফাঁকা আর মুখ ইউরোপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; তুমি ইহার কাছ হইতে আর বেশী কি চাহ?" অর্থাৎ এই মূর্তি আমেরিকার স্বাধীনতার সিম্বল্ স্বরূপ, কিন্তু তাহা অন্তঃসারশূন্য, কারণ আসলে সে-দেশে মানবের স্বাধীনতা নাই, আর ইউরোপকে আদর্শ করিয়া সে তাকাইয়া আছে। যে-স্থানের মানব মুক্ত নয়, তাহার কাছ হইতে মুক্তির বাণী কি-প্রকারে শ্রবণ করিবে ও সে-দেশে তাহা কি প্রকারে অনুভব করিবে?

আমার আমেরিকায় অভিজ্ঞতা, প্রথম ভাগ (১৯২৬), সূচনা

সত্যচরণ চক্রবর্তী

বাঙ্গালীর ছেলে হয়েও বাঙ্গালার জল-হাওয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় কম। আমি মানুষ হয়েছিলুম কাকিমার কোলে মান্দালয়ে। সেখানে নদীর উপরেই, সহর থেকে অনেকখানি দূরে আমাদের মস্ত কাঠের কারবার ছিল; তা দেখাশুনা করতেন কাকা। বাপ-মা হারিয়ে আমি ঠাকুরমার সঙ্গে সেইখানে গিয়েছিলুম। কাকার দুটি সন্তান হয়ে মারা গিয়ে আর ছেলেপুলে হয় নি বলে কাকা-কাকীমা দুজনেই আমাকে ভালবাসতেন প্রাণের মত। আর একজন আমাকে খুব ভালবাসত, সে আমাদের কারবারের বখরাদার কাফাতো সাহেব।

কাফাতো আফ্রিকা দেশের লোক। কাকা একবার কি-কাজের জন্য জনকতক সাহেবের সঙ্গে সেই অঞ্চলে গিয়ে, ফিরে আসবার সময়ে ওই মানুষটিকে সঙ্গে করে এনেছিলেন; সেই থেকে সে, ছায়ার মত, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতেই থাকত। কাফাতো শুধু কারবারের বখরাদার নয়, সে আমাদের ভাই, বন্ধু, অভিভাবক, গোলাম, নফর, সর্বেসবা! বলতে কি, সেখানে আমাদের যা কিছু পশার-প্রতিপত্তি হয়েছিল, তা কেবল ওই কাফাতোরই জন্য।

কাফাতো বিরাট পুরুষ— যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া, যেমন জোয়ান তেমনি কালো, তেমনি ভয়ানক, ঠিক যেমন যমের দূত। তাকে দেখে ভয় পেত না, এমন লোক সে অঞ্চলে ছিল না। তার উপর কাণ্ড কারখানাগুলোও তার আশ্চর্য! সে যখন বুনো হাঁস কি মুরগি শিকার করে তাদের তপ্ত রক্ত চোঁ চোঁ করে চুমুক দিয়ে খেল, তখন তাকে রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই মনে হত না। তাছাড়া তার গায়ে যেমনি অসীম বল ছিল, সাহসও ছিল তেমনি অসীম। পঁচিশজন জোয়ান যে-কাজ করতে হিমসিম খেয়ে যেত, কাফাতো তা একাই চোখের পলকে শেষ করে দিত। কাজেই লোকে তাকে ভয় না করে তাকতে পারত না।

কিন্তু কাফাতো ছিল ঠিক যেন মাটির মানুষ; এমন ভালোমানুষ হাজারে একজন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ! মনটি ঠিক শিশুর মতই সরল, উদার, পবিত্র; অতি বড় শত্রুকেও হাসতে হাসতে ক্ষমা করত, পরের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতে কাতর হত না।

রাক্ষসের দেশে (১৯২৬)

দাদা দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও বারই তাঁহার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নাই। প্রথমা স্ত্রী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দাসী গুণবতী ও অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগিনী ছিলেন। সুললিত কবিতা রচনায় তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেন। বিবাহের পর কয়েক বৎসরমাত্র জীবিত থাকিয়া একদিন দাদার একটা অতি তুচ্ছ কথায় তিনি অভিমানে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে দাদা হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইয়াছিলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাছারির ছুটিতে যখন তিনি তোড়কণায় যাইতেন, প্রথম কয়েক মাস সায়াহ্নে সকলের অজ্ঞাতসারে শ্মশানে গিয়া পত্নীর চিতাভস্মের উপর পড়িয়া ক্রন্দন করিতেন। বাবার অনুরোধে দাদা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, কিন্তু এ-বিবাহে তাঁহার আদবেই ইচ্ছা ছিল না।

প্রথমা পত্নীর বিষয় উল্লেখপূর্বক তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন, "স্ত্রী স্বামীর কত তিরস্কার-ভর্ৎসনা হাসিমুখে সহ্য করে। আমি একরকম পরিহাসচ্ছলেই তাকে বলেছিলাম, ছেলে পাবার আশাতেই পুরুষমানুষ বিবাহ করে; নয়তো কে আবার একটা মেয়েমানুষের ভার আজীবন ঘাড়ে নেয়?" আমার এই সামান্য কথাটুকু স্ত্রীর সহ্য হল না; দলায় দড়ি দিয়ে মরল। যা হোক, ভগবান আমার অদৃষ্টে যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ভালই! আমি ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর হাঙ্গামা হয়তো পোয়াতে পারতাম না। আমি বই পড়ে যে-সুখ পাই, তার তুলনা নাই। এ-সুখ তাহলে আমি পেতাম না। বই পড়ে আমি ভুলতে পারি না, এমন শোক-দুঃখ, কষ্ট-যন্ত্রণা পৃথিবীতে কিছুই নাই। তবে ছোট ছোট ছেলের সঙ্গে খানিকটা করে কথা কইতে বড় ভালবাসি..."

দাদা বলিতেন, "পৃথিবীতে তিনটি জিনিস আমি বড় ভালবাস; সর্বপ্রথম বই, তারপর ফুল ও কুকুর।" তাঁহার কুকুরের প্রতি ভালবাসার কথা কি বলিব!... তিনি বাহির হইতে গৃহে ফিরিলে অমনি কুকুরগুলি গিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্বক লেজ নাড়িয়া তাঁহার চারিধারে যখন ছুটাছুটি করিত, লাফাইয়া তাঁহার গায়ে উঠিত যাইত, তখন তিনি বলিতেন, "দেখ, দেখ এদের কি আহ্লাদ! যাদের ছেলেপিলে নেই, তারা কুকুর পুষুক! সমান সুখ পাবে। বরং কুকুর চিরদিন এমনিভাবেই প্রভুকে ভালবাসে। আজকাল ছেলে ষোল পেরুলেই বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চায় না। এই দুঃখেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত লোকেও বলতেন, মহাপাপ করলে তবে ছেলের বাপ হয়।"

দাদার কথা (১৯২৬), ত্রয়োবিংশ অধ্যায়: দাম্পত্য জীবন

রামেন্দু দত্ত

ভরা-যৌবনে কিষণ মাহাতোর স্ত্রী বিধবা হইল। মাতৃহীন ভূখ্‌লী সেই যে কখন্ দশ বৎসর বয়সে বাপের বাড়ী হইতে পিতার সৎকার শেষ হইবার পর, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, তাহা আজ আর তাহার ভাল করিয়া মনে পড়ে না। তাহার পর দীর্ঘ দশ বৎসর আরো গত হইয়াছে। তাহাদের ছোট ঘরখানিকে সে লেপিয়া পুঁছিয়া ঝকঝকে তকতকে রাখিয়াছিল। তাহার স্বামী মুনিশগিরি করিত, কিন্তু উপার্জনের প্রত্যেক পয়সাটি সে সম্ভব হইলেই বন্ধুদের সঙ্গে তাড়ি বা ধেনো মদ খাইয়া উড়াইয়া দিত। কাজে কাজেই ভূখ্‌লীর বিবাহিত জীবন মোটেই সুখের হইতে পারে নাই। এর-ওর বাড়ীর তরি-তরকারী মাঙিয়া এবং মারধোর খাইয়া সে কোন কোন দিন স্বামীর কাছ হইতে যাহা নগদ আদায় করিতে পারিত, তাহাতেই অতিকষ্টে তাহার দুঃখের দিনগুলিকে সচল করিয়া লইতেছিল। এমন সময় কিষণ তাহার সমস্ত দুঃখ-দুশ্চিন্তার অবসান করিয়া দিয়া অকালে বিদায় লইল। সেদিন ভূখ্‌লী দেখিল, ঘরে একমুঠো চাল নাই বা একগণ্ডা পয়সা নাই— বুঝিল, এভাবে আর চলিবে না।

সে সহরের এক বাবুঘরের কামিনের কাজ লইল। সেখানে ভোর হইতেই উঠিয়া যাইত— বাবুদের স্কুল-কাছারীর ভাত; বেলা এগারটা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই: বাসন মাজা, বাজার করা, গৃহিনী রাঁধিবেন, তাঁহার ছেলে ধরা। তারপর সকলে অফিস কাছারী স্কুল যে যা-র গেলে, ভূখ্‌লী ছুটি পাইত। বাবুদের বাড়িতেই সে দুবেলা খাইত। দুপুরেও সে কোথাও যাইত না। সন্ধ্যার পর সকলের খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পলারী বা সানকিতে ভাত ঢাকিয়া লইয়া সে তাহার পাড়ায় বাড়ির দিকে রওনা হইত। তাহাদের মাহাতো পাড়াতেই বাবুদের মালী নন্দার বাস। সে ভূখ্‌লীকে বাড়ি পর্যন্ত দাঁড়াইয়া দিয়া যাইত।

নন্দা অবিবাহিত।

দুলালী (১৯২৬), ভূখ্‌লী

(বেগম) শামসুন নাহার মাহ্‌মুদ

সুদীর্ঘ রজনীর মোহনিদ্রার অবসানে ইসলাম জগতে যে-জাগরণের বাঁশী বাজিয়াছে, তাহার সুরে সুরে নারীগণও চঞ্চল হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ নবযুগের রক্তপ্রভাতে দাঁড়াইয়া মোসলেম নারী নব প্রভাতী ধরিয়াছে: "পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।" সেই বাঁশরীর সুরে তুর্ক-ললনা জাগিয়াছে, পারস্য, মিশর, আফগানীস্থানের নারী জাগিয়াছে, আরও অনেকে জাগিয়াছে, জাগে নাই শুধু বঙ্গ রমণী। বাংলার মুসলমান সমাজ নারীর স্কন্ধে অবরোধ ও অশিক্ষার যে-বিপুল জগদ্দল শিলা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারই গুরুভারে বঙ্গনারী গৃহকোণে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে। ঘনঘোর পর্দার আবরণ ভেদ করিয়া বাংলার সুপ্তিমগ্না মোসলেম নারীরও কানে এখনও জাগরণের সুর প্রবেশ করে নাই; কর্ণে প্রবেশ করিলেও অজ্ঞানতার কৃষ্ণ আবরণ ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের মর্ম স্পর্শ করিতে পানে নাই। অবরোধের বিষময় ফলে আজ তাঁহারা অজ্ঞানতার গভীর পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাহাদের শয়নকক্ষে সূর্যালোকের প্রবেশাধিকার নাই, তাহাদের মনস্কক্ষেও তদ্রূপ জ্ঞানালোকের প্রবেশ নিষেধ।...

অবরোধ প্রথা আমাদের কিরূপে সর্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি; তথাপি এই সর্বনাশকর কঠোর প্রথা আমরা অবনত মস্তকে পালন করিতেছি। কেন করিতেছি? কারণ আমরা মনে করি ইহা ধর্মের বিধান। নারী স্বভাবতই ধর্মশীলা, ধর্মের আদেশ যতই ক্লেশদায়ক হোক না কেন, নারী তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে পালন করিয়া থাকে। তাই অবরোধ প্রথাকেও তাহারা কোরান-হাদিসের আদেশ জ্ঞানে নীরবে মাথা পাতিয়া বহন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এই কঠোর প্রথা পালন সত্যই কি ইসলামের নির্দেশ? না... হজরত মোহম্মদের সময়ে মুসলমান নারীগণ স্বাধীনভাবে বেড়াইতেন, প্রত্যেক ধর্মসভায় যোগদান করিতেন, এমন কি সমরপ্রাঙ্গণে পর্যন্ত ভৈরবী মূর্তিতে আবির্ভূতা হইতেন।

নারী জাগরণী (১৯২৬)

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহসা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ গর্জন সকলের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, প্রিয় পরিজনের মৃত্যুর ম্লান মুখচ্ছায়া তাহাদের আত্মহারা করিল। সকলেই যে যাহার গৃহাভিমুখে রুদ্ধশ্বাসে শেষ বাধাটুকু দিবার জন্য ছুটিল। কেহ কাহাকেও সাহায্য করিবার অবসর পাইল না, কেহ কাহারও খোঁজ রাখিবার অবকাশ পাইল না; সে কি ভীষণ শ্রবণ-বধির দামোদরের গর্জন! যেন নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের আনন্দ-অধীর দেহভঙ্গীর ভীষণ শব্দ! দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যে জল প্রবেশ করিল। পুষ্করিণী, তড়াগ, মাঠ সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমে জল পথে উঠিয়া দাড়াইল। এই থৈ থৈ ভাব দেখিয়া আসন্ন মরণোন্মুখ গ্রামবাসী যেন একটু আশ্বস্থ হইয়া বিপন্নের নিঃশ্বাস ফেলিয়া জল মাপিতে আরম্ভ করিল। সহসা আর একটা ভয়ঙ্কর পর্বত-পতনের মত শব্দ শ্রুত হইল। যাহারা ক্ষীণ আশা অবলম্বন করিয়া এতক্ষণ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া জল মাপিতেছিল, তাহারা আশা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর রক্ষা নাই! আর-এক জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।" মুহূর্তে জল পথ ছাড়িয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। তারপর সে-বর্ণনা ভাষায় করা যায় না, চক্ষুতে দেখা যায় না, কর্ণে শুনিতে পারা যায় না; যাহার যাহা ছিল, নিষ্ঠুর দামোদর সব টানিয়া লইয়া গেল। জননীর স্নেহপূর্ণ বক্ষ হইতে তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তান কাড়িয়া লইল। সতী স্ত্রী প্রেমালিঙ্গন-বদ্ধ বাহুলতা বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীকে ছাড়াইয়া লইল। অত্যাচারের চরম পীড়নে বড় বড় গৃহকে ভূমিসাৎ করিয়া সাগর-দরবারে, রণদৃপ্ত জয়োল্লাসে, স্নেহহীন দামোদর, মমতাবিহীন দামোদর ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের যথাসর্বস্ব ভাসাইয়া চলিল। এ-অত্যাচারের প্রতিকার করিতে শক্তি বা অনুনয় কোন প্রয়োজনেই লাগিল না। এক দিনে, কয়েক ঘণ্টায়, যাহা কেহ কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, তাহাই ঘটিয়া গেল। রোগে নয়, শোকে নয়, দুর্ভিক্ষে নয়, শত শত লোক গৃহহারা, পুত্রহারা, আত্মীয়হারা, সম্পদহারা হইল। দামোদরের জল পরদিন কমিয়া গেল। কিন্তু গ্রামবাসীর নয়নজল প্রতিদিন বাড়িয়া চলিল।

দামোদরের মেয়ে (১৯২৭), দামোদরের মেয়ে

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

সিংহল থেকে জাহাজে চড়ে ইন্দোচীন অভিমুখে যাত্রা করবার সময় যখন ভারতের শেষ নিশানা— কলম্বো-সৈকতের নারিকেলবন— চোখের সামনে দিগন্তে মিলিয়ে গেল, মনে তখন জাগছিল ইতিহাসের পুরানো কথা। সাগরপারের সেই দ্বীপগুলিতে ভারতসন্তানগণ কবে ও কিভাবে তাঁদের সভ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা-ই জানবার উৎসাহে মনটা তখন ভরপুর ছিল। এসিয়ার নানা দেশে ঐ সভ্যতার যে-ধ্বংসাবশেষ হয়েছে, তার কিয়দংশ দেখে চক্ষু সার্থক করা-ই ছিল মনের একান্ত কামনা; উদ্দেশ্য ছিল ভারত-ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায়ের কিছু উপাদান সংগ্রহ করা।

কলম্বো থেকে পেনাং প্রায় ছ'দিনের পথ। এ ছ'দিন জাহাজে বিশেষ কিছু করবার মত কাজ ছিল না। অসীম জলরাশির দিকে তাকিয়ে প্রভাত ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতাম, আর ভাবতাম, ভারত-সন্তানগণ যখন এই বিশাল সাগর বক্ষ উত্তীর্ণ হয়ে ইন্দোচীনে তাঁদের উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন, তখন তাঁরা হৃদয়ে যে-উদারতা পোষণ করতেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তাঁরা উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু রক্তপাত করেন নি; তাঁরা দেশ ত্যাগ করে এসেছিলেন, কিন্তু পরকে শোষণ করবার জন্য নয়; তাঁরা সভ্যতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তা-ই বলে পরের বুকের উপর পাষাণ চাপিয়ে দেন নি। পরের দেশের বাজারে এসে সে-সভ্যতা মুক্তহস্তে তাঁরা বিলিয়েছিলেন; যার পছন্দ হয়েছিল, সে ওজন করেই তা নিয়েছিল ও নিজের অভিরুচি অনুসারে তা গড়ে তুলেছিল। আজ যখন এই সাগরের উপকূলের দিকে তাকাই, তখন দেখি নানা জাতির হা-হুতাশে বাতাস অগ্নিময় হয়ে উপকূলভাগ দুঃসহ হয়েছে। এই সমুদ্রতীরবর্তী জনসমাকুল নগরসমূহের মন্দিরচূড়া পূর্বে যেখানে অভ্যাগতকে সাদর আহ্বান জানাত, এখন সেখানে সান্ত্রীর তাড়নায় মানুষের নামতেও ঘৃণা বোধ হয়।

আমরা কত কথাই না ভুলে গিয়েছি। কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মণ যেদিন ভারতের পতাকা বহন করে এই সাগরের উপর দিয়ে সিংহল থেকে যবদ্বীপে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন, উজ্জয়িনীর পরমার্থ যখন তাঁর পারদর্শী-বিদ্যা নিয়ে ইন্দোচীনে ও চীনে গিয়ে নূতন বাণী প্রচার করেছিলেন, তখন ছিল ভারতের এক স্মরণীয় যুগ।

ভারত ও ইন্দোচীন (১৯২৭), ১: ইন্দোচীনের পথে

(মোহাম্মদ) বরকতুল্লাহ্

চিন্তা-ই মানবের বৈশিষ্ট্য। চিন্তাশীল মানব যুগে যুগে জীবন-সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে। যখনই রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হইতে মানুষ একটু নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, অর্থাৎ যখনই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের ধনপ্রাণ নিরাপদ হইয়াছে, তখনই মানব বর্মাচ্ছাদন ও অসি-বল্লম দূরে নিক্ষেপ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছে; তাহার চিন্তাধারা বহির্জগৎ হইতে ঘুরিয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে, এবং আত্মা কি, মন কি, জীবনের পরিণাম কি, মরণের পর কি আছে— এই সকলের সমাধানে নিয়োজিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন, চিন্তার ইহা স্বাভাবিক প্রগতি। প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও তাহার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। দিনান্তের কলরোল যখন থামিয়া যায়, মানুষ যখন নৈশ নিভৃতির অবিক্ষুব্ধ মুহূর্তে জগতের দৃষ্টিপথ হইতে আত্মগোপনের অবসর পায়, তখন তাহার মনে হইতে থাকে— আজ সারাদিন কি করিলাম, কাহাকে প্রসন্ন করিলাম, কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিলাম, কাহার নিকট কি প্রতিদান পাইলাম, কিসে কি হইল, কি করিলে এমনটা না হইত ইত্যাদি। এই সমস্তই আত্মজীবনের সমালোচনা। জাতির জীবনেও এইরূপ আত্মচিন্তার যুগান্ত আছে এবং সে-আত্মচিন্তা অতি বৃহদাকারেই পরিস্ফুট হয়।... জাতির জীবনপ্রবাহে ঐহিক প্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উহার পারলৌকিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনীর অদম্য প্রেরণা ওত-প্রোতভাবে প্রসারিত হয়। জীবন-রহস্য ও পরলোক সম্বন্ধে জানিবার এই যে আগ্রহ, ইহা প্রত্যেক জাতির ভিতরেই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ সামর্থমত এ-সকলের এক-একটা সমাধানও করিয়া বসিয়া আছে। মানবের এ-ক্ষুধা চিরন্তন ও চিরনূতন। কেননা আজ পর্যন্ত মানব এ-সকলের কোনো অবিসংবাদিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই।...

বেদান্ত ও সুফীমতের মীমাংসার ভিতর গভীর ঐক্য রহিয়াছে।

সুফীমত ও বেদান্ত (১৯২৭), ভূমিকা

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

সাহিত্য চিরন্তনের সাধনাক্ষেত্র। বিশ্বমানবের সার্বভৌম মনোভাব, অনুভূতি ও জীবন-প্রবাহের বিকাশক্ষেত্র সাহিত্য। ইহাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি প্রভৃতি বিশ্বমানবের অন্তর্ভূক্ত হইলেও ইহাদের সমগ্র স্বরূপই সাহিত্যের বিষয়ীভূত নহে। ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু বিশ্বজনীন, যাহা কিছু মানবতার অনুকূল, যাহা সমগ্র মানব-অনুভূতিতে একটা সাড়া দিতে পারে, তাহাই চিরন্তন, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্য তাই দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ নহে; সাহিত্য তাই সর্বদেশিক, সর্বকালিক এবং সার্বজনীন। এক দেশের সাহিত্যকে যখন অন্য দেশের সাহিত্য-রসিকগণ আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারে, এক যুগের সাহিত্য হইতে যখন তাহার বহুপরবর্তী যুগের সাহিত্যও রস-সংগ্রহ করিতে পারে এবং সাহিত্যোক্ত ব্যক্তির বাণীতে যখন বিশ্বের সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণ অন্তরের বাণী শুনিতে পান, তখন সেই সাহিত্যই হয় চিরন্তন, সেই সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য হয়।...

আমাদের দেশের স্বরাজ-আন্দোলনের কথা ধরা যাউক। ইহা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ইহা সঙ্কীর্ণ দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং ইহার সাময়িক কোলাহল ও সঙ্কীর্ণ জাতীয় উচ্ছ্বাস সাহিত্যের বাণী হইতে পারে না— যদিও সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গিতে বাহিরের রূপ হিসাবে ইহার স্থান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে কি সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে এমন চিরন্তন বাণী নাই? আছে; তাহা হইতেছে এদেশবাসীর মুক্তির আকঙ্ক্ষা। অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সবলের নিষ্পেষণ হইতে দুর্বলের মুক্তিকামনা— মানব-মনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, মনুষ্যত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহা শুধু এ-দেশেই আবদ্ধ নহে, ইহা সর্বদেশে, সর্বকালেই হইয়া আসিয়াছে, আসিতেছে এবং আসিবে। সুতরাং স্বরাজ-আন্দোলন সঙ্কীর্ণ দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা আবদ্ধ হইলেও এবং ইহার সাময়িক ঝড়-ঝঞ্ঝা-কোলাহল সাহিত্যের অন্তর-বাণী হইতে না পারিলেও মুক্তির যে-আকাঙ্ক্ষা হইতে ইহার সাময়িক প্রকাশ, তাহা সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা (১৯২৭)

(মৌলানা) আকরম খাঁ

মক্কাধামে আজ এক অভিনব দৃশ্য দেখা দিয়াছে। সেই উপেক্ষিত উৎপীড়িত সত্যের সেবক, দুই লক্ষ অনুরক্ত ভক্তের অনুপম জামাত সঙ্গে লইয়া আজ আবার কাবা-র সন্নিধানে সমবেত হইয়াছেন। সাফা-মারওয়া পরিক্রম এবং কাবা প্রদক্ষিণ-কালে একই প্রকারে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত এই বিপুল জনসমুদ্র, কখনও ধীরে কখনও বা দ্রুতপদবিক্ষেপে, উপত্যকা-অধিত্যকা অতিক্রম করিতেছে, বিশাল সাগরবক্ষের উর্মিমালার মত সেই অনন্ত জনসাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক অধিরোহণ-অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে হজরতের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া দুই লক্ষ কণ্ঠ রহিয়া 'লাব্বাএক' নিনাদে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। ফলে আজ আবার আল্লার নামের জয়জয়কারে মক্কার গগন-পবন পুলকিত, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কাবার প্রস্তরে প্রস্তরে রোমাঞ্চ জাগিল, স্বর্গের পুণ্যাশীষ সহস্রধারে নামিয়া আসিল।...

হজরতের বদনমণ্ডল ক্রমশঃই স্বর্গের পুণ্যপ্রভায় দীপ্ত এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর সত্যের তেজে ক্রমশঃই দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় তিনি আকাশের পানে মুখ তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন: "হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি? আমি কি নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি?" লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল: "নিশ্চয়, নিশ্চয়!" তখন হজরত অধিকতর উদ্দীপনাপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন: "আল্লাহ্, শ্রবণ কর, সাক্ষী থাক; ইহারা স্বীকার করিতেছে, আমি আমার কর্তব্য পালন করিয়াছি। হে লোকসকল, আমার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে; তোমরা সে-প্রশ্নের কি-উত্তর দিবে, জানিতে চাই।" আরাফাতের পর্বতপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া লক্ষ কণ্ঠে উত্তর হইল: "আমরা সাক্ষ্য দিব, আপনি স্বর্গের বাণী আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন।" হজরত তখন বিভোর অবস্থায় আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন: প্রভু হে, শ্রবণ কর; প্রভু হে, সাক্ষী থাক; হে আমার আল্লাহ্, সাক্ষী থাক।"

মোস্তফা-চরিত, ৭৭ম পরিচ্ছেদ: বিদায় হজ

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

"মা, আমি গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করিতে চাই, আমার গোত্র কি?" একটি বালক আসিয়া তাহার মাতাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল।

বালকটির নাম সত্যকাম; তাহার মাতার নাম জবালা। সত্যকামের এ-জগতে মা ছাড়া আর কেহ ছিল না। জবালারই বা এই শিশু ছাড়া আর কি অবলম্বন ছিল? শস্যশ্যামলা বিশাল এই ধরণীর কোলে, উদার অনন্ত আকাশের তলে দূরবিস্তৃত গহন বনানীর পার্শ্বে গ্রামপ্রান্তের এই ক্ষুদ্র কুটীরখানি, মাতাপুত্রের আপনার বলিতে এই সব। আর ছিল নদীর কুলুকুলু গান, পাখির সুমিষ্ট তান, রৌদ্রের উজ্জ্বল আলো এবং চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি।

পুত্রের প্রশ্নে জবলার বিগত জীবনের কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। হা ভগবান! তুমি অভাগিনীর কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলে! যৌবনকালেই তাহাকে কত দেশ ঘুরিতে হইয়াছিল, দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়া কত পরিচর্যা করিতে হইয়াছিল। তারপর একদিন নাড়ী-ছেঁড়া ধন সত্যকাম আসিয়া অভাগিনীর কোল উজ্জ্বল করিয়া বসিল। সেইদিন বুঝি জবালার প্রথম সুখোদয়। জবালার মাতৃহৃদয় স্নেহে ভরপুর হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। সে আর কোনও দিকে চাহিল না। উর্ধ্বে ভগবানকে স্মরণ করিয়া শিশুকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া জবালা নিজের নূতন জীবন পত্তন করিল। সেই হইতে দূরে অতিদূরে এই নিরালা কুটীরে তাহার বাস। সে আর কাহারও দাসীবৃত্তি করে না। এখন সে জননী জবালা, সত্যকামের মা। তারপর কত শরৎ, কত বসন্ত, কত বর্ষা মাতার চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কি-দারুণ শ্রম করিয়া মাতাকে এই শিশুর অন্ন এবং নিজের অন্ন যোগাইতে হইয়াছে, তাহা শুধু বিধাতাই জানেন। কিন্তু জবালার মনে তো সুখের অভাব কদাচ হয় নাই। ভাঁটার পর জোয়ারের ন্যায় যেন একটানা আনন্দই তাহার জীবনে প্রবাহিত হইতেছে। জননীর বড় তৃপ্তি, নির্মল শিশু সে, নির্মল প্রকৃতির মধ্যে আপন অনাবিল স্বভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। মাতৃবক্ষের দুগ্ধধারার ন্যায় শুভ্র, মাতৃহৃদয়ের স্নেহরসের ন্যায় সুমিষ্ট, মাতার মুখশ্রীব ন্যায় শান্ত সুন্দর এই শিশু সত্যকাম শুধু মাতার যত্নেই পুষ্ট হইতেছিল। জবালার স্নেহাঞ্চল-ঘেরা সত্যকামের জগতে কোনও দিন পাপ, কুটিলতা, মিথ্যা প্রবেশ করিতে পারে নাই।

পুত্রের জিজ্ঞাসায় পুত্রের মুখে চাহিতেই জননীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল।

গল্পে উপনিষদ (১৯২৮), সত্যকাম, জননী জবালা

হেমেন্দ্রলাল রায়

মিনতি আমার প্রতিবেশী। ছোটবেলা থেকে তার সাথে একসঙ্গে খেলা করেছি। তারপর বড় হয়েও তাকে পেয়েছিলুম, কিন্তু যে আর এক ভাবে। তাই যাবার সময় যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, চোখের জলে বান ডাকিয়ে যে বলল, "যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এসো, সমীরদা! মনে রেখো, তোমার হাতের স্পর্শ ছাড়া আমার চোখের ধারার এ-সোঁতা কখনো শুকোবে না।"

বিদেশের শুষ্ক মরুভূমিতে মিনতির চোখের জলের সেই ঝর্ণাই ছিল আমার সব আনন্দ, সব সান্ত্বনা। ভবিষ্যতের গাছে যত সোনার ফল ফলিয়েছি, ফুল ফুটিয়েছি, তাদের সবাইকে তাজা করে রেখেছিল সেই চোখের জলের ঝর্ণাটা। কিন্তু কল্পনার সে-স্বর্গটাও আমার অকস্মাৎ একদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভেঙে টুটে রেণু-রেণু হয়ে পথের পাশে পায়ের ধুলোর তলেই লুটিয়ে পড়ল।

ফেরবার প্রায় সময় হয়ে এসেছে, হঠাৎ একদিন মিনতির চিঠি পেলুম। সে লিখেছে: "আমায় মাফ করো, সমীরদা! অন্য জায়গা থেকে আমার ডাক এসেছে, ভাই; আমি তোমার জন্য সবুর করতে পারলুম না। আমার হৃদয় সেভাবে নিজেকে তোমার পায়ে বিলিয়ে দেবে বলে শপথ নিয়েছিল, সে-শপথ তার ভেঙে গেল। যদি পার, তোমার এই চঞ্চলচিত্ত বোনটাকে ক্ষমা করো। হৃদয়টাকে ঠিক বুঝতে না পেরে যে-ভুলের জের টেনে-চলাকে তুমি অপমান বলেই মনে করবে। তোমার ভালবাসাটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি, কিন্তু তাকে অপমান করবার সাহস আমার নেই।"

এ-চিঠির উত্তর দেবার কোনো দরকার ছিল না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আসবার দরকারটাও কমে গিয়েছিল। তারপর দুটি বছর ছন্নছাড়ার মতো বিদেশের পাহাড়-পর্বত, বন জঙ্গলে ঘুরে মনের দিক দিয়ে সর্বরিক্ত এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পুরো নাস্তিক হয়ে বাংলার বুকে ফিরে এসেছি বটে, কিন্তু মিনতিদের বাড়িতে এখনো পা দিতে পারি নি। যে-মিনতি আঠারোটি বৎসরের সম্বন্ধ একখানা চিঠি মারফৎ শেষ করে দিতে পারে, তার কাছে দাঁড়াবার সাহস আমারও ছিল না, যে-আমি সাহসে ইউরোপের বেপরোয়া পাহাড়ীদের দলকেও পরাজিত করেছিলুম।

পাঁকের ফুল (১৯২৮), পাঁকের ফুল

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। মানুষের সভ্যতার দুই মূর্তির প্রতীক। পৃথিবীর অন্য-সব জীবজন্তুর মতো শরীর ও মন নিয়ে মানুষ। এবং তাদের মতোই মানুষের মনের বড়ো অংশ ব্যয় হয় শরীরের প্রয়োজনে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার বেশির ভাগ এবং অনেক সভ্যতার প্রায় সমস্তটা শরীরের প্রয়োজন ও বিলাসের দাবি মেটাবার কৌশল। ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, রেল-স্টীমার, মোটর-এরোপ্লেন, টেলিফোন-রেডিও, কলকব্জা, কৃষিবাণিজ্য— মুখ্যত এই কৌশল ছাড়া কিছু নয়। এদের আবিষ্কারে মানুষের যে-বুদ্ধি অর্থাৎ মন কাজ করেছে, তার শক্তি ও জটিলতা বিস্ময়কর। কিন্তু তার লক্ষ্য সেই সব প্রেরণার লক্ষ্য থেকে ভিন্ন নয়, যাতে পাখিরা বাসা বাঁধে, মাকড়সা শিকার ধরার আশ্চর্য কৌশল দেখায়, হাঁসের দল প্রতি শীতে উত্তর-ইউরোপ থেকে বাংলার পদ্মার চরে পথ না ভুলে পৌঁছে যায়। কিন্তু সভ্যতার এই কাত্যায়নী-মূর্তি তার সমগ্র চেহারা নয়। পৃথিবীতে প্রাণের আর্বিভাব আজও অজ্ঞাত রহস্য। তার চেয়ে গূঢ় রহস্য প্রাণীর শরীরে মনের বিকাশ। প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টিতে মন যে পরম সহায়, এবং প্রাণের যন্ত্রমাত্র কল্পনা করে জটিলকে সহজবোধ্য করার প্রলোভনও স্বাভাবিক। কিন্তু এ-তথ্যও স্পষ্ট যে, প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর সৃষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজন মেটাবার যে-চেষ্টা, তা-ই যদি হয় কাজ, মনের এ-সৃষ্টি খেলামাত্র। লীলা নাম দিলে হয়তো ভদ্র ও গম্ভীর শোনায়, কিন্তু স্বরূপের বদল হয় না।

খেলা হোক আর লীলাই হোক, সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী-মূর্তি তার অন্য মূর্তির মতোই স্বাভাবিক শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে মানুষের মনের যে প্রকাণ্ড সৃষ্টি, তাকে যদি বিনা প্রশ্নে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে, তবে মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে-সৃষ্টি, তাকেও সমান স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই।

কাব্যজিজ্ঞাসা (১৯২৮) সাহিত্য, ১

সুরেশ চক্রবর্তী

আমি কালো। আমার নামও হয়েছে ঐ কালো। একটুখানি বয়েস থেকেই শুনে আসছি, সকলেই বলে যায়: "মেয়েটা কালো!" মাকেও বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছি এই আমাকে নিয়ে। আমার দেহের এই কালো আবরণের জন্যে বাবাকে কত ব্যথাই না সহ্য করতে হয়েছে ঘরে ও বাইরে।

বাবা আমায় বরণ করে নিয়েছিলেন ভগবানের পূত্র আশীর্বাদী ফুলটির মতো। তাঁর সমস্ত স্নেহটুকুর দাবিদার হয়ে বসেছিলুম একা আমিই। শুধু তিনিই আমার এই কালো হওয়ার দুঃখকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর অতিরিক্ত স্নেহমমতায় গড়া হৃদয়খানা দিয়ে।

আমারই ছোট বোন আলো সুন্দরী। তার দিকে প্রায়ই চেয়ে দেখতুম, ভাবতে পারতুম না কেন সে সুন্দরী। তার তো আমার চেয়ে কিছুই বেশী নেই! আলোর দেহের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে তুলনা করেছি— কই, বুঝতে ত পারছি না।

কিন্তু বুঝেছি, সে তার অনেক পরে। বয়স তখন আমার পোনেরো কি ষোলো। আমার বিবাহের চিন্তায় বাবার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দেহখানি আরও শুকিয়ে উঠতে লাগল। বেদনায় বুকের ভাবনা মুখের উপর এসে জড় হল। অবশেষে সকল ভাবনার চরম হল সেদিন, যেদিন কোন কিছুই আর তার মরদেহকে সাড়া দিতে পারলে না। আমার বিয়ের জন্যই বুঝি তিনি ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়তে চলে গেলেন। কিন্তু তাতেও ত বিয়ের কোনই সুবিধা হয়ে উঠল না। বরং মা সে-অবস্থায় আমায় নিয়ে পড়লেন আরও এক ভীষণ বিপদে। কেননা আমি কালো।

আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে, হাতখানা দোলা দিয়ে, মুখখানা ঘুরিয়ে, খোঁপাটা কতবার করে খুলে, বিউনীর ডগাটি দাঁতের আগায় চেপে, মুচকে হেসে, চোখ ঘুরিয়ে অনেক করে দেখছি; কিন্তু দেহেব ওই কালো রঙই আমাব অঙ্গেব প্রত্যেক ভঙ্গিমার সঙ্গে মিশে প্রতি পদে আমার বাদ সেধেছে। কিন্তু এই কালো রঙটাকেও একদিন পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হল— হয়ত অল্পসময়ের জন্য।

নতুন বসন্তের কচি পাতার মত আমার দেহে যৌবনের প্রভাব এসে পড়ল। এই কালো রঙের ওপরেও গালের টোল, চোখের কোলে ফুটে উঠল দীপ্ত তারুণ্যের টাটকা আভা। বর্ষাপ্লাবিত নদীর মত বুকখানির দু-কূল ভরে উঠল প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বসিত স্রোতে। কিশোরীর অবগুণ্ঠিত চাঞ্চল্য রক্তিম যুবতীর লজ্জার বাসে ঢাকা পড়ল।

মধুপ (১৯২৮), কালোর কথা, ১

দেখতে না দেখতে পাথুরে বাঁদর বেশ বড় সড় জোয়ান হয়ে উঠল। বাঁদরের দলে সে মানুষ হতে লাগল।

একটা খুব বড় উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণা ঝরেছে। তার ঠিক নীচেই একদল বাঁদর, সবাই মিলে খেলা করছিল। ঝরণার জল ভীষণ জোরে পাহাড়ের পাথর ঠেলে পাতালের মুখে ঝরে চলেছে। বাঁদরেরা সবাই মিলে হঠাৎ ঠিক করলে, সেই পাগলা ঝোরার জল কেটে উপর পাহাড়ে যে আগে এক চোটে উঠতে পারবে, তাকেই তারা রাজা বলে মেনে নেবে। ছোট বড় কোনো বাঁদরই জলের গতিক দেখে সাহস করে না লাফ দিতে। তখন সেই পাথুরে বাঁদর এক লাফে নিজের ঝাপটে জল কেটে পাহাড়ের চূড়োয় একটা দেবদারু গাছের মগডালে গিয়ে লেজ ঝুলিয়ে বসল। সবাই দেখে "সাবাস সাবাস" বলে হাততালি দিতে থাকল। সেদিন থেকে, বাঁদরের দেশের রাজা হলেন রেমো-নীল পাথুরে বাঁদর 'রামদাস' খেতাব নিয়ে।

রাজা রামদাসের জামবাড়ী তৈরী হল পাহাড়ের গায়ে। কোনো বাঁদর হল তাঁর সেনাপতি, কেউ হল তাঁর দেওয়ান; কেউ সেপাই, কেউ চাকর, কেউ দাসী, এমনি নানান কাজে বহাল হয়ে তারা দিন কাটাতে লাগল।

রাজা হয়ে একদিন রেমো বাঁদর তাঁর যত লোকজনকে ডেকে এক ভোজ দিলেন। সেদিনটা ছিল 'জন্ম-নবমী'। রাজা সকলকে নিয়ে জামবাড়ীতে পাকা জামের পায়েস খেতে খেতে হঠাৎ পাতের উপর পা ছড়িয়ে কেঁদেই আকুল। রাজা কাঁদেন। সবাইকার মহা ভাবনা। অনেক করে রাজাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর কাঁদন থামালে তারা। তখন বাঁদর-রাজ বললেন, "কাঁদছি যে কেন, তা তোরা কি করে বুঝবি, বল? চিরদিন কি সমান যায়? দেখ্ না: দেখতে দেখতে চুলে পাক ধরল; এবার কোন্‌দিন আমায় পটল তুলতে হবে; তখন তোদের দশা কি হবে, বল্ তো? তাই ভেবেই আমার চোখে জল এসেছে।"

একটি ধারে চুপটি করে একটা খুব বুড়ো বাঁদর বসে ছিল, তার আশীর উপর বয়েসে; সে তখন বললে, "রাজন্, আপনার মনে খুব বড় কথারই উদয় হয়েছে, দেখছি।"

পাথুরে বাঁদর রামদাস (১৯২৮)

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

আমি প্রথম হইতে যেরূপ ভাবে এই যুগ বিশ্লেষণ করিতেছি, তাহাতে সমগ্র শতাব্দীকে একটা বৈদান্তিক যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে আমি কিঞ্চিৎ আপত্তি না করিয়া পারি না। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ অংশের প্রথমভাগে বাংলাদেশে যে দুইটি সিদ্ধ মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, অথবা শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে যদি তাঁহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষা করা যাইত, তবে সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগকে একটা বৈদান্তিক যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে আমি বিশেষ কিছু আপত্তি করিতাম না। কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর মর্মর প্রাসাদশিখরে তাঁহারা এই অত্যল্পকালের মধ্যে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। পণ্ডিতের গ্রন্থাগার ও মূর্খের বিলাসভবনেও তাঁহাদের সমান প্রতিপত্তি দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষ এজন্য সময় সময় যেরূপ নিস্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া স্বামিজী যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন। এবং আমারও জাতীয় চরিত্রের সেই শেষ কলঙ্কচিহ্ন উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবার প্রবৃত্তি নাই।

শতাব্দীর প্রথমে ধর্মসংস্কারের স্রোত যিনি বা যাঁহারা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহার নমস্য। সেই স্রোতে যাঁহারা সন্তরণ করিয়াছেন, স্বীয় বাহুর সঞ্চালনে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়াছেন, তাঁহারা বিচিত্র হইয়াও স্রোতকে অব্যাহত রাখিয়াছেন। আর শতাব্দীর শেষভাগে যে দুই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বর ও গেণ্ডেরিয়ার জঙ্গলে নিজ নিজ আসনে অটল হইয়া বসিয়া, কেবলমাত্র অঙ্গুলিহেলনে শতাব্দীর পূর্বাংশে প্রবাহিত স্রোতকে হেলায় মুখ ফিরাইয়া ভিন্ন পথে চালিত করিলেন, তাঁহারা কে? তাঁহারা কি শুধু ইতিহাস? না ইতিহাসের নিয়ামক, সত্যই পুরাণ বর্ণিত অবতার? তাঁহাদের শক্তির পরিচয় আমাদের পাওয়া উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী, অষ্টম বক্তৃতা (১৯২৮)

(বেগম) রোকেয়া সখাওৎ হোসেন

সবেমাত্র পাঁচ বৎসর হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে-মানুষের অবাধ গতি— অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণভয়ে যত্র-তন্ত্র— কখনও রান্নাঘরের ঝাপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটীর অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।...

আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে এই কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয়া ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ী বোহার হইতে দুইজন চাকরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রী পাসপোর্ট' ছিল, তাহারা সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়মান হরিণশিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্র-তত্র— কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নীচে— পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জন চিল-কোঠা ছিল; অতি প্রত্যূষে আমাকে খেলাই কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত, প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। বোহারের চাকরাণীদ্বয় সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিল-কোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সমবয়সী ভগিনীপুত্র হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল; আমি সেই ছাপরখাটের নীচে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম— ভয়, পাছে আমার নিঃশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়হীনা স্ত্রীলোকেরা খাটের নীচে উঁকি মারিয়া দেখে! সেখানে কতকগুলি বাক্স পেটরা মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার (ছয় বৎসর বয়সের) ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেইগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারিধারে দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজখবর কেহ নিয়মমত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিল-কোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা 'বিন্নি' আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না— ছেলেমানুষ ত, ভুলিয়া যাইত।

অবরোধ-বাসিনী (১৯২৮) ২৩

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন আগের সে দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া উর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল। সেদিন— আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢু দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তরে বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে!

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথে-ঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহকোণে— আজ কিন্তু সত্য সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!

তাহার যেন মনে হয়, দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়; তাহা কি, সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে: আতুরী ডাইনী, নদীর ঘাট, তাহাদের কোঠাবাড়ীটা, চালতেতলার পথ, রাণুদি, কত বৈকাল, কত দুপুর, কতদিনের কত হাসিখেলা, পটু, দিদির মুখ, দিদির কত না-মেটা সাধ!

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে!

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যে অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল— আমি যাই নি, দিদি; আমি তোকে ভুলি নি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসি নি— ওরা আমায় নিয়ে যাচ্চে!

পথের পাঁচালী (১৯২৯), উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজীন্দ্রকে মাধুরী ভালবাসিত। নিজের উদ্ভিন্ন যৌবনের সমস্ত আকুলতা দিয়া সে তাহাকে বরণ করিয়াছিল। এবং এ-কথাটা পিতামাতার কাছেও গোপন করে নাই। তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াই সমরেন্দ্র বিবাহে সম্মতি দেন, যদিও দুই পক্ষের bank balance-এ যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

আজীন্দ্র স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিবে, আর সে হইবে তাহার সহায়: মুখের কথায়, চোখের ইঙ্গিতে, অঙ্গের স্পর্শে সে তাহার বাহুতে শক্তি দিবে, প্রাণে উৎসাহ দিবে; নিজের মাথার কেশ বিনাইয়া সে তাহার ধনুতে ছিলা পরাইবে; তাহার বিজয়রথের মত্ত অশ্বদুটাকে ছুটাইয়া লইয়া যাইবে একেবারে শত্রুব্যূহের বুকের উপর দিয়া— এই রকম কত শত কল্পনা তাহার মনে আসিত। তখন মাধুরীর চরমপন্থিত্বে আজীন্দ্রও শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু আজীন্দ্র বোমার দায়ে চালান গেল সাত সমুদ্র তের নদীর পার, আর মাধুরী ঘরের কোণে বসিয়া রহিল, কুরুষকাটি হাতে করিয়া।

আজীন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণটা ছুটাছুটি করিয়াছিল, সত্য। কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই— কর্তার ইচ্ছা। বোমার আসামীর সহিত তাহার পিতা কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না।

মাধুরীর ইচ্ছা করিতে লাগিল, রাজপুত্র রমণীদের মত জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং নিজের দেহমুক্ত আত্মাকে আজীন্দ্রের সম্মুখে হাজির করিয়া বলে, "ওগো, আছি, আছি, আছি। দিবস-রজনী আমি তোমাকেই ঘেরিয়া আছি। সুখে, দুঃখে, উত্থানে, পতনে আমি একান্তই তোমার।"

একদিন আগুন জ্বলিল, হবি পুড়িল শাঁখও বাজিল অনেকগুলো। কিন্তু সে জহরব্রত করিল না। একজন লোমশ পুরুষের কর্মকর্কশ হাতের উপর হাত রাখিয়া কতকগুলো অনুস্বারের টঙ্কার শুনিল, এবং পরদিন 'দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে, নম্রনেত্রপাতে' রক্তপট্টাম্বর-নিপীড়িত দেহযষ্টিখানি বহন করিয়া ব্রজদুলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল।

আজীন্দ্রের বদলে আর কাহাকেও হৃদয় দান করিতে পারিবে, এ-কথা মাধুরী ভাবিতে পারে নাই। তাই ব্রজদুলালের সহিত বিবাহের প্রস্তাবেই সে প্রতিজ্ঞা করিল আত্মহত্যা করিবে, দেহত্যাগ করিবে, বা ঐ রকম দুঃসাহসিক একটা কিছু করিয়া বসিবে। কিন্তু কিছু করে নাই, শুধু বিবাহ হইয়া গেল বলিয়া।

যোগভ্রষ্ট (১৯২৯), চৌদ্দ

লোক দেখিবামাত্র তাহাদের চরিত্র ও ক্ষমতা ঠিক বুঝিয়া প্রত্যেককে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করা-ই প্রকৃত রাজার গুণ। শিবাজীর এই আশ্চর্য গুণ ছিল। আর তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী-শক্তি ছিল চুম্বকের মত: দেশের যত সৎ দক্ষ মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত; তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়া, তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিয়া, তাহাদের নিকট হইতে তিনি আন্তরিক ভক্তি এবং একান্ত বিশ্বাস ও সেবা লাভ করিতেন। এইজন্যই তিনি সর্বদা সন্ধিনিগ্রহে, শাসন ও রাজনীতিতে এত সফল হন। সৈন্যদের সঙ্গে সর্বসর্বদা মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের দুঃখকষ্টের ভাগী হইয়া ফরাসী সৈন্যমধ্যে নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি একাধারে তাহাদের বন্ধু ও উপাস্য দেবতা হইয়া পড়েন।

সৈন্যবিভাগের বন্দোবস্তে শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, সব বিষয়ের সূক্ষ্মাংশের প্রতি দৃষ্টি, স্বহস্তে কর্মের নানা সূত্র একত্র ধরিবার ক্ষমতা, প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অনুষ্ঠান-নৈপুণ্য— এই সকল গুণের তিনি পরাকাষ্ঠা দেখান। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার ও তাঁহার সৈন্যগণের জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কোন্ প্রণালীর যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইবে, নিরক্ষর শিবাজী শুধু প্রতিভার বলেই তাহা আবিষ্কার ও অবলম্বন করেন।

শিবাজীর প্রতিভা যে কত মৌলিক, কত বড়ো, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি মধ্যযুগের ভারতে এক অসাধ্য সাধন করেন। তাঁহার আগে কোন হিন্দুই মধ্যাহ্নসূর্যের মত প্রখর দীপ্তিশালী শক্তিমান মুঘল-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই; সকলেই পরাজিত হইয়া লোপ পাইয়াছিল। তাহা দেখিয়াও এই সাধারণ জায়গিরদারের পুত্র ভয় পাইল না, বিদ্রোহী হইল এবং শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল!...

শিবাজীর রাজ্য লোপ পাইয়াছে; তাঁহার বংশধরগণ আজ জমিদার মাত্র। কিন্তু মারাঠা জাতিকে নবজীবন দান তাঁহার অমর কীর্তি। তাঁহার জীবনের চেষ্টার ফলে সেই বিক্ষিপ্ত পরাধীন জাতি এক হইল, নিজ শক্তি বুঝিতে পারিল, উন্নতির শিখরে পৌঁছিল। ফলতঃ শিবাজী হিন্দু জাতির সর্বশেষ মৌলিক গঠনকর্তা এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কর্মবীর।

শিবাজী (১৯২৯), চতুর্থ অধ্যায়: ইতিহাসে শিবাজীর স্থান

একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক নিজের দেশে মথুরাদাসের অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছিল। কন্‌খলে আসিয়া তাহার একান্ত আগ্রহ হইল যে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মথুরাদাসের ভোজন করাইবে। একদিন পাণ্ডাপাড়ায় স্ত্রীলোকটি খাদ্যদ্রব্য ও জল লইয়া একটি রকে বসিয়া আছে, কারণ মথুরাদাসকে কোন নির্দিষ্ট ভোজনের নিয়ম ছিল না। স্ত্রীলোকটির ধারণা ছিল, মথুরাদাসের শিরে জটা, ভব্যসভ্য বেশভূষা খুব থাকিবে এবং সঙ্গে অনেক শিষ্যবর্গ থাকিবে। খানিক পরে সেই স্ত্রীলোকটি দেখিল, গায়ে ধূলামাখা একটা বুড়া ন্যাংটা আসিল এবং তাহারই পাত্র হইতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া দূরে গিয়া তাহাকে দেখাইয়া একটু একটু করিয়া খাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল, একটা ধূলামাখা ন্যাংটা পাগল আসিয়া তাহার খাবার জিনিস লইয়া গেল। উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাহার জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছ?" স্ত্রীলোকটি দুঃখিত হইয়া বলিল, "কেন, এখানে মথুরাদাস নামে বিখ্যাত এক সাধু আছে, তাঁহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি; আর একটা ধুলামাখা সাধু আসিয়া আমার পাত্র হইতে খাবার লইয়া গিয়া কি না আমায় দেখাইয়া দেখাইয়া খাইতেছে!" উপস্থিত লোকেরা বলিল, "ওঁরই নাম মথুরাদাস! অযাচিতভাবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। উনি কখনও কাহার কাছ হইতে জিনিস লইয়া আহার করেন না। তবে তোমার ভিতর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল মথুরাদাসকে ভোজন করাইবার, সেইজন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমার আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।" তখন স্ত্রীলোকটি মহা আনন্দ করিতে লাগিল যে, তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছ।

মথুরাদাস অল্পমাত্র কিছু আহার করিয়া চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

সাধু-চতুষ্টয় (১৯২৯), মথুরাদাস

(শেখ) ফজলুল করিম

সেইদিন হইতে বৃদ্ধ ভূপতি বিষয়কর্মে জলাঞ্জলি দিয়া নির্জনে নিবিষ্ট মনে কেবল ধর্মচিন্তা করিতে লাগিলেন। নূতন নরপতি রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

ইব্রাহীমের দয়া, ক্ষমা, দণ্ড এবং ন্যায় সকলের পক্ষেই সুফল প্রসব করিল। দস্যু-তস্করেরা দেশ ছাড়িয়া পলাইল, সাধু-সজ্জনেরা প্রতিপালিত হইতে লাগিল; অনুগত সৈন্যগণের রণকুশলতায় বহু জনপদে বল্‌খেশ্বরের বিজয়পতাকা প্রোথিত হইল।

এইভাবে চারি বৎসর অতীত হইলে একদিন বৃদ্ধ বাদ্‌শাহের দেহান্ত হইল। ইব্রাহীম মাতামহের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মনেই সেই বিয়োগ-ব্যথা অধিক মাত্রায় বাজিল। চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত্রি ইব্রাহীম সে-শোকে মরণাপন্ন হইয়া রহিলেন। মাতামহের সমাধিমন্দির তাঁহার প্রাণ জুড়াইবার একমাত্র স্থান হইল। পাত্রমিত্র এবং বন্ধুবর্গ বিবিধ প্রকারে তরুণ বাদ্‌শাহকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু বাদ্‌শাহের মন তাহাতে যথার্থ শান্তি পাইল না। নশ্বর সংসারের ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসে তাঁহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা জন্মিল! তিনি বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা কেবল বংশরক্ষার জন্য। তিনি সিংহাসনে বসিলেন বটে, কিন্তু কাহা কেবল দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। ইব্রাহীমের উদাস প্রাণপক্ষী গুহাশ্রমের সীমারেখা ছাড়াইয়া উর্ধ্বলোকে বিচরণের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না।

দশ বৎসর অতিবাহিত হইল, ইব্রাহীম কলের পুতুলের মত সংসারধর্ম পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন তাহাতে আদৌ বসিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর করুণ হাহাকার তাহাতে থামিল না। সে বলিতে লাগিল, "চল, চল, ইব্রাহীম, আর এ-অট্টালিকায় থাকিয়া কাজ নাই। ঐ দিগন্ত প্রসারিত মুক্ত প্রান্তরে, ঐ নির্জন পর্বতগুহায় বাস করিয়া এ-জীবনের জ্বালা জুড়াইবে না? এখানে থাকিলে ধনের স্বাদ, বিলাপের স্বাদ পাইতে পার, কিন্তু জীবনের স্বাদ পাইবে না। চল, আমরা বাহির হইয়া যায়!"

ইব্রাহীম পাখিটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া কোনরূপে পোষ মানাইয়া রাখিতে লাগিলেন, কিন্তু পাখি মাঝে মাঝেই তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজর্ষি ইব্রাহীম

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কয়লা-খাদের মুখ হইতে কয়লা-টানা ছোট ছোট গাড়ীর সরু ট্রাম-লাইন, আঁকিয়া বাঁকিয়া আমবাগানের ভিতর দিয়া দূরে একটা ডিপোর কাছে শেষ হইয়াছে। সেই ঘন-বিন্যস্ত আমবাগানের ভিতর, ট্রাম-লাইনের এক পাশে, একটা ছোট কদম গাছের তলায় বিলাসী মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, থম্‌থমে আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলার এক পাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। আমগাছের কচি কচি নূতন পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পথ দেখিয়া সাঁওতাল ও বাউরী কুলীগুলা কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী লাইনের উপর ঠেলিয়া আনিতেছিল। একদিকে মেয়েরা সাইডিং-এর উপর বড় বড় মালগাড়ীতে কয়লা বোঝাই করিতেছিল। কয়লা ফেলার ঝুপ-ঝাপ শব্দ এবং ট্রাম-লাইনের ঘড়ঘড়ানির তালে তালে তাহাদের অপূর্ব মেঠো সুরের আনন্দসঙ্গীত বর্ষার জলো হাওয়ায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া সুদূরের শূন্য প্রান্তরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

বিলাসীর এ-সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু নান্‌কুর উপর অভিমান করিয়া খাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া একমনে একটা কদম ফুলের শুভ্র কেশর ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিতেছিল, আর উদাস, চঞ্চল দৃষ্টিতে এক-একবার খাদের মুখের পাল্লার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল— যদি নান্‌কু তাহার রাগ ভাঙ্গাইবার জন্য উঠিয়া আসে! বিলাসীর সারা দেহে যৌবনের উচ্ছ্বাস ছাপাইয়া পড়িতেছিল। তাহার পরনের সাড়ীখানা কালো কয়লার বিশ্রী ময়লার সামান্য মলিন হইলেও গায়ের রং-এর জৌলুষ এতটুকু মলিন হয় নাই— জলে-ধোয়া কচিপাতার মতই জ্যোৎস্নালোকে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ অলকগুচ্ছের সাঁওতালী খোঁপার ফাঁকে কদম ও টগর ফুলের শুভ্র পাপড়ি ও কেশরগুলি দেখা যাইতেছিল। বিলাসী হতাশ হইয়া একমনে ভাবিতেছিল— যার জন্যে চুরি করি, সে-ই বলে চোর!

কয়লা-কুঠী (১৯৩০)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আমাদের পূর্বপুরুষগণ সংসার-রূপ বৃক্ষে দুইটিমাত্র অমৃতফলের সন্ধান পাইয়াছিলেন— একটি কাব্যরস, অপরটি সাধুসঙ্গ। জীবনে আমরা নানা ফলের আস্বাদ গ্রহণ করি সত্য, কিন্তু তাহার কোনটিকেই জোর করিয়া অমৃতফল বলা যায় না। সাধুসঙ্গ এ-যুগে একান্ত দুর্লভ। এখন যাঁহারা অমৃতফলের আস্বাদ লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের কাব্যরসই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু দেখা যায় এই কাব্যরস-রূপ অমৃতফলের আস্বাদন-প্রয়াসীদের মধ্যে নানা মতভেদ, বৈষম্য, এমনকি বিসম্বাদ। এই মতভেদের কাব্যাতিরিক্ত ব্যক্তিগত কারণগুলি ছাড়িয়া দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার পরিমাণ অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে রস আস্বাদন অনেকেই করিয়াছেন, তাহার পথও অনেকের পরিচিত। তৎসত্ত্বেও এত মতভেদ দেখিয়া এই বিচিত্র কাব্যরসের উৎস, ধারা ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করিবার বাসনা মনে জাগিয়া ওঠে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে রসের স্থান অতি উচ্চ— তাহা নাকি ব্রহ্মাস্বাদ-সোদর। কিন্তু এ-রস কোথায়? কবিচিত্তে, না কাব্যে, না পাঠকচিত্তে? অথবা কাব্যের ভিতর দিয়া কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার যে-মিলন, তাহার নাম রস? কোন্ কাব্যে কি-পরিমাণে রস আছে, তাহার শেষ মীমাংসা যে আজও হইল না, তাহার কারণ কি এই নয় যে, এ-প্রশ্নের মূলে ভূল আছে? কাব্য ও রস হয়ত আধার-আধের সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে।

এ-সমস্ত প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা করিয়া রসের স্বরূপ বোঝানো ঠিক সম্ভবপর মনে হয় না। কারণ রস অনুভূতির বিষয়। কাব্য বুঝা যায় ও অনেকাংশে বুঝানো যায়, কিন্তু রস অনুভব করিতে হয়...

কাব্য কি-বস্তু এবং রস কেন বুঝা যায় না, ইহার আলোচনা করিতে গিয়া দেখা যায় যে, এই ব্যাপারে দুইটি পৃথক ধারা কাজ করিতেছে: প্রথমটি— কবিচিত্তধারা, যাহা কাব্য সৃষ্টি করে; অপরটি— পাঠকচিত্তধারা, যাহা কাব্য উপভোগ করে।

এই দুইটি ধারার পথে রসের হ্রদ কোথায়? কোন্ গহনের অন্তরালে তাহা আপনার অপার বিস্তৃতি ও অগাধ গভীরতা লইয়া বিরাজ করিতেছে? এ-সন্ধান কাব্যের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে, কারণ কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের মিলন কাব্যর ভিতর দিয়াই সংঘটিত হয়। কাব্যই পাঠকচিত্তের পক্ষে রসে পৌঁছিবার উপায়, আর কবিচিত্তের পক্ষে রস-স্নানের পর তীরে উঠা।

কাব্য-পরিমিতি (১৯৩০), সূত্র

(মিসেস) এম্ রহমান

বাঙ্গালীর ঘরে চৌদ্দ বৎসরের বালিকা মা না হইলে 'বন্ধ্যা' নাম রটিয়া যায়। এলাহিপুরের জমিদার মরহুম কাসেম আলী সাহেবের একমাত্র দুহিতা, হাফেজ কামালুদ্দীন সাহেবের এক মাত্র পুত্রবধূ মোমেনা খাতুনের বাইশ বৎসর বয়সেও সন্তান না হওয়ায় তাহাকে কেবল যে বন্ধ্যাত্বের অগৌরব বরণ করিয়া লইতে হইল তাহা নহে, হাফেজ সাহেব পুত্রের পুনর্বিবাহের নূতন নূতন সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে একটি সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান মিলিল, সমস্ত স্থির, ইস্টারের ছুটিতে বিবাহ। নববর্ষের গেজেটে দেখা গেল হাফেজপুত্র ডিপুটি মনিরুজ্জমান পূর্বপঙ্গে বদলী হইয়াছেন; ডিপুটি-জায়া পূজার ছুটিতে পুত্রের বিবাহের দিন স্থির করিলেন। খোদার মর্জি, পূজোপলক্ষে আফিস বন্ধ হইবার দুই সপ্তাহ পূর্বে মোমেনা খাতুন একটি কন্যারত্ন প্রসব করিল। জমিদার-ভবনে আনন্দের রোল উঠিল, ডিপুটি সাহেবের বিবাহও স্থগিত হইয়া গেল।

চৈত্রমাস; মধ্যাহ্নের স্তব্ধ অবসরে রৌদ্রপ্লাবিত বীরভূম শহরটি যেন তন্দ্রালু হইয়া আসিয়াছে। সদর রাস্তার উপর একটি দোতলা বাড়ির বারান্ডায় নয় বৎসরের একটি বালিকা পাঁচ বৎসরের একটি বালিকাকে 'কনে' সাজাইয়া খেলা করিতেছে। বালিকা দুইটি ডিপুটি মনিরুজ্জমানের কন্যা— সালেমা ও হাসিদা। সালেমা পিতামাতার বড় আদুরে মেয়ে।...

মোমেনা খাতুনের জ্ঞাতি পিতৃব্য, এলাহিপুরের বড় তরফের জমিদার সাহেবের একমাত্র পুত্রের বিবাহ। জমিদার-ভবনে সমারোহের সীমা নাই। অন্তরমহলে রূপের দীপ্তি, উৎসবের কলহাস্য-ঝঙ্কার; নানা স্থান হইতে আত্মীয়া অনাত্মীয়া মহিলারা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। এত বড় মহিলা-মজলিস সালেমা কখনও দেখে নাই। আনন্দের চাঞ্চল্যে যে কাহারও গায়ের রং দিতেছি, তাহারও ছেলে কোলে লইতেছে, সমবয়স্কদের সঙ্গে হাসি-গল্প করিতেছে।

বহুদিন পরে খালা, ফুফু, মামী ও বাল্যসঙ্গিনীদের গৃহে পাইয়া সালেমার মাতাও যেন হারানো কৈশোর ফিরিয়া পাইয়াছেন। নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা ভ্রাতৃবধূকে দেখিয়া সালেমার মাতা চমকাইয়া উঠিলেন, মনে হইল, তবে তো আমার সালেমাও বিবাহযোগ্যা হইয়াছে! খালা মামীরাও একমত হইয়া বলিলেন, "বেটিছেলে সাতে সোনা, নয়-এ রাং, আর দেরী করছ কেন, মা?..." শীগগির মেয়ের বিয়ে দাও।"

মা ও মেয়ে

যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি একজন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একেলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে; বলিবে, "বেটা গাঁজাখোর! ভেবেছে, আমরাও গাঁজা খাই!" কিন্তু স্যার অলিভার লজ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি ভূত দিবারাত্রি পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহ সহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ— অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত সহজ! শুধু একটি পণ্ডিতের নাম— একটি বড়সড় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত— সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে তো সবই মাটি!

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর, এ-কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন্ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ-দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরাণী, বিদ্যা এন্ট্রান্স পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি— আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?

রেলের পাস পাইয়া যে-বৎসর আমি রাজগীরে ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই, ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তুপের উপর দাঁড়াইয়া সেদিন প্রথম আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে-দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কতদিনের কথা! দুহাজার বৎসর, না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শস্প আরও শ্যাম ছিল।

আমি জাতিস্মর। ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানী— জাতিস্মর! উপহাসের কথা, অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার, বোধ হয় বহু শতবার, এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।

অমিতাভ (১৯৩০)

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতৃমাতৃহীন হইয়া মায়া মামা-মামীর স্নেহনীড়ে তাঁহাদের সন্তানদের সহিত সমান আদর-যত্নে লালিত হইয়া আজ কৈশোর-সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে, উচ্চশিক্ষারও সুযোগ পাইয়াছে।

এবার আই এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরেই মায়ার নিরুপদ্রব জীবনে প্রথম অশান্তির উদ্রেক দেখা দিয়াছে। মায়া যদি পরীক্ষায় ফেল করিত, তাহা হইলে না হয় কথা ছিল; কিন্তু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মামী সুলোচনা দেবীর ইচ্ছা নয়, মায়াকে মিছামিছি পড়ানো হয়। আরও পড়িয়া, আর একটা পাশ করিলে যদি জানা যাইত যে, বিয়ের খরচ বাঁচিয়া যাইবে, তাহা হইলে আর কথা কি ছিল— অনায়াসে পড়ানো যাইত। কিন্তু সে-গুড়ে যখন বালি, পাশ করিলেও বিবাহের খরচ কমিবে না, তখন আর খরচ বাড়াইয়া লাভ কি? তাঁহার বড় মেয়ে নির্মলাও ত তিনটে পাশ করিয়াছিল, তবে তাহার বিবাহ দিতে নগদ দশটি হাজার টাকা দণ্ড দিতে হইল কেন? পাশ-করা মেয়ে বলিয়া ত বরের বাবা ছেলের দর নামায় নাই। এখনো যে মাসে মাসে সেই বিয়ের দেনা শুধিতে হইতেছে!

গৃহিণীর যুক্তি শুনিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ও বুঝিলেন যে, কথাটা মিথ্যা নয়, মেয়েকে পাশ করাইবার জন্য মাসে মাসে কিছু খরচ করিয়া যাওয়া যত সহজ, বিবাহের জন্য এক কাঁড়ি টাকা বাহির করা তত সহজ নহে। সুতরাং স্থির হইল, মায়ার বিবাহ দিতে হইবে এবং মামী ঘটকীদের ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে, অল্পে স্বল্পে হয়, মাথা রাখবার ঠাঁই আছে, খেতে পরতে পায়, এমন পাত্র হইলেই যথেষ্ট— আসছে অগ্রহায়ণেই মেয়েকে তিনি যেমন করিয়া ঠিক পার করিবেনই।

মায়া কিন্তু তাহার বান্ধবীদের সহিত পরামর্শ করিতেছিল, বি এ পড়িবার জন্য কোন্ কলেজে ভর্তি হইবে এবং কিরূপ কম্‌বিনেশন লইবে। এমন সময় এই নির্ঘাৎ সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

মায়া কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইল, খাওয়া বন্ধ করিল। কিন্তু মামীকে সঙ্কল্পে অটল দেখিয়া মায়া দৃঢ় স্বরে জানাইল: "বিয়ে আমি করব না, কিছুতে না। এই আমার পণ।"

সুটকেশের উপাখ্যান

গিরীন্দ্রশেখর বসু

ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে যে-ডোবা আছে, তার একদিকে কালো পিপীলিদের রাজ্য আর একদিকে লাল পিঁপড়েদের রাজত্ব। দুই রাজত্বে বিশেষ বনিবনাও নেই। কালো ও লাল পিঁপড়েদের মধ্যে প্রায়ই খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া মারামারি হয়।

আজ বড়ই গুমোট করেছে, পিপীলিদের কালো বউ ডোবার ধারে জলে নিতে এসেছে। কালো বউয়ের রূপের ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়ে না। তার উপর যে কালো রাণীর পেয়ারের সখী। এ-ঘাটে যখন কালো বউ জল ভরছে, ডোবার ওপারে লাল পিঁপড়েদের একদল পল্টন কুচকাওয়াজ করতে এল। পল্টনের দলের এক ডেঁপো ছোকরা কালো বউকে দেখে সুড়সুড় করে এপারে এগিয়ে এসে হাতমুখ নেড়ে কালো বউয়ের উদ্দেশে ঠাট্টা-তামাশা জুড়লে। কালো বউ রেগে ঘাড় বেঁকিয়ে, ঘাট থেকে উঠে এসে গালাগালি দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলল, লাল ডেঁপো গান ধরলে, "কালো বউ কালো কোলো; জলে ঢেউ সামলে চোলো।"

কালো বউ একেবারে হন্‌হন্ করে রাণীর কাছে উপস্থিত হয়ে আছড়ে পড়ল। "কি হল, কি হল?" বলে রাণী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন...

রাণী সব কথা শুনলেন। "এক্ষুনি এর প্রতিকার করব। সখী, আমরুলপাতা আর বেলকাঁটা নিয়ে আয়। আমি রাজাকে লিপি পাঠাই।"

চিঠি লেখা হল, সাঁড়াশীমুখো প্রতিহারী শুঁড় বেঁকিয়ে লিপি নিয়ে রাজসভায় গেল। কালো পিপীলিদের রাজা পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে সজনেতলার সভা কালো করে বসেছেন। ডাইনে কালো মন্ত্রী, বাঁয়ে কেলে কোটাল সেনাপতি। সভায় সড়সড়ে পিঁপড়ে ফরফর করে এদিকে-ওদিকে ঘুরে খবরদারি করছে। অর্থী প্রার্থী সব জোড়হাতে শুঁড় নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময়ে প্রতিহারী ঝুঁকে মাটিতে শুঁড় ঠেকিয়ে রাজাকে অভিবাদন করলে। রাজা চিঠি পড়লেন। পড়ে মন্ত্রীর হাতে দিলেন। বললেন, "মন্ত্রী, এর কি বিহিত করা যায়?"

লাল কালো (১৯৩০)

ঈদের উৎসবের দিনে বৃদ্ধ বয়সে আজ সব একে একে মনে পড়ছে।

একমাত্র কন্যা হামিদা যেদিন তার মাকে হারালো, সেদিন যে-ব্যথা পেলাম, তা আজও ভুলতে পারি নি। হামিদার কঠোর কণ্ঠের করুণ আহ্বান "মা, মা, তোমার সোহাগের হামিদাকে ছেড়ে গেলে!" আজও মনে পড়ে। আর আজও মনে হয়, সকলের গোপনে হামিদার বুক-ফাটা করুণ ক্রন্দন...

হামিদার মাকে দাফন-কাফন করবার জন্য যেদিন প্রতিবেশীদের ডাকলাম, তারা এল, আমার উপরে আরও কিছু বোঝা বাড়াবার জন্য। খেতে না দিলে তারা কেউ দাফন-কাফন করতে স্বীকৃত হল না। অগত্যা দু বিঘা জমি বিক্রি করে সর্বনেশে লোকের বহুদিনের গোপনে সঞ্চিত বিশ্বগ্রাসী জঠরানলের পূজা করলাম। পূজা শেষ করলাম হামিদার বুকের খুন নিয়ে...

শেষে কাজ করবার মজুরের জীবনী বইতে লাগলাম। পাড়াপ্রতিবেশীর আবদার তবুও এখনো যায় নি; তারা চায় বড় একটা 'মজলিস', হামিদার মা-র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য। হাত-পা ধরে অনেক সাধ্যসাধনার পর তবে তাদেব একটু শান্ত করেছি। কিন্তু যখনই তারা সুযোগ পায়, তখনই আমাকে 'একঘরে' করে রাখবার ভয় দেখায় ও নানারূপ অকথ্য কথা শুনিয়ে দেয়। প্রতিবেশীর কূপে পানি আনতে গেলে আমার অভাগিনী কন্যা হামিদার প্রতি কত বিদ্রুপ-বাণ ছুঁড়ে দেয়, গরীবের মাটির কলসি ভেঙে চুরমার করে ফেলে...

আজ ঈদের দিন— উৎসবের মহা ধূমধাম। ধনীর গৃহ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। মাথায় টার্কিশ টুপি, পরণে পাজামা, গায়ে চাপা চোপকান, পায়ে ডারবী-সু। আবার পোষাকের উপরে আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি... ঈদের নামাজ পড়তে গেলাম, বড় বড় পাগড়ি-মাথায় হাদিস-বিশারদ মৌলবী-মুন্সিরা এক গাড়ি হাদিস-ফেকা খুঁজে বলল, "এবার চার আনা করে ফেতরা দিতে হবে; তা না হলে ঈদের নামাজ আর এক মাসের রোজা সমস্তই বরবাদ হবে, খোদার দরগায় কবুল হবে না।"

ঈদ (১৯৩০)

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভট্টাচার্য মহাশয়দের একান্নবর্তী পরিবার এতদিন সুখে স্বচ্ছেন্দে বাস করছিল। সকালে ঠাকুরপুজো থেকে আরম্ভ করে শ্রীমণ্ডপের সান্ধ্যসম্মিলনের তাসভাঁজা ও তামাক-সাজা পর্যন্ত এমন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, দেখে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হয় যে, হ্যাঁ একটা সদ্‌ব্রাহ্মণ বটে! বাহ্যিক ও আন্তরিক দুই প্রকার শাসনের দৃঢ়বন্ধনে বাড়ির ছেলেমেয়ে বড়-ছোট এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, তারা সচল কি অচল, এ-প্রশ্ন অদ্যাপি কারো মনে জাগে নি। বাহিরের অশুচিসংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে এমন পবিত্র জীবনযাপন কলিকালে দুর্লভ! অন্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীদের অস্তিত্ব এমন রহস্যময় যে, তাঁদের কর্মজীবনের ক্ষুদ্র পরিধির দুর্গপ্রাকার ভেদ করে, এমন সাহস বিশ্বচারী আলো-বাতাসেরও ছিল না— মানুষের কলুষদৃষ্টি তো দূরের কথা এহেন পরিবারের বহুযত্নগ্রথিত কারাপ্রাচীরের লৌহদ্বারের অর্গল ভেঙে অর্বাচীন ছোকরা এক যখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে এক লাফে নেমে নিম্নশ্রেণীর মজুরদের সঙ্গে জুটে তাদের সর্দার হয়ে লিভারপুল শহরের নৌ-কারখানায় পৌঁছল, তখন বাপ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন, মাতৃব্য-পিতৃব্য সবাই তার নরক-গমনের পথ সুপ্রস্থ করলেন, আর ছেলেপিলেগুলো আমবাগানে ঢুকে বলাবলি করতে লাগল: আমরা একবার লুকিয়ে সাহেবের খানসামার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রুটি-মাখন মুর্গির ডিম খেয়েছিলমু, দাদা বোধ হয় রোজ তা-ই খাচ্ছে, কি মজা!

লিভারপুল থেকে বিবিকে নিয়ে যখন দেশে ফিরল, বাড়ির চৌকাঠ পেরোবার আগেই বাপ বললে, "দূর হও!" অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র বললে, "তথাস্তু! তোমার বাঁধন তোমার থাক! আমার পথযাত্রায় আমায় মুক্তি দাও।"

অক্ষুব্ধ শান্তিসমুদ্রে অশান্তির ঝঞ্ঝা এসে লাগল। দুইয়ের সংঘাতে অন্তরের ও বাহিরের প্রাণতরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করল। বাঁধন গেল ছিঁড়ে, বাধা গেল ধূলিসাৎ হয়ে, আর এই ভগ্নস্তূপের উপর আনন্দযজ্ঞের হোমশিখা দীপ্ততেজে জ্বলে উঠল...

আমাদের সঙ্গীতের অবস্থাও কতকটা এইরকম। ক্লাসিকাল ম্যুজিক বলতে আমরা বুঝি হিন্দী গান। তার বড় বড় ইমারৎ, কেল্লা ফৌজ, তার প্রাকারের পর প্রাকার প্রাচীরের পর প্রাচীর দেখে স্তম্ভিত হই, বাহবা দিই। প্রাচীন-স্মৃতিসৌধরক্ষাসমিতি সেগুলি সযত্নে রক্ষা করছেন, কিন্তু দৈনিক জীবনযাত্রায় সেগুলো কোন কাজে লাগে না। সেই বিরাট প্রাসাদ-রচনার মালমশলা নিয়ে নিজের মনের মত করে ছোটখাটো কুটির রচনা করেই আমার আনন্দ।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (১৯৩০)

এস ওয়াজেদ আলি

পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকট ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলাকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত একটা টাক, চারপাশে তার ধপধপে সাদা চুল; নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা, গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক-একবার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুনত, আবার খদ্দের এলে গিয়ে তাদের দেখাশুনা করত। আমারই বয়সী একটি ছেলে, খালি-গায়ে, বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত, বিষয়টি তারা বিশেষভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কি পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতুহল হল। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কী করে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁচেছিলেন, তা-ই ছিল পাঠের বিষয়... আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম, তা-ই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই বা কী করেছিলেন, তা তখন জানতে পরি নি।

দু-চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই...

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম ঘর বাড়ি সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ম্যান্‌শন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু-চারটে রিক্সা আর ঘোড়ার গাড়িই সে-পথ দিয়ে যেত; এখন বড়ো বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত; এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। জিনিসপত্র ঠিক আগের মতো সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধ হয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি।

মাশুকের দরবার (১৯৩০), ভারতবর্ষ

রামনাথ বিশ্বাস

কোনরূপ ভূমিকা না করেই বলছি, তুর্কীর সীমান্তে পৌঁছেই মনে হল, আমি বিদেশের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি... মনে হল, কি করে দিন কাটবে, ইউরোপের লোক কেমন হবে, ইউরোপের লোকের সঙ্গে কি করে খেতে এবং শুতে হবে, ইত্যাদি নানা কথা। এরূপ চিন্তা মাথায় গজাবার একমাত্র কারণ হল, যে-সকল ভারতীয় বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইউরোপ ভ্রমণ করে বই লিখেছেন, তাঁরা ইউরোপের মাহাত্ম্য এত বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, আমরা ইউরোপের কথা ভাবলেই যেন ঘাবড়িয়ে ভীত হয়ে পড়ি। তাছাড়া ইংরেজ জাতের ভারতে পদার্পণের পর যে-সকল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বৃটিশের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা গ্রামে গিয়ে ইংরেজ মাহাত্ম্য এমনই করে বলতেন যে, তার ফলে লোকের মনে ইউরোপীয়দের স্থান দেবতার স্থানের চেয়েও উপরে উঠেছিল। আমি যেরূপ আবহাওয়াতেই বর্ধিত হয়েছিলাম; সেইজন্যই তুর্কীর সীমান্তে এসে থমকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল।

১৯৩১ সালে চীনাদের অন্তর্বিপ্লব, মানচুরিয়ায় জাপানীদের বিজয়ডঙ্কা শুনে, দুর্দান্ত বেদুইনের সঙ্গে থেকে, হৃত সাম্রাজ্যমদে মাতোয়ারা তুরুকদের সংস্পর্শে এসেও মনে ভয় হয় নি। কিন্তু আজ এই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এবারে আমি ইউরোপ যাচ্ছি। ভারতীয় বিলাত-ফের্তারা নাকিসুরে যাকে 'বিলেত গিয়েছিলুম' বলেন, আমি সেই বৃহত্তর বিলেতের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এটাকেই বলে বিলাত-যাত্রা। ইউরোপ হল বাবুদের স্বর্গভূমি আর দেশীয় রাজাদের পুণ্য অর্জনের স্থান। এরূপ স্থানে ভ্রমণ করতে পারব কি?... যখন এইভাবে আমি চিন্তা করছি, তখন ফেজধারী একজন লোককে দেখে আমি আর না হেসে থাকতে পারলেন না। লোকটি বুলগেরিয়ার সীমান্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ফেজ নানা রকমের, ইউরোপের অনেক স্থানেই ফেজের প্রচলন আছে, কিন্তু লাল রঙের ফেজ তুরুকরাই ব্যবহার করত। এখন আসল তুর্কীর লোক তা পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু যে-সকল তুরুক তুর্কীর বাইরে রয়েছে, তারা সেই পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে নূতন আচার-ব্যবহার গ্রহণ করতে পারছে না: ফেজ এখনও তাদের মাথার ভূষণ হয়েই রয়েছে।... ফেজ-পরা লোকটিকে সামনে দেখতে পেয়ে ভাবলাম, আমার মত অনেক দীনভাবাপন্ন লোকও ইউরোপে রয়েছে, তাই মনে সংশয় একেবারে দূর করে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চললাম।

বিদ্রোহী বল্‌কান, সোফিয়ার পথে

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইস্কুলের ছুটির সময় গ্রামে এসে গল্প শুনতে পেতাম। এক গোমস্তা ছিলেন, বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত, কিন্তু এত গল্প জানতেন ও বলতে পারতেন যে লোকে তাকে গল্পের 'ধুকড়ী' বলত। পরে দেখেছি, তাঁর লোমহর্ষণ গল্পের কোনটা দশকুমার-চরিতের, কোনটা বেতাল-পঞ্চবিংশতির, কোনটা বত্রিশ-সিংহাসনের। ভোজ ও ভানুমতীর ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কাহিনী কোথায় পেয়েছিলেন, জানি না: তিনি মুখে মুখে শিখেছিলেন। নায়ক-নায়িকার নামে ভুল হয়েছিল, কিন্তু কাহিনীর বস্তু প্রায় একই। স-সে-মি-রা কাহিনীতে শুনেছিলাম, বিক্রমাদিত্যের মহিষী তিলোত্তমার উরুতে তিল ছিল, রাজমন্ত্রীর বধূবেশে কবি কালিদাস রাজপুত্রকে চারি শ্লোক শুনিয়ে উন্মাদ রোগ হতে মুক্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, সে-চারি শ্লোক গোমস্তার মুখস্ত ছিল, ভাষায় কিছু কিছু ভুল ছিল, কিন্তু অর্থ বুঝতে বিঘ্ন হত না। বিক্রমাদিত্যের সাহস ও বীরত্ব একবার শুনলে মনে গাঁথা রয়ে যায়। সে-সব কথা আরব্যের নয়, পারস্যের নয়। এ-দেশেরই ধর্মবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, দানবীরের কথা। শুনলে উৎসাহ হয়, চিত্তের প্রসার হয়, জড়তা দূর হয়। হাসির গল্পও ছিল। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, নাপিতের ধূর্ততা, তাঁতীর মুর্খতা, চোরের বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রচলিত হয়ে দেশবাসীর নিকটে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামায়ণ ও ভারত পাঠ, রামায়ণ মহাভারত ও চণ্ডীর গান, কৃষ্ণযাত্রা ও শ্যামযাত্রা গান, বৈষ্টমের কীর্তন, বাউলের গান আর এই সকল কাহিনী গ্রামবাসীকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিত। সে-সব দিন কোথায় গেল, আর আসবে না। এই বই পড়ে গল্প শিখতে হচ্ছে।

কিন্তু গল্পেরও গুণ চারি আনা, কথকের গুণ বার আনা। দেবদত্ত শক্তি না থাকলে কথক হতে পারা যায় না। সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম, দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি বলত, বিশ-পঁচিশ জন একসঙ্গে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে পড়ত। দক্ষিণ বাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষঃলগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত কখনও অনুদাত্ত হত। লোকটি দেবদত্ত শক্তি নিশ্চয় ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা কথা জীবন্ত হয়ে উঠত। গল্পলেখকের সে-সুবিধা নাই। লেখককে ভাষার দ্বারা কথক হতে হয়।

কি লিখি?, গল্প (১৯৩১)

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বি এ ফেল করিয়া ঘর ছাড়িলাম। মাতৃকূল পিতৃকূলের ত্রিসীমানায় কেহ ছিল না, সুতরাং গতি আমার অবাধ।

ফেল করিয়া দুঃখ করি নাই, সংবাদ শুনিয়া কবিতার খাতার প্রথম পাতা খুলিয়া কহিলাম, "ওগো তোমারই জন্য এই যে ব্যর্থতা— এ তো আমার পুরস্কার! কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ নাই!" অক্ষরগুলি কথা কহিল না; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে রচিত এই ছন্দের মালা তাহার প্রসন্ন উজ্জ্বল তৃপ্তিভরা চক্ষু দুটি স্পষ্ট খাতার পাতায় ফুটিয়া উঠিল।

সে আমার কৈশোরের আনন্দের স্বপ্ন— মঞ্জুলতা। মঞ্জুলা বলিয়া ডাকিতাম। আমার প্রতিবেশিনীর তেরো বৎসরের কন্যা। এনট্রেন্স পাশ করিয়া সহরে গেলাম। এফ এ পাশ দিয়া ফিরিয়া শুনিলাম, মঞ্জু অপরের গৃহ আলো করিতে চলিয়া গেছে। সে-দিনের সেই আঘাত! সে কি নির্মম!

কবিতার মধ্যে স্বস্তি খুঁজিলাম। দিনের পর দিন বিচিত্র ছন্দে আমার খাতার পাতায় জীবনের এই মূর্তিময়ী কামনার স্তব ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু এই খাতাখানি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন বন্ধন ছিল না। কলেজের বাহির দিকে চাহিতেই মনে হইত, ইহাদের জন্যই মঞ্জুকে হারাইয়াছি। পুঁথির পাতায় মন বসিত না। বি এ ফেল করিলাম।

...মঞ্জু আজ ষোল বছরের। ষোটটি বসন্তের রূপ ও আনন্দের অপূর্ব সঞ্চয় আজ অপরের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আছে। শুধু আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব, আমি একা। কোনো লক্ষ্য ছিল না; দুই বৎসর ভারতের নানা স্থানে ঘুরিলাম। হৃদয়ের রিক্ততা ঘুচিল না, শুধু কবিতার খাতা মঞ্জুলতার নব নব রূপ-বন্দনায় ভরিয়া উঠিল।

মাঝে মাঝে মনে একটি খোঁচা লাগিত: মঞ্জু পরস্ত্রী। পর মুহূর্তেই মনের এ-দুর্বলতা মুছিয়া ফেলিতাম। শাস্ত্র আর হৃদয়ের বিরোধ চিরকালকার। জানিতাম, হৃদয় যাহাকে চাহে, শাস্ত্র তাহার বিচিত্র বিধি-নিষেধের যবনিকা দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়। তারপর প্রেম? সে কোনো বন্ধন, কোনো সংস্কার, কোনো নিষেধ মানে না। মঞ্জু আজ পরস্ত্রী, দুর্লভ। মনে ভাবিতাম, ইহাই বিধাতার বিধান— আমার হৃদয়কে ব্যথতায় ভরিবার জন্য, আমার কবিতাকে সার্থক করিবার জন্য।

দিবাকরী (১৯৩১), অভিসার

অবনীনাথ রায়

ভারতবর্ষীয় বিবাহপদ্ধতির মধ্যে তার সামাজিক কি অভিপ্রায় ব্যক্ত হচ্ছে বুঝতে হলে আমাদের সমাজ-জীবনের তথা ভারতীয় সভ্যতার ভিতরকার তত্ত্বটি বোঝা চাই। ভারতীয় সভ্যতার ধারা হচ্ছে নিবৃত্তিমূলক— এখানে প্রবৃত্তির জয় গাইবার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং যে-দেশে ত্যাগ এবং নিবৃত্তির চর্চা হয়ে থাকে, সে-দেশে সমাজের মূল উপাদান ব্যক্তি নয়, গৃহ। এই গৃহকে গৃহাশ্রম নাম দিয়ে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হয়েছে, এবং যারা দুর্বলেন্দ্রিয়, মনুর মতে তারা এই আশ্রমের অযোগ্য। সুতরাং হিন্দু স্ত্রী প্রেয়সী নয়, গৃহিনী, যৌথ পরিবারের অঙ্গবিশেষ। এই পরিবারে স্ত্রীপুরুষের প্রেম বলে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আছে, তাকে অতিক্রম করে দাম্পত্য প্রেম নামক একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে গড়ে তোলবার সাধনা ছিল। কিন্তু এ-কথা আমাদের মনে রাখা চাই যে এ-দেশে গৃহকেও চরম বলে স্বীকার করে নি, এখানকার গৃহাশ্রম বানপ্রস্থের পূর্বাশ্রমমাত্র। মুক্তির অন্বেষণে একদিন গৃহকেও ত্যাগ করতে হবে, এই ছিল ভারতসমাজের উপদেশ। এবং উক্ত আদর্শকে সম্ভব করে তোলবার জন্যে আমাদের দেশে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। যে-ইচ্ছা স্ত্রী পুরুষের মিলন ঘটায়, তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমত করা-ই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভাল। বিবাহের পূর্বেও নানা কথাকাহিনী ব্রতপূজার মধ্য দিয়ে তাদের মনকে এই আদর্শের উপযোগী করে গড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা। ফলে স্বামী তাদের পক্ষে একটা আইডিয়া— যতটা তাদের নিজের মনের জিনিস, ততটা বাইরের জিনিস নয়। সমাজে সতী স্ত্রীর মাহাত্ম্যকীর্তনের যে-ব্যবস্থা আছে, তাতেও এই উদ্দেশ্য পরিপুষ্টি লাভ করে।

এই রকম করে আমাদের যে-সমাজ গড়ে উঠেছে, সে যে আদৌ চলিষ্ণু নয়, এ-কথা বলা বাহুল্য। এ-সমাজের স্থিতির দিকেই লক্ষ্য, গতির দিকে নয়। তাই মন্দিরের মত জরাজীর্ণ আচার অনুষ্ঠান আঁকড়ে স্থাবর হয়েই যে রইল বৃক্ষের মত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আলো-বাতাস সে গ্রহণ করতে পারলে না। এই রকম ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-সৌধের একখানি ইঁট নড়তে দিলেও ক্ষতি। তাই এখানে সতকর্তার অন্ত নেই; চলাফেরা সম্বন্ধেও তার এত সাবধানতার বাণী। বিবাহ সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সে খাতির করে না, ভয় করে, তাই প্রাণপণে দাবিয়ে রাখতে চায়। কেননা আচারই তার বাহন, বিচার নয়।

পাঁচ-মিশেলি (১৯৩১), বিবাহ-সমস্যা ও 'দেবদাস'

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বর্তমানে বাঙালী জাতি আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। একেই ত রাজনীতিক কারণে বাঙলার বাহিরে বাঙালীর জীবিকার্জনের দ্বার রুদ্ধ, তাহার উপর তাহার মাতৃভূমি এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশেও তাহার অন্ন উঠিবার উপক্রম হইতেছে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থ বাঙালীর তো কথাই নাই। তাহাদের ঘরে যত বেকার, বোধ হয়, জগতের আর কোন শ্রেণীর মধ্যে তত নাই। যে-বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার সহিত বাঙালীর সম্পর্ক নাই; হয়ত দুই-চারি দিন হইতে সে-সম্পর্ক পাতান হইতেছে কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কয়জন? হয়ত দুই-চারিজন খুচরা দোকানদার বাঙালী আছে। কৃষিকার্যেও অর্ধেক লক্ষ্মী, কিন্তু তাহা এত ভরপুর যে, সেখানে আর স্থান নাই। ভরসা ওকালতি, ডাক্তারি অথবা চাকরি! সেদিকে একেবারেই স্থানাভাব।

ইহা ছাড়া বাঙালীর স্বকৃত অপরাধেও ঘাট নাই। বাঙালীর কর্মবিমুখতা, শ্রমে আতঙ্ক, আলস্য ও আরামপ্রিয়তা বাঙালীকে জীবনসংগ্রামে মরণের পথে লইয়া যাইতেছে। বাঙালার বাহিরের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালী এই সকল দোষে পারিয়া উঠে না। বাঙালী ধ্বংসের পথে যাইবে না কেন?

বাঙালী স্বেচ্ছায় এই অপরাধকে পুষিয়া রাখিয়াছে। উহার প্রতিকারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহা যদি আত্মহত্যা না হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা কি, আমি জানি না। কেবল কি কর্মবিমুখতা? অপকর্মেও বাঙালী অগ্রণী। যে দোষগুলি মানুষকে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়, সেগুলিতে বাঙালী যত সহজে ও সত্বর অভ্যস্ত হয়, তত বোধ হয় আর কোন জাতি নহে। ইহার মধ্যে একটা মহৎ দোষ চা-পান...

নূতন আমদানী সভ্যতার মাপকাঠি এই চা! চা না হইলে বাঙালী গৃহস্থের ঘর-সংসার একদিনও চলে না। ভদ্র, শিক্ষিত, ইতর, অশিক্ষিত সকলের ঘরেই চা চাই-ই! ইহার ফলে বাঙালীর ধনের ও স্বাস্থ্যের প্রতিদিন কত অপব্যয় হইতেছে, তাহা কয়জন বাঙালী ভাবিয়া দেখেন?

চা-পান ও দেশের সর্বনাশ, বাঙালীর আত্মহত্যা (১৯৩১)

ম্যাদ্‌লেইন মন্দিরে ধূপধুনার গন্ধ শুঁকিলাম, আরতি দেখিলাম, ঘণ্টা বাজানো শুনিলাম, সাধা গলায় 'সামগান' শুনিলাম। দেখিলাম না কেবল পাঁঠাবলি। তাহা ছাড়া হিন্দুবৌদ্ধ ধর্মের ষোলকলাই মজুদ আছে। ডানাওয়ালা পরীর আবেষ্টনে মেরী দেবীর মূর্তি। এখানে ওখানে অমুক ঋষি বা অমুক দেবতা, হয় চিত্র না হয় প্রস্তরমূর্তি।

আর বড়দিনের সময় প্রদর্শিত হইয়াছিল নিরেট জন্মাষ্টমী। শিশু-যীশু গোয়াল-ঘরের বাথানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ভেড়ার পাল, গরুর পাল, গোয়ালার পাল আর রাজার পাল শিশু দেবতার পূজায় উপস্থিত ইত্যাদি।

প্রধান পুরোহিতের বক্তৃতাটা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। বাজখাঁই গলা— লোকেরা একমনে শুনিতেছে। সোনালী জরিওয়ালা শাল চড়াইয়া আলখাল্লা পরিয়া পুরোহিতেরা বেদী গুলজার করিয়া রাখিয়াছেন। বালখিল্যের দল লাল ঘাঘরার উপর সাদা জ্যাকেট পরিয়াছে। নেপোলিয়ান টুপি মাথায় দিয়া চোপদার মহাশয় পুরোহিতদের জন্য দক্ষিণা মাগিতেছেন। অর্গ্যানের বাজনা শুনাইল ভাল। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময়ে লোকেরা তীর্থজলের ফোঁটা কপালে ও বুকে ঠেকাইতেছে।

প্রায় গোটা ফ্রান্সই এই ধর্মের পরিপোষক। বুড়াবুড়ী ছাড়াও এই প্রকাণ্ড মন্দিরে অনেক লোক দেখিলাম। তাহারা উচ্চশিক্ষিতও বটে আর পয়সাওয়ালাও বটে। ইহারাও বেদির সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করে। ধর্মের কুসংস্কারগুলা পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া না দিলে যদি মানুষের বৈজ্ঞানিক ও সাংসারিক উন্নতি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে ফ্রান্স অন্ততঃ বিজ্ঞানে ও শিল্পে যারপরনাই পশ্চাৎপদ থাকিত। কিন্তু দেখিতেছি ঠিক উল্টা। ল্যাটিন ভাষায় অবোধ্য মন্তর আওড়াইয়া, প্রতিমা-পূজা করিয়া, যীশুর পুতুল বুকে রাখিয়া, মা মেরীর মানত করিয়া অসংখ্য ম্যাদ্‌লেইন মন্দির হজম করিয়া— এই শ্রেণীর অনেকানেক অবৈজ্ঞানিক কাণ্ডে মসগুল থাকিয়াও ফরাসীরা বর্তমান জগতের বহু বিজ্ঞানেরই প্রবর্তক হইতে পারিয়াছে। প্রটেস্টান্টিজম্ বা ধর্মসংস্কারের চরম বিরোধী রহিয়াও ক্যাথলিক মতাবলম্বী নরনারী বিজ্ঞান-চর্চায় অগ্রণী হইতেছে। ভারতবর্ষে এই কথাটা তলাইয়া বুঝা আবশ্যক।

প্যারিসে দশ মাস (১৯৩২), খৃষ্টান সমাজে হিন্দুয়ানি

কি সে আনন্দ যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, "আনন্দাদ্ধ্যোব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"?

কোথায় সে-আনন্দের প্রস্রবণ, যাহার চতুর্দিকে উৎসারিত হইয়া এই সমগ্র চরাচর বিশ্বকে সুখময়, শান্তিময়, প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছে? যেদিন প্রথম প্রভাতে ইতস্ততঃ আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় নাই, যেদিন বিহগ-বিরাবে সঙ্গীতের কলকাকলি শ্রুত হয় নাই, যেদিন গগনে, প্রান্তরে, শৈলসিন্ধুতে, বন-উপবনে আনন্দের বেণু-বীণা বাজে নাই, সেদিন বিশ্বসৃষ্টি তাহার প্রলয়রাত্রির জড়ত্ব পরিহার করিয়া উঠিতে পারে না। সেদিন হয়ত সঙ্গীত ছিল, মধুরতা ছিল না; রূপ ছিল, প্রেম ছিল না, চরিত্র ছিল, মহনীয়ত্ব ছিল না। তারপর একদিন কোন-এক শুভমুহূর্তে কাহার ইচ্ছায় আনন্দের একটি ঢেউ বহিয়া গেল; আর অমনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তড়িতের প্রভাবে কম্পিত, মুগ্ধ, অণুরণিত, হইয়া উঠিল, ঈষদুদ্ভিন্ন দুর্বাদল হইতে সুদূর গ্রহনক্ষত্র পর্যন্ত একটি দিব্য স্পন্দন অনুভূত হইল। সে-স্পন্দন, মহাপ্রাণের এক বিশাল বিরাট আনন্দোৎসব। যেখানে যাহা কিছু আছে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, নিকটে কি দূরে, ভূগর্ভে কি অন্তরীক্ষে, সকলেই সেই আনন্দসত্তার সংক্রামক স্পর্শে চঞ্চল ও বিচিত্র তাল-লয় লীলা, পতঙ্গের পক্ষপুটে কত নিপুণ বর্ণসমাবেশ, গগনের সীমাহীন বিশালতায় কত রহস্যপূর্ণ মহান ভাবের আবির্ভাব! সৃষ্টির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেন রূপ, রস, সঙ্গীত, সৌরভের এক অমৃত বন্যা বহিয়া গিয়াছে! আর তাহারই ক্ষুদ্র বৃহৎ লহরীগুলি ধরিবার জন্য মানবের চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র হইতে ব্যাকুলতা জানাইতেছে।

সুখ দুঃখ (১৯৩২), সুখ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পুরন্দরের হচ্ছে নর্ম্যান টাইপের চেহারা, বছর আটাশ বয়েস, তেজী মজবুত শরীর, জোরালো চোয়াল আর চওড়া থাবা, উদ্ধত নাকে দৃপ্তি আর উন্নত কপালে উজ্জ্বলতা— ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা; আর দুই চোখের দৃষ্টি কামনায় তীক্ষ্ণ, কামনায় গভীর, কামনায় করুণ। শরীরে যেমন সামর্থ্য, মনেও তেমনি সক্রিয়তা— একদণ্ড সে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না, তার স্নায়ু-শিরায় রক্তের প্রবাহ যেমন অবিরাম, সৌররঙ্গমঞ্চে পৃথিবী যেমন নিয়তঘূর্ণ্যমতী, তেমনি সব সময়েই পুরন্দরের শরীরে সচল বেগ, সবল উৎসাহ, অজস্র উদ্দামতা। মন তার উন্মুখর বর্ষাবিস্ফারিত ঝর্ণার মতো কর্মের স্রোতে সমস্ত দুঃখ সমস্ত ভাবুকতা প্রভাতের জ্যোতির্বন্যার সমুখে নিস্তেজ তারকাকণার মতো সে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। 'সময় নেই' প্রতি স্নায়ু-শিরায় এই তার চিরমুহূর্তের হাহাকার, উত্তপ্ত স্পর্শে প্রতিটি মুহূর্তকে সঞ্জীবিত ক'রে, অনন্তকালের ক্ষণিক অনুগুলিকে নিংড়ে-নিংড়ে মধু বা মদ, সুধা বিষ ভোগ ক'রে লেহন ক'রে তবে সে এগিয়ে চলে, ঝাপটা দিয়ে চলে, নিজেকে বিকীর্ণ করতে করতে অগ্রসর হয়। হাতে জমিদারি, তবু তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া না টেনে, মোসাহেবের ভিড়ে ব'সে মদ না খেয়ে, মেয়েমানুষ না রেখে সমস্ত সাবেকি চাল উলটে দিয়ে পুরন্দর বিশাল আকাশের নিচে উন্মুক্ত ও উদ্দাম পাখা বিস্কার ক'রে আশ্রয় থেকে বহুতর আশ্রয়ে, আনন্দ থেকে গাঢ়তর আনন্দে, চেতনা থেকে তীব্রতর চেতনার অভিযান শুরু করেছে।

কিন্তু তাকেই কিনা বিয়ে করতে হল। কবে কখন আকাশ ছিল ম্লান, মুহূর্তটি এল স্তিমিত হয়ে, রোগাক্রান্ত পুরন্দরের দৃষ্টি হল আচ্ছন্ন, পুরন্দর আধো তন্দ্রার আবছায়ায় অস্তিত্বের মাঝে কোথায় যেন একটি শব্দহীন বিরলতার সন্ধান পেল, বিয়েতে মত দিয়ে বসলে। বাড়ি জাঁকিয়ে উৎসব হল শুরু, বন্ধুরা ট্রাজেডির অভিনয় দেখতে এসে পেট পুরে খেয়ে একই বিছানায় পুরন্দর সীতাকে বাকি জীবনটা বিশ্রাম করতে ব'লে বিদায় নিল।

সীতার মাঝে আধুনিকতার ক্ষীণতম আমেজটুকুও ছিল না, কিন্তু যা কোনো কালের নয়, অনন্তকালের কবির কাব্যের মতো— সর্বাঙ্গে তার সেই রূপ, সদ্যজাগ্রত চোখে ঘুমের তরল আভাসের মতো কৈশোরের ক্ষীণ একটু লজ্জা ও জড়িমা এসে সেই রূপকে করেছে আরক্তিম ও শুচিস্মিত, আভায় এনেছে সন্ধ্যার কোমলতা। স্ত্রীকে দুই রাত্রি পাশে রেখে শুয়েই পুরন্দর বুঝেছে এ-রূপে দীপ্তি আছে তো তাপ নেই, এবং আরো দুমাস কাটিয়ে সে বুঝল এ-রূপে প্রাচুর্য আছে বটে, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই।

প্রাচীর ও প্রান্তর (১৯৩২), এক: নূতন নেশা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'বিশ্ব' কথাটি সর্বদাই যুক্ত থাকে। কি-অর্থে এই কথাটি প্রযোজ্য ভেবে দেখা উচিত। যাঁরা জ্ঞানী পাঠক, তাঁরা দেখিয়ে দিতে পারেন কাব্যের কোন্ উপকরণ দেশ ও কাল্যের অতীত, কোন্ পদ্ধতি সার্বভৌমিক, কোন্ লিখন-ভঙ্গী অমর। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তার উপাদানের ও উপাদান-সংযোগের চিরন্তন মূল্য যাচাই করা সাধারণ পাঠকের শক্তিতে কুলায় না। সকলেই কিন্তু একটা কথা বোঝেন, কবি হতে গেলেই দেশ ও কালের ভেতরে থেকেও তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, কবির কাছে তাঁর দেশ ও কাল উপায়মাত্র। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কাব্যবস্তু ও কাব্যাবস্থান আমাদের সুপরিচিত না হলেও তাঁরা আমাদের নিতান্ত প্রিয়। তাঁদের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের আপেক্ষিক অজ্ঞানতা আমাদের রস-গ্রহণের মাত্রা হ্রাস করে মনে হয় না। কিন্তু অন্য একটা দিক থেকে আমাদের কাছে দেশ ও কালের একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে অন্তত দেখার আনন্দ হয়; যাকে চিনি না, তার কাছে সঙ্কোচ বোধ করি, তাকে আপন করতে সময় লাগে; অভ্যস্তকে আমরা সহজে গ্রহণ করি, অনভ্যস্তকে আমরা ভয় করি, পরিহার করি, নচেৎ অনিচ্ছায় গ্রহণ করি। আমাদের কাছে আমাদের দেশ ও কাল বন্ধুর মতই পরিচিত। অবশ্য জ্ঞানের দ্বারা অপরিচিতও পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য শক্তি খরচ করতে হয়, মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। শক্তির এই 'অপব্যবহার', এই 'অপচয়' সহজ-আনন্দ-উপভোগের বিঘ্ন উৎপাদন করে। কারণ, অনন্ত পরিমাণের দিক থেকে বলা যায় যে, কোন এক বিশেষ অবস্থার পক্ষে মানসিক শক্তি স্থির ও নিত্য। স্থূলভাবে দেখলেই মনে হয় যেন মন একটা বিশেষ ঘটনা-সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ অবিচ্ছিন্ন শক্তি বিকিরণ করছে। অতএব উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হলেও, কবিতা পড়ে আনন্দ-উপভোগের মত সহজ মানসিক কার্যের বদলে সাধারণ পাঠক তার শক্তির মূলধনকে জ্ঞানার্জনের মতন অনিশ্চিত ব্যবসায় খাটাতে অনিচ্ছুক হয়। এই অপচয়ের অনিচ্ছা এবং পূর্ব-পরিচিতের সাক্ষাৎজনিত সহজভাব ও শক্তিসংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতের অন্য কোন বিশেষ মূল্য নেই। এর বেশি মূল্য যদি নেই, তাহালে দেশ ও কালের অতিরিক্ত ও অতিক্রান্ত বিশ্বের একটি অর্থ হচ্ছে— দেশ ও কালের মধ্যস্থিত সাধারণ মানুষের নিকট কবির রসসৃষ্টির সহজ-বোধ্যতা, সহজ-উপভোগ্যতা। বিশ্ব-কবি সর্বসাধারণের কবি, সহজ কবি।

চিন্তয়সি, বিশ্ব-কবি (১৯৩২)

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রকৃতির পক্ষে সর্বদা আমরা বুঝতে পারি যে, জরার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি তার যৌবনের বসন্তোৎসব নিত্য নবভাবে উপভোগ করে থাকেন এবং এই বিচিত্র উপভোগের ও বিকাশের লীলাতেই ঋতুপর্যায়ের সৃষ্টি; তথাপি মানুষ যে কেমন করে জরার মধ্য দিয়ে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপনার যৌবনকে প্রতিবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে নূতন করে নিতে পারে, এ-কথা বোঝা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন। মানুষের দেহটা একেবারে ছাই হয়ে যায়, কাজেই তার যে আবার পুনরুত্থান হতে পারে, তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আর যদি বা পারি, হয়ত জন্মান্তরবাদের রূপক আশ্রয় করতে হয়। কিন্তু যদি কেবল তরুলতাকে নিয়ে পৃথিবী ব্যেপে একই রমণীয়া প্রকৃতি সুন্দরীকে সজীবভাবে দেখতে শিখি, তাহলেই বুঝতে পারব যে, শীতের মধ্য দিয়ে তিনিই তাঁর যৌবনকে নব নবভাবে প্রস্ফুটিত করে উপভোগ করছেন। তাতে পৃথক ভাবে কোনও বৃক্ষের বা লতার কোনও বিশেষ দাবী নেই; তাদের মধ্যে আমরা পরিবর্তনটা লক্ষ্য করতে পারি, সেটা একটা সমষ্টিভূত প্রাণশক্তির ব্যষ্টিগত প্রকাশ...

সমস্ত মানুষকে নিয়েও আমরা এমনি করে বিরাট প্রাণশক্তির বিপুল চেতনার সন্ধান করি। যদি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে না দেখে, সমস্ত মানুষকে ব্যেপে যে-একটা চৈতন্য পর্য্যাপ্ত হয়েছে, তাকে আমরা দেখতে পারি, তবে বুঝব যে, শতদল পদ্মের যেমন সমস্ত দলগুলির বিকাশ নিয়ে একটি পদ্মের অখণ্ড বিকাশ, তেমনি সমস্ত মানুষকে নিয়ে বিশ্বের চিৎপদ্মের একটা অখণ্ড বিকাশ চলেছে। সমষ্টিকে বাদ দিয়ে যখন খণ্ডভাবে ব্যক্তি হিসাবে আমরা এই ব্যাপারটিকে তথ্য সম্পর্কে বিচার করতে যাই, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য রাখতে পারি না। দেখি যে, জরামৃত্যুর এক একটা প্রকাণ্ড বিশ্বগ্রাসী গহ্বর একের থেকে অপরকে একেবারে তফাৎ করে রেখেছে। কিন্তু সমস্ত প্রাণপর্যায়কে যদি একই প্রাণের বিকাশ বলে বুঝতে পারি, তবে আর তাদের ব্যক্তিগত জরামৃত্যুর ছায়া এসে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করতে পারে না, একটা মানবপর্যায়ের মৃত্যুর পর নূতন পর্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার তাদের মৃত্যুর পর আর এক পর্যায় আসে, এমনি করে পর্যায়ের পর পর্যায়ের নব নব ধারা চলতে থাকে, কোথাও এর বিরাম নেই। জড় প্রকৃতির মতন চেতন প্রকৃতির মধ্যেও শীতবসন্তের ঋতুলীলা চলছে। নূতন জ্ঞান নূতন আশা নূতন আদর্শের রঙীন পতাকা উড়িয়ে নবযৌবন এসে উপস্থিত হয়; আবার যেই সেটা জরার রুক্ষ বাতাসে মলিন হয়ে আসে, অমনি মানুষ মৃত্যুর মানস-সরোবরে স্নান করে চ্যবন ঋষির মত তাঁর যৌবনকে নূতন করে নেয়।

রবি-দীপিতা (১৯৩৩), ফাল্গুনী

মহম্মদ কাসেম

অসীম ক্ষুধা আর নগ্ন দারিদ্র্য বয়সের মাত্রাটাকে বেমালুম হজম করেছে যা হোক! চকের তেপান্তর মাথা রেখে যে-পথটি বিবাগীর মতো সোজা পূর্বদিকে ছুটে গেছে, সেই পথের সাথেই ওসমানের মিতালী। ওর চোখের দুয়ারে যেন ভাবীকালের উজ্জ্বল স্বপ্ন, দৃষ্টিতে যেন অনাবিষ্কৃত মহাদেশের ইঙ্গিত। খালি পায়ে সারাদিন পথে পথে টো টো করে। বেলা নিভে গেলে আবার এঁদো গলিটার ভেতর ফিরে আসে। প্রত্যহ এমনি।

অন্ধকার অপরিসর খান দুই কুঠরি। কোনমতে মাথা গুঁজে মাতা-পুত্রের দিন গুজরে যায়। প্রতিটি দিনের মতো সেদিনও সদর দরজার কড়াটা উঠে নড়ে ডাক পড়ল: "মা!" ডাক নয়, যেন বলদৃপ্ত বিজয়ীর হর্ষধ্বনি। ভেতর থেকে জবাব এল: "এই যে, এলাম বাবা!" ভেতরে ঢুকে পড়ল তারপর।

আহারে বসে ওসমান হেসে বলল, "আজ বিড়ির ফ্যাক্টরীতে একটা কাজ ঠিক করে এলাম। একটা হপ্তা কোনোমতে চলবে না? কাজ দেখে এক হপ্তা পরে মাইনে, পরে হাত চালু হলে হাজার-করা হিসেব। শিখে নিলে ঢের পয়সা— সে বেশ হবে কিন্তু, না মা?" বলে নিজের মনেই খানিক হেসে নিলে।

যেন বহুদিন পর শুকনো চড়ায় আজ প্লাবন জেগেছে। নির্বোধ সারল্যের এই উচ্ছল ধারাটি কোথায় যেন আত্মগোপন করেছিল এতকাল। তৃপ্তির একটা প্রশান্তি আজ অনেক দিনের পর মা-র মুখে ভেসে উঠল। ওসমানের মুখের দিকে চেয়ে মা যেন হঠাৎ স্বপ্ন দেখতে লাগলেন— যুগযুগের স্বপ্ন: একটা সহজ সরল গতি, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পুত্র আর পৌত্র-ঘেরা হাস্যমুখরিত একখানি শান্ত স্নিগ্ধ নীড়।

ওসমান আবার বলল, "শুনছ, মা?"

আগামীবারে সমাপ্য (১৯৩৩)

"আ মর্, গলায় দড়ি! ওই সোয়ামীর আবার ঘর করিস, ওরই আবার সেবা করিস? যা-ই বলিস বাছা, আমি হলে কখনও অমন সোয়ামীর মুখই দেখতুম না, সেবা করা তো দূরের কথা! ওই যে লোকে কথায় বলে না 'যাকে লোকে বলে ছি, তার মনুষ্যত্ব রইল কি?' হেন লোক নেই যে না বিশুকে ছি ছি করছে! সত্যিই তো, লোকে বলবে নাই বা কেন? লোকের অপরাধটা কি? বলবার মত কাজ করলেই লোকে বলে থাকে। সেবার গাঁয়ের মধ্যে কি-কাণ্ডটাই না করলে, লোকে সকালবেলা যার জন্যে ওর নাম করে না। তারপর দুটি দিন যেতে না যেতে কি না এই কাণ্ড! মা গো! কি প্রবৃত্তি! গলায় একগাছা দড়িও কি জোটে না?"

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাত্যায়নী এই কথাগুলো বলিয়া গেলেন, সে একটা উত্তরও দিল না, একটিবার মুখও তুলিল না। নীরবে নতমুখে সে বসিয়া রহিল। আর তাহার চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া মাটিটাকেই ভিজাইয়া দিতে লাগিল মাত্র।

কি-কথা বলিবে সে? কি লইয়া বিবাহ করিবে? একা-কাত্যায়নী নহেন, গ্রামের ছোট বড় সকলের মুখেই সে একই কথা শুনিতেছে।

স্বামী তাহার অসচ্চরিত্র, মাতাল; কিন্তু সে-দোষ কি তাহার? লোকে তাহাকেই দোষ দেয়— সে যখন স্ত্রী হইয়াছে, তখন স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিবার ভার তাহার! কেন সে তাহা করে নাই? বিশ্বপতি না কি প্রথমে বেশ ভালো ছেলেই ছিল, কিন্তু যে-পর্যন্ত তাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে, সেই পর্যন্ত সে অধঃপাতে গিয়াছে।

সে অনেকেরই মুখে শুনিতে পায়— আজ বিশ্বপতি যে-মদকে পরমার্থ জ্ঞান করে, একদিন সে তাহাই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। চরিত্রহীনকে সে কোন দিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারে নাই। সে নাকি কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহে নাই, কেবলমাত্র মায়ের জিদে পড়িয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। বিবাহের মাস-তিনেক পরেই মা এই মেয়েটির মাথায় সংসার ও ছেলের ভার চাপাইয়া নিজে অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন।

ঘূর্ণি হাওয়া (১৯৩৩)

(মোহাম্মদ) ওয়াজেদ আলী

মানুষের জীবনের প্রকাশ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে। এদের ভিত্তিযুগে যে-সব বিশ্বাস, সংস্কার ও বিধি-বিধান— তাদের উপর নির্ভরতা নেই। তাদেরকে জড়িয়ে মানুষের যে-জীবন গড়ে উঠেছিল, তার সমগ্রতা নষ্ট হয়েছে; খানিকটা গেছে বদলে, বাকিটুকুতে প্রত্যয় নেই। যে-গৃহের খানিকটা গেছে ধ্বসে, তার শেষটুকুকে বিশ্বাস করতে স্বভাবতই বাধে। তাই মানুষের মন আজ সংশয়ে চঞ্চল; জীবনকে নূতন ভিত্তিমূলে দাঁড় করাবার জন্যে সে ব্যতিব্যস্ত। বাইরেকার সৃষ্টিকে যে নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখল, নিজের জীবনকে সে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে? তার মাল-মশলা, তার উপকরণ, তার রচনা-কৌশল, সব-কিছুতেই নূতন আলোকের তীব্র রশ্মিপাত হয়েছে। অনেকখানি মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে মানুষ তার বোঝাপড়ায় লেগেছে। রথচক্রের যে-সুর, যে-তাল, সে আজ রাজপুত্রের কানে ঠেকছে বেজায় বেসুরো, বেতালা; ওকে পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয়েছে। চক্র তার জীর্ণতায় পরিত্যাজ্য হয় হোক, রথ নূতন ঢঙে গড়বার দরকার হয় হোক, তার গতি সুসঙ্গত স্বচ্ছন্দ হওয়া-ই আসল কথা।

মানুষের মন আজ রাজশ্রীমণ্ডিত। পূজারী নয়, অনুগত নয়, ভীতিবিহ্বল আশ্রয়ার্থী নয়, আজ সে অধিকারী। তার অধিকার-সীমা আজ দিগন্তপ্রসারী। বাধা নেই, বন্ধ নেই, সব-কিছুকেই সে দেখবে, জানবে, বুঝবে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অভিভাবক-অভিভাব্যের সম্বন্ধ, সমাজে অর্থ-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অধিকার— এ সকলের মূলে যে-মন, তার অনুসরণ নয়, তাকে বিচার করবার, তার অন্তস্থল পর্যন্ত দেখবার বুঝবার ভার আজ মানুষের। তাকে বিশ্লেষণ করে তার তত্ত্ব নিয়ে বোঝাপড়া চলছে; কিন্তু সে মনের সঙ্গে আধুনিক মনের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বড় কম। কেননা আগেকার মনের কোথাও গতি কোথাও বা আড়ষ্টতা, কোথাও সমতা কোথাও বা বিঘ্নকর বন্ধুরতা। এর মধ্যে সে-ছন্দ, যে হল বিষম তাকে স্বীকার করতে যুগ-মনের স্বভাবতই বাধে। তাই নূতন ব্যবস্থার আয়োজনে সে তৎপর। কোথাও ব্যস্ততা, কোথাও বা মন্দ গতি, কিন্তু আয়োজন চলছেই।

যুগের মন (১৯৩৩)

রাধাচরণ চক্রবর্তী

শম্ভুচন্দ্র ও মহেশ মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছেন, মৈত্রগৃহিনী ভবশঙ্করী স্বহস্তে পরিবেশন করিতেছেন। রন্ধনগৃহের দ্বারপার্শে মৈত্রকন্যা গৌরী বসিয়া পরিবেশনরতা জননীর দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু শুধুই কি চাহিয়া থাকা? মুখের ভাব দেখিয়া অনুমান হয়, যে যেন ভবশঙ্করীর প্রতি দৃষ্টি তুলিয়া বিশেষ কিছুর প্রত্যাশা বা প্রতীক্ষা করিতেছে।

বিবাহের পর স্বামীগৃহ-দর্শন এ-পর্যন্ত গৌরীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বৈবাহিক পক্ষের সহিত সামান্য কি খুঁটিনাটি কারণ লইয়া শম্ভুচন্দ্রের যে-মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়— অর্থাৎ স্বভাবকোপন শম্ভুচন্দ্রই স্বয়ং আকস্মিক গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলেন— তাহাকে বধূকে না লইয়াই বরপক্ষ স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন; এবং একপক্ষে বরের পিতা আপনাকে অপমানিত বোধ করেন ও বরের মুখ ম্লান-গম্ভীর হইয়া পড়ে, অন্যপক্ষে বধূ ও জননী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করেন। তারপর অর্ধবৎসরকাল কাটিয়া গিয়াছে। অপমানিত বরের পিতা তাঁহার জীবনকালে বধূকে আর স্বগৃহে আনিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; এবং পুত্র সতীনাথের পূর্ণ অমত সত্ত্বেও তাহাকে অন্যত্র বিবাহিত করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার জীবনের মেয়াদ অলক্ষিতে ফুরাইয়া আসিয়াছে। এমন সময় একদিন অতর্কিতে হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি পরলোক-পথগামী হইলেন। তারপর মাস দুই গত হইয়াছে। ভবশঙ্করীর আপ্রাণ চেষ্টায় সতীনাথ শাশুড়ীর আমন্ত্রণ শিরোধার্য করিয়া শীঘ্রই শক্তিপুরে আগমন করিতে স্বীকৃত হইয়াছে— হয়তো আজকারে মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিতে পারে। গৌরী জননীর দিকে এই প্রত্যাশায় চাহিতেছিল যে, তিনি কখন সতীনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে গৌরীর স্বামিগৃহগমনে সন্তুষ্টির সহিত সম্মত করাইবেন।

অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা-বাটিগুলি একে একে স্বামী ও পুত্রের সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, একখানি পাখা লইয়া আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে মৈত্রগৃহিণী বসিলেন। শুক্‌তো, দাল, ভাজা শেষ হইয়া আহার যখন মৎসপথে অগ্রসর হইল, তখন ভবশঙ্করী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার নিকট সতীনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপনের উপক্রমণিকাস্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার গোঁফ-জোড়া যেমন একদিকে বাড়ছে, গাল দুটো তেমনি ওদিকে রোগা হয়ে তুবড়ে পড়ছে"।

বৈরাগীর চর (১৯৩৩), বৈরাগীর চর

চারুচন্দ্র দত্ত

রাজাবাবু বায়নগরের জমিদার। ঠিক জমিদার নয়, জমিদার-পুত্র। তবে বাপ-মা তাঁর হাতে সংসার তুলে গিয়ে বানপ্রস্থ নিয়েছেন। আজ দু-বছর থেকে বৃন্দাবনবাসী। রাজাবাবুর নাম কুমার অমরেন্দ্রনাথ রায়। বয়স বাইশ-তেইশ বছর। অসাধারণ রূপবান, কার্তিকেয় সমতুল। অর্থাৎ সত্যিকার দেবসেনানীর মত— আমাদের দশভূজার পাশে নধরদেহ ময়ূর-বাহন যে আদুরে ছেলেটি থাকেন, তাঁর মত নয়। ছেলেবেলা থেকে কুস্তি ক'রে, ঘোড়ায় চ'ড়ে, শিকার খেলে রাজাবাবুর শরীরটা একটু অন্যায়রকম শক্ত হয়ে উঠেছে। রোদে পুড়ে, জলে, পাকা বাঁশের মত রঙ ধরেছে। দেহের ত এই অবস্থা। মনটাও ঠিক আভিজাত্যের উপযোগী হয়ে গ'ড়ে ওঠে নাই। একে ত এম এ পাস করেছেন, তার উপর আবার অহরহ প্রজার অভাব, প্রজার মঙ্গল, প্রজার অধিকার— এই সব ব্যাপার নিয়ে জটলা করছেন। পুরানো কর্মচারীরা মহা চিন্তায় পড়েছেন: এ রকম লোক এই বিশাল জমিদারি রাখবে কি ক'রে? বুড়ো মহারাজা যখন ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া স্থির করেছিলেন, তখন এ-সব ভাবা উচিত ছিল। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে এ-রকম শুচিবাই নিয়ে কি সংসার করা চলে? আর ধর্মজ্ঞান ত কত! কথায় কথায় দেব দ্বিজ নিয়ে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ! বামুনের ছেলে, অথচ সন্ধ্যা-গায়ত্রী বিষয়ে উদাসীন। পিতা মহারাজা আজন্ম গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁর পেয় সম্বন্ধে ব্যছবিচার বিশেষ না থাকলেও ভোজ্য বিষয়ে তিনি চিরদিন নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। এ-হেন স্বধর্ম-নিরত পিতার ছেলে হয়েও রাজাবাবুর মুরগীর ডিম না হলে সকালে ঘুম ভাঙ্গত না। শুধু তাই নয়। বৃদ্ধ ওস্তাদ আহমদ সাহেবের রান্না পোলাও-কাবাবও মাঝে মাঝে ভোজন-পাত্রে স্থান পেত। এদিকে এই সব অনাচার, অথচ শীতের দিনে এক ছিলিম গাঁজা, কি সারাদিন শ্রান্তির পর এক পাত্র-ধান্যেশ্বরী কারও খাবার জো ছিল না। দু-তিন জন চাকর, এমন কি একজন মুহুরি পর্যন্ত এই অপরাধে বর-তরফ হয়েছিল।

দেবারু (১৯৩৪), মালতী, এক

শৈলবালা ঘোষজায়া

বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হওয়ায় আযৌবন মাতুলের অনুগ্রহে যত্নে লালন-পালন হইলেও রুদ্রকান্তের স্বভাবের নিজস্ব তেজটুকু নির্জীব হীনতার মাঝে মোটেই ডুবিয়া যায় নাই...

গ্রাম্য পাঠশালায়, বুঝি সম্বন্ধে নিরীহ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে উদ্ধত কয়েকটিমাত্র সহাধ্যায়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মারামারিতে ছাড়া বিশেষ কোনই কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। কিন্তু যখন দশ বৎসর বয়সে মাতুলের অনুগ্রহে জেলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ছত্রিশজন বালকের নীচে ক্রমিক সংখ্যানুসারে স্থান লাভ করিয়া প্রবিষ্ট হইল, তখন তাহার এমনি নিদারুণ রোক চাগিয়া উঠিল যে, গভীর গ্রীষ্মে ঘোরতর বর্ষায় ও নিদারুণ শীতে শরীর সম্বন্ধে লেশমাত্র আরাম-উপভোগের অবসর না রাখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরূপে প্রস্তুত হইল যে, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল ছত্রিশ জনের মধ্যে সে-ই প্রধান হইয়াছে। এইরূপে বৎসর বৎসর প্রতি শ্রেণীকে অবাধে উত্তীর্ণ হইয়া সর্বোচ্চ স্থান লাভে কুড়ি বৎসর বয়সে যখন সে পরিচিত আত্মীয় বন্ধুগণের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও ইতর সাধারণের ভক্তিমিশ্রিত ভয় উৎপাদন করিয়া সম্মানে বি এ পাশ করিয়া ফেলিল তখন তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী— বোধ হয় অতিরিক্ত স্তুতিবাদের সংঘাতে— অকস্মাৎ বিমুখ হইয়া বসিলেন।

রুদ্রকান্তের অভিভাবক মাতুল সারদাপ্রসন্ন বসু মহাশয় তালুকদার মানুষ। সুতরাং আইন-ব্যবসায়ই তাঁহার চক্ষে সর্বাপেক্ষা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বিদ্যা। কাজেই তিনি ভাগিনীকে অতঃপর আইন অধ্যয়ন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ভাগ্নে রুদ্রকান্ত অত্যন্ত দৃঢ় অথচ পরিষ্কারভাবে লিখিয়া পাঠাইল যে, বাক্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন তাহার মত ক্ষুদ্রপ্রকৃতি লোকের সম্ভবপর নহে, বরং এম এ পাশ করিয়া অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী হওয়াই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় পথ। মাতুল একটু উষ্ণ হইয়া তাহাকে জেদ ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্রকান্ত রুষ্ট হইয়া পত্রের জবাব দিল না।

সেই সময় আর-একটি ঘটনা ঘটিল।

রুদ্রকান্ত (১৯৩৪), রুদ্রকান্ত, ১

সুনির্মল বসু

চোখে কালো চশমা, ঝোড়ো কাকের মত চুলগুলো, পায় ময়লা ক্যান্‌ভাসের জুতো, একটা সুটকেশ হাতে দুপুরবেলা হঠাৎ গঙ্গারাম বাড়ীতে এসে হাজির হল। দুই মাস আগে "চাকরী করতে যাচ্ছি" বলে হঠাৎ গঙ্গারাম যে কোথায় কর্পূরের মত উবে গেছিল, তার খোঁজ আর এতদিন আমরা পাই নি। আজ তাকে এই বেশে হঠাৎ ফিরতে দেখে আমরা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে দস্তুরমত অস্থির করে তুললাম।

গঙ্গারাম কোনকালে যে জীবনে কিছু উন্নতি করবে, সে-আশা বাড়ীর লোকেরা সবাই অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই বেচারীর শরীরে যেন রাজ্যের অসুখ 'মৌরসী পাট্টা' গেড়ে বসেছিল; গেঁটে বাত, পেটে পিলে, হাঁপানি, আর তার উপর ছিল ম্যালেরিয়া। এই রোগগুলোর তদারক করতে করতেই বেচারী গঙ্গারামের ত্রিশ-ত্রিশটা বছর পার হয়ে গেল। তার জীবনের যত কিছু সুখের স্বপ্ন, এই রোগগুলি ধারালো করাতের মত ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিল। বেচারী গঙ্গারামের কি দোষ? তারপর সেদিন যখন তার জ্যাঠামশায় বললেন, "হতভাগা বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাপ-জ্যাঠার অন্নগুলি বসে বসে গোরুর মত গিলছে!" তখন গঙ্গারাম আর স্থির থাকতে পারল না। গঙ্গারাম ভাবলে, সে তো মানুষ, সত্যিই তো সে কেন অন্যের পয়সা খাবে? তারও হাত-পা আছে, থাকুক না শরীরে রোগ। রোগ কার না হয়? জ্যাঠামশাইয়ের উপর তার রাগ হল না একটুকুও, ধিক্কার এল নিজের উপর। তারপরেই গঙ্গারাম উধাও। অনেক চেষ্টা করেও এতদিন তার খোঁজ আমরা পাই নি।

আজ দুই মাস পর তাকে ফিরতে দেখে আমাদের আর কৌতূহলের শেষ নেই। গঙ্গারাম বললে, সে দিল্লী থেকে আসছে। টীমারপুরে সে একটা চাকরী পেয়েছে, পনের দিন পরে গিয়েই চাকরীতে যোগ দিতে হবে। এই কয়দিনের জন্যে সে বাড়ীতে দেখা-শোনা করতে এসেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে সে আর ছুটি পাবে না।

সন্ধ্যার সময় চায়ের দোকানে আমার গঙ্গারামের সঙ্গে দেখা... নানা রকম গল্প করতে করতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল গঙ্গারামের নাকের উপর। নাকের ভাগটা বেশ টকটকে লাল হয়ে উঁচু বলের মত হয়ে আছে। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "নাকে আবার কি হল, গঙ্গারাম?" গঙ্গারাম বললে, "আরে ভাই, দিল্লীকা লাড্ডু খেয়ে এই ব্যাপার হয়েছে!"

দিল্লীকা লাড্ডু (১৯৩৪), দিল্লীকা লাড্ডু

রাখালচন্দ্র সেন

সৃষ্টিধর মাঝির তিন পুরুষের খবর জানা যায়। তাহাদের কাহারো জীবন নিজ গৃহে রোগশয্যায় শেষ হয় নাই। প্রপিতামহ উমানাথের মৃত্যু হইয়াছিল পদ্মার বুকে জলদস্যুর হাতে, পিতামহ দশরথের মেঘনায় নৌকাডুবিতে, এবং পিতা অভয়চরণের নিজ নৌকায় সর্পদংশনে। সৃষ্টিধরও প্রায় চল্লিশ বৎসর অবধি মাঝির কাজ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার শরীর ভাঙিয়া গেল ম্যালেরিয়ায়, সে ব্যবসায় ছাড়িয়া সঞ্চিত কিছু অর্থ লইয়া মহাজনী করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই তাহার মনে বিশেষ সুখ ছিল না। এখনকার লোকে নৌকায় হউক, তাড়াতাড়িতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিলেই সুখী। পৌঁছানোটাই যেন সব, আর যাওয়াটা কিছু নয়। কোথায় গেল সেই আগের কালের যাত্রী সব! তাহারা মাঝিকে চাকরের মত দেখিত না। দ্বিপ্রহরে কোনো বাজারের কাছে গাছের ছায়ায় নৌকা লাগাইত। যাত্রীদের কর্তা বাজার করিয়া আনিতেন। মাঝিদের খাবারও তাহার সঙ্গে আসিত। তারপর সেই গাছের ছায়ায় রান্নাবান্না হইত। গ্রামের লোক আলাপ করিতে আসিত। অপরাহ্নে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার নৌকা চলিত। এমনি করিয়া আজকালকার তিন দণ্ডের পথে সারাদিন কাটাইয়া যাত্রা শেষ হইলে কর্তারা যেমন খুসী হইয়া যাহা দিতেন, মাঝিদের তাহাতে কখনো অসন্তুষ্ট হইতে হয় নাই। এখন আর সেদিন নাই। নৌকাভাড়া কড়ায় গণ্ডায় ঠিক করিয়া তবে যাত্রী নৌকাতে পা দেয়। চুক্তি অনুযায়ী সময়ের মধ্যে না পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে আবার তাহা হইতে কাটা যায়। যাত্রীদের যাহা ব্যবহার, আগের কালের লোকে চাকরের সহিতও সেরূপ করিত না। তখনকার কালে পাল তুলিয়া বসিলে কর্তাদের সহিত সুখ-দুঃখের, দেশ-বিদেশের গল্প হইত, কোনো মাঝি পাঁচালি পড়িত, কেহ বা গান করিত— কিন্তু সেদিন আর নাই। সুতরাং ব্যবসায় ছাড়িবার আগে হইতেই সৃষ্টিধরের ব্যবসায়ে আর মন ছিল না। কিন্তু তবু যখন বর্ষায় তাহাদের গ্রামের নাগর নদী দু-কূল ছাপাইয়া শীতলাতলা অবধি আসিত, যখন বাতাসে আসিত নূতন ধান ও পাটের গন্ধ, তখন একটা অনির্দিষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টিধরের মেজাজ খারাপ করিয়া দিত। রাত্রিতে ভালো ঘুম হইত না। সৃষ্টিধরের স্ত্রী ইচ্ছাময়ী ভয়ে ভয়ে থাকিত, এবং প্রতিবেশিনীদের কাছে বলিত যে, বর্ষায় তাহার কর্তার শরীর একেবারেই ভালো থাকে না।

সপ্তপর্ণ, সারথি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল। এতকাল অনুর্বরা থাকিয়া সন্তানলাভের আশা সে একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। ব্যর্থ আশাকে মানুষ আর কতকাল পোষণ করিতে পারে। সাত বছর বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাত্বের প্রমাণেরই সামিল। শ্যামাও তাই জানিয়া রাখিয়াছিল। সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশ্য ছিল না, কারণ সে মাতৃগর্ভে থাকিতেই তার বাবা ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি হইয়া মারা যায়...। একটা যুক্তিহীন ছেলেমানুষী ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে নিজে যখন এক মা-র এক মেয়ে, দুটি একটির বেশী ছেলেমেয়ে তারও হইবে না। বড় জোর তিনটি। গোড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এরা আসিয়া পড়িবে, এই ছিল শ্যামার বিশ্বাস। তৃতীয় বছরেও মাতৃত্বলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরের চারটা বছর সে পূজা, মানত, জলপড়া, কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্বরা করিয়া তুলিতেই একরকম ব্যয় করিয়াছে। শেষে, সময়মত মা না হওয়ার জন্য নানাবিধ মানসিক বিপর্যয়ের পর তার যখন প্রায় হিস্টিরিয়া জন্মিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তখন ফাল্গুনের এক দুপুরবেলা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করিয়া শীতলপাটিতে গা ঢালিয়া ঘুমের আয়োজন করিবার সময় সহসা বিনা ভূমিকায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল সন্দেহ। বাড়িতে তখন কেহ ছিল না। দুপুরে বাড়িতে কেহ কোনদিনই প্রায় থাকিত না, থাকিবার কেহ ছিল না— আত্মীয় অথবা বন্ধু। সন্দেহ করিয়াই শ্যামার এমন বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, তার ভয় হইল হঠাৎ বুঝি তার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। সারাটা দুপুর সে ক্রমান্বয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া কাটাইয়া দিল। সন্দেহ প্রত্যয় হইল এক মাসে। কড়া শীতের সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আর্বিভাব ঘটিয়াছিল, সে জন্ম লইল শরৎকালে। জগজ্জনী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাত দিনের পুরাতনী জননী হিসাবে দেখিলেন।

জননী (১৯৩৫), এক

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ছোট নদীর ধারে হাট। গ্রামের নাম বেতডাঙ্গা; নদীর নাম চন্ননা, হাটের নাম চন্ননার হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তনের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না, চন্ননাকে ভালবাসিয়া হাটের নাম দিয়াছে চন্ননার হাট।

এই হাটের উপর রামপ্রসাদের মুদিখানা; কলের তেল মসলাপাতি প্রভৃতি আর বার্লি হইতে ডাল পর্যন্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু খুচরা বিক্রয়ের দোকান সেটা। অমন আরো আছে; রামপ্রসাদেরটা তাহাদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ না হইলেও ক্রমবৃদ্ধি নাই বলিয়া সে-ও চিরদিন লোকের কাছে অপাত্রই রহিয়া গেছে...

সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, বৈকালে— শনিবারে আর মঙ্গলবারে; চারের হাট আর তিনের হাট নামে তারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। ঐ দুটি দিনেই যা খরিদ্দারের ভিড়, আনোগোনা, ধুমধাম, সরগরম, এটা সেটা বিক্রী; তা ছাড়া বাকি পাঁচ দিন উহাদের দিবারাত্র বসিয়াই কাটে— চোখের সামনে বিরাজ করে হাটের ধূলার উপর লোকের পদচিহ্ন, পরস্পরের মুখ চন্ননার অপরিচ্ছন্ন শুষ্কপ্রায় দেহ, নিবিড় জঙ্গল, একটি বিরাট বনস্পতি আর অলক্ষ্মীর ছায়া। কর্মহীন আলস্যের মাঝে বসিয়াই সময় কাটে। সামান্য দু-এক পয়সার জিনিস কচিৎ কখনো লোকে আসিয়া চায়: সাগু, মিছরি, হলুদ শুকনো লঙ্কা, বার্লি— লোকে বলে বার্লিক।

কিন্তু দোকান প্রত্যহই খুলিতে হয়... দোকানের সুমুখটা ঝাঁট দিতে হয়, জল ছিটাইয়া ধূলা মারিতে হয়, জিনিসপত্র ছিটাইয়া ছড়াইয়া একাকার হইয়া থাকে, সেগুলি গুছাইয়া সাজাইয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতে হয়; পোস্তদানায় কি যেন জটা বাঁধিয়া ওঠে, জটা ছাড়াইয়া তাহা ঝাড়িয়া রাখিতে হয়; আটায় কীট জন্মে, তাহা বাছিয়া ফেলিতে হয়, জিরে মৌরি পুরাতন বিষ হইয়া ওঠে, নতুনের সঙ্গে তাহাকে মিশাইয়া লইতে হয়, এমনি শতেক কাজ— শতেক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে দুটি পয়সা আনিতে হয়।

বন্ধু-বান্ধব আসে; ঠেকনো দিয়া তুলিয়া রাখা ঝাঁপের নীচে বাখারির বেঞ্চিতে তারা বসে, মধুর অম্লমধুর ও অমধুর বিবিধ আলোচনা হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িতেছে, ধান জন্মিতেছে না, বাকি পয়সা আদায় হয় না— রামপ্রসাদ এই সব অনুযোগ করে। কিন্তু তার দুঃখের কথা কেহ ভাল করিয়া শোনে না, কেউ হয়তো আনমনে সায় দেয়: "তা ঠিকই বলেছ, রামপ্রসাদ!"

যথাক্রমে (১৯৩৫)

অনেক ঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে-কোলে পূজা দিবার মানত করিয়া, মাদুলি-কবচ ধারণ করিয়া, ঔষধ খাইয়া নৃত্যকালীর যখন কিছুতেই একটি ছেলে হইল না, তখন সে জেদ করিয়া নিজে দেখিয়া শুনিয়া স্বামীর আর-একটি বিবাহ দিল। একটি ছেলে না হইলে কি ঘর-সংসার মানায়?

স্ত্রীলোক যখন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। আজ বাইশ বৎসর যে-স্বামী তাহার ছিল, যাহার জীবনের সহিত তাহার সুখ-দুঃখ জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই স্বামীকে হাসিমুখে প্রশান্ত মনে তরঙ্গিনীকে দান করিয়া সেই নবীন দম্পতির সেবা ও যত্নের ভার গ্রহণ করিল।

...তরঙ্গিণী বাপের বাড়ী হইতে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া দিদির যত্ন-মমতায় একদিনের তরেও মুখ মলিন করিবার অবসর পায় নাই। সে খাইতে না চাহিলেও নৃত্যকালী তাহাকে "দিদি আমার, বোনটি আমার, লক্ষ্মী আমার" বলিয়া সাধিয়া সাধিয়া বার বার বিবিধ সামগ্রী খাওয়ায়; সে সাজিতে না চাহিলেও দিদি তাহার নিজের হাতে বিচিত্র বস্ত্র-অলংকারে দিনের মধ্যে তাহাকে পাঁচবার পাঁচ রকম করিয়া সাজায়; নৃত্যকালী নিজের হাতে বিবিধ ছাঁদের চুল বাঁধিয়া, টিপ কাটিয়া, আলতা পরাইয়া তরঙ্গিনীকে জেদ করিয়া জোর করিয়া দিনের মধ্যে পাঁচবার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেয়।

সংসারের এতটুকু কাজও তরঙ্গিণীকে করিতে হয় না। সংসারের সমস্ত সেবা ও কর্মের ভার নৃত্যকালীর; হাসি, আনন্দ ও সম্ভোগের জন্যই যেন তরঙ্গিনীর জীবন।

তাহার পর যখন তরঙ্গিনীর সন্তান-সম্ভাবনা হইল, তখন নৃত্যকালী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে একটি সোনার চাঁদ কোলে পাইবে। তাহার ঘর-সংসার উহার হাসিতে আলো হইয়া উঠিবে। তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালী এখন চোখে হারায়, সদাই তাহাকে সাবধান করিয়া রাখে, অনুক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে টিকটিক করিয়া বেড়ায়, কোনো মতে যেন কিছু অনাচার না হয়, কাহারো ছোঁয়াচ নজর না লাগে; সু-ভালাভালি দুজন দুঠাই হইয়া গেলে সে বাঁচে। তরঙ্গিণী সন্ধ্যাবেলা মাথার ঘোমটা খুলিয়া থাকিলে বা এ-ঘর ও-ঘর করিবার সময় মাথায় একটা খড়কুটা গুঁজিয়া না রাখিলে তাহাও নৃত্যকালীর নজর এড়ায় না, সে তরঙ্গিণীকে বলে, "পেটের কাঁটাটা আমার কোলে একবার ফেলে দে, তারপর তোর যা খুসি তাই করিস, আমি আর তোকে তখন কিছু বলব না।"

সদানন্দের বৈরাগ্য (১৯৩৫), সতীন

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

হরপ্রিয় কালক্ষেপ না করিয়া মহাশ্বেতার বাসার দিকে চলিতে লাগিল; উত্তেজনায় শুধু পায়েই-বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, উত্তপ্ত মাটির সংস্পর্শে আসিয়া পায়ের তালু জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তথাপি চলা থামে নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের কলাবন পার হইয়া জীর্ণ বেড়াটার নিকটে আসিতেই তাহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। বেড়া পার হইতে পারিলেই প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পাশেই দাওয়া। দুর্দান্ত সাহস হরপ্রিয়কে পাইয়া বসিয়াছে— সত্যই প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া পড়িল। খানিকটা অগ্রসর হইতেই দেখিল, মহাশ্বেতা সিক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; শুকনা মাটি জল শুষিয়া লইলেও ভিজা মাটির রং শুকনা হইতে পৃথক হইয়া আছে। বিপদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে পারিলে সাহস যেমন আপনা হইতে আসিয়া পড়ে, সেইরূপে হরিহর আসন্ন বিপদকে গ্রহণ করিয়া ফেলিল। হাঁটার পথে কুটীরের আড়াল অপসারিত হইতেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, দেখিল, সিক্তবসনাবৃতা প্রাঙ্গণের দিকে পিছন ফিরিয়া গামছার সাহায্যে ভিজা চুল নিংড়াইতেছে। অপূর্ব দৃশ্য। মহাশ্বেতাব গঠন-সৌন্দর্য এইভাবে যে কখনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই। পূর্ণাঙ্গীর ভরাট মাংসল নিতম্বের অত্যুজ্জ্বল গৌর বর্ণ সিক্ত বসনের আবরু ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

সুচারু রেখা দেহগঠনেব লীলায়িত ভঙ্গীকে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়াছে। কোমর হইতে উর্দ্ধে পিঠের কিয়দংশ দেখা যায়। চুল নিংড়াইবার সময় দেহ যে ত্রিভঙ্গ-রূপ লইয়াছে, তাহারই সুবিধা পাইয়া কয়েকটি মনোরম মেদ-বর্জিত নরম পাতলা চামড়ার খাঁজ পড়িয়াছে। রেখাগুলি বহ্নিশিখার ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া একদিক হইতে অপর দিকে মিলাইয়া গিয়াছে; রেখায় উত্তাপ থাকিলেও জ্বালাময় নয়, রসিকের নয়ন তৃপ্ত করিয়া দেয়। হরপ্রিয় বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অকস্মাৎ পিপীলিকার কামড়ে মহাশ্বেতা অসংযতভাবে প্রাঙ্গণের দিতে ফিরিতে দেখিল, হরপ্রিয় উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; দৃষ্টি তাহার বিহ্বল হইলেও কাম-প্রজ্বলিত— ঐ দৃষ্টির ভাষা আছে। যাহা বলিতে চায়, তাহা নির্বাক হইলেও অবোধ্য নয়। মহাশ্বেতা কোন প্রকারে আবরণহীন বক্ষ ঢাকিয়া দ্রুত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। দৃশ্যপট হইতে মহাশ্বেতা অন্তর্ধান করিলে বিহ্বল হরপ্রিয়র চেতনা আসিল; তখন তাহার অন্তর ও বাহিরের কাঁপুনি থামিয়া গিয়াছে।

মাংসলোলুপ, প্রথম খণ্ড

প্রভু গুহঠাকুরতা

যতদিন কথার ভারে বাঙলার নাটক নিপীড়িত হয়ে থাকবে, ততদিন বাঙলা থিয়েটারে প্রশংসাযোগ্য অভিনয় কি করে সম্ভব, তা বুঝে উঠি না।

নাটকের প্রাণবস্তু যে কথোপকথন— শুধু কথা নয়— এ-কথা কে না জানে? তবুও নাটকে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে স্বগত-বিবৃতি, অথবা অসংলগ্ন, আত্মবিস্মৃত আবৃত্তির এত বাড়াবাড়ি কেন? বাঙলা দেশের লেখকেরা সোজা, স্পষ্ট এবং কেবল পাত্র-পাত্রী-সম্পর্কিত কথোপকথনের ভেতর দিয়ে নাটক কেন সৃষ্টি করতে পারেন না? স্বাভাবিক মানুষ— উত্তেজিত, শান্ত কিংবা ক্রুদ্ধ, যে-অবস্থাতেই হোক— যেরূপ আচরণ করে, ঠিক তারই অনুরূপ প্রতিকৃতি-ই তো আমরা রঙ্গমঞ্চে দেখতে আশা করি। এই যে আচরণ, তার প্রকাশ কথাতে হওয়া-ই সবচেয়ে বেশী সহজ ও স্বাভাবিক; কিন্তু সব সময়ে কথা দিয়েই হতে হবে, তারও কোনো মানে নেই; ভাব, ভঙ্গি, চলাফেরা এমন কি চোখের একটিমাত্র চাউনি কিংবা কণ্ঠস্বরের একটিমাত্র বিশিষ্ট ভঙ্গিমার ভেতর দিয়েও সে-আচরণ প্রকাশিত হতে পারে।

ধরা যাক, কোনো অভিনেতা রাগের ভাবটা প্রকাশ করতে চান; তিনি চীৎকার করে কাউকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেছেন। ক্রুদ্ধ অবস্থাতে মানুষের চিত্তবিক্ষেপ হওয়া যেরূপ স্বাভাবিক, সেরূপ সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থারও পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক; কাজেই শুধু বাক্য দিয়েই এই রাগের ভাবটির সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব। রাগ হলে অনেক সময় মুখ দিয়ে কথা নাও বার হতে পারে— সেটা রাগের বিশেষ অবস্থা বা আতিশয্যের উপরই নির্ভর করবে; এবং এই অবস্থাতে মুখ-চোখের ওপর অনেক প্রকারের চিন্তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আবার রাগ থেমেও যেতে পারে এবং থেমে গেলে চেহারার ও পরিবর্তন হওয়া অনিবার্য। সুতরাং রাগ জিনিসটাকে কোনো মামুলি থিয়েটারি ঢং-এর ছাঁচে ফেলা যেতে পারে না।

আসল কথা এই যে, বাঙলা দেশের নাট্যকার সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী করে কথা গাঁথতে চেষ্টা করেন না। তার ফলে বাঙলার নট-নটীরা কোনো প্রকারের মানসিক অবস্থাতেই সাধারণ রক্তমাংসের মানুষের মতো কোনো কথা— কখনো আস্তে, কখনো জোরে, কখনো থেমে-থেমে, কখনো তাড়াতাড়ি–– স্তরে-স্তরে, পলে-পলে প্রকাশ করবার সুবিধা পায় না।

নাট্যকার কথা দিয়ে তাদের আটকে রেখেছেন।

এ ও তা (১৯৩৬), আমার কথাটি ফুরোয় না

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র নিজে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক। তিনি মধ্যবিত্ত সাধারণ ভদ্রলোকের ঘরের কথাকেই তাঁহার কথার কেন্দ্র করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনা এত শীঘ্র সমগ্র বাঙালী জাতির অধিকাংশ নরনারীর এমন প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। শরৎ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদিগকে শরৎচন্দ্রের কল্পিত নরনারীকে ভাবিয়া চিনিতে হয় না, সকলেই সকলের চেনা, অতিপরিচিত, নিত্যই তাহাদের সহিত আমাদেব দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়, ইহারা রক্তমাংসের মানুষ। কাজেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, ভয়ভালবাসা সমগ্র পাঠক-পাঠিকাদের মনে এমন অণুরণিত হয়।

বাঙালী বলিতে আমরা বুঝি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক, যাহারা অল্প-বিস্তর লেখাপড়া শেখে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সৎসামান্য রোজগার করে; যাহাদের চিকিৎসার পয়সা নাই, বিলাসের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই; যাহার আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভারে পীড়িত, অথচ চক্ষুলজ্জা কিংবা স্নেহের খাতিরে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না, কেবল সহ্য করে; যাহাদের আজ আনিলে কাল থাকে না, অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ হয় না বা পুত্রের শিক্ষা হয় না; যাহারা ঠাকুরদেবতা মানে, পূজা করে, মানসিক করে; যাহারা ম্যালেরিয়ায় ভোগে, জলাভাবে দুর্ভিক্ষে মড়কে এমন কি সময় সময় মোটর চাপা পড়িয়া মরে, ভিটার মায়ায় বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া পাড়াগাঁয়ে বাস করে। যাঁহারা এ-দলভুক্ত নহেন তাঁহারা নামেমাত্র বাঙালী, কিন্তু কার্যে 'সাহেব' অর্থাৎ অবাঙালী। সকল দেশেই এজাতীয় অভিজাতশ্রেণী আছে, বাংলা দেশেও আছে, এবং এই অভিজাত-সম্প্রদায় অন্যান্য দেশের মতই টবের গাছ: মাটির সহিত ইহাদের কোনও সংস্রব নাই। পল্লী হইতে শহরে, এ-শহর হইতে ও-শহরে, এ-দেশ হইতে ও-দেশ ইহারা চলিয়া বেড়ান-- বাগান হইতে বারান্দায়, বারান্দা হইতে ঘরে, দ্বিতল হইতে ত্রিতলে যেমন টবের গাছ ঘুরিয়া বেড়ায়। শরৎচন্দ্র টবের গাছের কথা লেখেন না, তিনি লেখেন গাছের কথা, যদিও সে-কথায় নিম শ্যাওড়া কালকাসিন্দাও আসিয়া পড়ে।

এইজন্যই শরৎচন্দ্রের পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা বোধ হয় বর্তমান বাংলার যে-কোনও গ্রন্থকার অপেক্ষা অধিক। শরৎচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছে বাংলার সাধারণ পাঠক-পাঠিকার দল; এ-অভিষেকের অনুষ্ঠান অভিজাত-সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় নাই।

আলোচনী, শরৎচন্দ্র ২ (১৯৩৬)

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বিনোদিনী আসার পর থেকে আর-একটি চালা বেড়েছে। সেটি বিনোদিনীর ঢেঁকিশাল। বিনোদিনী রসময়ের পোষ্য সংখ্যা বাড়ায় নি। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি থেকে সে ধান নিয়ে আসে, সেই ধান ভেনে নিজের প্রাপ্য কেটে রেখে বাকি যার ধান তাকে দিয়ে আসে। এইভাবে তার গ্রাসাচ্ছাদন হয়, কিছু বাঁচেও। একটা পেট বই তো নয়। বিনোদিনীর আশা আছে, বৎসরখানেকের মধ্যে এই করে সে কিছু জমাতেও পারবে। জমান উচিতও। মানুষের সময়-অসময়, আপদ-বিপদ আছে। গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বউ— সঞ্চয়ের বীজ তার রক্তের মধ্যে আছে।

কিন্তু রসময় যেন তাতে মনে-মনে বিরক্ত হয়। এ তার গৃহ নয়, আখড়া। সে নিজেও গৃহী নয়, বাউল সন্ন্যাসী। সঞ্চয় তার ধর্মবিরুদ্ধ। তার আখড়ায় বিনোদিনী ধীরে ধীরে যেন গৃহের আবহাওয়া আনছে— শুধু ধান ভেনে আর সঞ্চয় করেই নয়, বহু মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন কারবারে লিপ্ত হয়ে। নদীর এ-দিকটায় আগে কেউ বড় একটা আসত না। এক আসত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফুল তুলতে, পেয়ারা পাড়তে আর নিরিবিলি খেলাপাতির ঘর বাঁধতে। আর আসত—

কিন্তু তাদের কথা থাক। মধুর লোভে মৌমাছি এসে জোটেই। ললিতা থাকলে আখড়ার আনাচে-কানাচে এমনি দু-চার জনের গতিবিধিও থাকবেই। রসময় তাদের গ্রাহ্য করে না। কিন্তু বিনোদিনী যেদিন থেকে ঢেঁকিশালে ঢেঁকি পেতেছে, সেদিন থেকে হরেক রকম মানুষের আসা-যাওয়ার আর বিরাম নেই। কেউ ধান ভানতে দিতে চায়, কেউ চাল কিনতে চায়। কোন গৃহস্থ-বধূ পরিজনের অসাক্ষাতে দুটি চাল এনেছে, স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে যেতে চায়। কারও চাল দিতে বিনোদিনীর দেরী হয়েছে, সে এসে চীৎকার করেছে। কেউ ধারে চাল নিতে এসেছে; বিনোদিনী তার আক্কেল সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। কারও সঙ্গে বাধছে চালের দর নিয়ে কলহ, কারও সঙ্গে ওজন নিয়ে। দিবারাত্রি এই হট্টগোল রসময় পছন্দ করে না। কিন্তু মুখে কিছু বলতেও পারে না। মুখের সামনে কাউকে রূঢ় কথা বলা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বলে— কখনও আকারে ইঙ্গিতে, কখনও পরিহাস করে, আবার কখনও বা নেচে গেয়ে।

কিন্তু বিনোদিনী তা গায়ে মাখে না।

গৃহকপোতী (১৯৩৭), এক

প্রবোধেন্দু ঠাকুর

রাজার নাম শূদ্রক। একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন তিনি এই সমুদ্র মেখলামণ্ডিত ধরণীর। সামন্ত নরপতিরা ভয়ে ও ভক্তিতে তাঁর শাসন নতমস্তকে স্বীকার করত— যেন তিনি দ্বিতীয় ইন্দ্র। চক্রধর বিষ্ণুর মত তাঁরও করকমলে দেখা যেত শঙ্খচক্রের চিহ্ন। হরের মত তিনিও ছিলেন জিতমন্মথ। শক্তির কথা যদি বল, তাহলে বলতে হয় দেবসেনাপতি কার্তিকই তাঁর তুলনা। সাগর যেমন লক্ষ্মীর পিতা, ইনিও ছিলেন তেমনিই সৌভাগ্যলক্ষ্মীর জন্মদাতা; মেরুর মত তাঁরও চরণচ্ছায়া ছিল নিখিল মানবের আশ্রয়স্থল; দিক্‌হস্তীর মত তাঁরও কর সর্বদা দানজলে থাকত সিক্ত। এমন কোনও আশ্চর্যই ছিল না যা তিনি করেন নি; এমন কোনও যজ্ঞই ছিল না যারা তিনি অধিষ্ঠাতা ছিলেন না। সর্বশাস্ত্রের ছিলে আদর্শ, সকল কলার উৎপত্তি, সকল গুণের কুলভবন। কাব্যামৃত-রসের তিনি ছিলেন উৎস, অমিত্রমণ্ডলের ধূমকেতু, মিত্রমণ্ডলের উদয়শৈল। বহু সভাসমিতির প্রবর্তন করেছিলেন তিনি; রসিকগোষ্ঠীর তিনি ছিলেন আশ্রয়, ধনুর্বিদ্যায় অপরাজিত, সাহসিকশেখর, বিদগ্ধদের শিরোভূষণ। এমনি ছিলেন শূদ্রক রাজা।

ভগবান বাসুদেব নরসিংহেব রূপ গ্রহণ করে নখদীর্ণ করেছিলেন শত্রুবক্ষ এবং ত্রিবিক্রমে আক্রমণ করেছিলেন ত্রিভূবন, কিন্তু নৃসিংহ শূদ্রকের নামোচ্চারণেই শত্রুহৃদয় দীর্ণ হয়ে যেত... সমরনিশা যখন নিবিড় হয়ে আসত, ধারাবৃষ্টি হত মত্ত মাতঙ্গের মদস্খলনে, শত্রুপক্ষের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শূদ্রকের কাছে আগমন করতে জয়লক্ষ্মী— অভিসারিকার মত। বিয়োগিনী রিপুসুন্দরীদের মানস-পতিকেও দগ্ধ করে দিত এমনই ছিল শূদ্রকের প্রতাপবহ্নি।

শূদ্রকের রাজত্বে প্রজাদের মধ্যে চিত্রকর্মেই ছিল বর্ণসঙ্কর, রতিকালেই কেশগ্রহণ, কাব্যেই দৃঢ়বন্ধ, শাস্ত্রেই চিন্তা, স্বপ্নেই বিরহ, কেতনেই কম্প, করীতেই মত্ততা, শশী কৃপাণ ও কবচেই কলঙ্ক, রতিকলহেই দূতসংবাদ এবং অক্ষক্রীড়ায় ছিল শূন্যগৃহ। পরলোকভীতি ব্যতীত অন্য ভয় ছিল না শূদ্রকের। তিনি কুটিলতা ভালবাসতেন অন্তঃপুরিকাদের কুন্তলভঙ্গে, মুখরতা সহ্য করতেন নূপুরে, অশ্রুবর্ষণ করতেন যজ্ঞধূমে এবং কশাঘাত করতেন তুরঙ্গপৃষ্ঠে। পুষ্পধনুর টঙ্কার ব্যতীত অন্য চাপধ্বনি উঠত না তাঁর রাজত্বে।

রাজা শূদ্রকের রাজধানী ছিল বিদিশা।

কাদম্বরী, প্রথম খণ্ড (১৯৩৭)

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

কৃষ্ণ বলিলেন: অর্জুন, তুমি যুদ্ধে আসার পরে শোকের অযোগ্য ব্যক্তিদিগের জন্য শোক করিয়াছ, আবার জ্ঞানের কথাও বলিতেছ! দেখ, জ্ঞানীরা মৃত বা জীবিত ব্যক্তিদিগের জন্য শোক করেন না। আমি পূর্বে কখনও ছিলাম না, এমন নহে; তুমি পূর্বে ছিলে না, তাহাও নহে; এবং এই রাজারা পূর্বে ছিলেন না, ইহাও নহে। আবার আমরা সকলে ইহার পরে থাকিব না, তাহাও নহে। জীবের এই স্থূলদেহে যেমন ক্রমশঃ বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য উপস্থিত হয়, তেমন অন্য স্থূলদেব-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানী লোক তাহাতে শোক করেন না। ভরতবংশীয়, কুন্তীনন্দন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করে, সে-বিষয়েন্দ্রিয়স্বন্ধের উৎপত্তিও আছে এবং বিনাশও আছে। সুতরাং তাহা অনিত্য। অতএব তাহার দুঃখ তুমি সহ্য কর। পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাঁহার নিকট সুখ ও দুঃখ সমান এবং যাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সেইরূপ যে পুরুষকে এই বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ চঞ্চল করিয়া তোলে না, সেই পুরুষই মোক্ষলাভের যোগ্য। অসৎ অপদার্থের সর্বদা অস্তিত্ব থাকে না; আবার সৎ পদার্থেরও ধ্বংস হয় না। তত্ত্বদর্শীরা এই দ্বিবিধ পদার্থেরই স্বরূপ দেখিয়াছেন। অর্জুন, যিনি এই সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই জীবাত্মাকে তুমি অবিনাশী বলিয়া অবগত হও। কারণ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ না থাকায় কোন পদার্থই এই জীবাত্মার বিনাশ করিতে পারে না। ভরতনন্দন, জ্ঞানীরা বলিয়াছেন: সর্বদা একরূপ, অবিনাশী ও অপরিমেয় জীবাত্মার এই দেহগুলিই বিনশ্বর। অতএব তুমি স্বধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কর। যিনি এই জীবাত্মাকে হন্তা বলিয়া জানেন, কিংবা যিনি উহাকে হত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা দুইজনই প্রকৃত বিষয় জানেন না। কারণ এই জীবাত্মা অন্যকে বধ করে না, কিংবা অন্যকর্তৃক হত হয় না... এই আত্মা জন্মহীন, চিরকাল একরূপ এবং সর্বদা সমান থাকে ও নিকটে থাকে। অতএব স্থূলদেশ বিনাশ করিতে পারিলেও আত্মাকে বিনাশ করিতে পারা যায় না। অর্জুন, যে-লোক এই আত্মাকে অবিনাশী, চিরকাল একরূপ, জন্মহীন ও ক্ষয়হীন বলিয়া জানে, সে-লোক কোন্ প্রকারে কোন্ আত্মাকে বধ করাইতে পারে বা বধ করিতে পারে? মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও তেমন জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। অস্ত্র-সকল আত্মাকে ছেদন করে না, অগ্নি উহাকে দগ্ধ করে না, জল ইহাকে আর্দ্র করে না, কিংবা বায়ু উহাকে শুষ্ক করে না... অতএব অর্জুন, তুমি আত্মার এই অবস্থা জানিয়া ভীষ্মপ্রভৃতির আত্মার জন্য শোক করিতে পার না।

মহাভারতম্, (১৯৩৭), ভীষ্মপর্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ বসু

মানবহৃদয় দেব-দানবের দ্বন্দ্বভূমি। তাহার মুষ্টি-পরিমিত হৃৎপিণ্ডের উপর সুরাসুরে, সদসতে নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। কখন্ দেবতার স্বর্গ দানবের বিলাস-ভূমি হয়, সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা আসে, সয়তানের কুমন্ত্রণায় বিহিত ভোগ ত্যাগ করিয়া কখন্ মানব নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে, কেমন করিয়া সুপ্ত রিপু-সকল, নিদ্রিত পিশাচদল জাগিয়া উঠে, কবে কোন্ ঘটনা বায়ুচালিত ক্ষুদ্র বীজ চিত্তক্ষেত্রে পতিত হইয়া কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়— কেবল প্রজ্ঞাচক্ষু প্রতিভার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই তাহা সূক্ষ্মরূপে লক্ষ্য করিতে সমর্থ। প্রতিভা দৈবশক্তিশালিনী। মানবমনের অব্যক্ত ভাব, ঘটনার অস্পষ্ট গতি, কার্যকারণের অদৃশ্য শৃঙ্খল কবির তৃতীয় নয়নের সমক্ষে আত্মগোপন করিতে পারে না। এইজন্যই রসসাহিত্যের আলোচনা প্রকৃত জীবনগ্রন্থ-পাঠের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু কবির শিক্ষা নীতিপাঠের নীতির ন্যায় সূত্রাকারে নিবদ্ধ নহে। তাঁহার অলিখিত, অব্যক্ত নীতিভাবের উচ্ছ্বাস রসের অমিয়ধারায় হৃদয়কে নিষিক্ত করে। তাহা চাণক্য-শ্লোকের মত স্মৃতির কোটরগত রাখিবার বস্তু নহে; তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সামগ্রী। শিক্ষাদান রসসাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু শিক্ষালাভ তদালোচনার অবশ্যম্ভাবী ফল। এইজন্য বোধ করি, ভারতে মোক্ষপথ-প্রদর্শক বেদ-বেদান্তাদির পর রসসাহিত্যে পুরাণের এত আদর। বৃহৎ ব্যোমবৃত্তান্ত হইতে জীবাণু পর্যন্ত বাহ্যপ্রকৃতির যে-সকল নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, মানবের হৃদয়রহস্য তদপেক্ষা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। এই হৃদয়রহস্য রসসাহিত্যের বিষয়ীভূত। বিজ্ঞান মানবের অশেষ কল্যাণসাধন করে, সত্য কিন্তু উচ্চশ্রেণীর রসসাহিত্য তাহার বুভুক্ষু আত্মার পুষ্টিকর অন্ন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের পথ প্রদর্শন করিয়া উচ্চাঙ্গের রস মুক্তিপথেরও প্রদর্শক; শাস্ত্রও স্বীকার করিয়াছেন "রসো বৈ সঃ।" ভাব-রসে সেই পরম রস-বিগ্রহের সাধনাই রসের চরম পরিণতি। রসসাহিত্যের আধিপত্য মানবের হৃদয়ের উপর; এইজন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়া মানুষ কবিকে হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমান বিশ্বে জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক থাকিতে সাধারণ জনহৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সমধিক।

গিরিশচন্দ্র, প্রথম অধ্যায় (১৯৩৮)

(কাজী) আবদুল ওদুদ

তাঁদের চিন্তা-ভাবনার ধারা কতকটা এই: মানুষ দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিভক্ত নিঃসন্দেহে, কিন্তু সভ্যতার প্রথম থেকেই এই সব বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে শুধু উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় হয় নি, চিন্তা-ভাবনার বিনিময়ও হয়েছ। সেজন্য কোনো জাতির সাহিস্যকে একান্তভাবে জাতীয় ভাবা অবিবেচনা মাত্র— তা হোক না তাদের ভাষাগত বিভিন্নতা যথেষ্ট। সাহিত্যের প্রবণতা আন্তর্জাতিকতার দিকেই— যান-বাহনের উৎকর্ষের সঙ্গে সাহিত্যের সেই প্রবণতা দিন দিন প্রখরতর হয়ে উঠেছে। সাহিত্যকে বলা যেতে পারে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট রুচির বাহন। সেজন্য জগতের যেখানে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট রুচির প্রকাশ ঘটেছে, সেদিকে সহজেই অন্যান্য দেশের মনস্বীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেই এক কারণে। তাই এ-যুগে ইয়োরোপের অনুসরণের বা অনুকরণের প্রশ্ন ঠিক ওঠে না, কেননা যে-নামেই বলা হোক এ-ভিন্ন আর কারো কিছু করবার নেই, কেউ কিছু করছেও না। বিজ্ঞান একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও আন্তর্জাতিক। সাহিত্য তেমন নৈর্ব্যক্তিক নয়। কিন্তু যেহেতু তা মুখ্যত জ্ঞানের কথা, সেজন্য সাহিত্যকেও মুখ্যভাবে আন্তর্জাতিক ভাবা-ই সঙ্গত। একালের বাংলা সাহিত্য যে জ্ঞাতসারে আন্তর্জাতিক হতে পেরেছে, এ তার সৌভাগ্যের কথা এবং এই পথেই তা দেশে নূতন জ্ঞানপ্রবাহ এনেছে। কিন্তু একালে বাংলা সাহিত্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে এই প্রধান কারণে যে, ইয়োরোপের অর্থাৎ একালের শ্রেষ্ঠ জীবনায়োজনের অনুসরণ তাতে যোগ্যভাবে হয় নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও ইয়োরোপীয় জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই সম্প্রসারণশীল জীবনে যত সমস্যা দেখা দিয়ে চলেছে, সাহিত্যে তার নিপুণ বিশ্লেষণ ও রূপায়ণ হচ্ছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যিকদের এই ভুল হয়েছে যে, বিশ্বের নিয়মে তাঁদের দেশেরও সমাজজীবনে য়ে-পরিবর্তন এসেছে, তার দিকে তাঁদের দৃষ্টি যায় নি। তার পরিবর্তে যে-সমাজের ভিতর এই সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল তারই সুখদুঃখ-বর্ণনার অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পেরেছেন। তাই বলা যেতে পারে, একালের বাংলা সাহিত্যে শক্তিহীনতা দেখা দিয়েছে ইয়োরোপের অনুকরণ বা অনুসরণ তাতে বেশী হয়েছে বলে নয়, বরং বেশী যোগ্যভাবে হয় নি বলে। দেশের জন্য এটি একটি সাহিত্যিক সঙ্কট সন্দেহ নেই।

আজকার কথা, একালের জীবন ও একালের সাহিত্য (১৯৩৯)

অবশ্য কাব্যগঠনের স্থানীয় রীতি, অর্থপ্রকাশের গতানুগতিক উপায়, সর্বগ্রাহ্য ভাবানুষঙ্গ ইত্যাদি বন্ধন ভাষার পক্ষে নিতান্ত অনুপকারী নয়; এবং প্রচলিত পদবিন্যাসের অভাব যেহেতু ভাষামাত্রের প্রাঞ্জলতা কমায়, তাই আধুনিক বাংলার দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা বাড়াতে গিয়ে আমরা প্রাচীন বাংলার প্রসাদগুণ হারিয়েছি। তাহলেও বোধহয় অর্বাচীনেরাই অবশেষে জিতেছে; এবং অভিধার হানিতে অভিপ্রায় তো বৃদ্ধি পেয়েছেই, এমনকি গদ্য-পদ্যের অভ্যস্ত ছন্দঃশৃঙ্খল ভেঙে যাওয়াতে ভাষায় এতখানি স্থিতিস্থাপকতা এসেছে যে, ইদানীং কেবল ধ্বনির সাহায্যে ভাবনা-বেদনার স্তরভেদ-জ্ঞাপন বাঙালীর পক্ষে সহজসাধ্য। তাছাড়া উত্তররাবীন্দ্রিক বাংলার ন্যায়সঙ্গতি যদিও খুব প্রশংসনীয় নয়, তবু তার চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়কর; এবং সর্বোপরি তার বেশ-ভূষায় আর পোষাকী-আটপৌরের তফাৎ নেই, স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে সে আর ভেক বদলায় না, অন্দরমহলে যে-সাজে থাকে, রাজপথেও সেই পরিচ্ছদে ঘুরে বেড়ায়।

অথচ সেই স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে বিদেশী স্বেচ্ছাচারের নামগন্ধ নেই, আছে স্বদেশী বিশ্রাম্ভালাপের অমায়িকতা; এবং সেই কারণে, সুযুক্তি সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সনাতনীদের আপত্তি শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি, সারা বাঙলা দেশ তাঁর দৃষ্টান্তে কথা কইতে শিখেছে। দুঃখের বিষয় একা জগদীশ্বরই একাধারে নির্দোষ ও বর্তমান, অন্যত্র সত্তা আর পরিপূর্ণতার সম্বন্ধ বিষমানুপাতিক, এবং মনুষ্যবিশেষের প্রতিভা যতই বহুমুখী হোক না কেন, সে যে-কালে অস্তিত্ববান, তখন তারই কর্মকাণ্ডে যে-সমস্ত সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখা দেয়, সেগুলোর প্রত্যেকটিকে সে ফলাতে পারে না। অতএব এ-কথা যদিও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার নির্বন্ধেই সাধু বাংলার মায়া কাটিয়েছিলেন, তবু কালক্রমে নূতন ভাষানির্মাণের উন্মাদনা তাঁকে এমনই পেয়ে বসল যে, তিনি তাঁর স্বভাবদত্ত সংবেদনশীলতা তথা দৃক্‌শক্তির ব্যবহার প্রায় ভুলে গেলেন, তাঁর রচনারীতি প্রাক্তন সারল্য ঘুচিয়ে আত্মজ্ঞ বক্রোক্তির শরণ নিলে, এবং তিনি তাঁর আদিম অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাঙিয়ে, সঙ্গে উপমা-অলঙ্কারের খাদ মিশিয়ে, কার্পণ্য সহকারে পরবর্তী লেখার কাজ চালাতে লাগলেন।

কুলায় ও কালপুরুষ, রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা (১৯৩৯)

পূর্বে ভাগলপুর বাংলার অন্তর্গত থাকায় সেখানে বহু বাঙালীর বাস, অনেকেই সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে ক্রমে উন্নতির সহজ উপায় সকল উদ্ভাবিত হওয়ায়, যেমন একান্নবর্তিতাকে বাহান্নবর্তিতায় রূপান্তরিত করে সত্বর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা ও স্বাতন্ত্র্যে সুখানুভব করা, সেইরূপ শিক্ষিত বিহারী বন্ধুরা বিহারকে বাংলা হতে বিচ্ছিন্ন করে স্বাতন্ত্র্য খোঁজায় বাংলাকে বহু ত্যাগ স্বীকার করে ক্ষীণ হতে হয়; ভাগলপুরকেও সেই হতে হারানো হয়। পথের ধারে প্রাচীন বাড়ি ঘর বাগান আজও বাঙালীদের পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে ভোলানাথের পিতা ভবনাথবাবু চাকুরি-সূত্রে ভাগলপুরে এসে বাস করেন। বাঙালীর সময়টা তখন মোড় ফিরছে, গ্রহ রন্ধ্রগত হবার রাস্তা নিয়েছে। আমরা স্বরাজের আওয়াজ পেয়েছি, বঙ্গভঙ্গে সকলে বেজায় উত্তেজিত, 'বয়কটে' উৎকট প্রেম, বিলাতী নিবের বদলে কঞ্চি দিয়ে "ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট" লিখছি। এই তেরস্পর্শে মহাহর্ষে মেতে রয়েছি ও প্রভুদের শুভদৃষ্টি হতে হটে চলেছি— দিন দিন তাঁদের বিষ-নয়নের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ছি।

এই অবস্থায় অনেক বাবুর মত ভবনাথবাবুরও চাকুরি সইল না। মতি তখন উলটো পথ ধরেছে। বাহবা সম্বলে বাহাদুরির হাসি হাসতে হাসতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির শান্তিকুঞ্জে আগুন লাগল, আলো দেখা দিল বাইরে আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়— ছাই পড়ল সংসারে, আঁধার হল প্রিয়ার মুখ, আবদার ও কান্না বাড়ল সন্তানদের!

বাড়িতে থাকা দায়। সেগুলো হল পাঁচিল-ঘেরা, ছাঁদ-আঁটা গারদ, বেকারের বনবাস। কেবল নাই, নাই— চাল নাই, ডাল নাই, বাজারের পয়সা নিত্য চাই, ঘুম না ভাঙতেই ভূতো জিলিপি চায়, লিলির তরল-আলতা জবা-কুসুম ফুরিয়েছে, ছেলের ইস্কুলের মাইনে চাই। পুজো যত কাছাচ্ছে, ভবনাথ কুঁজো মারছেন। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় প্রহরের দিকে চাওয়া বরং সহজ, কিন্তু মুখ তুলে পত্নীর মুখপানে চায় কার সাধ্য! আড়চোখে সশঙ্কে তাঁর মেজাজটা যাচাই করতে গেলে হৃদ্‌কম্প হয়।

সন্ধ্যাশঙ্খ (১৯৪০), ভোলানাথের উইল

(শেখ) হবিবর রহমান

অনেকক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়াছে, প্রকৃতির প্রশান্ত বিশাল বক্ষে বিষাদের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সমীরের মর্মভেদী দারুণ দীর্ঘশ্বাসে তরুলতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আকাশ তারকারাজি কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। তরুরাজি সর সর করিয়া দারার হৃদয়ের দারুণ দুঃখ-কাহিনী জগৎকে শুনাইতেছে।

সোমগড়ের মহাপ্রান্তর আজ মহাশ্মশান। সহস্র সহস্র বীরহৃদয়ের তপ্ত রুধিরে তাহার ঊষর বালুকারাশি সুরঞ্জিত; বিশাল প্রান্তর ব্যাপিয়া শবদেহ, কেবলি শবদেহ। যাহাদের প্রতাপে এক সময় জগৎ কম্পিত হইত, যাহাদের সগর্ব পাদবিক্ষেপে একদিন পথিকের হৃদয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত, আজ তাহারা ভূমিশয্যায় অচেতন, শৃগাল-কুক্কুরের আহার্য। হায়, কাহারো মস্তক চূর্ণ, হৃদয় দীর্ণ, কাহারো বাহু ছিন্ন, কাহারো শরীরের অর্ধাংশ ভীষণ কামানের গোলায় উড়িয়া গিয়াছে, কাহারো নয়ন-অভ্যন্তরে অর্ধহস্তপরিমিত তীর-শলাকা প্রবিষ্ট হইয়াছে। কত হতভাগ্যের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া এখনো প্রাণ-পাখী বাহির হয় নাই। দারুণ তৃষ্ণায় সমস্ত শরীরের শোণিত শুকাইয়া আসিয়াছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত, কণ্ঠ অবরুদ্ধ। অস্ফুটভাবে জল জল শব্দ কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবার পূর্বেই শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। আজ এ-মহা প্রান্তরে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, আমীর-ফকির সকল পার্থক্য উঠিয়া গিয়াছে। সকলেরই এক দশা! কত আমীর-ওমরা, সৈন্য-সেনাপতি সামান্যতম সৈনিকগণের সহিত অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া আজ এ-মহা নিদ্রায় বিভোর। আজ সমস্ত উচ্চাশা, সমস্ত যশোলিপ্সা, আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম তাড়না সমস্তই নিবিয়া গিয়াছে।

প্রত্যহ যেরূপ উঠে, আজও সেইরূপ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তারা ফুটিয়াছে, চন্দ্রের সেই স্নিগ্ধ শুভ্র রশ্মি আজ এ-মহাশ্মশানের মধ্যে যেন পিশাচের ন্যায় হা-হা করিতেছে। মানবের সমগ্র উচ্চাশার উপরে যেন কি এক তীব্র উপহাসের বিদ্রূপ-কটাক্ষ তীরের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে এই শোচনীয় আত্মকলহ— মানব হইয়া মানবের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা— হৃদয়ের শোণিত-পান! জগতে দ্বারে দ্বারে এ-কথা ঘোষণা করিবার জন্য উধাও সমীরণ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়াছে।

আলমগীর, প্রথম ভাগ, চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রবিবার (কারণ সেই দিন মেয়েটির স্কুল থাকে না) সকাল নয়টার সময়ে মনে মনে বাংলা দেশের খ্যাতনামা প্রেমিকদের নাম জপ করিতে করিতে মনোজ সেই গলিতে প্রবেশ করিল। গলির মুখেই একটি বড় দোতলা বাড়ি, তাহার সদর-দরজা বড় রাস্তার উপরে। এই বাড়ির পরেই একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির সদর-দরজা বন্ধ। খোলা জানালার মাথায় একটি সাইন-বোর্ড, তাহাতে লেখা: হ্যানিমান হোমিও হল, ডাঃ রাঘবচন্দ্র বোস, এইচ এম ডি (ফিল)। অর্থাৎ ডিগ্রীটি স্বদেশী সস্তা মাল নহে, বিদেশ হইতে বহুমূল্যে সংগৃহীত হইয়াছে। মনোজের মন ও বুদ্ধি দুইটি একযোগে রায় দিল, মেয়েটি এই বাড়িরই। কিন্তু বাড়িতে ঢুকিবে কি উপায়ে? জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখা গেল না। মনোজ কি ডাক্তারের উদ্দেশে দরজায় ধাক্কা দিবে? হঠাৎ পিছন হইতে বাজখাঁই গলায় 'কি চাই' প্রশ্ন শুনিয়া মনোজ চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তাহার চেয়েও প্রায় এক হাত লম্বা একজন লোক বুক চিতাইয়া, ঠোঁট দুইটা চাপিয়া, কোটরে-ঢাকা ছোট ছোট চোখ দুইটার ধারালো দৃষ্টি তাহার উপর উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটার মাথাটা শরীরের অনুপাতে ছোট। ঘোড়া প্যাটার্নের লম্বা মুখ, উঁচু চোয়াল, বসা গাল, সারা মুখটা ব্রণ ও মেচেতায় ভর্তি, বুকটা চ্যাপ্টা, পাঁজরের হাড়গুলো এক-একটি করিয়া গোনা যায়, হাত দুইটা আজানুলম্বিত বলা চলে, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখে দাড়ি ও গোঁফ নাই বলিলেই হয়, পরিধানে খাটো কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরা, গা ও পা দুইই খালি। লোকটার বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হইবে না। মনোজ কোনমতে তোতলাইয়া কহিল, "ডা— ডা— ডাক্তার—"

"ওঃ, রোগী!" বলিয়া লোকটা পাঁজাকোলা করিয়া মনোজকে একেবারে ডাক্তারখানায় ঢুকাইয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল কহিল, "বসুন, ডাক্তারবাবু আসছেন!" বলিয়া দেওয়ালে ঝোলানো একটা মলিন বঙ-চটা পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইল।

অভ্যর্থনার বহর দেখিয়া মনোজ ঘাবড়াইয়া গেল। ডাক্তার না ডাকাতের সর্দার, কে জানে চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টি ফেলিয়া ফেলিয়া প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুধার প্রেম (১৯৪০), ২

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ঢাকাই শাড়ীই হোক আর গরদের পাঞ্জাবীই হোক, নিশ্চিন্ত নির্বিবাদে তাকে দেওয়া হত মোট গুণতির হিসেবে। কোন্‌টা সযত্নে সাবান দিয়ে কাচতে হবে আর কোন্‌টা কাচতে হবে রিঠের জলে, তা বলে দেবার কোন দরকার ছিল না। সে-মাথাব্যথা, যে কাচবে তার। গৃহস্থ যথাসময়ে ঝকঝকে-করে-কাঁচা ও পরিপাটি-ইস্তিরি-করা অবস্থায় ফেরত পাবে।... সেকেলে ধোপা-ধোপানীদের হাতে জামাকাপড়ের আয়ু যা ছিল, তাতে কোন গৃহস্থকেই এ-বিষয়ে অপব্যয়ে পড়তে হত না। তিনখানা কাপড় এবং তিনটে জামা হলে অনেকদিন ধরে নিশ্চিন্তে ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলা যেত।

ধোপানীর হাসিতে যতই চমক ও চলনে যতই গমক থাকুক না কেন, তার ব্যবহারে কোন জটিলতা ছিল না। মাঠে-ঘাটে, গাছের ডালে ও ঝোপের উপর কাপড় শুকোতে দিয়েও সেগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে আনত তারা। খোঁচা লেগে ছিঁড়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখত। দাঁত দিয়ে কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে আসার স্বভাব কোনদিন তাদের মধ্যে দেখি নি। আর শার্টের একটা হাতা ছিঁড়ে রেখে দিতে হবে, এমন ফন্দি তাদের মাথায় কোনদিন আসে নি। এক-আধটা বোতাম যদি বা ছিঁড়েছে বা ভেঙেছে, সেটাকে যত্ন করে লাগিয়ে নিয়েই ফেরত এনেছে। আধুনিক শিল্পবোধ তখনো জাগে নি তাদের মধ্যে, তাই গরম ইস্তিরির দাগে জামাকাপড় বিচিত্রিত করে দেওয়ার প্রয়াস তারা পায় নি কখনো।

তা বলে কোনদিন কোন জামাকাপড় ছেঁড়ে নি, পোড়ে নি, খোয়া যায় নি, তা নয়। কিন্তু সে-অবস্থায় ধোপানী খবরটা যেদিন নিয়ে এল, তা নিবেদন করল সভয়ে চোরের মত। ধমকে বললাম, "দাম কেটে নেব, চাইকি কিছু জরিমানাও দিতে হবে তোকে!" মুখ কাঁচুমাচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, যেন শাস্তিটা সে ন্যায্য বলেই মেনে নিচ্ছে। বর্ষা-বাদলা ও অন্যান্য দুর্যোগে কাপড় দিতে অপরিহার্য বিলম্ব ঘটলে যখন তিরস্কার করছি, হেসে বলেছে, "আমাদের কথা কি দেবতা শোনে? গরীবের, ছোট জাতের কথা? আপনারা বললে শুনবে!"

অথ বস্ত্রহরণ কথা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন প্রতিহার-বংশের পতনের ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেই খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা সূর্যপাল খুব পরাক্রান্ত হয়ে উঠে সাম্রাজ্য গঠন এবং প্রতিহার-বংশের পূর্বগৌরব ফিরিয়া আনবার দিকে মন দিয়েছেন, এমন সময়ে সূর্যপালের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিল।

ব্যাধি যে ঠিক কি, তা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। দক্ষিণ পায়ের একটি শিরা টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করে, বুক ধড়ফড় করে, আর বাম চক্ষুটা থেকে থেকে জরাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। রাজবৈদ্যগণের মধ্যে কেউ বললেন বাতব্যাধি, কেউ বললেন হৃৎরোগ, কেউ বা বললেন মস্তিষ্কের পীড়া। উৎসর্গ তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মহারাজা দিন দিন বলহীন এবং কৃশ হয়ে পড়তে লাগলেন। মুখ বিস্বাদ, মেজাজ খিটখিটে, আহারে রুচি নেই, আমোদ-প্রমোদে মন সাড়া দেয় না।

রাজবৈদ্যগণ একটা পরামর্শ-সভা ক'রে স্থির করলেন যে, এ-ব্যাধি আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রবিদিত কোন ব্যাধি নয়; এ নিশ্চয় এমন একটা চোরা ব্যাধি যারা উৎপত্তিস্থল শরীরের বিশেষ কোন গুপ্ত প্রদেশে নিহিত। নিদানশাস্ত্র মথিত ক'রে যখন তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। মূলে কুঠারাঘাত না ক'রে শুধু শাখাচ্ছেদন করলে কি মহীরূহের বিনাশ সাধন করা যায়? রোগ বেড়েই চলল, মহারাজা সূর্যপাল ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়তে লাগলেন।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় মহারাণী চন্দ্রশীলা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজার আরোগ্য-কামনায় তিনি কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত গ্রহপূজা করালেন; মাদুলি এবং কবচে, নীলায় এবং পলায় মহারাজার কণ্ঠ ও বাহু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক— কিছুই বাদ গেল না; কিন্তু রোগ বিন্দুমাত্র উপশমের দিকে না গিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনে হল, দেবতাও বুঝি সূর্যপালের প্রতি বিরূপ।

উট-রোগ

বলিয়াছি, গ্রামটি জনহীন। কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। একদিন এই গ্রাম ধনে জনে সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার জমিদারের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য তাঁহাদের বিরাট কোঠাবাড়ির জাঁকজমক, গ্রামের মাঝখানে শিবমন্দির ও প্রকাণ্ড দীঘি, গ্রামের হাট, সবই ছিল বিস্ময়কর। দূরের গ্রাম হইতে ব্যাপারীরা এখানকার হাটে আসিত, পাশের গাঁয়ের লোক রোজ এই বাজারে আসিয়া মাছ কিনিত, ফড়িয়ারা এইখান হইতে মালপত্র কলিকাতায় চালান করিত, গাড়ি এখানে পাঁচ মিনিট দাঁড়াইত।

তারপর গ্রামে ম্যালেরিয়া লাগিল। প্রথমটা লোকে বড় একটা গ্রাহ্য করিল না; যশোহরে ম্যালেরিয়া একটা অতি সাধারণ বস্তু। আর অত বড় গ্রামে দুই-চারিটা লোক মরিলেও সহসা কাহারও চমক লাগিবার কথা নয়। এই ঔদাসীন্যের অন্তরালে কখন যে ম্যালেরিয়া জাল বিস্তার করিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই; তারপর যখন সে একেবারে ভীষণ সংহারমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন আর সাবধান হইবার অবসর রহিল না। ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়া ডাক্তার ডাকিবারও সময় দেয় না, ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরিতে লাগিল; বিকট হরিধ্বনিতে গ্রামে আকাশ-বাতাস অনুক্ষণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর ক্রমে হরিধ্বনি কমিয়া আসিল। ম্যালেরিয়া কমিয়াছে বলিয়া নয়, হরিধ্বনি করিবার মত গলার জোর আর অবশিষ্ট নাই বলিয়া। গ্রামে মহামারী লাগিয়া গেল। যাহারা পারিল, গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। যাহারা পারিল না, তাহারা মরিল। শ্মশানে যাইবার লোক ও সামর্থ্যের অভাবে মড়া ঘরে পড়িয়া পচিতে লাগিল। অনেকে চারিদিকে এই আতঙ্কের পরিবেষ্টনে রক্ত শুকাইয়া তিলে তিলে মরা অপেক্ষা একেবারে শেষ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিল— মৃত পুত্রের শবের পাশে মাতার দেহ আড়ায় ঝুলিয়া রহিল, দীঘির জলে বহু পতিপুত্রহীনার দেহ ফুলিয়া ভাসিয়া পচিয়া গলিয়া গেল। দুই বৎসরের মধ্যে গ্রাম নির্জন হইয়া গেল।

টিকিয়া রহিল শুধু তাহার বিরাট প্রাণহীন জমিদার-বাড়ি, তাহার নির্জন পথঘাট শিবমন্দির, তাহার স্বচ্ছশীতল দীঘি আর তাহার রেল-স্টেশন।

ডায়লেক্‌টিক (১৯৪০), অলক্ষ্মী

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

অতসী যুবতী। অতসী বিধবা। গ্রামের একমাত্র জমিদার ত্রিলোক চক্কোত্তির বড় আদরের মা-মরা ছোট মেয়ে অতসী। সেই অতসী কিনা কাঁদে। কাঁদিতেছে। বুকফাটা ক্রন্দন! তাই বলিয়া অতসী কিন্তু প্রেমে পড়ে নাই, কাউকে সে ভালবাসে নাই। তাহাকে দু-কথা শোনাইয়া মনে ব্যথা দিতে পারে, এত বড় দুঃসাহস এ গাঁ-এ কাহারো নাই। তবু অতসী কাঁদিতেছে। প্রেমে পড়িয়া নয়— প্রেমের গায়ে আঘাত খাইয়া।

তাহাকে নাকি ভালবাসিয়াছে তাহারই পিতার এতদিনের অতিবিশ্বাসী কর্মচারী যতীন ঘোষাল! তাই সে কাঁদে। কাঁদিয়াই অতসী সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চায়। মণিহারা ফণিনীর মত ফুঁসিয়া করিয়া যে-প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কাল রাত্রে, আজ ভোরের আলোয় চোখের জলে তাহারই শেষকৃত্য করিতে চায়! এত বড় আস্পর্ধা! তাহার বৈধব্যের সুযোগ লইয়া মনে করিয়াছে সে এতই সস্তা, এতই অসহায়!

যতীন ঘোষালকে এখন সে হাতের কাছে পাইলে বুঝি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু অপরাধী এখন আয়ত্তের বাহিরে— দেড় শ মাইল দূরে, কলিকাতায়। কাল রাত্রের গাড়িতেই সে চক্কোত্তি গোষ্ঠীর ম্যানেজারের পদে ইস্তফা দিয়া চিরকালের মত পলাশপুর ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। ভুল বঝিয়াছিল, ভুল ভাঙ্গিতেই পলাইয়া বাঁচিয়াছে— লজ্জায়, নিরাশায়, অপমানে না অভিমানে, কে জানে। রাতারাতি একেবারে দেড় শ মাইল ব্যবধান।

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে অতসী— ফুলিয়া ফুলিয়া। রুদ্ধ দুয়ার। বিস্রস্ত এলোচুল। বিক্ষুব্ধ চেতনা। কাল রাত্রের সেই ক্রুদ্ধ সিংহিনী আর নাই। বহ্নিশিখা জ্বলিয়া পুড়িয়া আজ এখন মুঠা মুঠা ছাই। এই ভস্মরাশির মধ্যে কোন ছলে কোন অদৃশ্য বীজ যদি লুকাইয়াই থাকে, তাহা এখন চোখের জলের অবাধ স্রোতে একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। এ তাহার ক্রন্দন নয়— প্রায়শ্চিত্ত। যে-পাপকথা দুটি পোড়া কানে শুনিয়াছে, অশ্রুজলে তাহারই প্রবাহ-প্রক্ষালন।

অতসী সে-জাতের বিধবা নয়... অতসী দীক্ষা নিয়াছে। গলায় পরিয়াছে কণ্ঠী, কপালে কাটে তিলক। বাহুতে দাগে গঙ্গামাটির ছাপ। গরদ পরিয়া আহ্নিকে বসে। নামজপে আত্মহারা হয়। কৃষ্ণকীর্তনে কেমন হইয়া যায়!... সকাল-সন্ধ্যা আরাধ্য গোপালের প্রস্তর-পুতুলকে ক্ষণে ক্ষণে শোয়াইয়া, বসাইয়া, কোলে লইয়া, বুকে থুইয়া, আপন মনের নানান রঙে রাঙাইয়া দেখে।

সবার সাথে (১৯৪০), কালীয়দমন

শ্রীমতী রমা পিত্রালয়ে গিয়াছে। মোহন রমা-প্রাসাদের দ্বিতলের ড্রইংরুমে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল। সবেমাত্র সে একা একা ব্রেকফাস্ট সারিয়াছে... এমন সময়ে সিঁড়িতে গম্ভীর ও উচ্চ পদশব্দ উত্থিত হইয়া মোহনকে জানাইয়া দিল যে, কোন আগন্তুক আগমন করিতেছে।

বিলাস দ্বার-মধ্যস্থলে উদয় হইয়া কিছু বলিবার পূর্বেই মোহন কহিল, "পাঠিয়ে দে!" বিলাস অদৃশ্য হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে একজন বৃহৎবপু ও স্ফীত-উদর ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিলেন। মোহন সংবাদ-পত্রখানি টেবিলের উপর রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে 'সুপ্রভাত' জানাইয়া কহিল, "বসুন, ভটচার্য্যি মশায়।"

ভদ্রলোকের সুবৃহৎ আননে বিস্ময়-সমারোহ ফুটিয়া উঠিল। তিনি মোহনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমাকে তুমি চেন, মোহন?" বলিতে বলিতে তিনি উপবেশন করিলেন।

মোহন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "অতীতের ইতিহাস এখনও এত পুরাতন হয়ে নি যে আপনাদের আমি বিস্মৃত হব। আচ্ছা, ও-কথা যাক! আপনি মিঃ হরিদাস হুইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে এসেছেন, না?"

আগন্তুক জমিদার শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য বিস্ময়ে হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন দেখিয়া মোহন হাস্যমুখে কহিল, "এটুকু জানার মধ্যে কোন ম্যাজিক বা যাদু নেই, ভট্চায্যি মশায়। আচ্ছা আগে বলুন, কোন্ শেয়ারে টাকা দিয়েছেন? রুবি না কয়লা?"

সদানন্দ ভট্টাচার্য আশান্বিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কি অন্তর্যামী, মোহন? আমি রুবির খনির শেয়ারে টাকা দিয়েছি।"

মোহন শান্তস্বরে কহিল, "এর জন্য অন্তর্যামী হতে হয় না, ভট্চায্যি মশায়। গত দুই মাসের ভিতর অন্ততপক্ষে দু'ডজন ভদ্রলোক হুইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে গেছেন। আপনি কত টাকার শেয়ার কিনেছেন?"

জমিদার সদানন্দের মুখে কোন স্থানেই এতটুকু আনন্দের চিহ্ন ছিল না। তিনি আর্তস্বরে কহিলেন, "আমার সর্বস্ব, দুটো তালুক বিক্রী ক'রে পঞ্চাশ হাজার টাকা শয়তান হুইয়ের হাতে তুলে দিয়েছি, মোহন। আমার স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আছে একটিমাত্র কন্যা। তাকে আমি কলকাতার হোস্টেলে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। কিন্তু এবার আমি একেবারে পথের ভিখারি হলাম। মোহন, পথের ভিখারি হলাম।" বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

বাড়ীর মানুষ মাত্র দুটি, তারাও আবার স্ত্রীলোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রায় বৃদ্ধত্বে পৌঁছল, অন্যজন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনমধ্যাহ্নের প্রাখর্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। মা-র আবার একটু শুচিবাই রোগ আছে। সকাল দশটায় স্নান করতে যায় পুকুরে, শ'দুই ডুব দিয়ে ফিরতি পথে আবার কিছু মাড়িয়ে আবার ডুব দিয়ে বেলা তিনটায় বাড়ি ফিরে উঠোনের সেই ডোবাটায় শেষ ডুব দেয়। মেয়ে তখন রান্না-বাড়া শেষ করে মা-র তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে থাকে। এমনি করেই কাটছিল, হঠাৎ একদিন মহেন্দ্র এসে হাজির। মহেন্দ্র অর্থাৎ মেয়েটির বর, মা-বুড়ির জামাই।

প্রাচীন ইতিহাস খুললে দেখা যায়, বছর সাতেক আগে মহেন্দ্রের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়েছিল; তখন ওর দাদামশাই অর্থাৎ ওর মায়ের বাবা শ্রীচরণ বেঁচে ছিল, এবং একমাত্র নাতনী মাধবীর বিয়েটাও দিয়েছিল বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে। মহেন্দ্রের অবস্থা বেশ সচ্ছল, জোতজমি তার ভালই ছিল... মোট ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না— এই সব দেশেশুনে একটু লেখাপড়া-জানা ছেলে খুঁজে শ্রীচরণ মহেন্দ্রকেই নির্বাচন করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের ফের! মহেন্দ্র যাত্রাদলের আখড়ায় গাঁজা ধরল, এবং একদিন নেশার ঘোরে মাধবীর চরিত্রে সন্দেহ করে এমন মার মারল যে, পরদিন সংবাদ পেয়ে শ্রীচরণ তাকে ডুলিতে করে তুলে নিয়ে এল। তারপর আর মাধবী শ্বশুরবাড়ি-মুখো হয় নি... এদিকে শ্রীচরণ আজ বছর দুই হল দেহরক্ষা করে জুড়িয়েছে, কিন্তু জ্বলছে এখনও মাধবীর মা। মাধবী কিন্তু মোটে খারাপ মেয়ে নয়। মা-র কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মুখচোপাটা তার একটু যা বেশি, এছাড়া মাধবী পল্লীর আদর্শ কন্যা। কৃষ্ণশ্যামল দেহে তার রূপ যত উথলে পড়ে, পাড়ার ছোঁড়ার ততই তার প্রশংসা করে, ভাব জমাবার নানা কৌশল অবলম্বন করে; মাধবী কিন্তু তার উঠোনের ফুলবাগান, ডোবার কলমী শাক আর মা-র শুচিবাই নিয়েই ব্যস্ত।

মহেন্দ্র এল— দীর্ঘদিন পরে এল মহেন্দ্র— প্রায় সাত বছর। আঠার বছরের মাধবী পঁচিশ বছরের হয়েছে। তরুণী মাধবী যুবতী হয়ে উঠেছে। কালো মাধবী শ্যামলতাকে ডিঙ্গিয়ে প্রায় ফর্সার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। এই দীর্ঘদিনের না-দেখা মাধবীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখল মহেন্দ্র। তারপর গলা-খাঁকারি দিয়ে ঢুকল বাড়িতে। মাধবী তখন এক ঝুড়ি গোবর ভালো ক'রে চটকে ঘুঁটে দেবার জন্যে গোল গোল নুড়ি পাকাচ্ছিল। মহেন্দ্রকে দেখে প্রথমটা সে চিনতেই পারে নি; তারপর হঠাৎ চিনেই মাথার ঘোমটাটা নাক অবধি টেনে দিল।

ধরণীর ধূলিকণা

চৈত্র মাসের প্রথম। বসন্ত পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উগ্র হইয়া উঠিতেছে; প্রকৃতি ধীরে ধীরে রুক্ষরূপ ধারণ করিতেছে। মাঠের চৈতালী ফসলে রসসঞ্চার হইয়া ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে; অনেকের ফসল ঘরে আসিয়া উঠিতেছে। বৎসরের শেষ, আখেরী কিস্তির খাজনা আদায়ের সময়। প্রাচীন সরকার বংশের সাড়ে সাতগণ্ডার অংশীদার বনবিহারী সরকার খাজনা আদায়ে চলিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়, যথাসম্ভব দ্রুতগমনে চলিয়াছেন। মাথায় ছাতা সত্ত্বেও তাঁহার গৌর বর্ণ রৌদ্রের উত্তাপে বাড়ী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে তাঁহার বাড়ীর একমাত্র ভৃত্য নিম্নজাতীয় একটি বালক— নাম নন্দলাল। নন্দলাল তাঁহার সব— গোরু-বাছুরের সেবাও করে, বাজারও করে, আবার চাপরাশীও সাজে। বয়সের অনুপাতে নন্দলাল দৈর্ঘ্যে অনেকটা খাটো; হাত-পা নাড়িলে পুতুলের মত দেখায়, গায়ের রং গাঢ় কালো; সর্বাঙ্গের মধ্যে সাদা তাহার গোল গোল দুইটি চোখ ও দুই পাটী দাঁত। নন্দলালের বগলে সরকার মহাশয়ের আদায়ের কাগজপত্রের দপ্তর; আঙুলে ঝোলানো দড়িতে বাঁধা দোয়াত ও কলম। অন্য হাতে প্রকাণ্ড এক লাঠি।

বনবিহারীবাবু নন্দলালকে বুঝাইতেছিলেন: "বুঝলি, নন্দা; মহালে গিয়ে যেন ম্যাদারাম হয়ে থাকবি না। খুব হাঁক-ডাক চালাবি, হটবি না কিছুতে। বুঝলি কিনা, মাটী তোর বাপের নয়, মাটী হল গিয়ে দাপের।"

নন্দলাল ছোট মানুষটি হইলেও হাত-পা নাড়িতে দীর্ঘাকার মানুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষিপ্র। সে লাঠিসুদ্ধই হাতখানা নাড়িয়া বলিল, "দেন কেনে একখানা পাগুড়ি কিনে— ইয়া লাল টকটকে রঙের। দেখবেন আমি কি-কাজ করি!"

—"পেন্নাম, সরকার কত্তা। আদায়ে চলেছেন নাকি?"

বিপরীত দিক হইতে দুইজন লোক আসিতেছিল; মুখোমুখী হইতেই একজন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া ঈষৎ নত হইয়া নমস্কার করিল। অপরজন একটু মুচকি হাসিয়া শুধু নমস্কারই করিল। সরকার কর্তা হাসিয়া বলিলেন, "আখেরী কিস্তি— আর কি আমাদের অবসর আছে, বাবা! হিসেব-নিকেশ কাগজপত্র সারা— অনেক ঝঞ্ঝাট!"

তাঁহারা আগাইয়া চলিলেন, লোক দুটিও বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। একজনের গলা শোনা গেল, সে ব্যঙ্গভরেই বলিল, "আমাদের কাগজ-বাবু! ভাগ্যে কাগজের বস্তা চাপা দেয় নাই! দেড় পয়সার জমিদার— কাগজের গল্প শোন কেন!"

সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার

ঘসিতেছি। উপর হইতে নিচে, নিচে হইতে উপরে, ডান হইতে বাঁয়ে, বাঁ হইতে ডাইনে, বার বার ঘসিতেছি। তবু ঠিক হইতেছে না। ক্ষুর হইতে ব্লেডখানি খুলিযা লইয়া হাতের তালুতে কয়েকবার শান দিলাম। ক্ষুর শান দিতে হয় চামড়ায়, হাতের তালু তো চামড়া দিয়াই মোড়া, সুতরাং হাতের তালুতে ক্ষুর শান দিতে বাধা কি? হাতখানা কাটিয়া না গেলেই হইল। ব্লেডখানি ক্ষুরে বসাইয়া আবার খানিকক্ষণ চেষ্টা করিবার পর যাহা হউক একপ্রকার কার্য সমাধা হইল। গালটা তেমন মোলায়েম হইল না। তাতে আর কি? এ-বয়সে কেই বা খোঁজ নেয়? ব্লেডখানা অবশ্য ভাল। এক মাস হইয়া গিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলে আরো পনের দিন চালান যাইতে পারে। মাসে পনের দিন করিয়া বেশি চলিলে বৎসরে প্রায় ছয় মাস চলিবে। মোটের উপর প্রায় এক টাকা বাঁচিবে। বৎসরে একটা টাকা, নেহাত কম কথা নয়।

এক টাকায় এক সের আলু হয়, এক পোয়া মাছ হয়, দুখানা কাটলেট হয়, ষোলখানা বেগুনি হয়, এক সের দুধ হয়, আধ গজ ছিট হয়, আধ মণ কয়লা হয়, একখানি রুমাল হয়, পাঁচবার কালিঘাট-শ্যামবাজার যাতায়াত করা যায়, এক শিশিস মাথার তৈল হয়, একখানা এক্‌সারসাইজ বুক হয়, চারটা পেনসিল হয়, এক দোয়াত কালি হয়, একখানা সিনেমার টিকিট হয়, এক শিশি ফিভার-মিকশ্চার হয়, একটি সরস্বতী-পূজার চাঁদা হয়, একটি তত্ত্ববাহকের বক্‌শিস্ হয়, একটি মন্দিরের ঠাকুরের প্রণামী হয়, একটি শ্রাদ্ধবাসরের কীর্তনীয়ার চাঁদা হয়, একবার ট্যাক্সির মধ্যে বসা যায়, আটখানা কাপড় কাচা যায়, দুইবার ক্ষৌরকর্ম করা যায়, আটখানা দৈনিক কাগজ হয়, চারবার টেলিফোন করা যায়, বিরহিনী প্রেয়সীকে আটখানা চিঠি লেখা যায় ইত্যাদি নানা কথা ভাবিতেছে। এমন সময়ে দেখি, গৃহিণী আসিয়া ব্রাশটা ধুইয়া রাখিতেছেন।

দেখিয়া প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিলাম, আহাহা, কর কি?

কেন, কি হল?

ব্রাশটা ধুয়ে ফেললে?

কেন, তাতে হয়েছে কি?

ওই ব্রাশের সাবানেই কালকের কাজটাও হয়ে যেত!

গাড়ি ও দাড়ি

মোহিতলাল মজুমদার

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পরিচয় করিতে গিয়া এই জাতির সমাজ ও ধর্মজীবন, নৈতিক সংস্কার, পুরুষপরম্পরাগত সাধনার ধারা— তাহার অন্তরের আকৃতি ও বাহিরের দৈন্য, মনের দীপ্তি ও চরিত্রের দুর্বলতা— যেভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আজ এই জাতির জন্য আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে জাতি-স্মরতার বেদনা জাগিয়াছে, এ-জাতির বর্তমান দুর্দশা-দর্শনে আমি অতিশয়, বিহ্বল হইয়াছি। আজ আমি বাঙালী কবি ও বাংলা কাব্যের কথায় উৎফুল্ল হইতে পারিতেছি না, এমন কি, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হইলেও সে-চিন্তা দূর করিয়া আপাতত এই জাতির জীবন-মরণ সমস্যার কথা ভাবিয়া অধিকতর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি। বাংলা সাহিত্যের কথা যখন চিন্তা করি, তখন ইহাই ভাবিতে বাধ্য হই যে, যে-ভাষা ও যে-সাহিত্য আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি, এবং আধুনিক ভারতে সংস্কৃতিকে যাহার দ্বারা পুষ্ট করিয়াছি, সেই সাহিত্য ও সেই ভাষা এক শতাব্দী পরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হইবে কি না, এত বড় মন্বন্তরের মুখেই যদি পড়িতে হইবে, তবে এই স্বল্প কালের জন্য আমাদের এই জাগৃতি ঘটিল কেন? আমাদের দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের জন্ম হইল কেন? বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন বয়স অল্প ছিল, প্রবল জীবনানুভূতি যখন মৃত্যুকে স্বীকার করিত না, তখন সে-যুগের সেই ঘূর্ণিবাত্যায় বাঙালীর বাস্তুভিটার ভিত্তিমূল যখন টলিতে আরম্ভ করিয়াছিল— আত্ম ও পর উভয়বিধ শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে যখন ভিতরে ও বাহিরে আগুন লাগিয়াছিল— তখনও আশা করিতাম, এ-জাতি মরিবে না; শ্মশানে শব লইয়া সাধনা করার অভ্যাস ইহার আছে, তাই বিভীষিকার সকল প্রহরে ইহার প্রাণশক্তি অটুট থাকিবে, ভিখারী হইয়াও সে অমৃতের স্বাদ ভুলিবে না। কারণ, তখনও উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজন্মের ঘটনা দূরবর্তী হয় নাই— বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগরের করস্পর্শ এ-জাতির বক্ষে তখনও শীতল হয় নাই। তাই মনে হইত, যে-মাটিতে এই সকল অমর প্রাণ অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে-মাটিতে জীবনের অমর বীজ নিহিত আছে, মৃত্যু তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আজ আর সে-ভরসা পাইতেছি না, দিকে দিকে মৃত্যুর বাতাস বহিতেছে, জাতির জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, যেন জীবধর্মও লোপ পাইতেছে।

বিবিধ কথা (১৯৪১), জাতির জীবন ও সাহিত্য

সকালবেলা।

টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল।

নিশিকান্ত আকাশের দিকে চাহিল। এবং চাহিয়াই রহিল। কিন্তু এ-কথা খুবই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, তাহার মনে কোন প্রকার কবিত্ববোধ জাগে নাই। জাগিয়াছিল গরম গরম ছোলাভাজার বোধ। তাই শূন্য আকাশ-পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, আধ-পয়সার ছোলাভাজা কিনিলেই একটা পয়সা ভাঙ্গাইতে হইবে। বাকী আধলাটাও থাকিবে না, কোন কিছুতে ঠিকই খরচ হইয়া যাইবে; গোটা-জিনিষ ভাঙ্গাইলে যা হইয়া থাকে। সুতরাং ছোলাভাজার কথাটা ভুলিবার জন্য সে এইভাবে তাহার মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যথাঃ "মেঘগুলো যেন ঠিক পেঁজা তুলো। এত মেঘ আসে কোত্থেকে? বারো মাস যদি বৃষ্টি হত, তাহলে পৃথিবী ভেসে যেত। ওঃ! রাস্তায় কত জল দাঁড়িয়েছে! লোকটা ভিজতে ভিজতেই চলেছে। বোধ হয় ছোলাভাজা-টোলাভাজা কিছু কিনতে যাচ্ছে আর কি!—" নিশিকান্ত একান্ত চেষ্টায় যতই ছোলাভাজার কথাটা মনের মধ্যে চাপা দিতে চায়, তাহা ততই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া পড়ে। অবশেষে মনটাকে বিষয়ান্তরে ভালভাবে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে রন্ধনশালায় রন্ধনরত স্ত্রীর কাছে আসিয়া একটা বাজে গল্পের উপক্রমণিক সুরু করিতেই বনমালা বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "নিষ্কর্মা লোকের বাজে বকবার সময় থাকতে পারে, কিন্তু কাজের লোকের তা শোনবার সময় থাকে না!" বলিয়াই বনমালা পাঁচফোড়নের দরকার না থাকিলেও ভাঁড়ার হইতে পাঁচফোড়ন আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে কহিলঃ "কোন কাজ না থাকে, খই ভাজো গে!" আবার সেই ভাজা! খই-ভাজা, মুড়ি-ভাজা, চাল-ভাজা, ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী তারপরই আসে ছোলাভাজা।

বনমালার কথার ধাক্কায় নিশিকান্ত প্রথমে সদর দরজায় এবং পরে সেখান হইতে এক-পা এক-পা করিয়া নিকটস্থ চাল-ছোলাভাজার দোকানে গিয়া হাজির হইল এবং আধ-পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া আনিয়া বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া তাহারই ভক্ষণকার্যে মনোনিবেশ করিল।

মিস্ মায়া বোর্ডিং-হাউস, (১৯৪১), নৌকাডুবি

জ্যোতির্ময় রায়

মানুষ আর তার স্বহস্তে-তৈরী কলকব্জার মিলিত বিরাট হট্টগোলের মাঝে বসবাস ক'রে আমাদের নাগরিক কর্ণযুগল হয়ে উঠেছে শব্দগ্রাসী, তার শব্দক্ষুধার যেন নিবৃত্তি নেই। ট্রাম, বাস, হকার, হর্ণ, লক্ষ লোকের কোলাহল ইত্যাদির প্রচণ্ড শব্দসাগরে কান দুটো মহানন্দে নেচে বেড়ায়, নিস্তব্ধতার ডাঙায় পড়লে ছটফটানির অন্ত থাকে না। কলকাতার বাইরে কোনো গ্রামে বা নিঃশব্দ জায়গায় গিয়ে পড়লে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ ক'রে গা আমাদের ছম্ ছম্ করতে থাকে, পরিদৃশ্যমান জগৎটাকে মনে হয় হঠাৎ-বাক্‌যন্ত্র-বিগড়ে-যাওয়া সবাক চিত্রের সচিত্র পরদা। কানের খোরাকে টান পড়ে, শব্দ-দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার জন্যে সশব্দ নগর কান ধ'রে টানতে থাকে। মাঝে মাঝে আমরা বলি, "কোলাহল আর ভালো লাগে না, সহরের বাইরে বাড়ী করব!" বা "বাইরে থেকে ঘুরে আসা যায়!" তার অর্থ এ নয় যে, কোলাহলে বিতৃষ্ণা ধ'রে গেছে, এ শুধু তৃষ্ণাকে তীব্র ক'রে স্বাদ পাবার একটা আয়োজন মাত্র।

কোলাহলের প্রতি আমাদের এত বড়ো প্রাণের টান যে, শুধু রেডিও আর গ্রামোফোনে আমাদের মন উঠলো না— ও তো কেবল সুর ও বাক্যচর্চার যন্ত্রমাত্র; তা থেকে কি কানের পুরো খোরাক মেলে? কোলাহল চাই। তাই ম্যাগনি-ফায়ার জুড়ে নিয়ে আধ মাইলের ভিতর তিন মাইল জোড়া আওয়াজ ক'রে তিন শো রেডিও আর গ্রামোফোন বাজতে সুরু ক'রে দেয়। সন্ধ্যায় যে-যার যন্ত্র চালিয়ে দিয়ে এমন একটা বিরাট তৃপ্তি নিয়ে পাশে ব'সে থাকে, যেন ভয়ানক গরম থেকে এসে শীতল জলে গা ডুবিয়ে বসেছে। নাগরিকদের এই শব্দক্ষুধা আবিষ্কার ক'রে ভিখারীগুলো পর্যন্ত বিকট সব আওয়াজ ক'রে পেটের ক্ষুধা মেটাবার পথ ক'রে নেয়। কোলাহল করার জন্য এমন প্রস্তুত হয়ে থাকে সবাই, যদি কেউ ব'লে ওঠে 'চোর চোর', ব্যস্, যে যেখানে থাকে, চেঁচিয়ে ওঠে 'চোর চোর'। কোথায় চুরি, কে চোর, জানাবার কিছু দরকার নেই, কুঁড়ে লোক রোয়াকে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, কর্মঠরা ছুটোছুটি ক'রে চিৎকার করতে থাকে। মহা একটা হট্টগোল, বেশ কাটে কিছু সময়, তারপর শ্রান্ত ও তৃপ্ত হয়ে যে-যার কাজে মন দেয়।

দৃষ্টিকোণ (১৯৪১), প্রথম খণ্ড, শব্দক্ষুধা

রাত তখন দুইটা। চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ, কোথাও টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। সামনের জানালা দিয়া বাগান হইতে তীব্র ফুলের গন্ধ আসিতেছে। বিছানায় বালিশের পাশেও নানারকম ফুল, কিন্তু নবকিশোরের কাছে তাহা এখন বিষের মতো মনে হইল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো অথবা সূচের মতো তাঁহাকে বিঁধিতেছে। পাশেই অরুন্ধতী তাহার প্রখর যৌবন আর চেহারার দীপ্তি লইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে। নবকিশোরের ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি ঘামিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তিনটা বাজিয়া গেল, হয়তো রাতকে দিন ভাবিয়া কয়েকটা কাক বাইরে কা-কা করিতেছে, কাঁটার বিছানায় শুইয়াও নবকিশোর একসময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার আশে-পাশে একদল নগ্ন নরনারী, চমৎকার তাহাদের চেহারা, যেন শ্বেত পাথরে খোদা মূর্তি, চমৎকার চোখ-মুখের ভঙ্গী, যেন অজস্র মানিক ঝরিতেছে, নবকিশোর দেখিলেন, খিল খিল করিয়া হাসিয়া তাহারা একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলিতেছে, অজস্র চুমা খাইতেছে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কোন মেয়ের হাঁটুতে মুখ রাখিয়া কি-সব বলিতেছে, কেউ বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে— আর সেই একদল হাস্যমুখর, সৌন্দর্যদীপ্ত মানুষের মধ্যে তিনি যেন একটি ভেড়া! এমন সময় নবকিশোর হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন, অসহায়তার তুলনা তো নাই, শরীরটাকে আরও অবসাদগ্রস্ত বোধ করিলেন। ঘরের এককোণে বাতি জ্বলিতেছে, মিট মিট করিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন, আশ্চর্য, বিছানা খালি, পাশে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী অরুন্ধতী নাই, ঘরের দরজা শা শা খোলা, হু হু করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চোখের পাতা আর ভ্রু কুঁচকাইয়া আসিল, তিনি খাট হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিলেন, আস্তে ডাকিলেন, 'বৌ?'

বনস্পতি

তারপর পূজা জপ ইত্যাদি। আতপ চালের ভাত চাপাইয়া বেশীক্ষণ জপে বসিয়া থাকিবার জো কি! কোন রকমে বার দশেক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া সূর্যপ্রণাম ও গুরুপ্রণাম সারিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে তিনি ফেন গালিতে থাকেন। একটা ঝালের ঝোল, একটু ভাতে ভাত, কোনদিন বা এক-আধখানা ভাজা, শেষ পাতে একটু দুধ। খাওয়া শেষ হইলে তিনি আশ্রিতদের জন্য পাতের প্রসাদ রাখেন। বড় জামবাটির আধ বাটি দুধমাখা ভাত কুকুরের জন্য, ছোট বাটিতে কিছু ভাত বিড়ালের জন্য, আর ভুক্তাবিশিষ্ট পাতের তরিতরকারি-মাখা ভাতগুলি গরুর জন্য। থালাখানি রোয়াকে রাখিবার সময় উচ্ছিষ্টলোভী যে-সব কাক, কবুতর বা শালিখ পাখী আসিয়া জড়ো হয়, যোগমায়া তাহাদেরও ভাগ করিয়া কিছু দেন। নিস্তারিণী আসিলে বলেন, "একা একা খেয়ে তৃপ্তি হয় না, বোন। কি যে রাঁধি ছাইপাঁশ, খাওয়া ত নয়— গর্ত বোজানো!"

বৈকালে আবার ঘরদোর ঝাঁটের পালা, গরুকে 'শানি' মাখাইয়া দিবার হাঙ্গামা ইত্যাদির মধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া যায়। তখন দুয়ারে গঙ্গাজল ছিটাইয়া, শাঁখ বাজাইয়া, ধূপধূনার ধোঁয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যাকে আহ্বান করিতে হয়। যে-ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয়, তাহার বেদিমূলে ও উঠানের তুলসী-বৃক্ষমূলে অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি মাথা লুটাইয়া প্রণাম করেন আর প্রার্থনা করেন। কি সে-প্রার্থনার মন্ত্র— সে এক জানেন তাঁহার অন্তর্যামী।

সন্ধ্যা দেওয়া শেষ হইলে যোগমায়া দেবী ঠাকুরঘরের পেরেকে টাঙানো জপের মালাগাছটি লইয়া শোবার ঘরের বারান্দার সম্মুখে কম্বলের আসনখানি বিছাইয়া বসেন। মেনকা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পাশে চক্ষু বুজিয়া ঘড়র ঘড়র করিতে থাকে। উঠানের ওপাশের মেজে হইতে উইচিংড়া ও ঘুরঘুরে পোকার তীব্র আওয়াজ ভাসিয়া আসে, সরিখাস গাছটার ডালে পাখীর ডানা-ঝটপটানির শব্দ বার কয়েক শোনা যায়, প্রাচীরের ও-পিঠে অদূরের জঙ্গল হইতে শিবালাপ সমস্বরে সান্ধ্য প্রহর ঘোষণা করে। ও-বাড়ীর দালানে খেঁদির ভেউ ভেউ ধমকের মতই শোনায়। চারিদিক অন্ধকার করিয়া রাত্রি নামিয়া আসে।

আলেখ্য (১৯৪২), বটগাছ

হুমায়ুন কবির

বাঙলা চিরদিনই কবিতার দেশ। একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যই বাঙালীকে কবি করে নি— তার কবিপ্রতিভার মূলে মননরীতির বৈশিষ্ট্যও সমানই পরিস্ফুট। বাঙলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মহিলা, এবং শ্রাবণের দিবারাত্র অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি। ষড় ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে, বাঙালীর কবিমানসের উৎস কোথায়। শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, কাশের শ্বেত হাসিতে নদীকূলে ভরে ওঠে, হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাক্ষ্খা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে। শীতার্ত কুহেলী রাত্রির অবগুণ্ঠিত মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে-জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অঙ্কুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত। ছয়টি ঋতুর এ-বিচিত্র খেলা। প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের সে-ঐশ্বর্য যে বাঙালীর মনকে কাব্যজগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কি?

কেবল ঋতুর লীলা ব'লে নয়, বাঙলার নৈসর্গিক সংগঠনের বৈচিত্র্যও কম নয়। সমুদ্রমেখলা সোনার বাঙলা, মাথায় তার হিমালয়ের কিরীট, আকটিকণ্ঠ জড়ানো গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনা তার মালা। পশ্চিম বাঙলায় শালবন আর কাঁকরের পথ— দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারায় গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস ক'রে তোলে। পশ্চিম বাঙলার প্রকৃতি তাই বাঙালীর কবিমানসকে যে-রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম ক'রে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।

বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ববঙ্গের হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করে নি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে-প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই।

বাঙলার কাব্য (১৯৪২), ১

গোলাম মোস্তফা

রবিউল-আউয়াল মাসের বারো তারিখ। সোমবার শুক্লা দ্বাদশীর অপূর্ণ-চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। সুবহে-সাদিকের সুর্খ্নূরে পুব আসমান রাঙা হইয়া উঠিতেছে। আলো-আঁধারের দোল খাইয়া ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি আজ নীরব। নিখিল সৃষ্টির অন্তরতলে কি যেন একটা অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বেদনা রহিয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। কোন্ স্বপ্নসাধ আজও যেন তাহার মিটে নাই। যুগযুগান্তরে পুঞ্জীভূত সেই নিরাশার বেদনা আজ যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আরবের মরুদিগন্তে মক্কা নগরীর এক নিভৃত কুটীরে একটি নারী ঠিক এই সময়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। নাম তাঁর আমিনা। আমিনা দেখিতেছিলেন: এক অপূর্ব নূরে আসমান-জমীন উজালা হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকে চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারা ঝলমল করিতেছে। কাহার যেন আজ শুভাগমন, কাহার যেন আজ অভিনন্দন। যুগযুগান্তরে প্রতীক্ষিত সেই না-আসা অতিথির আগমনমুহূর্ত আজ যেন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন এই আয়োজন। কুল-মাখলুক আজ সেই আনন্দে আত্মহারা। গগনে গগনে ফেরেশতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তোরণে তোরণে বাঁশি বাজিতেছে। সবাই আজ বিস্মিত পুলকিত কম্পিত শিহরিত। জড় প্রকৃতির অন্তরেও আজ দোলা লাগিয়াছে; খসরুর রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে; কাবা-মন্দিরের দেবমূর্তিগুলি ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে; সিরিয়ার মরুভূমিতে নহর বহিতেছে।

আমিনার কুটীরেই বা আজ কি অপরূপ দৃশ্য! কাহারা ওই শ্বেতবসনা পুণ্যময়ী নারীরা? বিবি হাওয়া, বিবি হাজেরা, বিবি রহিমা, বিবি মরিয়ম, সবাই আজ তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান। বেহেশতী নূরে সারা ঘর আজ আলোকিত। বেহেশমতী খুশবুতে বাতাস আজ সুরভিত।

এক স্নিগ্ধ পবিত্র চেতনার মধ্যে আমিনার স্বপ্ন ভাঙিল। আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কোলে তাঁহার পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা সৃষ্টির অন্তর ভেদিয়া ঝঙ্কৃত হইল মহা আনন্দধ্বনি: "খুশ্ আমদিদ্ ইয়া রসুলুল্লাহ্! মারহাবা ইয়া হাবীবুল্লাহ্!" বেহেশতের ঝরোকা হইতে হুর পরীরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, অনন্ত আকাশে অনন্ত গ্রহনক্ষত্র তসলিম জানাইল। বিশ্ববীণাতারে আগমনী গান বাজিয়া উঠিল।

বিশ্বনবী (১৯৪২), পরিচ্ছেদ ১: আমিনার কোলে

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ফরিদপুরের একটি খেজুর গাছের কথা জগদীশচন্দ্র সংবাদ পাইলেন। সূর্য অস্তাচলে গমন করিলে মন্দিরে যখন সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয়, শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে সমস্ত পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে, এই গাছটি তখন মস্তক অবনত করিয়া ভূমি স্পর্শ করে। আবার প্রভাতে নবোদিত সূর্যের প্রতি উন্মুখ হইয়া সমস্ত প্রকৃতি যখন নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, এই গাছও আকাশপানে তাহার মাথা তুলিয়া থাকে।

অনুসন্ধানে তিনি অবগত হইলেন যে, এই খেজুর গাছটি মাটি হইতে একেবারে সোজা উঠে নাই। শিশু অবস্থায় একটা ঝড়ে কাত হইয়া যায়, তাই খানিকটা হেলিয়া গিয়া তাহার হঠাৎ এক স্থানে মোচড় খাইয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে। গাছটা যেখানে বাঁকিয়াছে, মনে করা যাক, সেই স্থানটা কোনরূপে উত্তেজিত করা হইল, উত্তাপ দিয়া বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করিয়া বা আঘাত করিয়া। লজ্জাবতীর ন্যায় ইহার কোন কোন গঠন বৈচিত্র্য না থাকায় বাহিরের সঙ্গোচনজনিক ক্রিয়া চারিদিকে সমভাবেই হইবে, অতএব গাছটি নড়িয়া সাড়া দিবে না। এই তো হইবার কথা। কিন্তু এই গাছটির গঠনবৈচিত্র্য আছে। এই খেজুর গাছের যে-স্থানটা বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানে উপর-দিকটা ক্রমাগত রোদ-ঝড়-জল খাইয়াছে, নিচেটা অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত। ইহার ফলে উপর অপেক্ষা নিচেটা অপেক্ষাকৃত বেশি কোমল। সুতরাং বাহিরের উত্তেজনার ক্রিয়া নিচেই বেশি হইবে। তাই মধ্যাহ্নের উত্তাপ যখন ঐ স্থানটিকে উত্তেজিত করিল, যখন তলা ও উপর ভিন্নভাবে সঙ্কুচিত হইল; ফলে গাছের মাথাটি নামিয়া গেল। সুতরাং ঐ অংশে উপর-নিচের অবস্থার তারতম্যই গাছের উঠা-নামার কারণ এবং বাহিরের উত্তাপ দ্বারাই উহা সংঘটিত হইতেছে।

একটি বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা গাছের উঠা-নামা ও উত্তাপের পরিবর্তন পাশাপাশি লিখিত হইতে লাগিল। দেখা গেল দুইটি লিপিই সম্পূর্ণ একই রকমের। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা গেল যে ঐ গাছের উত্থান-পতন কেবলমাত্র বাহিরের উত্তাপের বিভিন্নতা-জনিত। সুতরাং যে-গাছ এইরূপ ভাবে জন্মায় যাহাতে করিয়া তাহার দুই দিন ভিন্ন অবস্থায় বর্ধিত হয়, সেই গাছই বাহিরের উত্তাপের তারতম্যে বাঁকিবে— তা উহা আমই হোক জামই হোক বা খেজুরই হোক— সে-গাছ ফরিদপুর বা রামপুরহাট যেখানেই জন্মাক না কেন। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ সংলগ্ন ঐরূপ গঠনের একটি খেজুর গাছে তিনি ফরিদপুরের ঐ খেজুর গাছের ন্যায় একই রকমের উঠা-নামা লক্ষ্য করিলেন।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৯৪৩), ফরিদপুরের প্রণামকারী খেজুরগাছ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমার লেখা ও বক্তৃতায় যদি কেহ আহাত হইয়া থাকেন, আমি নিরুপায়। যাঁহাদের হঠকারিতায় আমার দেশবাসীর এই সীমাহীন দুর্গতি, কোন কারণেই আমরা তাঁহাদের ক্ষমা করিতে পারি না। ইতিহাসে চিরকাল তাঁহাদিগকে কলঙ্কলিপ্ত করিয়া দেখাইবে, মুখের ভাষায় আমরা তাঁহাদের কি-শাস্তি দিতে পারিয়াছি?

করাল মন্বন্তরের মধ্যে মানুষের দুঃখ-দুর্গতি ও নীচাশয়তা দেখিয়াছি, তেমনই আবার মানুষের উদার মহানুভবতায় বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাইয়াছিলাম। যাঁহারা ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত, অবস্থা লঘু করিয়া দেখাইয়া ও অভিসন্ধির আরোপ করিয়া তাঁহারা প্রকারান্তরে সাহায্য-চেষ্টা ব্যাহতই করিতেছিলেন। ইহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহির হইতে অজস্র সাহায্য আসিয়াছে। আর্ত মানুষকে বাঁচাইবার আগ্রহে প্রাদেশিকতার বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

সহস্র সহস্র দাতার এই অখণ্ড বিশ্বাস ও প্রীতি-ধারায় আমরা অভিভূত হইয়াছি। শত শত সেবক সেবাকর্মে অহোরাত্রে শ্রম করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীরা ভ্রুকুটি করুন, কিন্তু সঙ্কটমুহূর্তে দেশবাসী আর একবার সংহতি ও অপরিমেয় সেবাবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু দুর্গতের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়া-ই একমাত্র বা প্রধানতম কাজ নয়। মন্বন্তরে মানুষের ঘর-গৃহস্থালী ভাঙিয়াছে; জীবন-ব্যবস্থা, অর্থনীতিক বনিয়াদ উল্টাইয়া গিয়াছে। বাঙালী পরপ্রত্যাশী ভিখারির জাতি হইতে চলিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যাঁহারা অনুন্নত শ্রেণী বলিয়া কথিত, তাঁহাদের অবস্থাই সকলের চেয়ে মর্মস্পর্শী। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর— বিশেষ করিয়া এই দুই শ্রেণীর— হৃতমর্যাদা উদ্ধার করিয়া সকলকে সমাজ-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এখন আমাদের বৃহত্তম কর্তব্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে মাসের পর মাস ধরিয়া কি শোচনীয় দৃশ্য চোখের উপর দেখিলাম। এমন যে সত্যই ঘটিতে পারে, ভাবীযুগের মানুষ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। এখন মাঠের ফসল ঘরে উঠিতেছে। অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দেখা না দিলে হয়তো সুদিন ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ আনন্দোচ্ছল শান্ত সংসার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, নিরাপরাধ নরনারীর দল অনাহারে তিলে তিলে রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে— তাহাদের অসহায় ধ্বংস-দৃশ্য চিরজীবন আমাদের বিভীষিকা হইয়া থাকিবে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), নিবেদন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জাহাজের বাঁশি শুনে মৃণালের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর, কে জানে রাত কটা। গম্ভীর অকম্পিত সুরে বাঁশি বেজে চললো। অন্ধকার গঙ্গার জল চিরে, কত নিদ্রিত যাত্রীকে নিয়ে বিরাট জাহাজখানা কোথায় যাবে, কে জানে: কত উচ্ছ্বসিত সমুদ্র, কত উপকূল, কত বন্দর। এই নিদ্রাহীন নির্জনতায় জাহাজের ডাকে বিরাট অজানা এক জগৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমুদ্র হানা দেয় তার রক্তে, দুরন্ত ক্ষুধিত সমুদ্র। মুছে যায় দৈনন্দিনের তুচ্ছতা, শুধু বিশাল এক পৃথিবী আর জ্বলন্ত এক দিন তার কল্পনায় কাঁপতে থাকে।

পরীক্ষা আসন্ন। অন্ধকার থাকতেই মৃণাল বিছানা ছেড়ে উঠলো। কি অদ্ভুত লোভনীয় ঘুম পায়! পরিত্যক্ত বিছানায় আবার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বার একটা যুক্তিহীন আগ্রহ হয়। কিন্তু পরীক্ষা এসে গেছে। তাকে ভাল করে পাশ করতে হবে, পেতে হবে স্কলারশিপ। শেষরাত্রে ঘুমুনোর মতো বিলাসিতা করার উপায় তার নেই। কম্বলটাকে গায়ে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে মৃণাল চেয়ারটায় বসলো। চোখের পাতাগুলো কি অদ্ভুত ভারি হয়ে রয়েছে! পড়তে পড়তে হঠাৎ এক সময় চোখ তুলতে দেখা যায় জানলার ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো বাইরের নিষ্পত্র কৃষ্ণচূড়া গাছের পিছনকার টুকরো আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। আধবুড়ো লোকটা তার সঙ্গীর সঙ্গে হোস-পাইপ কাঁধে পথে জল দিয়ে গেলো। লুঙ্গি-পরা আর-একটি লোক বাঁশের আকশি দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে গেলো গ্যাসের আলোগুলো।

সাড়ে সাতটা নাগাদ বিপিনবাবু বেড়িয়ে ফিরলেন। নিঃশব্দে কখন তিনি বেড়াতে বেরোন মৃণাল টের পায় না। চাপা স্বরে বললেন, "চল, বাবা, মুখ-হাত ধুয়ে এসো। দয়ালকে চা দিতে বলি।" বাড়ির ভিতরে ফ্যাকাসে আলো। দুপুরের দিকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে খানিকটা রোদ চারপাশের বাড়ি ডিঙ্গিয়ে উঁকি দিয়ে যায়। বাকী সমস্ত সময় একটা রুগ্ন স্যাঁৎসেঁতে ভাব। এদিকে সবাই কথা বলে ফিসফিস করে, পা ফেলে সাবধানে, বিন্দি-ঝি তার পেতলের চুড়িগুলো আঁচলে বেঁধে বাসন মাজে, রান্নার বাসনপত্র দয়াল অতি সাবধানে নাড়াচাড়া করে। বিপিনবাবুর স্ত্রী ঘুমের ওষুধ খেয়ে এ-সময়টা ঘুমিয়ে থাকেন। উঠতে বারটা-একটা হয়। গোলমালে একবার ঘুম ভাঙলে আর রক্ষে নেই। তাই সকালের দিকে বাড়িটা যেন মরে থাকে।

পূর্বরঙ্গ (১৯৪৪), এক

সরলা দেবী (চৌধুরানী)

আমাদের সব-ছোট বোন উর্মিলা তখনও জন্মায় নি। দিদি হিরণ্ময়ী, দাদা জ্যোৎস্নানাথ ও আমি, এই তিনজনে আছি তখন। দিদি আমাদের স্বনিয়োজিত সরদার। একদিন সর্দারি করে বললেন, "তোর চুল বড্ড বড় হয়েছে; আয় ছেঁটে দিই।" কোথা থেকে একটা বড় কাঁচি সংগ্রহ করে কচ কচ করে আমার মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল কাটতে লাগলেন। উবরো-খুবরো যেমন-তেমন করে, মাথা প্রায় ন্যাড়া করে কাটা হল চুল। মা-বাবা বাড়ি ছিলেন না; ফিরে যেমনি আমার চুলের দিকে দৃষ্টি পড়ল, বাবামশায় ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— মা-ও তাতে অমত করলেন না— "আজ থেকে সাতদিন পর্যন্ত তোমার বাইরে যাওয়া বা বাড়িতে কেউ এলে তাদের সামনে বেরন বন্ধ। এমনি চুল নিয়ে লোকের সামনে বেরুলে লোকে হাসবে।"

শিশু আমি লোকের হাসির মর্মান্তিকতা কিছু বুঝলুম না, কিন্তু একটি অবিচারবোধের তীব্র শেল আমার বুকের তলায় তলায় বিঁধতে লাগল। দিদি, যিনি আমার চুল বিশ্রী করে কাটলেন, আসল দোষ করলেন যিনি, তাঁর কোন শাস্তিই হল না। তিনি আগেকারই মত দিব্যি ফিটফাট হয়ে বুক ফুলিয়ে রোজ বিকেলে দাসীদের হাত ধরে হাওয়া খেতে যেতে লাগলেন। দাদাও তাঁর সঙ্গী হলেন— যদিও মা-বাবার বিনা অনুমতিতে দাদাও তাঁর চুলটা দিদির হাতে সমর্পণ করেছিলেন, দাদারও মাথায় দিদির হাতের কারিগরির নমুনা কিছু কিছু পরিদৃশ্যমান হয়েছিল। কিন্তু বেটাছেলে তিনি, তাঁর চুল একটু-আধটু খারাপ দেখানতে আসে যায় না বোধ হয়, মেয়েদেরই শ্রীশালীনতার দিকে দৃষ্টি রাখবার দরকার। তাই তিনজনের দোষের জন্য আমি একাই দায়ী হলুম। সাতদিন ধরে একলাটি ছাদের উপর একটা ঘরে আবদ্ধ রইলুম— একলা একলা, সঙ্গীহীন, কাঁদিকাটি, কি করি সে আমিই জানি।

দিদি প্রথম সন্তান বলে মা-বাবার আদুরে মেয়ে, দাদা প্রথম পুত্র বলে আদুরে, আমি আর একটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়েমাত্র। তাই বৈদিক ঋষিকুমার শুনঃশেফের মত আমার জীবনের পৃষ্ঠপটে একটা অনাদরের পরদা টানা। সে পরদাখানা উঠে গেল অল্পে অল্পে শুনঃশেফেরই মত বাইরের সংস্পর্শে।

জীবনের ঝরাপাতা, এক (১৯৪৫)

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

গান শেষ হতেই আচার্য ঢুকলেন মন্দিরে। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী— দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। মাথার বিরল রুক্ষ কেশ। গায়ে একটা সবুজ রঙের ফ্ল্যানেলের শার্ট... বেদীর ওপরে আসনপিঁড়ে হয়ে ব'সে ভাঙা গলায় বললেন, "সঙ্গীত!" সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে বাজনার শব্দ ও তার সঙ্গে গান আরম্ভ হয়ে গেল।

সঙ্গীতান্তে শাস্ত্রীমশায় চীৎকার ক'রে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। সে-সব ভাল ভাল কথা, গূঢ় তার অর্থ, নানা অলঙ্কারপূর্ণ সে-ভাষা—- শিশুর কাছে তা প্রহেলিকা। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এ যেন একটা ইস্কুল। বেদীর ওপরে ব'সে আছেন ওই মাস্টারমশায়, চেঁচিয়ে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছেন।... সে একবার বাপের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে ফেললে।

পেছনে হেলান দেবার একটু দেওয়াল পাবার ফলে এবারের নিদ্রাটি স্থবিরের বেশ গাঢ়ই হয়েছিল— হঠাৎ কান্নার আওয়াজে তার অমন মনোরম ঘুমটি ছুটে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখতে পেল, তার পাশেই একটি বৃদ্ধ হেঁচকি তুলে কাঁদছে আর বিড়বিড় ক'রে কি বলছে!... এই দৃশ্য দেখে স্থবির স্থির বুঝতে পারলে, ব্যাপারটি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। নিশ্চয় কোনও অপরাধের জন্যে শাস্ত্রীমশায় তাঁদের ধমক দিচ্ছেন।

ইতিমধ্য শাস্ত্রীমশায় চীৎকার ক'রে উঠলেন, "ওই যে বিহঙ্গ শূন্যপথে মুক্তপক্ষে প্রয়াণ করিল—-" স্থবিরের পাশে লোকটি, যিনি এতক্ষণ কান্নার সঙ্গে বিড়বিড় ক'রে বকছিলেন, হঠাৎ তিনি ডাক ছেড়ে ডুকরে উঠলেন, "জয় দয়াময়, জয় দয়াময়!" স্থবির ভাবলে, এবার বোধ হয় শাস্ত্রীমশায় বেদী ছেড়ে নেমে এসে এদের প্রহার আরম্ভ করবেন...। কিন্তু শাস্ত্রীমশায় বেদী থেকে নামলেন না। তাঁর চীৎকারের মধ্যে ধমকের সুরটা যেন ক্রমেই ক'মে আসতে লাগল... ধাপে ধাপে নামতে নামতে শেষে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

শিবনাথ শাস্ত্রী স্থবিরের পিতৃগুরু। তিনি যতক্ষণ চীৎকার ক'রে পুরুষোচিত অভিব্যক্তিতে ব'লে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার ভালই লাগছিল... কিন্তু হঠাৎ তাঁরও সুর অনুনয়ের পর্দায় নেমে আসায় তার শিশুচিত্ত শুধু বিহ্বল নয়, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, কে সে নিষ্ঠুর, কোথায় তার বাড়ি, কেমন ভীষণ তার চেহারা, কত শক্তি সে ধরে, যাকে এমনভাবে অনুনয় করা হচ্ছে, অতিবড় পাষাণও যাতে দ্রবীভূত হয়! স্থবির স্থির করলে, বড় হয়ে এইজনকে খুঁজে বার করতেই হবে। আজও স্থবির তারই অনুসন্ধানে ফিরছে।

মহাস্থবির জাতক, প্রথম পর্ব (১৯৪৪)

প্রফুল্লকুমার সরকার

ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর বীরেশ তাহার পড়িবার ঘরে অন্যমনস্কভাবে বসিয়া ছিল। কি জানি কেন, আজ সে কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারিতেছিল না। বাহিরে শীতের রৌদ্র তখনও কুয়াশাকে ভাল করিয়া ভেদ করিতে পারে নাই, তাহার ক্ষীণ রশ্মিরেখা গৃহপ্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ উদ্যানের বৃক্ষ-লতার উপর পড়িয়া চপল শিশুর মতই ক্রীড়া করিতেছিল। বীরেশ একমনে বোধ হয় তাহাই দেখিতেছিল। একটা শালিক পাখী কোথা হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাগানের মধ্যে এক স্থানে তাহার শাবককে অতি যত্নে খাওয়াইতেছিল। বীরেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার মনে হইল, পক্ষিশাবকটিও বোধ হয় তাহার চেয়ে সুখী— উহার মা আছে, আদর করিয়া উহাকে খাওয়ায়, কিন্তু বীরেশের কেহই নাই। এত বড় বাড়ি, এত লোকজন দাস দাসী, নামজাদা জমিদারের ছেলে সে, কিন্তু তবুও সে একা। দাস দাসী লোকজন তাহাকে খুবই আদর যত্ন করে বটে, কিসে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়, সেজন্য তাহারা সর্বদাই শশব্যস্ত, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক থাকিয়া যায়। সে ফাঁক কিছুতেই পূর্ণ হয় না। ওগুলা যেন মুদীর দোকানের দৈনিক বাঁধাবরাদ্দের কেনা জিনিস, যতটুকু মূল্য দেওয়া যায়, তাহার উপর এক তিলও বেশী পাইবার জো নাই।

অদূরে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে চাহিয়া বীরেশ দেখিল, বালক পটলা ও তাহার ছোট বোন অলকা কি একটা ছুটাছুটি খেলা করিতেছে। দুইজনের উচ্চহাসির প্রতিধ্বনি বীরেশের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার মনকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। অলকার মত একটা ছোট বোনও যে তাহার নাই! থাকিলে তাহারই সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া অমনই ভাবে সে খেলা করিতে পারিত। সে কতদিন দেখিয়াছে, পটলা সামান্য অছিলায় অলকাকে প্রহার করিয়াছে, অলকা আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়াছে। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সব ভুলিয়া আবার হাসিমুখে দাদার সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়াছে। এই দুইটি ভাইবোনের সম্বন্ধের মধ্যে কি মধুর রহস্য! অনেক সময়ই বীরেশ তাহা নিজের অন্তরে অনুভব করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক ভাবটি ধরিতে পারিত না— সে যেন তাহার আয়ত্তের বাহিরে।

ভ্রষ্টলগ্ন, প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সদ্য-চুনকাম-করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিলে দু'একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা। তক্তপোশের উপর পা ঝুলিয়ে-বসা অমিতার দিকে আর-একবার তাকাল চিন্মোহন। ঘরের মতই নিরাভরণ শুভ্র ওর সজ্জা। ভিজে এলোচুল সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ও যেন কালো শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক। ইচ্ছা করলে এখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত চিন্মোহন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে, অমিতা একটুও বাধা দেবে না, একটুও বিস্মিত হবে না...

কোনো কোনো দিন চুলের মত সূক্ষ্ম একটু কালো রেখা থাকে, আজ একেবারে সাদা থান পরেছে অমিতা। তাতে গাম্ভীর্য যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। রিক্ততার মধ্যেই যেন ওর ঐশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

একটু চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহন ডাকল, "শ্বেতা!" বেশ আর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম দিয়েছে চিন্মোহন, 'মহাশ্বেতা'। স্নিগ্ধ হাসল অমিকা। চিন্মোহনের মনে হল, ওর হাসির রঙও যেন সাদা একগুচ্ছ জুঁই ফুলের মত। যেমন স্বল্প, তেমনি সুন্দর।

"তবু ভালো, আজ আর মহাশ্বেতা নই!"

চিন্মোহন বলল, "মহাশ্বেতাই তো! আমার দেওয়া নাম যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয়, তার জন্যে শাড়ির প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু পর্যন্ত তুলে দিয়েছ।"

অমিতা কোনো কথা বলল না।

চিন্মোহন বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই। এ-বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে, আমি সে-দিনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।"

চিন্মোহন তার চোখের দিকে তাকাতে অমিতা চোখ নামিয়ে নিল। কি যেন আছে চিন্মোহনের দৃষ্টিতে যাতে সমস্ত অন্তর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে।

বেশ বদলানো আর রোধ করা যাবে না, এ-কথা অমিতাও জেনেছে। সে-সম্ভাবনা দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্তে ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। বদলাতে হবে। শুধু কি বেশ?

মহাশ্বেতা

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

হেমন্ত সেই যে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া আসিয়া দাওয়ায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া চাপিয়া বসিয়াছিল, আর উঠিবার কোন গা-ই সে করিতেছিল না। হেমন্তের স্ত্রী শান্তি বার কত হেমন্তের পায়ের কাছে খুব ঘটা করিয়া মাথা কুটিয়া দাওয়ার অপর প্রান্তে গিয়া একটা চরকা লইয়া সেই যে মুখ ঘুরাইল আর ফিরিয়াও চাহিল না।

অভাব অনটন যেখানে, সেখানে বচসা ত লাগিয়াই আছে। খুব সামান্য কারণেই ভোরবেলা এই বচসার সূত্রপাত, কিন্তু এমন যে-অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার শেষ যে কোথায় এবং কি হইবে, তাহা ত উভয়েরই চিন্তার বাহিরে।

হেমন্ত ভাবিতেছিল, বিবাহ করাটাই জীবনে তাহার মস্ত ভূল হইয়া গেছে। আর শান্তি ভাবিতেছিল, বাপ-মা ইহা অপেক্ষা একটা পাথর বুকে বাঁধিয়া তাহাকে নদীতে ভাসাইয়া দিলে সে শান্তিতে মরিতে পাইত। ইদানীং আত্মহত্যার কথাও শান্তি যে দুএকবার ভাবে নাই, তাহা নয়; কিন্তু এখন মৃত্যুতেও তাহার শান্তি নাই। পাঁচ বছরের মেয়ে শোভাকে রাখিয়া মরিবার মত দুর্বলতা তাহার নাই। কাজেই অশান্তি তাহার জীবনের উপর তীব্র হিম নিশ্বাস ফেলিতেছে। এখন বাঁচিতে হইলেও মূক হইয়া থাকা চলে না!...

ডালার তুলাটুকু শেষ হইয়া যাইতে শান্তির হুঁশ হইল। চরকাটা দাওয়ায় এক পাশে তুলিয়া রাখিয়া হেমন্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ঠায় বসেই আছ? বলি, কতকাল এমনি বসে থাকবে শুনি? আমার যেমন কপাল!" বেশী কথা বলিবার মত মনের অবস্থা শান্তির তখন ছিল না। কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব সে তাহার 'কপালের' কথাটাই স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া থামিল। সব কথা অনায়াসে শেষ করিবার মত এত বড় ব্রহ্মাস্ত্র বুঝি আর নাই।

হেমন্তের হঠাৎ সুবুদ্ধি হইল। সে গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি না বলছিলে বউ আজ সকালে? হ্যাঁ, এমনি বসে থাকা আর চলে না, ভালও দেখায় না। যা আমার বিদ্যে বুদ্ধি, তাতে কেউ জজিয়তি দেবে না, জানি, কিন্তু তা বলে মুটেগিরি আমার কে মারে শুনি, কেমন? এই বলে রাখছি তোমাকে— এখন থেকে বেপরোয়া। আর মান সম্মান? থুয়ে দাও তোমার মান সম্মান! আগে ত দেহে বাঁচি, তারপর মান বাঁচব, বুঝলে?..."

শান্তি নিষ্প্রভ মুখে সহানুভূতির একটু আঁচ লাগাইয়া বলিল, "বুঝেছি, সবই বুঝেছি; এখন যাও, পুকুর-ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে এসো।"

সবিনয় নিবেদন (১৯৪৫), কপাল

সুধাংশুকুমার হালদার

বেশ আছে এই সাঁওতালরা! এদের স্ত্রীপুরুষের মিলনে কোনো মানসিক বাধা তো কোনোদিন আসে না। আবার বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলেও অতীতের স্মৃতি তো এমন ক'রে পোড়ায় না, সভ্যমানুষকে যেমন ক'রে পোড়ায়। ঐ সদ্যবিচ্ছিন্ন সাঁওতাল দম্পতীর কথাই ধরা যাক। হত যদি সভ্যসমাজ, কাগজে কাগজে কত চাপা ইঙ্গিত, ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে কত বক্রহাসি, কত বিদ্রুপ, আদালতে কত তর্জন গর্জন, নির্বিকারত্বের অভিনয়! সেই মূক উৎপীড়নের ভয়ে অবশেষ স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন। এক একবার অসীমের মনে হয় সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে সাঁওতালদের মাঝেই সাঁওতাল হয়ে যায়! সে তো বেশ হবে! থাকবে না ভাবনা-চিন্তা, থাকবে না বিপ্লব-চাঞ্চল্য, জীবননদী ঝিরঝিরিয়ে বয়ে যাবে এই সব মহুয়া গাছের তলা দিয়ে ঐ ক্ষীণ নদীটির মতো। তারপর হয়তো একদিন আকৃষ্ট হবে কোন সাঁওতাল নারী, আসবে বনফুল খোঁপায় গুঁজে, মনোহরণ ক'রে নেবে তার। সে তো বেশ হবে! কিন্তু এই কি যথার্থ ভালো? এই কি যথার্থ কাম্য?... এই যে অর্ধবন্যদের বাঁচা, এই কি বাঁচার মতো বাঁচা? দুঃখ নেই, এইটেই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ! পশুরও তো দুঃখ নেই। মানুষের সভ্যতা, সে যে বড় দুঃখের ধন, দুঃখের ওপরই যে তার প্রতিষ্ঠা। মানুষের মনুষ্যত্ব, সে যে দুঃখের দ্বারাই দুর্লভ, চোখের জলেই সিক্ত, যে চোখের জল কোনোদিনই থামবার নয়, সেই যে তাকে শৌর্য দিয়েছে, বীর্য দিয়েছে, তাকে অপরূপ সৌন্দর্য বিভূষিত করেছে। এ-দুঃখ তার খাওয়া-পরার দুঃখ নয়, এ-দুঃখ তার আর্থিক ক্ষতির, তার সামাজিক অপমানের দুঃখ নয়, এ-দুঃখ তার চারিদিকে স্থৌল্যে গড়া নাগপাশ হতে মুক্তি পাবার দুঃখ, তার মোহনিদ্রাচূর্ণ করার দুঃখ, সে-দুঃখের ব্যথায় নীল হয়ে ওঠেন জননী, জন্ম দেন নতুন প্রাণের— এ সেই চিরনবজন্মের দুঃখ।

প্রত্যাখ্যান (১৯৪৫), ৪

নিমাইখুড়ো 'ওস্তাদ' উপাধি যে কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, সে-ইতিহাস কেহ রাখে না; তবে যখনই কেহ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিত, তখনই তিনি গাল-ভরা হাসিয়া উত্তর দিতেন, "আমার নাম ওস্তাদ-শ্রীনিমাইচরণ রায়, আপনার দাসানুদাস।"

তাঁহার ওস্তাদির প্রধান উপকরণ ছিল একটি তানপুরা। যন্ত্রটির মানকা ভাঙ্গিয়া আধাখানা হইয়া আছে, মুদারা খরজের তারটি নাই, সোয়ারীগুলি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে এবং তুম্বীর উপরে ইদুরের উপদ্রবে ছোট-বড় অনেকগুলো ছেঁদা হইয়াছে। তানপুরার ভিতরে সপরিবারে পরম সুখে আরসুলারা বাসা বাঁধিয়া নিরাপদে ঘরকন্না করিত। রোজ সকালে কাক-চিল ডাকিবার আগেই নিমাইখুড়ো তম্বুরার তবলিতে তাল রাখিতে 'সা, রে, গা, মা— মা, গা, রে, সা' প্রভৃতি বলিয়া দুই চোখ বুঁজিয়া প্রাণপণে হাঁ করিয়া গলা সাধিতে বসিতেন, এবং সেই অপূর্ব সঙ্গীত-শ্রবণে আরসুলাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত; তাহারা পালে পালে শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে বাহিরে আসিয়া তানপুরার গা-ময় মর্নিং-ওয়াক্ করিয়া বেড়াইত।

নিমাইখুড়োর সঙ্গীত-পটুতা পাড়ার ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবারই জানা ছিল। কথিত আছে, একদা বর্ষাকালে নিমাইখুড়োর শ্রোতাদের ভিতরে মুড়ি-ফুলুরি খাইতে খাইতে তর্ক সুরু হইয়াছিল যে, ওস্তাদজী মেঘমল্লার গাহিতে পারেন কি না। তর্ক শুনিয়া খুড়ো সবজান্তার মত ঈষৎ হাসিয়া এবং ঈষৎ কাসিয়া তখনই তানপুরা লইয়া বসিয়া গেলেন। মেঘমল্লারের অপূর্ব মহিমায় খুড়োর গা বহিয়া দরদর ধারে ঘর্ম ঝরিয়া তাঁহার লোল চর্ম সিক্ত করিতে লাগিল। অবশেষে গান শেষ হইলে খুড়ো যখন তানপুরা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, শুনলে ত?" তখন তাঁহার একজন মুখর ভক্ত করজোড়ে নিবেদন করিল, "কিন্তু ওস্তাদজী, কৈ, আকাশে বৃষ্টি হল না ত?"

খুড়ো মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হবে, বাবা, হবে।... দাঁড়াও, পৃথিবীতে বসে গান গাচ্চি— সুরটাকে আগে আকাশে গিয়ে পৌঁছতে দাও। পৃথিবী থেকে আকাশ ত দু-চার মিনিটের— বলব কি— পথ নয়। আমি গাইলাম মেঘমল্লার, বৃষ্টি হবে না? বলব কি, আলবৎ হবে।"

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

আষাঢ়ের নবীন মেঘকে দেখিয়া প্রিয়াগমনের প্রত্যয়বশতঃ যে-পথিকবনিতাগণ উদ্‌গৃহীতালকান্তা হইয়া উর্ধ্বে তাকাইবে, অনুকূল বাতাসে মন্দ আন্দোলিত মেঘের বামে থাকিয়া যে-চাতকগুলি মধুর রব করিবে, গর্ভাদান-ক্ষণপরিচয় বশতঃ যে-আবদ্ধমালা বলাকাশ্রেণী নয়ন-সুভাগ মেঘের সেবা করিবে, মেঘের শ্রবণ-সুভাগ যে-রবে ধরণী শস্যশ্যামলা হইয়া ওঠে, সেই রব শুনিয়া মানসসরোবর-গমনোৎসুক সে-রাজহংসগুলি খণ্ড খণ্ড মৃণালের পাথেয় লইয়া কৈলাসপর্বত পর্যন্ত মেঘের সঙ্গী হইবে, চিরসুহৃদের ন্যায় দীর্ঘবিরহান্তে যে-চিত্রকূটপর্বত উষ্ণবাষ্প মোচন করিয়া মেঘের প্রতি স্নেহ ব্যক্ত করিবে, পবন গিরিশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে না কি, এই কৌতুহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া যে-সিদ্ধাঙ্গনাগণ মেঘের দিকে ভীত নয়নে তাকাইবে, ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ যে-জনপদবধূগণ তাহাদের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা মেঘকে পান করিবে, তাহাদের ভিতরে বিজাতীয়ত্বের স্পষ্ট ভেদরেখা কোথায়? মেঘবর্ষণে প্রশমিতদাবাগ্নি সেই সানুমান আম্রকূট, কর্কশ হস্তীর গাত্রে শোভিত রেখা-বিন্যাসের ন্যায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা উপলবিষমা বিশীর্ণা রেবা নদী, সেই অর্ধসমুৎপন্ন কেশরসমূহে হরিৎ ও কপিশবর্ণ কদম্বপুষ্পের দর্শনে উৎফুল্ল এবং ভূমিকদলীর প্রথমোৎপন্ন মুকুল ভক্ষণ করিয়া বনভূমির মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছে যে-হরিণগুলি, স্বাগতরবকারী শুক্লাপাঙ্গ সজলনয়ন কেকাগুলি, সেই দশার্ণদেশ যেকানে কেতকীপুষ্পে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে উপবনের বেড়াগুলি, যেখানে গৃহবলিভুক্‌ পাখিগণের নীড়নির্মাণ-কোলাহলে আকুল হইয়া উঠিয়াছে গ্রামপথের বৃক্ষগুলি, যে-দেশে বর্ষাগমে পরিণতফল শ্যামজম্বুতে বনান্ত ভরিয়া গিয়াছে, সেই বেত্রবতী নদীর চলোর্মি-সভ্রূভঙ্গ মুখ, সেই নবজলকণায় বননদীতীরে জাত যূথিকাকলিকা, সেই যুথিকালম্বী নারীগণ কপোলের ঘাম মুছিতে গিয়া যাহাদের কর্ণোৎপল মলিন হইয়া গিয়াছে, আর সেই উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিত লোলাপাঙ্গ নয়নের দৃষ্টি— সকল মিলিয়া যেন একটা অদ্ভুত 'সঙ্গতের' সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেও কবি বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দিকে দেখিয়াছেন যে, বিরহমিলন-মধুর প্রেমলীলা তাহাই যেন মানুষের সকল সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের একটা বিরাট পটভূমিকা বা নেপথ্য-সঙ্গীতের মত দাঁড়াইয়া আছে; এই নেপথ্য-সঙ্গীতের সহিত মানুষের জীবনসঙ্গীত মিলিয়া গিয়া একটা অখণ্ড আস্বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে।

ত্রয়ী (১৯৪৬), বাল্মীকি ও কালিদাস

একাকী থাকিতে হয়, সঙ্গী-সাথীর অভাবে নয়, মনের স্বভাবের জন্য। সময় কাটাইবার জন্য এক রকম খেয়ালবশেই কলম লইয়াছি, স্মৃতির পাতায় তাহা দিয়া দাগা বুলাইয়া চলিয়াছি। পড়াশুনা ইত্যাদির অবসরে রাত যখন একটু বেশী হয়, পাশের অন্যান্য ঘরে বাতি নিভাইয়া সবাই যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন কলম নিয়া স্মৃতির পথ ধরিয়া চলি। চলিতে চলিতে সে-পথ যদি এক সময় আমার ব্যক্তিগত জীবনের দরজায় আসিয়া থামে, তবে পাশ কাটাইবার কোন কথা আমার মনে আসে না। যে-আমি একদিন ছিলাম, আজ আর নাই, সেই আমির দুয়ারে আজিকার আমি আসিয়া থামি...

সাত বছর আগে একদিন বেলা এগারোটার সময় গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসি। ভাইবোনরা সকলে এবং সহরের অনেকে জেল-গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসে। জেল-গেট বন্ধ হইলে তাহারা চলিয়া যায়। একটি ঘরে গিয়া নিজের জায়গা লই।

জেল আমার কাছে নূতন নয়... দাদারা ষড়যন্ত্র-মামলায় ধরা পড়িয়া এই জেলে কয়েকদিন ছিলেন। স্কুলে যাইবার আগে রোজ বাসা হইতে তাঁদের খাবার এখানে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতাম। জেলের গরাদের পাশে তখন তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইতেন। এই ছবি মনে আসিতেছিল, আর এই কথাই মন ভাবিতেছিল: সেই দিনের সে-বালক আজ বড় হইয়া নিজে জেলে আসিয়াছে, এবার তাহার জন্যই হয়তো সন্ধ্যার সময় ছোট ভাইরা খাবার নিয়া আসিবে। এবং সে-দিনে গরাদের পাশে যাঁহারা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাঁহারা আজ এ-পৃথিবীতে নাই, কে জানে কোথাকার অদৃশ্য জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহারা নীচের পৃথিবীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিতেছেন। মনে একটু ভয়ের সঙ্গে কথাটা খেলিয়া গেল; তবে কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে? আজ যে-ভাইরা খাবার নিয়া আসিবে তাহারাও একদিন শেষে এই ভিতরে আসিবে এবং আমি পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িয়া সেই অদৃশ্য-বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইব?

ঘরে তখনও আলো দিয়া যায় নাই। কিছুক্ষণ এই ভাবনাগুলিই মনকে দখল করিয়া ছিল: আজ তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি।

ডেটিনিউ (১৯৪৬)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই; আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালীও ইহার ছিল না। ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে: বর্ষণমুখর রাত্রি, স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ, অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলাচঞ্চল নৃত্য, সর্বোপরি কল্পনাপ্রবণ আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেল শিশুহৃদয়, এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত, সরস, তরল কণ্ঠস্বর। এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে, তাহা স্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বইএর পাতায় ও সাহিত্যব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। শিশুচিত্তের উপরে ইহার অনুপম প্রভাব বুঝিতে হইলে আগে শিশুর মনোজগতের কতকটা পরিচয় থাকা চাই। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, যাঁহার মনে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারে প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার নিকট পৃথিবী আপনার সম্পূর্ণ রহস্যভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে, তাঁহার ইহার মধ্যে প্রকৃত রসের সন্ধান না পাইবার কথা। শিশুর মনের গোপন কোণে যে-পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত রহস্য যেন নীড় রচনা করে; তাহার চিন্তাকাশে যে-কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে অন্ধকার তারার মত, নানা বর্ণের আকাশকুসুম ফুটিয়া থাকে। পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্বদা মশগুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্ত-বিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বারা খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্য, সে পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা (১৯৪৬), রূপকথা

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

জগতে যাঁহারা উচ্চসাহিত্যসৃষ্টির সুদুর্লভ অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আপনার অন্তর্লোকেই সেই সৃষ্টির যাবতীয় উপাদানের সঞ্চয় লইয়া আসেন। বাহিরের উপকরণ তাঁহাদের নিকট উপলক্ষ্য মাত্র। উর্ণনাভের মতো বাহিরকে আশ্রয়মাত্র করিয়া তাঁহারা আপনার অন্তর হইতেই আপনার সৃষ্টিজাল রচনা করিয়া চলেন। অন্তরের উপাদানে এই স্বতঃস্ফুর্ত অনায়াস আনন্দসৃষ্টির নাম রসসৃষ্টি। কিন্তু এই রসসৃষ্টির রহস্যজগৎ আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। দৃশ্য যেখানে চক্ষু অতিক্রম করিয়া বক্ষের অনুভূতির বিষয় হইয়া উঠিল, সেখানে বাহিরের রবিকর আমাদের পথনির্দেশ করিতে পারে না। বস্তু ও বিষয়ের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া যে-রঞ্জনরশ্মি রসজগতের সহিত মানবচিত্তের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়, তাহাকেই রসদৃষ্টি বলা যায়। সাহিত্যজগতে পথ দেখিতে ও দেখাইতে হইলে এক রসদৃষ্টির প্রয়োজন।

বঙ্গসাহিস্যের একান্ত সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথে এই রসসৃষ্টি ও রসদৃষ্টির অতি অপূর্ব ও অভাবনীয় শুভসংযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি অন্বর্থনামারূপে একাধারে স্রষ্টা, দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা। আকাশের রবির ন্যায়ই স্বীয় অন্তর হইতে স্বকীয় সৌরলোক রচনা করিয়া স্বপ্রকাশ ও বিশ্বপ্রকাশরূপে তিনি আমাদের বহু উর্ধ্বে বিরাজ করিতেছেন।

এই সহস্রকর কবি যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির আলোকে তাহাই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই সুবিপুল বিশ্বপ্রকৃতিরই মতো তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আর শেষ নাই, বর্ণ ও বর্ণনাবিন্যাসেরও আর অন্ত পাওয়া যায় না। নব নব সৃষ্টি যেন তাঁহার অন্তর্লোকের আলোকপাতে প্রমূর্ত ও উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

রসসৃষ্টি ও রসদৃষ্টি তাঁহার এমন করায়ত্ত বলিয়াই মৌলিক রচনার বাহিরেও যে সমালোচনা-সাহিত্য একবার তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়াছে, তাহাই নূতন সৌন্দর্যে, নূতন রসে, নূতন অভিব্যক্তিতে জীবনময় হইয়া একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।... তাঁহার সমালোচনারচনাগুলিতে এমন একটি সৃষ্টির পরিচয় পাই, যাহাতে চিত্ত বক্তব্য বিষয়টি অবলম্বনমাত্র করিয়া অনবদ্য ভাষা ও ভঙ্গীর সাহায্যে বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সুপ্রসার সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, সুদূরবর্তীর সহিত যোগসংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ লাভ করিয়া অমৃতরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া উঠে। এই আনন্দের অভিসিঞ্চন তাঁহার সমালোচনা-সাহিত্য হইতেও লাভ করি বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি বলিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য (১৯৪৭), রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচনা-সাহিত্য

১৩ই এপ্রিল বেলা ১২টার আগেই লাহোর পৌঁছবার কথা। কিন্তু আম্বালায় গাড়ি বদলিয়ে কিছুক্ষণ চলবার পরেই ট্রেন থেমে থেমে চলল থেকে থেকে। অনুসন্ধানে জানলাম যে, আগের দিন নাকি জায়গায় জায়গায় রেল-লাইন উপড়ে ফেল হয়েছিল— তাই এই সতর্কতা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেট করে ট্রেন যখন অমৃতসর স্টেশনে ঢুকল, যখন দেখি প্লাটফরম ছেয়ে ফেলেছে গোরা ফৌজ; বড় বড় খিলানগুলো সব বালির ব্যাগ দিয়ে বন্ধ; তার উপরে চড়ানো মেশিনগান। কাউকে নামতে দিলে না অমৃতসরে। গোরারা এসে গাড়িতে উঠে খানাতল্লাসী শুরু করলে। হঠাৎ কড়কড় শব্দে চমকিয়ে উঠলাম— আওয়াজ আসছে কাছ থেকেই। কিসের আওয়াজ বুঝতে দেরি হল না। একটা গোবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারখানা কি? উত্তরে সে স্টেশনের বাইরের শহরের দিকে তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা বাড়িযে দিয়ে জানালে, "ওখানে দেদার মজা চলেছে!"

সেদিন ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল, সেই বিকালবেলায়, অমৃতসর শহরে একটা পোড়ো জমির উপর রক্তের অক্ষরে লেখা সুরু হল ভারত-ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। পরদিন সকালেই লাহোরে খবর পৌঁছল জালিয়ানওয়ালাবাগের। সেখানেও দুদিন আগে গুলি চলেছে আনারকলির বাজারে, দোকানপাঠ সব কিছু কদিন থেকেই বন্ধ। এবার উত্তেজনা উঠল চরমে। ওডায়ার হুকুম দিলেন, "খোলো বাজার, খোলো সব দোকান— নইলে জারী হবে জঙ্গী-আইন!" লাহোরের লোক বললে, "সেদিন আনারকলিতে যাদের গুলি করে মেরেছে, তাদের 'মুরদা' দাও আগে ফিরিয়ে।" ওডায়ার সশস্ত্র বাহিনী সামনে পিছনে রেখে স-পারিষদ অশ্বপৃষ্ঠে এসে ঢুকলেন পুরানো শহরের সঙ্কীর্ণ 'কুচা' 'কাটরার' মধ্যে। সিয়াপা-র ক্রন্দনরোলের ছলনাপরিহাসে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে অন্তঃপুরিকারা, আর পুরুষেরা লাটসাহেবের পাশেই পাঠান উষ্ণীষধারী ঘোড়সওয়ার, পাঞ্জাবের নামজাদা খয়ের-খাঁ, তিওয়ানার মালেক ওমর হায়াৎ খাঁকে দেখেই স্বাগত জানালে হাঁক দিয়ে "সরকারকো মামা আ গিয়া, সরকারকো মামা আ গিয়া!" লাঞ্ছিত লাটবাহাদুর ফিরে এলেন, পারলেন না দোকান-পাট খোলাতে।... সুরু হল লাহোরে কর্নেল ফ্রাঙ্ক জন্‌সনের জঙ্গী-তাণ্ডব। গুজরাণওয়ালায় হাওয়াই জাহাজ করলে নিরস্ত্র জনতার উপর বোমাবর্ষণ; কাসুরে চলল মেয়েদের উপর বেকসুর অত্যাচার, আর অমৃতসরের রাস্তায় বেয়নেটের আগায় মানুষকে হাঁটানো হল বুক দিয়ে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি (১৯৪৮)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

মানুষ যতই সভ্যতার ধাপে উঠেছে, যতই সভ্যতার প্রসার হচ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে জমানো তহবিল থেকে খরচের হার। পৃথিবী প্রতিদিন যা সূর্যের কাছে পাচ্ছে, তারই পরিমিত ব্যয়ে তার সংসারযাত্রা আর চলে না। বর্তমান সভ্যতার চাহিদা মিটানো শক্ত, তবু সে-মোহিনী তাকে মুগ্ধ করেছে। কল্পনার কুহকে নিজের খেয়ালে সে পূর্বযুগের তহবিল নিঃশেষ করতে চলেছে। অঙ্গারসম্পদ কিংবা মাটির তেল কিছু চিরদিন থাকবে না। ভাণ্ডার হতে যা খরচ হয়, তার প্রতিপূরণ হচ্ছে না। যে-অবস্থায় এই সব সম্পদ সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে তারও হয়েছে আমূল পরিবর্তন। তাই আজকাল সাবধানী মহলে শোনা যায় সর্তকতার বাণী। আর কতকাল অঙ্গার বা তেল মনুষ্যসমাজের নিত্যবর্ধমান চাহিদা যোগাতে পারবে, তারও হিসাব হচ্ছে মাঝে মাঝে, আর মানুষ ছুটছে নতুন কয়লাখনির সন্ধানে, নতুন তেলের উৎস মাটির বাইরে আনতে।

সব দেশের মানুষ একই ভাবে জীবনযাত্রা চালায় না। শিক্ষার কৌশলে কার্যকারিতায় তাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ আছে। আবার প্রাকৃতিক সম্পদ সারা পৃথিবীতে একই ভাবে ছড়ানো নেই। জাতির মধ্যে যারা প্রভাবশালী, তারা সমস্ত খনিজ সম্পদ নিজেদের দখলে রাখতে উদ্‌গ্রীব। যারা কপালগুণে পৃথিবীর বিত্তভাণ্ডারের আজ অধিকারী, তারা তাদের দখল চিরস্থায়ী করতে চায়। অনুন্নত জাতির দেশে যে-প্রাকৃতিক সম্পদ আজও অটুট আছে, তার উপর অধিকার বিস্তার করতে উন্নত জাতিদের নিয়ত প্রয়াস। ফলে হয় কঠোর প্রতিযোগিতা, প্রবলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষ। নির্মম কঠোর সংগ্রাম। এতে সারা বিশ্বের কল্যাণকারী বিত্ত— বহু বৎসরের মানুষের আয়াসের সঞ্চিত ধন - অল্পদিনে পরিণত হয় ভস্ম ও ধ্বংসস্তুপে। সচ্ছলতার দেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ মহামারী। বিজয়লক্ষ্মী যে-জাতির প্রতি নিষ্করুণ, তারা হয়ত সমৃদ্ধির শিখর হতে সর্বনাশের রসাতলে ডুবে যায়। রক্ত ও বিত্তক্ষয়ে বিজেতারাও হয়ে পড়ে নিস্তেজ। শান্তি সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে তাদেরও লাগে বহুদিন, লোকসান পুরাতে সহ্য করতে হয় অনেক ক্লেশ, অনেক দুঃখ।

জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও পাকা জুয়াড়ীর চৈতন্য হয় না। সে ফেরে নতুন বিত্তের সন্ধানে, যা পণ রেখে আবার সর্বনেশে জুয়ায় নিজের ভাগ্য-পরীক্ষা নতুন ক'রে করতে পারবে।

শক্তির সন্ধানে মানুষ (১৯৪৮)

ফিরিঙ্গীটি লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, "এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?"

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। "হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ" বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি, তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে "গোয়িঙ ফার?" বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশী বলতে পার— দুটোর যে-কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু "হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ" যেন ইলিসিয়াম রে'র প্রশ্ন— ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

তা সে যা-ই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার ফিয়াঁসে নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরী ক'রে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদস্তুর পলটন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে, আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিভ বস্তু, হয়ত বড্ড বেশী ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল, সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন ক'রে আ লা কার্ত ভোজন, যার যা খুশী খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল, আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জ'মে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তা-ই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিককাবাবের জায়গায় শামীকাবার নয়, আলু-গোস্তের বদলে কপি-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, "ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই; এ-সব জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে কেনা।"

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গী মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তা-ই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গীকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াঁসের একটা বর্ণনা দিতে, কিন্তু থেমে গেলুম। কি আর হবে বেচারীর সন্দেহ বাড়িয়ে— তার উপর দেখি বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক ক'রে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা— কখন রঙ বদলায়।

দেশে-বিদেশে (১৯৪৯)

ভুজঙ্গভূষণ রায়

হিমাদ্রিশীর্ষে কৈলাসের একাংশে দিক্‌পালগণের অন্যতম ধনাধিপ কুবেরের রাজধানী মনোরম অলকাপুরী। সেই কুবেরের অনুচর ছিল এক যক্ষ। অজ্ঞাতনামা সে-যক্ষেরও বাসভবন ছিল এই অলকায়। একান্ত দয়িতানুরক্তিতে সে সমাহিত হইতে না পারিয়া প্রভুর কার্যে প্রভূত শৈথিল্য করিয়াছিল। ধনেশ্বর প্রভু তাহা সহিতে পারেন নাই। কেবল পত্নীপ্রেমেই যক্ষ কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া যক্ষেশ্বর হঠাৎ তাঁহার অনুচরটির জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন। এ-দাম্পত্যপ্রেমের গাঢ়তা কত, তাহা তিনি একটিবারও ভাবিলেন না। দণ্ডাদেশ বা অভিশাপ দিলেন: বৎসরকালের জন্য দক্ষকে রামগিরিতে নির্বাসিত হইয়া একাকী অবস্থান করিতে হইবে।

যাহা একজনের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অকস্মাৎ তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার চেয়ে গুরুদণ্ড আর নাই। কাহার প্রাণের স্রোত কখন কোন্ দিক প্রবাহিত, ইহা সকলে সর্বক্ষণ বুঝিতে পারে না; পারিলে হয়ত সবাই আত্মপর ভুলিয়া পরস্পরের আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হইয়া পড়িত। স্বার্থপর ধনাঢ্যদের এরূপ বোধহীনতা স্বভাবসুলভ। ভৃত্যেরা সদাকালেই পরবশ। প্রভু তাহাদের মন, প্রাণ, বিবেক-বুদ্ধি—সবই স্ববশে পরিচালন করিতে ব্যগ্র!

...সহৃদয় কবি কাব্যারম্ভে কাব্যের সেই অনুকূল নায়ক যক্ষের নাম উল্লেখ করেন নাই। সে যে অভিশপ্ত! অভিশাপে হতশ্রী হইয়া যে-সমাজ হইতে দূরে গেল, কবির লিপিচাতুর্য তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে না ধরিয়া শুধু তাহার বিরহ-কাতরতার আবেগময়ী বাণীই কাব্যের বিষয়ীভূত করিয়াছে। সে-বাণীতে কবির হৃদয়বীণার তন্ত্রী কাঁপিয়াছে, প্রাণ গলিয়াছে, আর সেইসঙ্গে ধরণীর সমুদয় সুসভ্য জাতির হৃদয়ে পরের মর্মপীড়ার অনুভূতির উদ্রেক করিয়া দিতেছে। যাহাদের হৃদয়-অশ্ম-লোষ্ট্রনিভ, তাহাদের পরুষতার স্বাতন্ত্র্য কেহ বা গণ্য করিয়া থাকে?

রামগিরির রমণীয় আশ্রমে বিরহী যক্ষ শাপপ্রভাবে 'অস্তগতমহিমা' হইয়া কয়েকমাস অবস্থান করিতেছিল। জনকতনয়ার স্নানপুণ্যসলিল-বিধৌত সে-পবিত্র স্থান বৃক্ষরাজিও সেথায় স্নিগ্ধ ছায়াদানে তাপিতকে শান্তি দিয়া থাকে, কিন্তু কামী যক্ষের হিয়ার তাপ ইহাতে যায় না; সে আজ প্রিয়জন হইতে দূরে! দুঃখতাপে তাহার কমনীয় তনুখানি দিন দিন কৃশ হইতেছে, কর হইতে কনকবলয় স্খলিত হইয়া যাওয়ায় তাহার দেহের শ্রীবিলুপ্ত হইয়াছে; নয়ন-দুটিতে বাষ্প-বর্ষণের অবসান নাই। এমন সময় আষাঢ়ের প্রথম দিনে চিত্রকূট পর্বতের সানুদেশ আলিঙ্গন করিয়া একখানি নবীন মেঘের উদয় হইল।

মেঘালোকে (১৯৪৯), কাব্য-সংস্তুতি, ১

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

জননীর এই ধ্বংসমূর্তির উপাসনা বিবেকানন্দ শিক্ষা করিয়াছিলেন স্বীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট। দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে অনুভব করিয়াছিলেন, দুঃখ দৈন্য ব্যাধি মড়ক পরাজয় ব্যর্থতার সহিত বীরের মত সংগ্রাম করা-ই, প্রয়োজন হইলে নির্ভীক দৃঢ়তায় মৃত্যুকে বীরের মত আলিঙ্গন করা-ই বর্তমান যুগের অবশ্যকর্তব্য শক্তিসাধনা। "রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী!" সেইজন্যই আজ ত্রিশ কোটীর মনুষ্যত্ব নিবীর্য ও অলস! তাই গুরুবলে বলীয়ান সাধক নবযুগের প্রারম্ভে ভারতবাসীকে ভীষণের পূজায়, মৃত্যুর উপাসনায় গভীর আরাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। এসো, নবযুগের শক্তিসাধক; আশা, আনন্দ, উল্লাস ও অতীত-গৌরবের কঙ্কাল-পরিপ্লুত এই ভারত-মহাশ্মশানে, নৈরাশ্য উদ্বেগ আশঙ্কার এই ঘোর অমানিশার শুভলগ্নে, অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শক্তিসাধনায় অগ্রসর হও। ক্ষুধিতের কাতর ক্রন্দন, ব্যাধিপীড়িতের অসহায় হাহাকার, পদদলিতের অক্ষম কাতরতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিও না, এ-ভীষণ তোমার উপাস্যা ইষ্টদেবী! যাও, যেখানে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি মড়ক— মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া যাও সেখানে, ছুটিয়া যাও! তাণ্ডবনৃত্য-পরায়ণা মৃত্যুরূপা মাতার চরণে হৃদয়ের উষ্ণশোণিত উৎসর্গ কর! প্রেতের অট্টহাসি, শিবার চীৎকার শুনিয়া রমণীর অঞ্চলতলে ভীরুর মত আত্মগোপন করা আর তোমার শোভা পায় না! শিয়রে মহাসর্বনাশ নিষ্পলক নেত্রে তীব্রদৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া। প্রেমের স্বপ্ন দেখিবার অবসর তোমার আছে কি? এসো, দূর কর নারীমায়া, ভোগ-বিলাসের কামনা হৃদয় হইতে নির্মম হইয়া দূর করিয়া দাও! রুদ্ধ গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া এসো, এই অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়! ভয়? ভয় কী? কিসের নৈরাশ্য? সিংহিনী যখন করিকুম্ভ বিদারণপূর্বক রক্তপান করে, যখন ভীষণ গর্জনে বনানী প্রকম্পিত করিয়া তোলে, তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান সিংহশিশু কি ভীত হয়? সম্মুখে ঐ রুধিরাক্ত-রসনা, করালদংষ্ট্রা সিংহী যত ভীষণা হউক, সে যে তাহার জননী! এসো যুগান্তরের নিরাশা ও জড়ত্বপাশ জীর্ণবস্ত্রের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কোটীকণ্ঠে একবার এই ভীষণাকে মা মা বলিয়া ডাক দেখি! সেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে পাগলা পূজারী যে-ভাবে যে-নগ্ন সরলতা লইয়া ডাকিয়াছিলেন, ডাক দেখি একবার! মৃত্যুরূপা মাতা প্রসন্না হইবেন, সাধনায় সিদ্ধি মিলিবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের দুর্দশাও ঘুচিবে।

বিবেকানন্দ চরিত (১৯৪৯), ষষ্ঠ অধ্যায়: যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন ঝড়ের খড়্গ দিয়ে নিজের বুক চিরে দুখানা ক'রে দিলুম, ছুঁড়ে ফেলে দিলুম আমার সত্তার অত্যন্ত প্রবল একটি অংশকে অতীতের অন্ধকারে। এমনি ক'রে মিটোলুম সেদিন আমার বাইরের সঙ্গে আমার ভিতরের দ্বন্দ্ব। আমার পক্ষে এটা বড় সোজা ছিল না। আটপৌরে আবহাওয়ায় আমার জীবন বিকশিত হয় নি। জীবন দিয়ে, সাধনা দিয়ে বিরাট মানুষেরা যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে এক শতাব্দী ধ'রে তাঁদের তৈরি সেই আলো-বাতাসের বুকে আমার জীবন মেলে দিয়েছিল তার দলগুলি। সেই অমিত-শক্তিশালী মানুষগুলি যে-সুরে আমাদের পারিবারিক জীবনের সুরের পর্দা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই সুরের ফাঁকা-তালে আমার জীবনের চলার ছন্দ ফেলা কি যে শক্ত ছিল, তা যারা এমন বিশ্ববিজয়িনী শক্তির সম্মুখীন হয় নি কোনদিন, তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এস্‌থেটিক অনুভূতির সে এক আশ্চর্য গভীর, সীমাহীন আকাশ এই রসোপলব্ধির সাধকেরা রচনা ক'রে রেখেছিলেন আমাদের জীবন ঘিরে। বাড়ির বায়ুমণ্ডল ছিল ভাবের রসে মন্থর, ভাবের গন্ধে উন্মন। সেই প্রবল, গভীর এস্‌থেটিক আবেষ্টনীর বিরুদ্ধে আমি ঘোষণা করলুম আমার বিদ্রোহ...

মানুষের জীবনের কেন্দ্রেই যখন এই অমাবস্যা, তখন কোথায় আলো, কোথায় রঙ? অথচ কি আলোই না জ্বলতে পারে জীবনের প্রদীপে রক্তের পলতেতে, কি-অফুরন্ত রঙ না ঝরতে পারে পাঁজরের তলায় মনের ঝরণা থেকে! জীবনের অন্ধকার খোলা চোখে দেখার বীর্য ভাববিলাসী এস্‌থেটদের নেই। তাই এড়িয়ে যায় তারা এই অন্ধকারকে, বলে শাশ্বত আলোর পূজারী তারা, ক্ষণিকের এই অন্ধকারের দিকে তারা চোখ দেবে কেন? জীবনের কেন্দ্রে অন্ধকারকে বাঁচিয়ে রেখে যারা আকাশের নীল আর মাঠের সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সকলের দৃষ্টি সেই দিকে টেনে নিয়ে চলে, তারা শাশ্বত আলোর স্তবগান মুখে যতই করুক না কেন, তারা আসলে আলোর পূজারী নয়, তারা অন্ধকার-রাক্ষসীর সেবায়েতের দল। মানুষের জীবন, তার প্রাণের আলো, রঙ সব এই রাক্ষসীর ভোগ দিয়ে আসছে তারা যুগযুগান্ত ধ'রে আর ভোলাচ্ছে মানুষকে প্রকৃতির রূপ দিয়ে। এই অন্ধকার-রাক্ষসীর থাবার তলায় মানুষের বুকের মধ্যে যে-নীল, যে-সবুজ চাপা প'ড়ে আছে, গুমরে মরছে, তার তুলনায় আকাশের নীল আর মাঠের সবুজ কতটুকু!

যাত্রী, প্রথম খণ্ড (১৯৫০)

তারপর দুলেরা অন্তর্হিত হলেন। আমি কিন্তু অনুভব করলাম তাঁর সান্নিধ্য, সেই ঘন নীল কৃষ্ণ রাত্রির অন্ধকারে সর্বত্র সর্বক্ষণ। রাত্রির শীতলতা আমার জলমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে সুশীতল করে দিচ্ছিল। বহু যুথী ও মল্লিকা আমার বারান্দায় ফুটেছিল, আমি আলোর নিচে বসে শুভ্র পুষ্পে একটি মালা গাঁথলাম। দুলেরার পরিচ্ছদ ছিল শুভ্র, তার মধ্যস্থলে ছিল স্বর্ণখচিত কোমরবন্ধ। একমাত্র চন্দ্রের চিন্তায় যেমন সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা খেলে যায়, তেমনি একমাত্র দুলেরার চিন্তায় আমার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তাঁর চিন্তা আমার জীবনের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস।

আজকের মতন আকাশ আমার এত সান্নিধ্যে এসেছে কি কখনো? আজকের মতন আকাশ আমার কাছে অতি স্বচ্ছ পদ্মরাগমণিখচিত চন্দ্রতপ। আজকের ধরণী আমার উৎসব-কক্ষ; তারকারাজি আমার উৎসবের উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে জ্বলছে, নদীর জলকলতান আমার বীণার সঙ্গীত, আমি সমস্ত বিশ্বকে আমন্ত্রণ করেছি আমার আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। আজ যে আমার স্বয়ংবর...

বাতাসের আন্দোলনে পত্রমর্মরের মত দুলেরার নাম দিল্লী বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। আমি কিন্তু দেখলাম, প্রিয়তমের দুটি নয়ন সমুদ্রের মত গভীর, সূর্যের মত ভাস্বর। আমি আজ তাঁর মধ্যে সন্ধান পেলাম আমার দয়িতের, যাকে আমি চিরকাল সন্ধান করে বেড়িয়েছি। আমি পেয়েছি আমার গুরু, যিনি আমাকে সব-কিছু শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁকে আমি চিরকাল অনুসরণ করতে পারি।

স্বামীবিহীনা নারী আর সূর্যহীন দিবস উভয়ই নিরর্থক।

আমি আমার অলিন্দে বসে স্বপ্ন দেখেছি: বিবাহের উৎসব-রাত্রিতে আলোর মালার মত খদ্যোৎমালা আমার পার্শ্বে নৃত্য করছে। চিন্তাশক্তির দ্বারা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার রহস্য শেখ ইবল-উল-আরাবী জানতেন। দুলেরার কাছে পত্র লিখতে আমার ইচ্ছা হল। সে-পত্রে জানিয়ে দেব আমার অন্তর-গোপন বাসনা; দারা যদি যুদ্ধে জয়ী হন, তবে সম্রাট আকবরের বিধানকে পরিবর্তিত করে দারা তাঁর ভগ্নীকে স্বেচ্ছায় বর বরণ করে নেবার অধিকার দেবেন। আমি জানিয়ে দিতাম, জানকী শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের সময় বলেছিলেন, "যদি আমার স্বামী রাজপ্রাসাদে অথবা স্বর্গে দেবতার রথে বিচরণ করেন, যদি শূন্যলোকে বা গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করেন, তবু স্বামীর চরণচ্ছায়াই স্ত্রীর একমাত্র আশ্রয়। সহভ্রমণের সময় মর্ত্যলোকে ধূলিকণার ঝঞ্ঝা-স্ত্রীর নিশ্বাস যদি রোধ করে, তবে সে ধূলিকণা হবে স্ত্রীর সুমধুর চন্দ্রনগন্ধবাহী কুমকুম।"

জাহানারার আত্মকাহিনী (১৯৫০), চতুর্থ স্তবক

কালিদাস রায়

বঙ্গের যে-অংশে এই গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছে, সে-অংশ প্রকৃতির অপূর্ব লীলাভূমি; নদনদী, খালবিল, অরণ্য, পাহাড় ও পল্লীশ্রীর অপূর্ব সম্মিলন হইয়াছে এখানে। ভিন্ন ভিন্ন বন্য, পার্বত ও গ্রাম্য জাতির সমন্বয় হইয়াছে এখানে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে সীমারেখা এখানে খুব দুর্লঙ্ঘ্য নয়, বর্ণাশ্রমী হিন্দুদের সামাজিক শাসন এখানে বিশেষ প্রভাব লাভ করে নাই, রাষ্ট্রীয় শাসনও ছিল এ-অঞ্চলে শিথিল, ধর্মে ধর্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এখানে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না; জীবনের সকল পথেই ছিল মুক্তি! এই সকল কারণে মুক্তির আবহাওয়ায় এখানকার লোকের প্রকৃতি ছিল কতকটা অবাধ, শৃঙ্খলাহীন। তাহাদের জীবনের গতি ছিল উদ্দাম, তাহাদের চিন্তা ছিল স্বাধীন, অনুভূতি ছিল গাঢ়, মনোবেগ ছিল অবল্গিত। জীবনীশক্তির অবাধ প্রাচুর্যে তাহাদের মধ্যে একটা অব্যাহত সৃজনী শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। এই সৃজনী শক্তি কোন কলাশ্রীসঙ্গত বা অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত আদর্শ, বিধিবিধান বা রীতিপদ্ধতি লাভ করে নাই। এই দেশেরই আত্মপ্রকাশের নিজস্ব একটা বাঁধা ছক বা আদরা ছিল; তাহাকেই অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের প্রাণের বার্তা অমার্জিত ভাষায় পঙ্গুদুর্বল ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রাণের আর্তি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। এগুলি অযত্নসম্ভূত বনফুলের মত— উদ্যানপুষ্পের শ্রীসৌরভ সৌষ্ঠব-গৌরব ইহাদের নাই।...

এই গীতিকাগুলির মধ্যে কোন তত্ত্বতথ্য নাই, কোন বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচয় নাই, বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয় এমন কোন উপাদান-উপকরণ এইগুলিতে নাই। গীতিকারগণ যেমনটি দেখিয়াছে, তেমনটিই বর্ণনা করিয়া গিয়াছে অন্তরের দরদ দিয়া। মানবজাতি সভ্যতার ক্রমোন্মেষের ফলে যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে, তাহার কোন পরিচয় এইগুলিতে নাই। যে-মনোবৃত্তিগুলির মানুষ অধিকারী হইয়াছে বন্য বর্বর অবস্থা হইতেই, যে-হৃদয়াবেগ মানবধর্মেরই অন্তর্গত, যে-বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি লইয়া মানুষ পশু হইতে আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, এই রচনাগুলিতে সেইগুলিই রসরূপ লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা যে-সাহিত্য হইতে পারে, সেকালের সভ্যলোকেরা তাহা জানিত না। যাহারা রচনা করিয়াছে, তাহারা সাহিত্য বলিয়া অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও কোন দিন ভাবে নাই। তাহারা ইহাতে আনন্দ পাইয়াছে এবং সকলকে আনন্দ দিতে পারিয়াছে— ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, দ্বিতীয়াংশ (১৯৫০), ময়মনসিংহ-গীতিকা

সতীনাথ ভাদুড়ী

এরপর থেকে আমার আর কালাচাঁদের মধ্যের সহজ সম্পর্কটা আর জীইয়ে রাখা সম্ভব হয় না। চেয়েছিলাম পাহারাকে আমার কুকুর, একান্ত আমার কুকুর ক'রে তয়ের করতে। পারি নি। এজন্য অসফল শিক্ষকের গ্লানি তো আছেই। কালাচাঁদের কাছে হেরে গিয়েছি; দিন দিন একটু একটু ক'রে তার শক্তি বাড়ছে আর আমার কমছে, অষ্টপ্রহর এ-কথাও আমাকে পীড়া দেয়।... পাহারার কাছ থেকে আমি কি প্রত্যাশা করি, তা আগে বুঝতে পারতাম না ঠিক, এখন পারি। সেদিন মার খাবার পর থেকে পাহারা আমার বশ মেনেছে অর্থাৎ দেখিছি ডাকলে আসে— ভয়ে, লেজ আর মাথা নামিয়ে হামাগুড়ি দেবার মতো নিচু হয়ে, বলির পাঁঠার মতো আড়ষ্টভাবে...। আমি চাই, আমার বাড়িতে ঢোকার সাড়া পেয়ে নিজে থেকে ছুটে আসুক, লেজ নাড়তে নাড়তে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ুক আমার গায়ে, গা-হাত চেটে সোহাগ জানাক। সেদিন মার খাওয়ার পর থেকে আমার বাড়ি ঢুকবার সাড়া পেলেই কয়লাগাদার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে থাকে!... ওর বশ্যতা চাই নি, ভালবাসা চেয়েছিলাম। প্রভুভক্তি চাই নি, চেয়েছিলাম অন্তরের টান— যেমন ওর আছে কালাচাঁদের উপর। ঐ যেমন ক'রে ও দাঁত না ফুটিয়ে কালাচাঁদের আঙুল কামড়ে দিয়ে পালায়, পাঁচিলের উপর কাঠবিড়ালি দেখে যেমন ক'রে তাকে মজার খবর দিয়ে যায়, যেমন তাকে বুড়ি ক'রে খেলা করে, তেমনি। আমার কথা পাহারা সব সময় শোনে, বাঁধবার জন্য ডাকলেও। কিন্তু কালাচাঁদ শেকল হাতে নিয়ে ডাকলে নাগালের থেকে দূরে পালায় দুষ্টু ছেলের মতো। আমিও তা-ই চাই। না শুনুক আমার কথা, আমি চাই তার মন। যে আমাকে তার খেলার সাথী ভাবুক। ভয়ের সম্পর্ক কি কখনও নিবিড় হয়? ভয় পেলে যে মনের অবস্থা কি হয়ে যায়, তা কি আমার জানা নেই? ছোটবেলা থেকে ভয়ের রোগে ভুগছি; আমি তো জানি সারা মনকে ভয় কি-রকম অসাড় ক'রে দেয়! সে-সময় কি কাউকে ভালবাসা যায়? তিন জনের সংসারে, তারা দুজন একদিকে; আমি ভোটে হেরে গিয়েছি। আমার সংসারে আমি হয়ে পড়েছি অনাবশ্যক।

অনাবশ্যক (১৯৫১)

পরিমল রায়

যে-ভয়টা পাইতেছিলাম, তাহা-ই হইল। টাইটা আর বাঁধিতে পারি না। পশ্চিমে চাকুরি পাওয়া অবধি অনবরত প্র্যাকটিস করিতেছি। ও-দেশে নাকি ধুতির রেওয়াজই নাই, প্যাণ্ট কোট পরিতে হইবে। দিনরাত অভ্যাসের ফলে ইদানীং হাতটা বেশ পাকিয়াও আসিয়াছিল, এবং একরকম নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিলাম। অথচ কি-ফ্যাসাদ, আজ চাকুরিতে প্রথম হাজিরা দিতে যাইব, আজই বিলকুল গোলমাল হইয়া গেল।

দিল্লিতে আসিবার পথে কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে উঠিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম, শ্যালকগণ অবলীলাক্রমে টাই বাঁধিতেছে। কথা বলিতেছে, টাই বাঁধিতেছে; পুত্রকে পড়া বলিয়া দিতেছে, টাই বাঁধিতেছে; স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করিতেছে, টাই বাঁধিতেছে। সে এক মহা তাজ্জবের ব্যাপার! দেখিয়া মনে করিলাম, আসলে এ নিশ্চয়ই অতি সহজ কর্ম। অতি সঙ্গোপনে একটি গলগ্রন্থি সংগ্রহ করিয়া বাথরুমে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু কৃতকার্য হওয়া দূরের কথা, উহার প্যাঁচটাই ঠাহর করিতে পারিলাম না। গলাটা কেবল শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

মিনিট দশেক কুস্তি করিয়া টাইটা পকেটে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেই শ্যালিকার সঙ্গে চোখাচোখি। শ্যালিকার সহিত রসিকতা না করিলে মান থাকে না। বলিলাম, "বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, পানি-প্রার্থী হইয়া তোমার কাছে যাইব ভাবিতেছিলাম।" কোথা হইতে হঠাৎ গৃহিণীর আবির্ভাব। কি-কারণে তাঁহার মেজাজ চড়িয়া ছিল, জানি না। বলিয়া বসিলেন, "কি যে সব গেঁয়ো রসিকতা কর, তার ঠিক নাই!" শুনিয়া আমিও সপ্তমে চড়িলাম। একাদিক্রমে ব্যঙ্গ, শ্লেষ, তাড়না, তিরস্কার ইত্যাদি ছোটোখাটো স্টেশনগুলি পার হইয়া ভাষা যখন স্রেফ গালাগালির জংশনে পৌঁছিয়াছে, তখন গলদেশ বারো ইঞ্চি ফুলিয়া উঠিয়াছে, টাই বাঁধা আর চলে না।

আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। টাইটা আর বাগে আসিতেছে না। এদিকে সময় উত্তীর্ণপ্রায়, বালুকারাশি হু হু বেগে বাহির হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বহু ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শেষামেষি কোনোরকমে একটা ফাঁস আটকাইয়া দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম।

চাঁদনির মোড়ে ইউনিভার্সিটির বাস্ ধরিতে হইবে।

ইদানীং, মেয়েরা

প্রতিমা ঠাকুর

মনে পড়ে পালকির ভিতর থেকে জন-তিনেক ছোট ছোট মেয়ে সন্তর্পণে পর্দা সরিয়ে রাস্তার চেহারাটা কৌতুকভরে দেখে নিচ্ছে। একপাশে দরওয়ান চলেছে, লাঠি হাতে, মাথায় মস্ত লটকান রঙের পাগড়ি, গলায় সোনার বড় বড় দানাওয়ালা মালা, ইয়া চাপদাড়ি। একদিকে পুজোয় পাওয়া রঙিন শাড়ি পরনে, হাতে অনন্ত গলায় মোটা বিছেহার, দর্পভরে বাহু দুলিয়ে চলেছেন 'লিচুর মা', দরওয়ানের সঙ্গে তার গল্প জমেছে বেশ।...

পালকি চড়াটা তখনকার দিনে একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। এই সময় মেয়েরা সর্বসাধারণের সঙ্গে পথে এসে দাঁড়াতে পারত, ঘেরাটোপের ব্যবধানের মধ্যেও একটা মুক্তির স্বাদে উঠত তাদের মন ভরে। কৌতুহলবশত পর্দা বেশি সরালেই দাসীর ধমক খেতে হত, ''কাণ্ড দেখ মেয়েদের, গা-ভরা গয়না, রাস্তার লোকগুলো সব দেখে ফেলুক!'' ঝি পর্দা পন্ধ করে দিত, তখন যে-তিমিরে সেই তিমিরে। কেবল রাস্তার লোকের পায়ের আওয়াজ আর ছোটখাট টুকিটাকি গল্পগুজব নানা ছবি মনে আনত। এমনি করে জনসমুদ্র পার হয়ে পুজোবাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে পালকি এসে নামত উঠোনে। আরতির বেলা তখন শুরু হয়েছে, অষ্টমী-পুজোর হৈ হৈ চলছে পুজোর দালানে, নাটমন্দিরে বাজছে সানাই। এরই মধ্যে আরো কত দর্শক এসেছে, প্রত্যেকের দৃষ্টি প্রত্যেকের গয়না-কাপড়ের দিকে। প্রতিমার সামনে বসল সব ছেলেমেয়ের দল। পুরোহিত এক হাতে প্রকাণ্ড গাছপ্রদীপ আর এক হাতে শাদা চামর নিয়ে শুরু করলেন আরতি। তারই সঙ্গে কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ, কানে তালা লাগবার যোগাড়। তারপর মায়ের প্রসাদী বাতাসা ছেলেমেয়েদের হাতে বিলোনোহত, সন্তুষ্টমনে শিশুরা তা-ই নিয়ে পালকি চড়ে বাড়ি ফিরত। রাস্তায় তখন গ্যাসের মিটমিটে আলো জ্বলছে, তারই আবছায়াতে মানুষ ভালো করে নজরে পড়ে না, কাজেই পর্দা ফাঁক থাকলে দাসী আপত্তি করত না। এই সুযোগে ঘেরাটোপের বন্ধন এড়িয়ে খোলা হাওয়াতে নিশ্বাস ফেলে বাঁচত তারা।

স্মৃতিচিত্র (১৯৫২), ২

সরলাবালা সরকার

জ্যাঠামহাশয় সেবার তাঁর হাণ্টার চাবুক দিয়া ঘোড়ার সহিসকে এলোপাথাড়ি চাবকাইতে গলা কাঁপাইয়া গর্জন করিতেছিলেন, আর সহিস আর্তনাদ করিতেছিল। বাড়ির সকলেই ভয়ে তটস্থ, কাহারও কিছু বলিবার সাহস নাই। আমার তখন মনে হইল, সহিস বুঝি মরিয়া গেল। আমি এলোচুলে কাঁদিতে কাঁদিতে 'ও জ্যাঠামশাই, ও জ্যাঠামশাই।' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া যখন তাঁহার হাত ধরিলাম, তখন জ্যাঠামশাই চাবুক মারা বন্ধ করিয়া একবার আমার দিকে চাহিলেন, ধমকের সুরে কি যে বলিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে: মনে হইল, বুঝি পড়িয়া যাই। কিন্তু সহিসকে মারা বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া আসিলাম।

জ্যাঠামহাশয়ের উপর ভয়ানক রাগ হইয়াছে: মনে হইতেছিল, তিনি কেন এত নিষ্ঠুর হইলেন, বেচাবি সহিস গরীব মানুষ, তাহাকে এভাবে মারা কি ভয়ানক নিষ্ঠুর! কিছুক্ষণ পরে জ্যাঠামহাশয় প্রতিদিনের মত জলখাবার খাইবার জন্য 'বুড়ি, বুড়ি' বলিয়া হাঁক দিতে দিতে যখন বাড়ির ভিতর আসিলেন, তখন আমি প্রতিদিনের মত ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলাম না, ঘরের ভিতর লুকাইয়া রহিলাম।

জ্যাঠামহাশয় যখন বার বার ডাকিতে লাগিলেন, তখন ঘাড় হেঁট করিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, তখনই তিনি আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মাইয়ার যে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়েছে, দেখছি। সহিসের উপর খুব মায়া, না? আর বেচারি ঘোড়াটা, সে যে না খেতে পেয়ে মর মর হয়েছে, সহিস রোজ তার দানা চুরি করে বিক্রি করে দিচ্ছে, তার উপর তো বুড়িমার একটুও মায়া নেই। সে যে নালিশ করতে পারে না, চেঁচাতে পারে না, সেইজন্য সে বাতিল হয়ে গিয়েছে, নয় কি? রোজ খাবার কম করে দিয়ে সহিস যে ঘোড়াটাকে মেরেই ফেলছিল। আমি দেখি, দিনে দিনে তার হাড় সার হয়ে যাচ্ছে; কি হল, তার কিছুই বুঝতে পারি না। শেষে ঘোড়ার ডাক্তারকে দিয়ে দেখালাম; সে বললে ঘোড়ার কোন অসুখ নয়, না খেয়ে তার এই অবস্থা হয়েছে। তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, দুষ্টু সহিস রোজ ওর দানা বিক্রি করে ওকে সিকি পেটা খাইয়ে রাখছে!" এই কথা বলিতে বলিতে মনে হইল জ্যাঠামহাশয় আবার রাগিয়া যাইতেছেন।

হারানো অতীত (১৯৫২)

টম ছিল কোথায়! ছুটতে ছুটতে এসে পায়ের কাছে মুখ নামাল। আবদারের আতিশয্যে লেজ দুলিয়ে সামনের পা দুটো ধরল তুলে। লালায়িত জিব বের ক'রে কেমন একটা ঘড়-ঘড় শব্দ করল গলায়। তার পায়ের চতুর্দিকে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। গলার কণ্ঠীতে ঝুমঝুমি। বাজল তার চাঞ্চল্যে।

আর কোথায় ছিল বিনোদা! কোন্ ঘরের ভেতরে! বেরিয়ে এল হঠাৎ। বললে, "কি ম্লেচ্ছ কাণ্ড! বাপের বয়সে দেখি নি, বাবা! কুকুরেব সঙ্গে মাখামাখি। জাত-জন্ম কিছু আর রইল না। বিদেয় কর, এক্ষুণি বিদেয় কর! চান ক'রে বেরিয়েই কুকুর?"

কৃষ্ণকিশোর হেসে ফেলল তার ধরণ-করণ দেখে। বিনোদা রাগ করলে মজা পায় সে। তাকে চটিয়ে দেয় যখন-তখন। পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। ক্রোধের মাত্রা তার যত বাড়ে, তত বেশী হাসি পায় কৃষ্ণকিশোরের। হাসতে হাসতে বললে, "তোমার আবার জাত আছে নাকি?"

খ্যাঁক ক'রে উঠল যেন বিনোদা। বললে, "না, তা থাকবে কেন! যত জাত আছে তোমার। আমার সাতপুরুষে কখনও কুকুরকে মাথায় তোলে না। ছুঁলে পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে হয়। জান?" কৃষ্ণকিশোর চাপা হাসির সঙ্গে বলে, "কিন্তু কুকুরও ভগবানের সৃষ্টি। কেমন প্রভুভক্ত জাত। কত কাজে লাগে।"

তেলে-বেগুনে যেন জ্ব'লে উঠল। বিনোদা। বললে, "থাক্ ঢের হয়েছে! তোমাকে আর ভগোবানের ছিষ্টি দেখাতে হবে না। তোমার আবার ভগোবান! এখন চান হয়েছে তো যাক না, গিয়ে খেতে বস গে, যাও না। বেলা যে দুটো!"

এবার পরিহাস নয়। সহানুভূতির সুরে বললে, সে "বিনোদা, তোমার খাওয়া হয়েছে?"

বিনোদার কণ্ঠস্বরে কোনো পরিবর্তন নেই। বলে, "আজ্ঞে না। আগে আপনি অনুগ্রহ ক'রে খেতে যান। খেয়ে মাকে খেতে দিন। তারপর দাসী-বাঁদীরা সব খেতে বসবে তো! ইস্, দরদ কত! খাওয়া হয়েছে কি না আবার জিগ্গেস করা হচ্ছে!"

রান্না-বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে। বিনোদার সব কথা হয়তো কানে যায় না তার। আপন মনে বলতে থাকে বিনোদা একা দাঁড়িয়ে। বলে, "ছিষ্টিছাড়া ছেলে বাবা! দেখি নি কখনও এমন। সময়ে চান করবে না, সময়ে খাবে না— যত্ত অনাছিষ্টি কাণ্ড!"

আকাশ-পাতাল, প্রথম পর্ব (১৯৫২)

জগদানন্দ বাজপেয়ী

স্মরণের অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সহসা পা বাড়াইতে গা ছমছম করে। মনে পড়িয়া যায় আগ্রা দুর্গের ভুগর্ভস্থ অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠের কথা; আঁকা-বাঁকা গলিপথ বহিয়া পাতালপুরে নামিয়া চলিয়াছি, জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে আমার গাইড, সদ্য-অপহৃত জীবনের দীপটি হাতে লইয়া যমদূত যেন মৃত ব্যক্তিকে লইয়া চলিয়াছে চিত্রগুপ্তের সেরেস্তায় আগামী জমা দিবার জন্য; কাহারও মুখে কোন কথা নাই, নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখাটি শুধু ধ্রুব জ্যোতিতে জ্বলমান। লোক এবং আলোক দর্শনে চকিত হইয়া নিশাচর চামচিকাদল সহসা উচ্চ চীৎকারে পাতালপুরী আলোড়িত করিয়া তুলিল; মনে হইল, বহু শতাব্দী ধরিয়া যে-সব দণ্ডিত হতভাগ্য পাতালপুরীর এই অন্ধকার কারাগারে তিল তিল করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহাদেরই প্রেতাত্মা যেন সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিয়াছে সেই অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে— বিচারের নামে যাহা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে বিধাতার দেওয়া আলো ও বাতাসের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ আশীর্বাদ হইতে। ভয় হয়, অবচেতনের অন্তস্তলে যে-সব অতৃপ্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অসন্তুষ্ট বঞ্চনা ও বেদনা গভীর ঘুমে সুপ্ত রহিয়াছে, স্মরণের আলোকসম্পাতে যদি সহসা তাহারা চকিত হইয়া একসঙ্গে কথা কহিয়া উঠিতে চায়, তাহা হইলে কাহার মুখে হাত দিয়া কাহাকে কথা কহিতে বলিব, কাহাকে থামাইয়া কাহার কথা শুনিব! দুর্গের উপরতলায় যখন নাচে ও গানে, বর্ণে ও গন্ধে, আলোকে ও পুলকে আনন্দের বান ডাকিয়াছে, নীচের তলার অধিবাসিগণ তখন সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ দিয়া প্রবিষ্ট অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মির আসা-যাওয়া দেখিয়া চন্দ্রসূর্যের উদয়-অস্ত নির্ণয় করিয়াছে, তাহারই মধ্যে ক্বচিৎ হয়তো ভাসিয়া আসিয়াছে ঊর্ধ্বলোকের আনন্দ কলরবের এতটুকু ক্ষীণ রেশ, সঙ্গীতের একটুখানি সুর, নৃত্য-চপল-চরণের নূপুর শিঞ্জিতের অস্ফুট রিনিঝিনি। সে-শব্দ অন্ধকারার বন্দিদের বুকে সেদিন যে-তরঙ্গ তুলিয়াছিল, নিশাচর পাখীর কণ্ঠে জাগিয়া উঠিয়াছে বুঝি তাহারই করুণ কল্লোল।

চলার পথে (১৯৫২), এক: পথের মানুষ

সরোজ আচার্য

অনেক দিন আগের কথা। কোন এক সাহিত্যানুরাগী বন্ধু বলেছিলেন, "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়েই প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছি।" কথাটি তাঁর নিজস্ব নয়, বোধ হয় অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় আমরা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছি কি না, বলতে পারি না। তবে শৈশবে-কৈশোরে যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের শুরু, তখন থেকে রবীন্দ্রনাথও আমাদের কথায়, গানে, কল্পনায় মিশে গেছেন। যে-রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথমে চিনেছিলাম, তিনি ঋষি, দ্রষ্টা, মহামানব এমন কোন পরিচয় নিয়ে আসেন নি। বাংলার জল-মাটি, আকাশ-বাতাসের মতই তিনি ছিলেন আমাদের কাছে সহজ, অন্তরঙ্গ এবং অনিবার্য। বর্ষার শ্যামল সমারোহ আমরা একবার দেখেছি বাইরে, আর-একবার তার কল্পরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়; এই দুয়ের মধ্যে কোথাও ছেদ কি বিরোধ আছে, কখনও ভাবতে পারি নি। সেই প্রথম বিস্ময়ের অপূর্ব অনুভূতি সারাজীবন ধ'রে রাখা আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়। অন্তত এখন তো নয়ই। বহুদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আগের মত পড়বার, উপভোগ করবার সময় হয় নি। ঠিক অবসরের অভাব এর কারণ নয়। বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নিশ্চয়ই নয়। রবীন্দ্রনাথকে আমরা অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু তাঁর ঐতিহ্যকে, আমাদের চিত্তলোকে তাঁর উপস্থিতিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন চসার ও শেক্‌স্‌পীয়র, তেমনি আমাদের সাহিত্য এবং জাতীয় সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের স্থান। কিন্তু এ হল সামান্য ঐতিহাসিক মূল্য-বিচার। রবীন্দ্রনাথ কি কেবল গিল্টি-করা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্য— না তাঁর সৃজনশক্তির দান এখনও আমাদের জীবনে "জীবন যোগ করার" প্রেরণা দেয়?

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের প্রশ্নের অন্ত নেই। তাঁর কাছ থেকে আমরা কী পেয়েছি, কীভাবে তাঁর মানস-সম্পদ আমরা নিতে পারি? এ-ধরণের প্রশ্ন অনেকের মতে আপত্তিকর ও অস্বাভাবিকও। তবু স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা মার্কস-লেনিন পড়ার ফল নয়। কালের ধারায় এক যুগের অবিস্মরণীয় প্রতিভা পরের যুগে নতুন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজ উদারতার সঙ্গে নিজেও এর যথার্থতা স্বীকার করতেন।

বই পড়া, চেনা রবীন্দ্রনাথ (১৯৫২)

নীহার ঘোষাল

কত ধানে কত চাল হয়, মদন মণ্ডল তা ভাল করেই জানত। সমস্তটা জীবন তো সে এক রকম হিসেবে করতে করতেই কাটিয়ে দিল। কিন্তু কতটা চাল সেদ্ধ করলে কতটা ভাত হয় এবং কতটুকু ভাত খেলে একটা মানুষের পেট ভরে, তার হিসেবে সে জানত না। মদন মণ্ডল চাষী। বাংলার চাষী। দু-বিঘে জমির মালিক সে। তাছাড়া ঘরের সামনেও আধ বিঘের মত জমি আছে। তাতে লাউ-কুমড়ো এবং বেগুন জন্মায় প্রতি বছর। মোট ফসলের যোগফল থেকে দুতিনজনের সংসার মোটামুটি ভাবে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তা চলে নি। কোনদিনও চলে নি। ইংরেজরা চলে গেল, কিন্তু মদন মণ্ডলের পেটের ক্ষিধে গেল না।

গত তিরিশ বছরের চেষ্টায় সে তিরিশের বেশি গুনতে শিখল না। শিখল না মানুষকে অবিশ্বাস করতে। মহাজন সদাই মোড়ল তার ফসল সব কিনে নেয়। লাউ-কুমড়োগুলো সাবালক হওয়ার আগেই সে দাদন দিয়ে আসে গদাই মোড়লের কাছ থেকে। এক শো টাকার জিনিস তাকে বেচতে হয় তিরিশ টাকায়। সে শুনেছে, কলকাতায় আর সাহেব-সুবো নেই— সব পালিয়েছে। কলকাতার লাটসাহেব এখন কলকাতারই মানুষ। কিন্তু মদন মণ্ডলের তাতে সুবিধে হয় নি। লাউ-কুমড়োর দাম বাড়ে নি তার এক পয়সাও। নতুন ইতিহাসের দাম বাড়ল অনেক, অথচ তার আয় বাড়ল না তিরিশ টাকার বেশি। তবুও মহাজন গদাই মোড়লকে সে অবিশ্বাস করতে পারল না। অবিশ্বাস করতে শেখে নি বংশীপুরের মদন মণ্ডল।

ঘরে বউ নেই, মারা গেছে প্রায় দশ বছর আগে। গেছে নবীনের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। মদনের একমাত্র সন্তান নবীন। বংশীপুরের পাঠশালায় সে বার পাঁচেক ভরতি হয়েছে, কিন্তু একসঙ্গে সে ছ-মাসও পড়তে পারে নি: মাইনে যোগাড় হয় না বলে নবীনের নাম কাটা যায় স্কুল থেকে। নবীন পড়তে চায়। লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক তার খুব বেশি। নাম কাটা গেলে কি হবে, নবীন এক থেকে এক শো পর্যন্ত গুনতে পারে। গুনতে পারে লাউ-কুমড়োর মোট সংখ্যা।

কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বংশীপুর গ্রাম।

দীপক চৌধুরীর গল্প, মদন মণ্ডলের কলকাতা যাত্রা (১৯৫৩)

পরদিন সকালে এক হাতির পিঠে সিরাজের মৃতদেহ চড়িয়ে দিয়ে সমস্ত শহরটা ধরে সেই হাতিটাকে রাস্তায় ঘোরানো হল। সকলে যেন প্রত্যয় যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর ইহজগতে নেই।

হাতি চলছে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেল। তিন বছর আগে ঠিক ঐখানেই সিরাজ হোসেন কুলী খাঁকে খুন করিয়েছিলেন। লোকে সভয়ে তাকিয়ে দেখল, সিরাজের মৃতদেহ থেকে দু-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে এসে সেইখানকার মাটির উপর পড়ল।

হাতি আবার চলল। সিরাজের পুরনো বাড়ির সামনে যখন সেটা পৌঁছেচে, তখন ভিড় জমে গেছে। চারদিকে খুবই হৈ-হল্লা উঠেছে। বাড়ির ভিতর থেকে হাতির পিঠে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে সিরাজের মা আমিনা বেগম খালি পায়ে আলুথালু বেশে টলতে টলতে এসে হাতির পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বেগম সাহেবা বেপর্দা হচ্ছেন দেখে পাশের বাড়ির এক ওমরাও তাঁর লোকজন দিইয়ে আমিনা বেগমকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে অন্দরমহলে ঠেলে ফেলিয়ে দেওয়ালেন।

তারপর সিরাজের মৃতদেহ হাতির পিঠ থেকে বাজারের চকের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। নরাধমদের কারো একবার মনেই হল না যে, শবের উপর অন্তত একটা কিছু ঢাকা দেওয়া উচিত...

আমীর থেকে ফকির, কি স্বদিশি কে বিদিশি সকলেরই বিরাগভাজন হয়েও সিরাজউদ্দৌলা তাঁর ভাগ্যহত অভিশপ্ত জীবনে একটা মস্ত বড় জিনিস লাভ করে গিয়েছিলেন। সেটা এক মহীয়সী নারীর প্রাণভরা একনিষ্ঠ প্রেম। সেই নারী তার স্ত্রী লুৎফউন্নিসা বেগম।

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর মীর জাফরের ইঙ্গিতে মীরন যখন লুৎফউন্নিসা বেগমের কাছে নিকার প্রস্তাব করে পাঠান, তখন তিনি উত্তরে বলে পাঠিয়েছিলেন, যে-জন চিরকাল হাতির পিঠে চড়ে বেড়িয়েছে, সে আজ কি করে গাধার পিঠে চড়ে বেড়ায়!...

তারপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত লুৎফউন্নিসা বেগম যতদিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিরাজের কবরের উপর একটি করে বাতি জ্বালিয়ে দিতেন। আর তারই পাশে বসে নীরবে তাঁর অন্তরের প্রার্থনা জানিয়ে আসতেন। ঘন অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে সেই প্রেমের বাতি জ্বলতে দেখে লোকের মাথা আপনা হতেই নুয়ে আসত।

পলাশির যুদ্ধ (১৯৫৩), চল্লিশ

নিরঞ্জন মজুমদার

এই কলকাতার পুরানো আবাস যখন ছেড়ে গিয়েছিলেম, তখন সত্যি মনে ভেবে মরেছিলেম কি জানি কী হবে। এখন সেই চেনা বন্দরে ফিরে এসে আমার মতো হাল-ভাঙ্গা পাল-ছেঁড়া নাবিকের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবার কথা! কিন্তু তা হল না। হাওড়াতে নেমেই মন নানা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। কলকাতায় ফিরছি বটে কিন্তু এতে কি খুঁজে পাব আমার প্রিয় সেই পুরোনো কলকাতাকে? সন্দেহী স্বামী যেমন বিদেশে বাণিজ্যের পরে স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনের পূর্বমুহূর্তে যুগবৎ আনন্দে অধীর ও সন্দিগ্ধতায় দগ্ধ হয়, তেমনি হাওড়া স্টেশনে পা পড়তেই আমার মন বলছিল— তা মন কী বলছিল মনই জানে।

কলকাতা এমনিতেই অসতী নগরী। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে আমি দীর্ঘ ষোলো বছর এই শহরে অতিবাহিত করেছি। এখানে আমি কেঁদেছি, কাঁদিয়েছি; হেসেছি, হাসিয়েছি। কিন্তু একদিনের জন্যেও বাইরে গেলে ফিরে এসে কলকাতাকে মনে হয়েছে অর্ধ-অপরিচিতা। মনে হয়েছে, ঘর যেন পর হয়েছে। বাইরে থেকে কিছুমাত্র বদল হয়নি। তবু ঘর আর বাড়ী থাকে নি। আমার মাত্র আটটি প্রহরের অনুপস্থিতির সুযোগে আমার বাড়ীর অন্তর অন্তর্হিত হয়েছে। আছে শুধু ইটের 'পরে ইট।

মাঝের মানুষ-কীটগুলির যেন আরো বেশি বদল হয়েছে। ইস্কুলে যাদের সঙ্গে পড়েছি, আজ তাদের সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেলে চিনতে পরি, হয়তো ঈষৎ আনন্দিতও হই, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিব্রত হয়ে ভাবি, চিনতে না পারলেই বুঝি ছিল ভালো। তাহলে আজকের লোকটির সঙ্গে পুরানো বন্ধুকে মিলিয়ে দেখতে হত না। আগেকার সৌহার্দের স্মৃতিসম্বল কঙ্কালটা আমাদের মধ্যে অনচ্ছ হয়ে দাঁড়াত না। অতীতস্মৃতি বর্তমানকে বিড়ম্বিত করত না কালের ব্যবধান সব মানুষগুলি আর জিনিসগুলি একেবারে বদলে গেছে, অপরিবর্তিত আছে শুধু তাদের নামগুলি। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়, যেমন কলিং বেল্ টিপলে উত্তর মেলে। কিন্তু এ-সাড়ায় স্পন্দন নেই, ঝঙ্কার নেই, যেমন আছে বীণার তারে।

তবু ডাকতে হয়। ধীরেনকে ধীরেন বলে, বিমলকে বিমল বলে। দেখা হলে হাত বাড়িয়ে দিই, কিন্তু সে-করমর্দনে কী যেন নেই। আজও কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি, কিন্তু কোথায় বেঞ্চির সেই উষ্ণ আলিঙ্গন? পুরানো বন্ধুতে, পুরানো বেঞ্চিতে সেই পুরানো প্রাণটা খুঁজে মরি, হাত এসে ঠেকে শীতল একটা অচেনা শবে।

অসংলগ্ন

ধীরাজ ভট্টাচার্য

পাতকুয়োর ডিউটি। রোজ সকালে আলো-অন্ধকারের মধ্যেই মাথিন আসে; যতক্ষণ থাকা সম্ভব পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বেলা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়ে। অনিচ্ছায় জল নিয়ে মাথিন চ'লে যায়। আমিও ঘরে গিয়ে বিছানার উপর শুয়ে প'ড়ে চোখ বুজে মাথিনকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখি। বিকেলে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সবাই চ'লে গেলে সে আসে। রাতের আঁধার যখন গাঢ় হয়, কাছের মানুষও দেখা যায় না, তখন আস্তে আস্তে সে চলে যায়। মাঝে মাঝে হরকি এসে ঠাট্টা করে, দু-একটা কথা বলে, ভালো লাগে না। নীরব চোখের ভাষায় যেখানে কাজ চলে, সরব মুখের ভাষা সেখানে অবান্তর ও অবাঞ্ছিত মনে হয়। টেকনাফে সবাই জেনে গিয়েছে আমাদের এই বিচিত্র প্রেমের কথা। আড়ালে আবডালে কানাঘুষাও চলে, গ্রাহ্য করি না। সবার জীবনে এ-রকম বেপরোয়া উদ্দামতা আসে কি না বলতে পারব না, কিন্তু আমার জীবনে এসেছিল। মাথিনের ব্যাপারে এ-সব নিন্দা-অপবাদ ভয়ের বহু উর্দ্ধে চ'লে গিয়েছিলাম আমি।

চৈত্র সংক্রান্তির আর মাত্র তিন দিন বাকি। সকালে নিয়মমতো মাথিন চ'লে গেল, বিকেলে এল না। পাগলের মতো ঘর আর বার ক'রে ক'রে পা দুটো ধ'রে এল, তবুও মাথিনের দেখা নাই। ভাবলাম, অসুখ-বিসুখ কিছু হল নাকি? সটান বেরিয়ে প'ড়ে বাজারের পথ ধরলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, নিবারণবাবুর দোকানের সামনে মাথিনদের দোতলার ঐ আধ-হাত চওড়া ফোকরের দিকে চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দেব। ভুলেও কি সে একবার উকি দেবে না?

অত দূরে যেতে হল না। মাঝপথে হরকির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, বাজারের দিক থেকেই সে আসছিল। অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন স্থনে গিয়ে বললে, "বসুন, বাবু।" কোনো দিকেই না তাকিয়ে পথের পাশে ধুলোর উপরেই ব'সে পড়লাম, সামনে উবু হয়ে বসল হরকি।

সোজা জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ সন্ধ্যেবেলা মাথিন এল না কেন?"

—"আসবে কি ক'রে? ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলে কেউ আসতে পারে?..."

যখন পুলিশ ছিলাম (১৯৫৫)

শশিশেখর বসু

কিসের একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। পশ্চিমে হাওয়া। বাঘ-বাঘ চিংড়ি-চিংড়ি সৌরভ। দত্ত বলল, "জান না, বড়মামা, খাঁ-সাহেবের মেয়ের বিয়েতে আঠারটা নেপালী খাসি এসেছে; তার সিক কাবাব, কোর্মা, কোফতা, গ্রিল, পোলাও হবে!"

নেপালী খাসি দেখতে রেল-লাইনের ধারে খাঁ-সাহেবের বাগানে গেলাম। যেন আঠারটা ঘোড়া বাঁধা আছে বোধ হয়। আমাদের দেখে সামনেকার খাসিটা শিং ঘুরিয়ে রোখ ক'রে পিছুদিকের দু ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে উচ্চনাদে উর্ধ্বনেত্রে 'ব ব' ডাকল, তার পিছনে দম্ভকারী আরও গোটাকতক 'ব ব' শব্দে যুদ্ধ করতে দড়ি সমেত লাফাল। বাংলা বিহার ইউ-পি খাসির মতন নেপালী খাসি 'ব্যা ব্যা' করে না। মাত্র একবার দুবার 'ব' বলে, তাতে আকার ওকার অ্যাকার নেই। নেপালী খাসি মুখ উঁচু ক'রেই থাকে, যেন জিরাফ, মস্ত দাড়ি ঝোলে বুক পর্যন্ত। খাসির দাঁড়ি-গোঁফ হয় না, এ-ধারণা ভুল। আমি আর দত্ত নেহাৎ ছেলেমানুষ। দত্ত পাকা বৈষ্ণবের ছেলে, আমি মৈথিল, বাঙ্গালী ও উড়িয়া ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না ছাড়া খাই নি; কিন্তু জাত সম্বন্ধে আমার যা শিক্ষা হয়েছিল, দুর্দম বেগবতী সিককাবাবের আকাঙ্ক্ষা তার পক্ষচ্ছেদ করল।

খাঁ-সাহেব ধনী লোক, টুকরা টুকরা বাংলা বাগান ঘেরা তাঁর বাসস্থান; আমাদের সঙ্গে খুব ভাব এবং যাতায়াত ছিল... তিনি আমার বাবাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন, আর সব অন্যান্য গণ্য-মান্য বাঙ্গালীকেও সাদর আহ্বান করলেন। দত্ত বলল, "মামা গো! এ-খাসি যদি না খেতে পাই, তবে এ-প্রাণ রাখব না!" বললাম, "আমারও রুই-কাৎলায় বিতৃষ্ণা!"

এটা জানা কথা যে, বাঙালীরা কেউ খাবে না, সভায় নাচ দেখে আতর গোলাপ মেখে চ'লে আসবে। আমি আমার বাবার, দত্ত তার বাপের প্রতিনিধি হয়ে বিয়ে-বাড়ী যাব। বাবা সাবধান করলেন, "দ্যাখ্! যেন শরবৎ খাস নি, কেবল একটু আতর ছুঁয়ে দুটো ছোট এলাচ হাতে নিবি, বুঝেছিস!"

দশরথের সময় থেকেই সকল বাপ মনে করেন, ছেলে আমার আজ্ঞা পালন করবে, আমার সত্য বজায় রাখবে। তাঁরা ভাবেন না যে, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির এবং বিশিষ্ট ভরদ্বাজ ইত্যাদি ঋষিরা যণ্ডমাংস শূলপক্ক ক'রে খেতেন। জানবেন কোথা থেকে? এ-সংবাদ নূতন রামায়ণ-মহাভারতে হালে বাংলা ভাষায় বেরিয়েছে। 'এডুকেশন ইজ স্লো ইন বেঙ্গল' লর্ড রিপন বলেছিলেন।

যা দেখেছি, যা শুনেছি, নেপালী খাসি

জীবনানন্দ দাশ

আমি বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি, তার ভিতরে বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মণীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি, তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না: আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়— তাহলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য— অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ: সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা। সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়— কিংবা প্রভুত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়— যে মনে হয়, এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে; এই সবের অপরূপ উদ্‌গীরণের ভিতর এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়; নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে, তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মণীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে— কাব্য জন্ম লাভ করে।

কবিতার কথা (১৯৫৫)

আমরা অবশ্য দরজাতে তালা লাগাই নি। কেন যে লাগাই নি, তার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের মনে ছিল না। আমার ভাগ্নী আর আমি দুজনে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম যে, আমাদের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তনই আমরা করব না, বিন্দুমাত্র না; আমরা এমন একটা ভাব দেখালাম যেন সেই জার্মান অফিসারটির কোন অস্তিত্বই আমাদের কাছে নেই; বড় জোর মনে ক'রে নিয়েছিলাম যে, কোন অশরীরী প্রেতমূর্তি হয়ত আমাদের সঙ্গে বাস করছে, এই পর্যন্ত। হয়ত এই ব্যবস্থার পেছনে এই মনোভাবও সঙ্গোপনে ছিল, নিজে যে-বেদনা সহ্য করতে পারি না, সে-বেদনা কাউকে দিতেও চাই না, হোক সে শত্রু।

বহুদিন ধ'রে প্রায় এক মাসেরও ওপর এই একই ব্যাপার প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘটতে লাগল: অফিসারটি এসে প্রথমে করাঘাত করে, তারপর ঘরে ঢুকে ঘরের ভেতর দিকে চলে যায়। আবহাওয়া সম্বন্ধে কিংবা সেদিনকার টেম্পারেচার অথবা ঐ-জাতীয় কোন অপ্রাসঙ্গিক তুচ্ছ ব্যাপার সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে। এই সব উক্তির মধ্যে একটা ব্যাপার কিন্তু প্রত্যেকদিনই সমান ভাবে থাকত: কোন উত্তরের প্রয়োজন বক্তা দাবী করত না। প্রতিদিনই ছোট্ট দরজাটার সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিত। একটা ক্ষীণ হাসির ম্লান আভায় বোঝা যেত যেন এইভাবে নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে তার ভাল লাগছে— প্রতিদিন সেই একইভাবে চেয়ে দেখা, একই ক্ষীণ হাসির রেখা। ঘর থেকে চ'লে যাবার আগে আমার ভাগ্নীর নত মুখের স্থির গম্ভীর নির্বাক রেখার দিকে একবার চোখ তুলে চাইত এবং যেভাবে তার মুখের ওপর থেকে অবশেষে যে চোখ ঘুরিয়ে নিত, তা থেকে বুঝতে পারতাম, ফরাসী তরুণীর সেই মুখের নীরব রেখার মধ্যে কোথায় যেন তার অন্তরের একটা সম্মতি ছিল। তারপর একটু মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে যেত: "প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক!"

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই একই ব্যাপার ঘটত একইভাবে।

কথা কও, প্রথম পরিচ্ছেদ

বাড়ির পরিচারিকা এবং অন্য তিন-চারিজন তৎক্ষণাৎ ছাদে গিয়া ছাদের উপর হইতে ডাকাতদের লক্ষ্য করিয়া ইট-পাটকেল ও হাতের কাছে যে যাহা পাইলেন, তাহাই ছুঁড়িতে লাগিলেন। ডাকাতদের মশালের আলোতে চারিদিক আলোকিত, কাজেই মহিলাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না: কাহারও গায়ে, কাহারও মাথায়, কাহারও পিঠে বৃষ্টির ধারার মত ইট-পাটকেল পড়িতে লাগিল। তখন দস্যুদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল: কে কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। কেহ মশাল নিবাইল, কেহ পলাইতে লাগিল। তাহারা হঠাৎ কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিল না, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। হতভম্ব হইয়া ভাবিতে লাগিল, খালি বাড়িতে কোথা হইতে এমন আক্রমণ আরম্ভ হইল।

এদিকে অন্নদাদেবী কি করিলেন, সে-কথাই বলিতেছি। অন্নদাদেবী তাঁহার কেশ এলাইয়া দিলেন, মেঘের মত তাঁহার দীর্ঘ কেশ পিঠে এলাইয়া পড়িল। তিনি কপালে পরিলেন বড় করিয়া সিন্দুরের টিপ, সারা মুখে ও সর্বাঙ্গে মাখিলেন কালি, কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত টানিয়া পরিলেন, এবং খড়্গ হাতে লইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া কালীমূর্তির মত নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিশ্চল ও নিঃস্পন্দভাবে, অনড় অটলভাবে।

ডাকাতেরা ঘরের পর ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে অন্নদাদেবী যে-ঘরের মধ্যে এইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দেখিল, ভীমা ভয়ঙ্করী কালীমা দাঁড়াইয়া আছেন। গদাধর সর্দার শ্যামা-মার এইরূপ প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল; সে হাতের তরোয়াল একপাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পাগলের মত বলিতে লাগিল: "জয় জয় জয়, শ্যামা-মায়ের জয়!"

গদাধরের সর্বশরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কণ্ঠ তাহার জড়াইয়া আসিতেছে, সে দেখিতে পাইল যেন কালীমায়ের কাছে ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনীরা সব বিকট মুখব্যাদান করিয়া হা-হা-হা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভয়ে হায় হায় করিতে কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহার সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিল, "ভাই সব, আর রক্ষা নেই! মা আমাদের উপর রাগ করেছেন; না, না, সব লুটের জিনিস ফেলে রাখ! যেখানে কালীমা দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে কি ডাকাতি চলে? তোমরা সব মাকে প্রণাম কর। ডাকিনী যোগিনীরাই ইট-পাটকেল ছুঁড়েছে! ওরে কালী কালী কালী!"

বাংলার ডাকাত (১৯৫৫), বীরাঙ্গনা অন্নদাদেবী ও ডাকাত-দল, দুই

নন্দলাল বসু

প্রাণস্পন্দনের বিচারে চিত্রের রেখাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: নির্জীব, নিপুণ, প্রাণস্পন্দিত বা জীবন্ত। জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর হকুসাই বলেছিলেন, শোনা যায়: "আমরা এই আশি বৎসর বয়সে ছবি আঁকার রীতি-পদ্ধতির মর্মে খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছি, মন হচ্ছে; আরও দীর্ঘ আয়ু যদি পাই, তাহলে ছবির মত ছবি আঁকতে পারব, আশা হয়: তখন চিত্রপটে যে-ফোঁটাটি ফেলব, যে-রেখাটি টানব, সবই কথা কইবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে।" বস্তুতঃ চিত্রকর এমন রেখা টানতে পারেন যাতে বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর সংশয়, ভয়, অনভিজ্ঞতা আর অস্থিরতা ফুটে উঠেছে; রেখার দৃঢ়তা, সাবলীল ছন্দ, অব্যাহত গতি ও যথোপযুক্ততা পদে পদে নষ্ট হয়েছে। আর, এমন রেখাও টানতে পারেন যাতে কোনো রকম অজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা বা প্রত্যয়ের অভাব দেখা যায় না; যা পরিণত মন, অভিজ্ঞ দৃষ্টি ও সুদক্ষ হাতের শীলমোহর-মারা। কিন্তু আঙ্গিকও চরমোৎকর্ষে পৌঁছতে পারে না। যিনি একাগ্র ও নিরলস ভাবে আঙ্গিকের সাধনাও করছেন আর শিল্পী হিসাবে যথার্থ রসপ্রেরণারও অধিকারী হয়েছেন, তাঁর তুলির টান কেবল নিপুণ নয়, জীবন্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ফলতঃ এরূপ রেখা তুলিকে অনুসরণ করছে বলা চলে না; বরং আন্তরিক উপলব্ধির দিকে তাকিয়ে বলতে হয়: রেখাকে তুলি অনুসরণ করছে! বিষয়ে ও বিষয়ীর একাত্মতা থেকে, একান্ত তন্ময়তা থেকে, এপ্রকার প্রাণস্পন্দিক জীবন্ত রেখা সম্ভব হয়। আঁকার আগেই এরূপ রেখা শিল্পীর হৃদয়ে জন্ম নেয়। যেটা আগে থাকতে আছে, তাকেই গোচর করা।

নিপুণ রেখা আর জীবন্ত রেখা— দুয়ের প্রভেদ বলে বোঝানো যায় না, বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় না।

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে 'ধ্বনির' প্রসঙ্গ আছে। ধ্বনি বলতে ব্যঞ্জনা। সাধাসিধা ভাষায় প্রাণস্পন্দন বললেও আমাদের কাজ চলবে। কারণ প্রাণ থাকলেই ব্যঞ্জনা আছে; প্রাণ নেই তো ব্যঞ্জনা নেই। এখন, আলঙ্কারিকেরা বলেন: ধ্বনি অনেক রকমের হয়। অলঙ্কারধ্বনি, অর্থধ্বনি, রসধ্বনিতেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ। ছবিতেও তেমনি রেখা, রঙ, রূপ প্রত্যেকটির ধ্বনি থাকতে পারে। আর, সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড ধ্বনি বা প্রাণস্পন্দন থাকতে পারে, রসের রূপ হতে পারে, তা রসিকের দৃষ্টিতে ও প্রতীতিতেই ধরা পড়বে। রেখা যেখানে জীবন্ত, সেখানে রেখা 'ধ্বনিত' হয়ে উঠেছে।

শিল্পচর্চা (১৯৫৫), রেখা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দেবদত্ত হেরে গেলেন, সিদ্ধার্থের অপর ভাই নন্দও হেরে গেলেন; যশোধরা সিদ্ধার্থকেই বর বলে বরণ করলেন। শুদ্ধোদন ছেলের বীরত্ব দেখে খুশী: রাজা হতে পারবেন তাঁর ছেলে, কেউ আপত্তি তুলবেন না।

বিয়ের পর আমোদ-আহ্লাদের ধূম পড়ে গেল রাজা শুদ্ধোদনের সাতমহল-দালানে: নাচ, গান, ভোজ, হাসিতে প্রাসাদ গমগম করছে। আগেকার ভাবনার অভ্যাস ভুলে গেলেন সিদ্ধার্থ, প্রাসাদ থেকে বাইরেই আর যান না। তারপর একই রকম ফুরতি রোজ রোজ তেতো হয়ে উঠল তাঁর মনে; সিদ্ধার্থ চার ঘোড়ার রথে কপিলাবস্তুর পথে বেরোলেন। বেড়াবেন। সারথি ছন্ন আছে সঙ্গে।

রোগা, বুড়ো, ভিখিরী কখনও দেখেন নি সিদ্ধার্থ। শুদ্ধোদনই হয়ত তাঁকে আটক রেখেছিলেন দুঃখীজনের কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন পথে বেরিয়ে না-যায়-প্রাণ কাকুতিসার এক বুড়োকে দেখতে পেলেন রাজকুমার আর তাঁর সারথি। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলেন: "ছন্ন, এ কে? এমন ককাচ্ছে কেন?"

"বুড়ো হয়েছে, শরীরে জোর নেই—" ছন্ন বললেন। সবারই একদিন এ-দশা হবে, তাও বললেন ছন্ন।

মন-খারাপ হয়ে গেলে সিদ্ধার্থের; তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বাবাকে বললেন, "আমিও কি বুড়ো হব, বাবা?"

"তা কেন?" বলেই শুদ্ধোদন ছেলের মন ভোলাবার জন্য মস্ত আহ্লাদের আয়োজন করলেন। ভুলে রইলেন সিদ্ধার্থ আরো কয়েক দিন। কিন্তু আবার তিনি বেরোলেন পথে। রোগে পুড়ে ধুঁকছে একটি লোক , দেখতে পেলেন। ছন্ন বললেন, "সবারই অসুখ-বিসুখ হতে পারে এমন। অসুখ কাউকে ছেড়ে দেয় না।" তৃতীয়বারে বেরিয়ে একটি মড়া দেখলেন; শ্মশান-ঘাটে বেঁধেছেঁদে আত্মীয়রা মড়াটি নিয়ে যাচ্ছেন। সবার মরতে হবে, ভাবলেন তা দেখে সিদ্ধার্থ। চতুর্থবার বেরিয়ে দেখলেন মাথা-মুড়ানো এক সন্ন্যাসীকে; কমলা রঙের পোষাক তাঁর। সিদ্ধার্থ জানতে চাইলেন, "ইনি কে, ছন্ন?"

"সন্ন্যাসী। ঘরদোড় ছেড়ে এসেছেন যোগী-পুরুষ। সত্য জানতে চান।"

এতদিন যেন গৌতম সিদ্ধার্থ নিজের চেহারা দেখতে পেলেন: ওই রকম তাঁকে হতে হবে, ভাললেন তিনি।

এদিকে যশোধরার একটি ছেলে হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ (১৯৫৫)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।

মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া-যাওয়া শীর্ণা পল্লীতটিনীর চোরা কাঙ্গালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।

তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয় কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।

কত নদীর তীরে একদা নীল-ব্যাপারিদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, মগ-দের ছিপনৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে, উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে, হাতিঘোড়াব রক্তে সে-সব নদীর জল কত লাল হইয়াছে... তিতাসের বুকে তেমন কোনো ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী। তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই। সওদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুক বিচরণ করিতে আসে না। ভুগোলের পাতায় তার নাম নাই।

ঝরণা থেকে জল টানিয়া পাহাড়ি ফুলেদের চুঁইয়া চুঁইয়া উপল ভাঙিয়া নামিয়া আসার আনন্দ কোনোকালে সে পায় নাই। অসীম সাগরের বিরাট আত্মবিলয়ের আনন্দও কোনোকালে তার ঘটিবে না। দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোন্‌কালে কোন্‌ অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়া ছিল; বাঁ তীরটা একটু মচকাইয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটি খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া, দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত শত পল্লী দুইপাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল, অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে— মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস।

তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬), এক, তিতাস একটি নদীর নাম

ক্ষিতিমোহন সেন

বাউল গানের মূল বিষয়-বস্তু একটি ধর্মতত্ত্ব ও সেই ধর্ম-সাধনার ক্রিয়াকলাপ। ইহার পরিধি সঙ্কীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির উৎসারণ বা কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই। তবুও এই ধর্ম-তত্ত্বের বিবৃতি বা ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ-নির্ধারণে যেটুকু ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগের পরিপ্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে যেটুকু সাহিত্যরস সম্ভব, তাহাই ইহার সাহিত্যিক মূল্য।...

বাউল গানগুলি বর্তমান যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা নয়। যাহারা বর্তমান যুগের অনুপাতে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, তাহারা-ই এই সমস্ত গানের রচয়িতা। এই সব সরল, বিশ্বাস-প্রবণ, ধর্মপথের যাত্রী পল্লীবাসীদের রচনায় ভাবের সুবিন্যাস, ভাষার মার্জনা, বা সচেতন অলঙ্করণের চেষ্টা নাই; তাহাদের ভাবানুভূতি স্বতঃ-উৎসারিতভাবে যে-রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই তাহাদের রচনার শেষ রূপ। একটা সহজাত কবিত্বের অনুপ্রেরণায় ভাব যেরূপ ছন্দোবদ্ধ আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা বা প্রয়াস নাই। এই রচনায় উপমা বা রূপকের বিষয়গুলি তাহাদের চারিদিকের দৃষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে সংগৃহীত; নিতান্ত আটপৌরে ভাষায়— সময় সময় আঞ্চলিক ভাষায়— তাহাদের ভাবানুভূতি রূপলাভ করিয়াছে। এই গানগুলি তাহাদের ভাবানুভূতির অকপট রূপায়ণ। প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদের মতো এ-রচনা স্বাভাবিক, সহজ, সরল ও অযত্ন-বর্ধিত।

বাংলা সাহিত্যের উদ্যান-কোণে এই জাতিগৌরবহীন বনফুল বিনম্র সৌন্দর্যে ফুটিয়া তাহার স্নিগ্ধ সৌরভ বিলাইতেছে। সাহিত্য যদি সমাজজীবনের দর্পণ হয়, তবে বাঙ্গালী সমাজের এক কোণের একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, অধ্যাত্মচিন্তা, জগৎ ও জীবন-সম্বন্ধীয় মনোভাব, বিভিন্ন ভাবানুভূতি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে; বাঙালীর-সংস্কৃতি, বাঙালীর ধর্মের অন্তর্গূঢ় স্রোতোধারা, তাহার সাধনার বৈচিত্র্যময় স্বরূপের সম্যক পরিচয় এই পল্লী-সঙ্গীতগুলির সঙ্গে জড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে বাঙালীর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্জীবনের রসসিক্ত অভিব্যক্তি আছে। সে-ধর্মসম্প্রদায় আর্য ও অনার্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও সুফী ভাবধারার সমন্বয়ে গঠিত বাঙলার একান্ত নিজস্ব একটি ধর্মসম্প্রদায়। এই ধর্ম কোনো অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়, ইহা জনসাধারণের ধর্ম।

বাংলার বাউল ও বাউল গান (১৯৫৭), প্রথম অধ্যায়

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

যাহারা কোমলস্বভাব এবং মানসিক শক্তিতে একান্ত দুর্বল, তাহারা মনে করে সুন্দরই বুঝি ভগবানের একমাত্র রূপ, শিব বা মঙ্গলই বুঝি ভগবানের একমাত্র ঐশ্বর্য, সত্যই বুঝি তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। তাহারা মনে করে— কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শোভা-সম্পদই ভগবানের আশীর্বাদ। দুঃখ, শোক, তাপ, অভাব, অনটন, অতিবৃষ্টি, প্লাবন, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ভুকম্পমারীভয় প্রভৃতি তাঁহার অভিশাপ। তাই প্রকৃতির নগ্ন মূর্তি দেখিলে, উগ্রমূর্তি দেখিলে, রুদ্রমূর্তি দেখিলে, রণরঙ্গ দেখিলে, ধ্বংসলীলা দেখিলে, অথবা ব্যক্তিজীবনে দুঃখ শোক, জরা-ব্যাধি প্রভৃতি বিপদ-আপদের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইলে তাহারা একান্ত অসহায় হইয়া ভয়ে ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া যায়। তাহারা বিরাট বিশ্বব্যাপী ভগবানকে বড় সঙ্কীর্ণ, বড় ক্ষুদ্র, বড় তুচ্ছ করিয়া দেখে। তাহারা অংশকে, তুচ্ছ অংশকে, পূর্ণ বলিয়া ভ্রম করে। তাহারা ভাবিয়া দেখে না— ভগবান কেবল সম্পদের নহে, বিপদেরও; কেবল পূর্ণতার নহে, রিক্ততারও; কেবল পণ্ডিতের নহে, মুর্খেরও; কেবল ব্রাহ্মণের নহে, চণ্ডালেরও; কেবল বিভূতির নহে, অনুভূতিরও; কেবল সমৃদ্ধির নহে, অসমৃদ্ধিরও; কেবল সুখের নহে, দুঃখেরও। বরং সুখ অপেক্ষা দুঃখের মধ্যে, সম্পদ্ অপেক্ষা বিপদের মধ্যে, সুদিনের অপেক্ষা দুর্দিনের অমানিশার ঘনান্ধকারের মধ্যে, সূতিকাগারের স্নিগ্ধতা ও পূর্ণতা অপেক্ষা শ্মশান-ভূমির রুদ্রতা, রুক্ষতা ও শূন্যতার মধ্যে, শান্ত সৌম্য ও কমনীয় সৌন্দর্য অপেক্ষা উৎকট বীভৎস অসুন্দরতার মধ্যেই তাঁহার রূপ অধিক প্রকট, অধিক দীপ্ত, অধিক উজ্জ্বল। সুখের দিনে, সম্পদের দিনে আমাদিগের মধ্যে কয়জন তাঁহাকে স্মরণ করি? দুঃখের দিনে, বিপদের দিনেই তো আমরা তাঁহার সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হই! জগতে সুখই একমাত্র সত্যবস্তু নহে, দুঃখও আছে। মানুষ যাহা কিছু গড়িয়াছে বা করিয়াছে, তাহা দুঃখেরই অবদান। দুঃখেরই অপর নাম তপস্যা। সুতরাং সুখ ও সম্পদ্ অপেক্ষা দুঃখ ও বিপদের মূল্য অধিক। দুঃখ-বিপদ, ঝঞ্ঝা-প্লাবন ভগবানের অভিশাপ নহে, আশীর্বাদই!

ভয়ঙ্করীর উপাসনা (১৯৫৭)

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিধবা মায়ের একটি মেয়ে। যথাসর্বস্ব খুইয়ে মা দিয়েছিলেন মেয়েটির বিবাহ। ভালো ঘরেই বিবাহ দিয়েছিলেন। জামাইরা তিন ভাই— জামাইয়ের মা-বাপ বেঁচে। বড়র সঙ্গে হয় মেয়ের বিবাহ। মেয়ের শ্বশুরের বাসনের কারবার বড়বাজারে; শ্বশুরের বাড়ি গোয়াবাগানে। নিজের বাড়ি— ভাড়াটে বাড়িতে বাস নয়। বিবাহের পর দেড় বছর মেয়ের দুঃখ-কষ্ট ছিল না শ্বশুরের সংসারে। মেয়েটির মা থাকতেন তাঁর দেওরের কাছে। দেওরের বাড়িতে হেঁশেল ঠেলতেন, দেওরের কাচ্ছাবাচ্ছাদের দেখতেন শুনতেন, খোরাক-পোষাকটা চ'লে যেত। নিজের গহনাগাঁটি যা ছিল মেয়ের বিয়ে দেবার পর, সেগুলি বেচে জামাইকে সমানে তত্ত্ব-তাবাস চালিয়ে বেয়াই-বেয়ান এবং জামাইয়ের তুষ্টিসাধনে কৃপণতা রাখেন নি। দেড় বছর ধ'রে সমানে সে-সব জুগিয়ে বিধবা নিঃস্ব হলেন। দেওরের কি দায়, দেওর করবে ভাইঝি-জামাইয়ের তত্ত্ব-তাবাস? তবে দেওরের একটু লক্ষ্ণলজ্জা ছিল: জামাইষষ্ঠীতে ভাইঝি-জামাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে সাধ্যমত খাওয়াতেন। সেবার পূজায় তত্ত্ব গেল না ব'লে বেয়ানের মেজাজ হল আগুন এবং বিজয়া-দশমীর পর মাকে, খুড়োখুড়ীকে প্রণাম করতে মেয়ে এল মায়ের কাছে— ব্যাস! তারপর সে-মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে আর উচ্চবাচ্য নেই! মায়ের কথায় মেয়ে চিঠি লিখল তার স্বামীকে। স্বামী দিলে জবাব: তার মা— অর্থাৎ মেয়েটির শাশুড়ী— বলেছেন, যেদিন জামাই আর তার বেয়াই-বেয়ানের মান-মর্যাদা রাখতে পারবে তার স্ত্রীর মা, সেদিন ও-বাড়িতে স্ত্রীর যাবার কথা উঠবে। তার আগে নয়।

এ-ঘটনার পর সাত-আট মাস কাটল। মেয়ে আছে তার মায়ের কাছে; জামাই আসে না, খোঁজ-খবরও নেয় না। এদিকে মা যে-দেওরকে আশ্রয় ক'রে ছিলেন, সে-দেওরও মারা গেল। এ-সংসারের অবস্থা হল খারাপ— কি ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন চলে? মায়ের একার নয়, মায়ের সঙ্গে তার মেয়ের! তখন পাঁচজনে মাকে নিয়ে আমার কাছে এলেন: মেয়ের খোরপোষের জন্য জামাইয়ের নামে নালিশ করতে হবে। ক্রিমিনাল-কোডে স্ত্রী খোরাকির দাবিতে স্বামীর নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করার ব্যবস্থা আছে। কেতাব হাতড়ে আমি দেখি, তাতে বলছে, স্বামীর cruelty-র জন্য স্ত্রীর পক্ষে যদি স্বামীর গৃহে স্বামীর সঙ্গে বাস করা কঠিন হয়, তাহলে স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে বাস ক'রে স্বামীর নামে নালিশ ক'রে খোরাকি আদায় করতে পারেন। মেয়ের মাকে বললুম, "স্বামী মারধর করত? গায়ে জখমের দাগ আছে?"

উকিলের ডায়েরি (১৯৫৭), কোর্ট ইজ স্টেজ

চট্ ক'রে বললে বিশ্বাস করা হয়ত শক্ত হয় যে, পৃথিবীতে আজকে আমাদের বাস, সে হল বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। শুধু ভারতবর্ষই ভাগ হয় নি, সারা দুনিয়াটারই সুস্পষ্ট বিভাগ হয়ে গেছে। একটি দুনিয়া দুঃস্বপনের, দুর্দিনের, বাস্তবের, আরেকটি দুনিয়া স্বপ্নের, রঙীন অবাস্তবের, আরব্যোপন্যাসের পাতা থেকে তুলে নেওয়া। একটি পৃথিবীতে কয়েকজনের বিলাসে বসবাস, আরেক পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের অর্ধাহার-উপবাস। প্রথম কার সৃষ্টি, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। দ্বিতীয় নিঃসংশয়ে বিজ্ঞাপনের সৃষ্টি! এই দ্বিতীয় পৃথিবীই আসলে অদ্বিতীয়: এ হল Film World!...

রাস্তা দিয়ে ছেঁড়া ফুটো-ফাটা জামা-কাপড় প'রে কাউকে আজ চ'লে যেতে দেখলে যদি আপনি মনে করেন যে, লোকটা গরীব, ভিখারী অথবা পাগল, তাহলে বুঝতে হবে আপনি গতজন্মে ব্যাসকাশীতে মারা গেছেন; বুঝতে হবে আপনি বিদ্যাসাগরের আমলের লোক, পাহাড়ী স্যানালের যুগের নয়; জানা যাবে যে, আপনি হচ্ছেন একটি "প্রথম জলের বোকা", কারণ ওই ফুটো-ফাটা. ছেঁড়া-খোঁড়া জামা দারিদ্র্যের চিহ্ন নয়, fashion-এর ঝাণ্ডা!...

আপনার বাড়ির মেয়েদের অঙ্গেও আপনি জানেন না মানে-না মানা শাড়ি, নার্গিস-হাতা ব্লাউস, অঙ্গাভরণে সন্ধ্যারাণী কানপাশা, অঙ্গমার্জনায় চিত্রতারকাদের প্রিয় সাবান, কেশতৈলেও কামিনীকৌশলের সার্টিফিকেট। গাড়ি, বাড়ি, গয়না, হোটেল, রেস্তোরাঁ এ-সবেরই নির্বাচনে চিত্ররাজ্যের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; অঙ্গের কতটুকু আবৃত থাকবে এবং কতখানি অনাবৃত, তাও ফিল্ম-স্টারের শরীর-নির্ভর। ব্লেডের বিজ্ঞাপনে বার্নার্ড শ অথবা বিশ্বকবির কল্পিত সার্টিফিকেট ছিল একদিন পরিহাসের বিষয়; কিন্তু এখন আর সেটা পরিহাস নয়, সত্যি সত্যি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের তলায় ফিল্মস্টারের লিপস্টিক্‌ড্ লিপের সুখটান দিতে পারার আনন্দে অস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখাটা আশ্চর্য নয়!

ভয় এতে শুধু সমাজের নয়; ভয় এতে দর্জির; ভয় এতে কাপড়ের মিলওলার; ভয় এতে জামা-কাপড়ের দোকানেরও। কিসের ভয়? কিসের আবার? কোনও এক শুভ মুহূর্তে যদি ফিল্ম-স্টারেরা স্থির করে যে, তারা আর জামা-কাপড় পরবে না, তা হলেই তো পরমুহূর্তেই বিশ্বসমাজের নিউডিস্ট কলোনীতে রূপান্তরিত হতে আর বাধা কোথায়?

অদ্য ও প্রত্যহ (১৯৫৮), নয়

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

সন্ধ্যাবেলা, মাস্টারমশাইর আসবার সময় হয়েছে, আমরা সবাই পড়ার টেবিল ঘিরে ব'সে অপেক্ষা করছি। সুরমামাসী আর দিদি একমনে বই পড়ছে। টুনী ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ ভার ক'রে ব'সে আছ— দাদা কি যেন ব'লে তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। মনির দুষ্টুমি-ভরা চোখ দুটো চকচক করছে; দেখেই বোঝা যায় টুনীর রাগটা সে বেশ উপভোগ করছে। দাদা নিরীহ ভালমানুষটির মত বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে, টুনীর কি হয়েছে সে যেন কিছুই জানে না। হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে দাদা বলল, "দেখ্ তো বুলু, মাস্টারমশাই আসছেন নাকি?" তিন বছরের বুলু সিঁড়ির মাথা থেকে ঝুঁকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "না, মাস্তালমসাই না, শাস্তিমশাই!" সিঁড়ি দিয়ে যিনি উঠছিলেন, তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, "শাস্তিমশাই! সে কি রে? আমি কি তোদের শাস্তি দিই?"

শাস্তি দূরের কথা, এই মানুষটি বাড়িতে এলে আমাদের মনটা খুশী হয়ে উঠত। "শাস্ত্রীমশাই এসেছেন" শুনলেই আমরা যে যেখানে থাকতাম, কাছে গিয়ে জুটতাম। তিনি যে অমন সাধু ভক্ত ও জ্ঞানী লোক, আমাদের ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ছোটবেলায় অত শত বুঝতাম না। চেহারাটাও তাঁর সুন্দর ছিল না, কিন্তু সেই চেহারার মধ্যে, চোখ পিটপিট ক'রে সেই হাসির মধ্যে কি-একটা আকর্ষণ ছিল, যার জন্য ছোট্টবেলা থেকেই আমরা তাঁর খুব ভক্ত ছিলাম। এমন কি দিদি, যে এমন শান্ত, সেও নাকি ছোট্টবেলায় শাস্ত্রীমশাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে তেড়ে ঝগড়া করত "আমার শাস্ত্রী!..."

আমাদের স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাস্ত্রীমশাই। স্কুলের প্রতিষ্ঠার দিনটি ছিল তাঁর জন্মদিন। সেদিন সকলে মিলে যেখানে বেড়াতে যাওয়া হত, শাস্ত্রীমশাইও আমাদের সঙ্গে যেতেন, আমাদের নিয়ে উপাসনা করতেন, আমাদের আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতেন, কত গল্প বলতেন! হাসি-তামাশা তিনি খুব ভালবাসতেন। স্কুলের জন্মদিনের পিকনিকে একবার মস্ত বড় ড্রাম-ভর্তি রসগোল্লার দিকে তাকিয়ে শাস্ত্রীমশাই বললেন, "এই সব রসগোল্লা কে একলা খেতে পারে?" দাদা অমনি চেঁচিয়ে বলল, "আমি পারি!" তারপর আস্তে বলল, "অনেক দিন ধ'রে।" শাস্ত্রীমশাই খালি হো-হো ক'রে হাসেন আর বলেন, "আরে! এ যে 'ইতি গজ' হল!" তারপর আমাদের মহাভারতের সেই "অশ্বত্থামা হত— ইতি গজ" গল্পটা বললেন।

ছেলেবেলার দিনগুলি (১৯৫৮), ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়ো জ্যাঠামহাশয় একটি ট্রাই-সাইকেল কিনেছিলেন— মস্তবড়ো তার তিনটে চাকা। সকালবেলায় সেই ট্রাই-সাইকেলে চেপে তিনি পার্ক স্ট্রীট দিয়ে ময়দানে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে যাবার অদ্ভুত পোশাক ছিল: পায়জামার উপর ডবল কোট। কোটের বোতাম লাগানো হাঙ্গামা বলে প্রথম কোটটি উলটো করে পরতেন, তাতে বুক ঢাকা হয়ে যেত; তারপর অন্য কোটটি যেমন করে পরে, সোজাভাবেই পরতেন। এই বিচিত্র সাজে গম্ভীর ভাবে বালিগঞ্জ পাড়ায় বেরিয়ে আসতে তাঁর কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ ছিল না।

জ্যাঠামহাশয়ের কাছে সেই সময়কার গণ্যমান্য অনেক লোকই দেখা করতে আসতেন। তাঁদের গুরুগম্ভীর আলোচনার বৈঠকঘর থেকে আমরা বহুদূরে থাকতুম, তবু থেকে থেকে কানে আসত তাঁর অট্টহাসির শব্দ! বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কখন কোনো সময় তাঁদের খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে বসতেন। পরমুহূর্তেই সে-কথা যেতেন ভুলে। এই নিয়ে তাঁর বড়ো বউমা হেমলতাদেবীকে প্রায়ই অপ্রস্তুতে পড়তে হত। কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক দুপুরবেলায় এসে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের কূটতর্কে মেতে রয়েছেন, কেউই ওঠবার নাম করেন না, হেমলতাদেবী খাবার সময় হয়েছে খবর দেবার জন্য কেবলই ঘোরাঘুরি করছেন, এমন সময় একটি চিৎকার কানে এল, চাকরকে ধমক দিচ্ছেন: "খাবার কোথায়, এঁদের খেতে দিবি নে?" এইরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। অনেক সময় কোনো ভুল হয়ে গেছে অনুমান ক'রে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা নিজেরাই চ'লে যেতেন।

জ্যাঠামহাশয়ের কাণ্ডজ্ঞানের সত্যই অভাব ছিল। 'সার সত্যের আলোচনা' নামে একটি দার্শনিক রচনা লেখা শেষ হয়ে গেছে। কোনো বিদ্বজ্জন-সভায় সেটা পড়া হবে। কিন্তু তার আগে কাউকে প'ড়ে শোনানো দরকার। লেখা যখন শেষ হল, বাড়িতে কাউকে খুঁজে পান না। কিন্তু অপেক্ষা করা তো যায় না। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল এক বুড়ি দাসী, আর কেউ তখন ছিল না। দেখা গেল ঐ দাসী দ্বিজেন্দ্রনাথের সামনে ঘোমটা টেনে মেঝেতে ব'সে আর উনি 'সার সত্যের আলোচনা' আগাগোড়া প'ড়ে শোনাচ্ছেন।

পিতৃস্মৃতি, ছেলেবেলা (১৯৫৯)

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

নজরুলের সঙ্গে তো বটেই, ধীরে ধীরে আমার সঙ্গেও মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। তিনি শুধু বড় কবি ছিলেন না, পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন...। আলাপ-পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমি বুঝতে পেরেছিলেম যে মোহিতলাল ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী। মহাভারতের আখ্যানের ওপরে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তিনি তার সমালোচনা করতেন, বলতেন, কবিতায় যেখানে হিন্দুভাব ফুটে ওঠা উচিত ছিল, তার জায়গায় ব্রাহ্মভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভক্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তুলনা করতে গিয়ে বললেন, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি কণামাত্র পেয়েছেন। তবে সাধারণভাবে ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব তিনি অত্যন্ত খোলখুলিভাবে ব্যক্ত করতেন। আর শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়দের সম্বন্ধে যে-ভাষা তিনি প্রয়োগ করতেন, তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। বাংলার রাজনীতিক জীবনে ব্রাহ্মদের অবদান অনেক, সেজন্যে মোহিতলালের ব্রাহ্ম-বিদ্বেষে আমি মনে মনে আহত হতাম।

আমি বলছিলাম মোহিতলাল আর নজরুল ইসলামের মধ্যে কোনও মিল ছিল না। মোহিতলাল ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক লোক। তাঁর পরিচয়ের পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অল্পসংখ্যক সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক লোকদের সঙ্গেই তিনি শুধু মেলামেশা করতেন। তার বাইরে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁর স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন হাইস্কুলের হেডমাস্টার। এক সময়ে তিনি বন্দোবস্ত-বিভাগের কানুনগো ছিলেন; সেই সময়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁর কিছু সংযোগ ঘটে থাকবে, তারপরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সংযোগ ছিল না। তার মধ্যে পসন্দ-অপসন্দর মনোভাব এত প্রবল ছিল যে, সাহিত্যিকদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। দু-পাঁচজনের মধ্যে বসে রাজনীতিক কথাবার্তা যে তিনি একেবারেই বলতেন না, তা নয়... তাঁর একটি রাজনীতিক মত নিশ্চয় ছিল। তাঁর লেখার ভিতরে তা খুঁজতে হবে। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। যাঁদের তিনি পসন্দ করতেন না, তাঁদের তিনি অজস্র গালাগালি দিতেন। 'বিটকেল' আর 'মর্কট' এই দুটি গাল তো তাঁর মুখে লেগেই থাকত। মোহিতলাল সুখী মানুষ ছিলেন না। যাঁর পরিচয়ের পরিধি এত সঙ্কীর্ণ, তাঁর পক্ষে সুখী হওয়া মুশকিল।

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (স্মৃতিকথা) ১৯৫৯

দারখিনের হাত থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বালিয়াড়িটার দিকে দৌড়লাম। দারখিন কিন্তু জোয়ান ছেলের মতো ছুটে আমায় ধ'রে ফেলল। পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বজ্রমুষ্ঠিতে সে আমার পা চেপে ধরল। আমরা দুজনে বালির উপর গড়িয়ে চলেছি। দারখিনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়েছে। একটানে রিভলভারটা বের ক'রে নিয়ে ওর দিকে বাগিয়ে ধরলাম, সেফটি ক্যাচটা খুট ক'রে উঠল, দারখিন এবার আমায় ছেড়ে দিল। হাঁটু গেড়ে আমার দিকে দুহাত মেলে দিয়ে ভাঙা গলায় ব'লে উঠল, "মৃত্যু, মৃত্যু!"

রিভলভার হাতে দৌড়ে উঠলাম বালিয়াড়িটার মাথায়। আজব জন্তুগুলো তখন অদৃশ্য। তাদের চলার পথে বালিতে যে-খাল হয়ে গেছে, তার মধ্যে প'ড়ে আছে আমার সঙ্গীদের নিশ্চল দেহগুলি। দারখিন আমার পিছন পিছন দৌড়াচ্ছিল। জন্তুগুলো পালিয়ে গেছে দেখে সেও নিশ্চল দেহ-দুটোর কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গীদের দেহের উপর ঝুঁকে প'ড়ে দেখলাম, প্রাণের কোন চিহ্নই নেই। মনটা অসহ্য বেদনায় ভ'রে উঠল। পাশে হেলান মাথাটা ঝুলছে, মুখ প্রশান্ত, চোখ আধ-খোলা মিশা শুয়ে আছে। আকস্মিক একটা তীব্র ব্যথায় গ্রিশার মুখখানা বিকৃত। দুজনের মুখই নীল। মনে হয়, কে যেন তাদের গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

মালিশ আর কৃত্রিম নিঃশ্বাসে চেষ্টা ব্যর্থ হল। এমনকি দারখিন রক্তপাত করানরও চেষ্টা করল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। ম'রে একেবারে হিম হয়ে গেছে ওরা। আমরা তো তা দেখে একেবারে হতবাক। দীর্ঘদিন ধ'রে একসঙ্গে জীবন যাপন ক'রে আমাদের বন্ধুত্ব অতি নিবিড় হয়ে উঠেছিল। ওদের নিজের ভাই ব'লে ভাবতাম। নিজের দোষের কথা ভেবে দুঃখ আরও বেড়ে উঠল। পাগলের মতো ওরা ধাওয়া করল, কিন্তু ওদের নিরস্ত্র করতে তো আমি কোন চেষ্টাই করি নি। আর ভাবতে পারছি না; সব-কিছুর খেই সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যর্থ আশায় চারিদিকে দেখছি: যদি জন্তুগুলোর দেখা পাই, তাহলে গুলি ক'রে একেবারে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলব। বুড়ো দারখিন হাঁটুতে ভর দিয়ে বালির উপর ব'সে পড়ল। সে নিঃশব্দে কাঁদছে। হঠাৎ খেয়াল হল, আমার জীবনের জন্য এই বুড়োর কাছেই আমি ঋণী।

মৃতদেহ-দুটো লরির পিছনে তুলে নিলাম।

ইভান ইয়েফ্রেমভ, গল্পসঙ্কলন (১৯৫৯), ওলগই-খরগই

যোগেশচন্দ্র বাগল

রামানন্দবাবু অনেক সময় বলিতেন, লোকরঞ্জনের জন্য আমাকে গল্প-উপন্যাসও বেশি করিয়া ছাপিতে হয়, কিন্তু সেজন্য রুচি-শালীনতাকে বিসর্জন দিব কেন? রুচি-শালীনতা বজায় রাখিয়া গল্প-গুণসমন্বিত যে-কোন রচনা প্রবাসীতে স্থান পাইত। বস্তু থাকিলে নামী কি অনামী সকল লেখকের রচনাই কদর করিতেন তিনি: প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে প্রবাসীতে অবশ্যই স্থান পাইত। আমরা যখন প্রবাসীতে যোগ দিই, তখন রচনা নির্বাচনের ভার অন্যের হাতে ছিল, তবে রামানন্দবাবুও যে লেখা না দেখিতেন এমন নয়। অধুনা বাংলা কথাসাহিত্যে যে-সব সাহিত্যিক প্রথিত-যশা হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই প্রথম দিক্‌কার লেখা প্রবাসীতে বাহির হয়। অ-নামী বলিয়াই কোন লেখকের রচনা কখনও ফেরৎ যাইত না। তবে কতগুলি মৌলিক বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট মতামত ছিল। এই সব প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি রচনা প্রকাশ অপ্রকাশ সম্বন্ধে সর্বদা কতগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতেন। তাঁহাকে ইহার ব্যতিক্রম করিতে কদাচিৎ দেখা যাইত।

প্রবাসী মর্ডান রিভিয়ুর প্রবন্ধসম্পদ সর্বজনস্বীকৃত। গুরুগম্ভীর অথচ তথ্যপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ রচনা প্রকাশে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। আজকাল দেখি, সংবাদপত্রের সম্পাদক বা পরিচালক হালকা ছাঁদের রচনার খুবই পক্ষপাতী। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবনী, শিল্পকলা, লোক-সাহিত্য, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি সকলই রমণীয় করিয়া লিখিতে হইবে, যেন গল্প পড়িতেছি। আজকাল আবার 'রম্যরচনার' বড় ছড়াছড়ি। কঠিন বিষয় সরল সহজ করিয়া লিখুন, ভালই। কিন্তু সবই হালকা ছাঁদে লিখতে হইবে এরূপ মনোবৃত্তি মূল খুঁজিয়া পাই না। কোন কোন মাসিক পত্র দেখিলে মনে হয়, এ যেন 'উড়ের যাত্রা' দেখিতে আসিয়াছি, এখানে রামও নাচেন, সীতাও নাচেন, লক্ষ্মণ ভরত সকলেই নৃত্য করেন। রামানন্দবাবুর সম্পাদনা-রীতি এরকমটি ছিল না। কঠিন বিষয় সোজা করিয়া লিখিতে তিনিও বলিতেন, কিন্তু উহা লইয়া ছেলেখেলার একান্ত বিরোধী ছিলেন তিনি। রামানন্দবাবু তথ্যমূলক পরিসংখ্যান ভিত্তিতে রচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন (...) যুবকদের পরিসংখ্যানমূলক রচনার সর্বদাই উৎসাহ দিতেন।

বরণীয় (১৯৫৯), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ

আমাদের গ্রাম বলরামপুরের স্কুলটা প্রকাণ্ড এক পুকুরের ধারে। সকাল দশটায় ভাত খেয়ে স্কুলে গিয়ে বইপুঁথি রেখে স্কুলের প্রায় সব ছেলেই সার্ট আর ধূতি পুকুরের পাড়ে রেখে দিগম্বর হয়ে পুকুর লাফিয়ে পড়তাম। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল না হওয়া পর্যন্ত সাঁতার কাটতাম। তারপর পণ্ডিতমশাই, যিনি সকাল থেকে এগারোটা পর্যন্ত নিজের সামান্য জমিতে হালচাষ করে স্কুলে আসতেন, তাঁর গর্জন শুনে পুকুর থেকে উঠতাম। পাঁচ ছ'দিন পরে পুকুরে নামবার আগেই ধূতি কেচে শুকোতে দিতাম, তারপর সেই ধূতি পরতাম। জুতা বলে কোনো জিনিষ গ্রামে ব্যবহারও হত না, আমাদের দরকারও হত না। প্রত্যেক হাটের বার বাবা আমাদের দুটি করে পয়সা দিতেন। এক পয়সায় দশ গণ্ডা মানে চল্লিশটা মোয়া কিনতাম, আর এক পয়সায় বাতাসা, তাও প্রায় পঁচিশ ত্রিশটা। এই দিয়ে ভোর সকালবেলা হত আমাদের নাস্তা। আটমাস দশমাস পরে নতুন সার্ট বা ধুতি পেতাম। সেই নতুনের গন্ধ যাতে ফুরিয়ে না যায় সেজন্য কাপড় প্রথম পানিতে ভিজাতাম প্রায় পনেরো বিশ দিন পরে। বাবুগিরি কাকে বলে, হাইস্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত জানতাম না।

আমাদের বাড়ির পুবে আদিগন্ত মাঠ— তারপর বয়ে চলেছে কালজানি নদী। বর্ষায় চেয়ে চেয়ে দেখতাম তার অপরূপ শোভা। সারাটা মাঠ সবুজ ধানে ভরে উঠত। পুবালী বাতাসে সেই ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যেত। সাদা মেঘ নদীর পারে বৃষ্টির জাল বুনতে বুনতে আসত মাঠের মাঝখানে, পড়ত আমাদের বড় বড় টিনের ঘরে ঝম্‌ঝম্ শব্দে। তখনকার দিনের বৃষ্টির কথা জীবনে ভুলতে পারব না। বৃষ্টি যখন আরম্ভ হত, একমাস দেড়মাসের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য বিরাম হত না। অনেকের বাড়িতে জ্বালানী কাঠ থাকত না। বর্ষার আগে তাই দশ পনেরো দিনের উপযোগী চিড়ামুড়ি তৈরী করে রাখত অনেকে। বৃষ্টিতে ভিজতাম, বড় ভাল লাগত অহেতুক বৃষ্টিতে ভিজতে। কোনো কোনো বছর বৃষ্টিতে ভেজার জন্য হত সর্দি-জ্বর, কখনো বা ম্যালেরিয়া। ছেলেরা দল বেঁধে বড়শী নিয়ে যেত মাঠের দিকে, আমারি নাকের ডগার উপর দিয়ে। শুয়ে শুয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতাম জ্বরের উপর। তখনকার দিনের ম্যালেরিয়ার একমাত্র ছিল "ডি. গুপ্তের টনিক"। মাকে বলতাম, "হোক তেতো, বেশী করে ওষুধ দাও, জ্বরটা তাড়াতাড়ি সরে যাক! দেখ না, সবাই কেমন মাছ ধরতে যাচ্ছে! আমি কদিন থাকব বিছানায় শুয়ে?"

আমার শিল্পী জীবনের কথা, আমার শৈশবের কথা

হারীতকৃষ্ণ দেব

নিমন্ত্রণ রক্ষা করলুম সশরীরে 'কমলালয়ে' উপস্থিত হয়ে। চিঠিতে ঠিকানা ছিল ১ নং ব্রাইট স্ট্রীট, বালিগঞ্জ। কিন্তু রাস্তাটিতে কোন ব্রাইট লাইট দেখেছি ব'লে তো স্মরণ হয় না। ট্রামের দৌড় তখন এলিয়ট রোডের মোড় পর্যন্ত, যেখানে এখনো দেখা যায় জোড়া-গির্জের চুড়ো আকাশের দিকে উচ্চাভিলাষী হয়ে দণ্ডায়মান, আর দেখা যায় প্রকাণ্ড সমাধিক্ষেত্র, যেখানে মাটির সঙ্গে মিশে আছে বিশ্বাসী মানুষের দেহাবশেষ, আর তাদের পরিচয় খোদাই কবা আছে প্রস্তর-ফলকে। মনে পড়ল মোপাসাঁর সেই স্বপ্নবর্ণনা, যাতে তিনি দেখেছিলেন এইরকম একটি সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রেতাত্মাগুলো উঠে এসে পাথরের গায়ে লেখা মিথ্যা প্রশংসা মুছে দিচ্ছেন এবং সত্য কথা ব্যক্ত করছেন। আমার সৌভাগ্য, এ-ধরণের দুঃস্বপ্ন কখনো দেখি নি। আর সৌভাগ্য, সেদিন আমায় গন্তব্যস্থানে বহন করবার বাহনও মিলেছিল নিকটেই, কেননা গোরস্থানের পাশেই দাঁড়িয়েছিল গোটা কয়েক ভাড়াটে ফীটন গাড়ি, যার সহায়তা না পেলে সবুজ-সভায় যোগদান করা সেদিন আমার পক্ষে সম্ভব হত না। আর আধ ঘণ্টার হাঁটা পথ কতক্ষণে অতিক্রম করেছিলুম, তা মনে নেই, তবে অশ্বের গতি মন্থর থাকায় রাস্তার আশেপাশে কিছু বাগানওয়ালা বাড়ী দৃষ্টিগোচর হল, যেগুলো সাহেবী ফ্যাশানে সাজানো।

...এক নম্বর ব্রাইট স্ট্রীটে প্রবেশ ক'রে যে-আলো পেলুম, তার ঔজ্জ্বল্য কম, কিন্তু মিষ্টতা অনেক। মনকে সরস, সবল, সতেজ রাখার জন্যে সে-আলোকের সৃষ্টি। ফটকে 'কমলালয়' নামটা লিখিয়েছিলেন কে, তা আমার জানা ছিল না, তবে অন্দরে ঢুকে বেশ মনে হল, এটি যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন-কেন্দ্র। উঁচু ফ্লোরের উপর একতলা বাড়ী, সম্মুখেই থামওয়ালা গাড়ি-বারান্দা। সোজা চ'লে গেলে ড্রইংরুম, আর ডান দিকে মোড় ফিরলে আপিস-ঘর। সেই আপিস-ঘরে ব'সে আছেন একজন সুপুরুষ এবং তাঁর পিছনের দেয়ালে লাগানো আছে একটি সুন্দরীর উত্তমাঙ্গের পাষাণী আভাস, কেননা মার্বেল বাস্-রিলিফ-এ রূপের আভাসমাত্রই মেলে। তবে মূর্তিটি যে লক্ষ্মীস্বরূপা, তার প্রমাণ, ওটি গৃহলক্ষ্মীর প্রতিকৃতি। লক্ষ্মীর নামান্তর কমলা ও ইন্দিরা। সুতরাং শিল্পীর ভাষায় এই কথাই বলা হয়েছে যে, কমলালয়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। এই শ্রীমতীর পটভূমিকায় যে শ্রীমান পুরুষকে দেখলাম, তাঁর বর্ণ গৌর, নাক টিকালো, গোঁফ বেনাপাতি, পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চটি, আর বাঁ হাতে অগ্নিমুখ ধূমায়মান প্রহরণ— অর্থাৎ একটি জ্বলন্ত সিগারেট।

সবুজ পাতার ডাক (১৯৫৯)

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বড়-অক্ষয়বাবুর খুব দরাজ গলা ছিল, যেটি মাঘোৎসবের উঠোনে ধ্রুপদ গাইবার সময় বিশেষ কাজে লাগত। তাঁর আর-একটি অভ্যাস ছিল যে, তাঁর যে-চড়া সুর গলায় কুলোত না, সেটি ঊর্ধ্বে ইঙ্গিত ক'রে দেখিয়ে দিয়ে কাজ সারতেন। তাঁর এক রোগ ছিল লেখকের রচনার উপর নিজের কথার রঙ চড়ানো। তাতে আরও রসিকতা বাড়বে ব'লে মনে করতেন। 'রাজা ও রাণী'তে সুমিত্রার রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবার সংবাদে যখন বিক্রম অত্যন্ত বিচলিত, সেই সময়ে ত্রিবেদীর (বড়-অক্ষয়বাবু) সঙ্গে পথে দেখা হল। রাণীকে ত্রিবেদী যেতে দেখেছেন শুনে বিক্রম যখন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "চোখে অশ্রু ছিল?" সেই নাট্যরসের গাম্ভীর্য নষ্ট ক'রে তিনি নাক ফুলিয়ে বললেন, "ওচ্ছ্রু, ফোচ্ছ্রু দেখি নাই চোখে"— মূল নাটকে শুধু আছে "অশ্রু দেখি নাই চোখে"। আর-একবার বাবা যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'রাজা ও রাণী'র অভিনয়ের পরিচালনা করছেন, তখন বড়-অক্ষয়বাবু কোনো-এক ভূমিকায় তাঁর বক্তব্যের অতিরিক্ত "সন্দেশ মন্দেশ রসগোল্লা ফসগোল্লা" জুড়ে দেওয়াতে বাবা ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাতে অক্ষয়বাবুর এমন অভিমান হল যে, তিনি তাঁর পরবর্তী অভিনয়ে কথাগুলি কিছুমাত্র রসকষ না দিয়ে একেবারে শুকনো ভাবে ব'লে গেলেন। তখন বাবাকে মা বলতে লাগলেন, "তুমি কেন ওঁকে এমন ক'রে বললে? এখন দেখ কি ক'রে অভিনয় চলবে!" তখন আবার তাঁর মানভঞ্জন করবার জন্য তাঁকে পঞ্চাশটি টাকা এবং একটি শাল ঘুষ দিয়ে তবে বাগ মানানো গেল।...

এহেন অক্ষয়বাবু 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয়ে লাট-পত্নীর সামনে প্রথম দস্যু সেজে খুব ফূর্তির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তাঁরা ভাষা না বুঝতে পারলেও অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা বিষয়টা সহজেই বুঝে নিতে পেরেছিলেন। অক্ষয়বাবু প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন, তখন লেডী এলিয়ট বলেছিলেন, "He is my man"। ছোটলাট-পত্নী তাঁকে my man বলেছেন, এই গৌরবের কথা অক্ষয়বাবু চিরদিন সকলের কাছে গল্প ক'রে বেড়িয়েছেন।

রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৬০), বাল্মীকিপ্রতিভা

রাসবিহারী মণ্ডল

সরকারী আপিসের সার্ভিস্ রেকর্ডের মত নিয়তির দপ্তরেও প্রত্যেক নরনারীর একটা ক'রে ফাইল আছে এবং সেই ফাইলে আছে জীবনের একটা নক্সা বা ছক। সেই ছকের মধ্যেই আমাদের জীবনের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। তার বাইরে যাবার উপায় নেই। স্রষ্টার পূর্ব-পরিকল্পিত ও পূর্বনির্ধারিত আমাদের জীবনের এই মানচিত্র। প্রতিটি দিনের বিশেষ ঘটনাবলি এরই মাঝে চিহ্নিত। আমাদের বোধের বাইরে। তবু এর অগোচর অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এর নির্দেশ মেনে চলতে হয়। প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনার মাঝে কার অদৃশ্য হাতের ছোঁয়া পাওয়া যায়! অথচ এর কোন ব্যাখ্যা হয় না। কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বাতুলতা। এ অজ্ঞেয়। এ অনতিক্রম্য। এ প্রশ্ন। এর উত্তর নেই। দৃশ্যতঃ যা অঘটন মনে হয়, নিয়তির বিধানে তা-ই ঘটনা। সহজ স্বাভাবিক ঘটনা। আকস্মিকতার দুর্নিবার বিহ্বলতা কেটে গেলেই মনে হবে, এ ছাড়া আর কিছু ঘটতে পারত না। এ বিচিত্র নয়। দুর্জ্ঞেয় নয়। এই জীবনের ছন্দ। ছন্দপাত নয়। এ ব্যথা নয়। এ আনন্দ। অভিশাপ নয়। আশীর্বাদ।

বিদিশার জীবনে ছকের চিহ্নিত বিন্দুগুলো বৃত্তের আকারে দ্রুততালে ঘুরছে। হাত ধ'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায় কে জানে? মনকে সে সরিয়ে নিয়েছিল শিবাজীর সংসর্গ থেকে। তাদের সান্নিধ্য তাকে আনন্দ দেয়। মাতা-পুত্রের জন্য তার অন্তরে আছে একটা গভীর মমত্ববোধ। তবু সে বিচার ক'রে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। মনকে আবৃত ক'রে রেখেছিল দুর্ভেদ্য কর্মের আবরণে। নিজের উপর বিশ্বাস হারায় নি সে। মুহূর্তের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় নি। নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু নিয়তি তার দূরের ব্যবধানকে সরিয়ে দিয়ে আবার কাছে ডেকে নিয়ে গেল। মৃদুলার রোগ-সংবাদ তার দ্বিধা-সঙ্কোচের সঙ্কীর্ণ বেড়া ভেঙ্গে দিল। সে ভুলে গেল নিজের কথা। ঘুচে গেল নিজের ভয়-ভাবনা। ভ্রূক্ষেপ করল না পিসেমশায়ের হীন কটাক্ষ। স্নেহের ডাকে সে সাড়া দিল। ফণা গুটিয়ে সাপিনী মন্ত্রপুত বাঁশী শুনতে গেল। এ-ডাকে বিচার থাকে না। এ-ডাকে হিসেব চলে না।

মরণাপন্ন মৃদুলা।

এক মুঠো মাটি, একুশ

জসীম উদ্দীন

পদ্মানদীর তীরে আমাদের বাড়ি। সেই নদীর তীরে বসিয়া নানা রকমের কবিতা লিখিতাম, গান লিখিতাম, গল্প লিখিতাম। বন্ধুরা কেউ সে-সব শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কেউ-বা সামান্য তারিফ করিতেন। মনে মনে ভাবিতাম একবার কলিকাতায় যদি যাইতে পারি, সেখানকার রসিক সমাজ আমার আদর করিবেনই! কতদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, কলিকাতার মোটা মোটা সাহিত্যিকদের সামনে আমি কবিতা পড়িতেছি। তাঁহারা খুশি হইয়া আমার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছেন। ঘুম হইতে জাগিয়া ভাবিতাম, একটিবার কলিকাতা যাইতে পারিলেই হয়। সেখানে গেলেই শত শত লোক আমার কবিতার তারিফ করিবে। কিন্তু কি করিয়া কলিকাতা যাই? আমার পিতা সারা জীবন ইস্কুলের মাস্টারি করিতেন। ছেলেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে এইরূপ আকাশ-কুসুম চিন্তা করে, তাহা তিনি জানিতেন। কিছুতেই তাঁহাকে বুঝান গেল না, আমি কলিকাতা গিয়া একটা বিশেষ সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করিতে পারিব। আর বলিতে গেলে প্রথম প্রথম তিনি আমার কবিতা লেখার উপরে চটা ছিলেন। কারণ পড়াশুনার দিকে আমি বিশেষ মনোযোগ দিতাম না; কবিতা লিখিযাই সময় কাটাইতাম। তাহাতে পরীক্ষার ফল সব সময়ে ভাল হইত না।

তখন আমি প্রবেশিকার নবম শ্রেণীতে কেবলমাত্র উঠিয়াছি। চারিদিকে অসহযোগ-আন্দোলনের ধুম। ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া স্বাধীনতার আন্দোলনে নামিয়া পড়িতেছে। আমিও স্কুল ছাড়িয়া বহু কষ্ট করিয়া কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার দূরসম্পর্কের এক বোন কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁর স্বামী কোন অফিসে দপ্তরীর চাকুরী করিয়া মাসে কুড়ি টাকা বেতন পাইতেন। সেই টাকা দিয়া অতিকষ্টে তিনি সংসার চালাইতেন। আমার এই বোনটিকে আমি কোনদিন দেখি নাই। কিন্তু অতি আদরের সঙ্গেই হাসিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। দেখিয়াই মনে হইল, যেন কত কালের স্নেহ-আদর জমা হইয়া আছে আমার জন্য তাঁহার হৃদয়ে। ঘরে সঙ্কীর্ণ জায়গা, তাহার মধ্যে তাঁহাদের দুইজনের মত চৌকিখানারই শুধু স্থান হইয়াছে। বারান্দায় দুই হাত পরিমিত একটি স্থান, সেই দুই হাত জায়গা আমার বোনের রান্নাঘর।

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় (১৯৬১), নজরুল

কিছুদিন পরে মেজদাদামশায় চ'লে গেলেন তিনতলার বাকি অংশ ছেড়ে। শূনশান হয়ে গেল সমস্ত তিনতলাটা। রাত্রিবেলা আলো জ্বলা বন্ধ হল। দিনের বেলা জানলা-দরজা আর খোলা হল না। তবু সেই নিরালা পুরী থেকে মাঝে মাঝে কিসের যেন আওয়াজ উঠছে ব'লে মনে হত। থেকে থেকে বোধ হত উপরে যেন কারা চলাফেরা করছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ একটা গুম্ গুম্ শব্দ শুনতে পেলুম। উপর থেকে আসছে। প্রথমে মনে হয়েছিল কানের ভুল। তারপর আবার শুনলুম শব্দটা। বাড়িটাও যেন কাঁপছে শব্দের সঙ্গে। অনেকেই শুনলুম আমরা। ভারি অস্বস্তি লাগল। বুঝতে পারলুম না কিছু। একবার মনে হল চোর এসেছে তেতলায়। কিছু ভাঙছে বোধ হয় মেঝেতে ফেলে। কিন্তু কি-ই বা থাকতে পারে উপরের খালি ঘরগুলোয়?... টর্চ নিয়ে আমরা শব্দ অনুসরণ ক'রে চৌতলার ছাদে গিয়ে উঠলুম। টর্চ ফেলে দেখি ছাদের এক কোণে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে সন্তোষ চাকর— হাতে এক গোছা লোহার শিক। ছাদের গায়ে যে লোহার শিকের পাঁচিল, তারই থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে শিকগুলো সংগ্রহ করছে বিক্রি করবার জন্যে...

সাধারণ অবস্থায় সন্তোষ এমন করার কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু জোড়াসাঁকো বাড়ির তখন সে কী এক আবহাওয়া— মানুষগুলো যেন অমানুষ হয়ে উঠেছে...

দাদামশায় শুনে বললেন: "কি আর করবি, বল্? ঐ দেখ্ দেয়ালের দিকে!" ব'লে একটা দেয়ালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। আমরা শিউরে উঠে দেখলুম, সমস্ত দেয়াল কালো ক'রে সারি সারি পিঁপড়ে নামছে। তেতলায় আর মানুষ নেই। পিঁপড়েরা টের পেয়ে গেছে। কোথায় কিসের ফাটলে থাকত পিঁপড়েগুলো, কে জানে? কতদিনের কত পুরুষের পিঁপড়ে, তা-ই বা কে জানে? মানুষের সঙ্গে এতদিন পিঁপড়ে ছিল। মানুষ চ'লে গেছে, পিঁপড়েরাও চাই চলল। তেতলা ছেড়ে সারি সারি কালো পিঁপড়ের দল পালাচ্ছে।

দক্ষিণের বারান্দা (১৯৬২), চব্বিশ

প্রিয়রঞ্জন সেন

নদী দেখিলেই মনে চিন্তা জাগে— নদী আসে কোথা হইতে, আর যায় কত দূর? এই চিন্তা বা প্রশ্ন সনাতন। নদীর আদি ও অন্ত থাকিতেই হইবে। যতবার নদীর দিকে তাকাই, ততবারই এই প্রশ্ন জাগে। আর এই প্রশ্ন যতই পুরানো হইয়া যায়, ততই অধিক গভীর, অধিক কাব্যময়, অধিক গূঢ় হইয়া উঠে। অবশেষে মনে মনে স্থির থাকিতে পারা যায় না, পা আর বাধা মানে না। মন একাগ্র হইয়া প্রেরণা দেয়, পা চলিতে আরম্ভ করে। আদি আর অন্ত খোঁজা— এই সনাতন সন্ধান আমরা হয়তো নদীর মধ্য হইতেই পাইতে পারি। তাই জীবনপ্রবাহকেও নদীর উপমা দিয়া আসিতেছি... এই সংসারের আদিম যাত্রী হইল নদী। তাই সেকালের যাত্রীরা নদীর উদ্‌গমস্থান, সঙ্গমস্থান ও মোহানা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন।

জীবনের প্রতীক এই যে নদী, ইহা কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়? শূন্য হইতে আসে, আর মিলাইয়া যায় অনন্তে। শূন্য অর্থাৎ অত্যল্প, সূক্ষ্ম কিন্তু প্রবল; আর অনন্তের অর্থ হইল বিশাল ও শান্ত। শূন্য ও অনন্ত, উভয়েই পরস্পরের নিকট হইতে গূঢ়, উভয়েই অমর। শূন্য হইতে অনন্ত— ইহাই সনাতন লীলা।...

মানবজীবনেরও এই অবস্থা। ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে জাতি, জাতি হইতে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র হইতে মানবসমাজ, মানবসমাজ হইতে ভূমা বিশ্ব— এইভাবে হৃদয়ের চিন্তার বিকাশ চলিয়া আসিতেছে। মাতৃভাষার দ্বারা আমরা প্রথমে আত্মীয়স্বজনের হৃদয় বুঝিয়া লইতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে শেষে ডাকিয়া লই। গ্রাম হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে দেশ, দেশ হইতে বিশ্ব, এইভাবে 'স্ব' বিকশিত করিতে আমরা 'সর্বে'র মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করি।

নদী ও জীবনের ক্রম সমান। নদী স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া চলে, তাহার কুলমর্যাদা রক্ষা করে, তাই সৃষ্টি হয় প্রগতির। শেষে নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়া যায়। তখনও সে স্থগিত বা নষ্ট হয় না, চলিতেই থাকে। ইহা হইল নদীর ক্রম। জীবন ও জীবন্মুক্তিরও ইহাই ক্রম।

জীবনলীলা (১৯৬৩), নদীমুখেনৈব সমুদ্রমাবিশেৎ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নৌকার দুইয়ের ভেতরে চুপ করে বসে ছিলেন ভারতচন্দ্র। ভরা গঙ্গার কোল ঘেঁষে নৌকো চলেছে; বাঁধানো ঘাট দেখা দিচ্ছে, স্নান করছে মেয়ে-পুরুষ। কোথাও গঙ্গাযাত্রী ঘাটের উপর শেষ নিঃশ্বাস টানছে, আঁজলা আঁজলা করে জল দেওয়া হচ্ছে তার মুখে, এমনিতে যদি সহজে না মরে, দম আটকেই ফুরিয়ে যাবে। আট-দশটি মেয়ে পাথরের মতো বসে আছে, পরনে টকটকে লালপাড় শাড়ি, কপালে সিঁদুরের মাখামাখি। কোনো কুলীন স্বর্গে চললেন, এরা তাঁরই সহধর্মিণী। হয়তো সহমরণে যাবে কেউ কেউ।

দৃশ্যটা সহ্য করা যায় না; ভারতচন্দ্র চোখ ফিরিয়ে নিলেন। গঙ্গার ওপারে যতদূর চোখ যায় সবুজের পর সবুজ। পাহাড়ের মতো উঁচু একটা শিবমন্দির দেখা যায়, তার চূড়োর ওপর রুপোর ত্রিশূল রোদে জ্বলছে। একটা প্রকাণ্ড জাহাজ পালের পর পাল তুলে এগিয়ে চলে গেল উজানে। মাঝিরা বলল, ওলন্দাজের জাহাজ, হুগলীর বন্দরে চলল।

ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসী। বন্দর করছে, কুঠি গড়ছে, ব্যবসা করছে। অচেনা মানুষ, অদ্ভুত চাল-চলন। ওই কালো প্রকাণ্ড জাহাজটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। কোথা থেকে একটা অশুভ সম্ভাবনার ছায়া ফেলতে লাগল মনের ভেতর। কী যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে। উড়িষ্যা থেকে বর্গীর হাঙ্গামা এখন কমে এসেছে, বর্গী সেনাপতি ভাস্কর রাও পণ্ডিতকে কৌশলে হত্যা করে দেশে এখন অনেকটা শান্তি এনেছেন নবাব আলীবর্দী; কিন্তু নবাবের বয়েস বাড়ছে, ক্রমে অথর্ব হয়ে পড়ছেন আর হাতে ক্ষমতা পাচ্ছেন তাঁর দৌহিত্র মীর্জা মামুদ। মীর্জা মামুদের বয়েস অল্প. মাথা গরম, মতিগতি ভালো নয়; শোনা যায়, বিদেশীদের, বিশেষ করে ইংরাজদের সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু এইরকম কালো কালো জাহাজে আকাশছোঁয়া পাল তুলে যারা দুরন্ত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে, আকাশের চাঁদের মতো যাদের রঙ, আগুনের মতো যাদের চুলের বর্ণ, চোখের তারা যাদের বাঘের মতো কপিশ, হাঁটবার সময় যাদের পায়ের দাপে মাটি কাঁপে আর তলোয়ার ঝনঝনিয়ে ওঠে, কথায় কথায় যাদের কামান গর্জায়— তাদের সঙ্গে বিরোধ করে কি শেষ পর্যন্ত ভালো হবে মীর্জা মামুদের?

কী একটা ঘটবে! কী একটা ঘটতে যাচ্ছে।

অমাবস্যার গান (১৯৬৫), তিন

মুনীর চৌধুরী

সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জন ড্রাইডেন অন্ত্যমিলযুক্ত পাদবদ্ধ চরণে 'আওরংজীব' নামে একটি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন।... এই নাটকে ড্রাইডেন আওরংজীবকে যে-আকৃতি দান করেছেন, প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষ্য তার বিপরীত। যে-গ্রন্থ পাঠ ক'রে ড্রাইডেন তাঁর নাটকীয় জগৎ পুনর্নির্মাণে উদ্যোগী হন, তার প্রকৃতিও সর্বত্র ঐতিহাসিক নয়।...

আওরংজীবের চরিত্রচিত্র সাহিত্যেও বিচিত্ররূপে পরিবেশিত হয়েছে। মোগল বাদশারা সবাই যে ইসলামের খেদমত করার জন্য রাজশাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, এমন নয়। মধ্যযুগের সকল দেশের সকল ধর্মী রাজপুরুষদের মতো তাঁরাও সিংহাসন দাবী করেছেন উত্তরাধিকারসূত্রে এবং দখল করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদারদের যে-কোনো উপায়ে পরাস্ত ক'রে। সিংহাসনে আরোহণ ক'রে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন, আমোদ-আহ্লাদে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, আবার দরবার ও দেশের একাধিক মানবকল্যাণকর সুকীর্তির সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। কেবলমাত্র আওরংজীব সম্পর্কেই এই অতিরিক্ত ধারণা কোন কোন ঐতিহাসিক প্রচার করেছেন যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন কঠিন শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন, ভারতে ইসলামকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বভাবতই পাক-ভারতের মুসলমান এই কারণে আওরংজীবকে একটু স্বতন্ত্রভাবে স্মরণযোগ্য ব'লে বিবেচনা করে। এইজন্যই বাংলা সাহিত্যে হিন্দু লেখক যখন আওরংজীবকে হেয় বা নগণ্য ব'লে চিত্রিত করেন, তখন মুসলমান পাঠকের মনে একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। হওয়াটা যৌক্তিক কি অযৌক্তিক সে-প্রশ্ন অবান্তর। কারণ মুসলিম পাঠক যেমন আওরংজীবকে স্বচক্ষে দেখে তারপর তাঁর সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ করে নি, তেমনি হিন্দু লেখকও গবেষণার নিষ্কাম অনুসন্ধানবৃত্তি পরিচালনার দ্বারা আওরংজীবের প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রাণপাত করেন নি। সাহিত্যিকরা সকলেই প্রচলিত তথ্যের নাড়াচাড়া করেছেন, প্রয়োজন ও অভিপ্রায় অনুযায়ী সেই আধা ইতিহাসের রদবদল করেছেন। বঙ্কিম থেকে শুরু ক'রে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত এই কথা সত্য।

ড্রাইডেনের চিত্ত বঙ্কিম-মানসের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বৈরীভাবের দ্বারা পীড়িত ছিল না। হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের ইতিহাসে ভারাক্রান্ত ভারতবর্ষের এক পরাক্রান্ত বাদশার মুসলমান হিসেবে কি-বিশেষ ভূমিকা ছিল, ইংলণ্ডের খ্রীষ্টান কবিকে তা ভাবিত ক'রে তোলে নি।

তুলনাত্মক সমালোচনা (১৯৬৯), ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়

মীরা দেবী

বাবা নিজের লেখাপড়া কাজে ব্যস্ত থাকলেও তারই মধ্যে রোজ সকালে আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। বেশির ভাগ সময় গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে বেছে বেছে কবিতা পড়াতেন। আমি ভাল মুখস্থ করতে পারতাম না, কিন্তু বাবা সুন্দর উপায়ে মুখস্থ করিয়ে দিতেন: যেখানে আমার মনে পড়ত না, সে জায়গার কবিতার ছবিটা মনে করিয়ে দিতেন, তখন আস্তে আস্তে সবটা মনে পড়ে যেত। যে-কবিতাটা মুখস্থ করাতে চাইতেন, সেটা বার কতক লিখতে লিখতে আপনি মুখস্থ হয়ে যেত। চেঁচিয়ে প'ড়ে মুখস্থ করার চেয়ে লিখতে লিখতে কত সহজে মুখস্থ হয়ে যায়, স্কুলের ছেলেমেয়েরা যদি একবার জানত, তাহলে নিশ্চয়ই আমার পন্থা ধরত। বয়সের তুলনায় বাবা একটু শক্ত বিষয় পড়াতে ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, ছেলেমানুষ বুঝতে পারবে না ব'লে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কোনো কালে তারা ভাবতে শিখবে না।... অজিত চক্রবর্তী তখন আশ্রমে এসেছেন, তাঁর কাছে আমাকে পড়তে দিলেন। অজিতবাবুর কাছে এনশেন্ট রোমান হিস্টরি পড়েছি। আমার কোনো কালে সাল বা তারিখ মনে থাকে না, তবু ইতিহাসের দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। বাড়িঘর, দেশের অবস্থা কি-রকম ছিল, অতীত লোকের চালচলন কেমন ছিল, এই সব জানতে ইচ্ছে করত। সেই বইটার চেহারা অবধি আজও মনে আছে। হঠাৎ একদিন আমার সেই সময়কার একটি রোমান ইতিহাসের নোট-লেখা খাতা পুরোনো আর্বজনা থেকে বেরিয়ে পড়ল। দেখে নিজের আশ্চর্য লেগেছিল যে, কী ক'রে পাতার পর পাতা এতখানি নির্ভুল ইংরেজিতে লিখেছি!...

বাবা শুধু যে লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন তা নয়, তারই মধ্যে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম ঠিকমত চলছে কি না, সে খোঁজও নিতেন। রাত্রিতে ছেলেরা শোবার পর তাদের ঘর একবার ঘুরে দেখে আসতেন, সবাই ঠিকমত মশারি গুঁজেছে কিনা। বরাবর দেখেছি, কারো অসুখ করলে বাবা স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। যখন নিজের হেঁটে যাবার মতো ক্ষমতা ছিল, তখন বিদ্যালয়ের ছেলেদের কারো কিছু হলে নিজে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আসতেন।... একবার অনেকদিন ধ'রে জ্বরে ভুগেছিলুম; বাবা বিছানায় এসে ব'সে কপালে হাত দিলে মনে হত, কষ্ট অনেক ক'মে গেছে; আবার বাবা উঠে গেলেই ছটফট করতে শুরু করতুম। বাবা আমাদের মায়ের অভাব বোধ করতে কখনো দেন নি, আবার অতিরিক্ত আদর দিয়ে নষ্টও করেন নি...

স্মৃতিকথা (১৯৬৯), ৪

রাসুর খোঁপায় এক জোড়া কদম ফুল। কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মতো কেমন উদাসীন আলসেমিতে পড়ে-থাকা খোঁপার দুধারে ঝুলে রয়েছে ফুলগুলো। আস্তে করে নাকটা ওর খোঁপার চুলে ডুবিয়ে দিল মালু। কদমের গন্ধ আর ওর চুলের খোসবু টানল বুক ভরে। যেন ফিসফিসিয়ে বলতে চাইল মালু: মুরোদ আমার আছে রে, মিছে ভয় পাচ্ছিস তুই। আচমকা উঠে দাঁড়ায় রাসু। মালুর হাত দুটো অকারণ জোরে ছুড়ে দেয়। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে, যেন দারুণ অপমানিত হয়েছে ও। মালু দেখল, অথৈ পানির শান্ত গভীরতা হারিয়ে চোখ দুটো রাসুর জোনাকির মতো জ্বলে উঠেছে।

কী আমার মুরোদ রে! ফোঁসফোঁসিয়েই বলল রাসু আর কি যে ঝাঁঝ ছড়াল। কোথা থেকে এত ঝাঁঝ এল রাসুর গলায়? ওর দিকে তাকিয়ে যেন দিশে হারায় মালু।

আর কিছু বলল না রাসু। মালুর দিকে চাইলও না একটিবার।

লতির আঁটিটা হাতে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কচু পাতার জঙ্গলের ওপারে। মালুর বুকটা কেন যেন ভারি হয়ে গেল। মনে হল, ওর কি এক কান্না জমেছে সেখানে। কিন্তু চোখ দুটো ওর জ্যৈষ্ঠের ক্ষেতের মতই শুকনো। এতদিন মালুর শরীরটাই বুঝি ফনফনিয়ে বেড়ে উঠছিল। আজ হঠাৎ করে ওর মনটাও যেন বয়সের ছোঁয়া পেল, এক লাফে যেন বেড়ে গেল মালু অনেকখানি।

সূর্যটা লাল হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নাববে এক্ষুনি। গড়গুলো পেরিয়ে সৈয়দ-বাড়ির অন্দর-মহলের পুকুরপাড়ে উঠে এল মালু। হঠাৎ ঢোলের আওয়াজ শুনে কানটা ওর খাড়া হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ ধরেই ঢোলের আওয়াজ আসছিল, কিন্তু সে-দিকে কান ছিল না মালুর।

বাকুলিয়ায় ঢাক ঢোলের রেওয়াজ নেই। বছরে শুধু একদিনই ঢোল বাজে ও-গাঁয়ে, মিঞাদের পুইন্যার সময়। কয়েক পা এগিয়েই মালুর আর সন্দেহ রইল না, সৈয়দ-বাড়ি থেকেই ভেসে আসছে ঢোলের আওয়াজ। ঢোলকের তালের সাথে সাথে টুং টুং কী-এক বাজনাও বাজছে যেন। সৈয়দ-বাড়িতে বাজনা? সূর্যের পশ্চিম দিকে ওঠার মতোই এ এক অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার। ঢাক ঢোল বাজনা, ও-সব হল শেরেকী ব্যাপার, হিন্দুয়ানি কারবার। তাই সব-রকমের বাজনাই নিষিদ্ধ এ-বাড়িতে। পুইন্যার সময়ও কোন ঢোল বাজতে পারে না সৈয়দ-বাড়িতে। পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দেয় মালু।

সংশপ্তক (১৯৭০)

পরিমল গোস্বামী

আজ ৮ই নবেম্বর ১৯৭০, বেলা চারটে, এ-সব লিখছি দোতলার ছাতে বসে। অল্প দূরের কলের চিমনি থেকে ঘন কালো ধোঁয়া আকাশ আচ্ছন্ন করেছে। তবু ভাল, এই মুহূর্তে হাওয়া কোন্ অজ্ঞাত কারণে পুব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই উত্তরে অবস্থিত ধোঁয়ার স্রোত ঠিক মাথার উপর দিয়ে চলছে না। পুব দিকের তিন-চারটি বাড়ির পরে কোনো এক বাড়ি থেকে হাল্কা হিন্দি গানের রেকর্ড বাজছে, অশ্রাব্য মনে হচ্ছে।

আকাশ এখন সম্পূর্ণ মেঘশূন্য। মেঘ থাকলে এ-লেখা হত না এখন। সূর্যাস্তের আধঘণ্টা অন্তত দেরি আছে, ইতিমধ্যে প্রায় আধখানা চাঁদ মধ্যাকাশ থেকে কিছু পুব দিকে বসে আমার অস্বস্তিটা লক্ষ্য করছে। পাঁচটা কাক ছাতের খাটো প্রাচীরে বসে আছে। এই পরিবেশে গ্রামের স্মৃতি লিখছি।

মেঘ থাকলে সূর্যাস্তের সময় আকাশ জুড়ে যে-বিচিত্র শোভা হয়, সে-দৃশ্য থেকে চোখ এবং মন ফেরানো যায় না। এই বিচিত্র রঙের কল্পিত স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ সম্বোধন করেছেন রঙের পাগল বলে। আমিও তো প্রায় তাই, শুধু দর্শকরূপে। আকাশের শতরকম রঙের অযত্ন বিন্যাস মনকে অত্যন্ত উতলা করে তোলে। তা প্রতি মুহূর্তে নতুন। তিনশ চারশ কোটি বছর ধরে হয়তো পৃথিবীর আকাশে এমনি মেঘে রঙের ভাঙাগড়া আর নতুন নতুন বিন্যাস চলেছে, কিন্তু আজও কোথাও দুটি মুহূর্তে তা একরকম হল না। আরো হাজার কোটি বছর ধরে এ-খেলা চললেও কখনো দুটি জায়গার দুটি মুহূর্তের চেহারা এক হবে না। মনের মধ্যে এই সীমাহীন বর্ণবৈচিত্র্যের শুধু প্রতিফলন হয়, ভাষার অভাবে সে-বৈচিত্র্য প্রকাশ করা যায় না। বারবার সেই একই ভাষা ব্যবহার করতে হয়, উপায় নাই।

শহরে ছাতে বসে সন্ধ্যাকাশের সেই রঙের খেলার দিকে চাইলে তখন আমি যে শহরে আছি, তা সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যায়। চারশ কোটি বছরের আকাশের গায়ে স্থানও নেই, কালও নেই, তার কোনো চিহ্নই নেই, আছে চিরকালের মেঘবিন্যাস আর বর্ণবিন্যাসের খেলা।

পত্রস্মৃতি (১৯৭১) শেষ পরিচ্ছেদ

এখন সব বদলে গেছে। মাঠের বদলে পাঁচতলা বাড়ি, ডোবার কবরের উপর রেস্তোরাঁ। সারাদিন কর্তব্যপরায়ণ ট্রাফিক। আর পথ চলতে ঝরা পাতা, ব্যাঙের ছাতা, থমথমে সন্ধ্যার বদলে— এখন দোকান, অনেক, বিচিত্র, ডাইনে-বাঁয়ে বক্তৃতার মতো বর্ধিষ্ণু। ঝকঝকে রঙিন মলাটে আনকোরা, বা পুরোনো কবির বইয়ের মতো ফুটপাতে। অথবা কোনো চিলতে রোয়াকে ম্যাজিকের মতো গজিয়ে-ওঠা। সারি-সারি, উন্নতির হাস্যময় দাঁতের মতো, দোকান।

এই দোকনগুলো দেখতে আমার ভালো লাগে। এখানে খেলা করে অমর লোভ, সনাতন দম্ভ; অভাবের সঙ্গে প্রয়োজনের যুদ্ধ চলে; মহিলারা লজ্জা ভুলে নিজেদের স্তন আর বাহুর ডৌল নিরীক্ষণ করেন; কাচের জানালায় প্রতিহত হয়ে কত ইচ্ছা মাছির মতো ম'রে যায়।

আর দোকানিরা— তাদেরও আমি লক্ষ করি: তাদের চাটুকারী ভঙ্গি, তাদের গৃধ্ন ও সতর্ক চোখ, আর সেই সঙ্গে তাদের অপেক্ষার ধৈর্য। আপনি ভাবছেন তারা শুধু সাজিয়ে রাখে, জুগিয়ে যায়, গছিয়ে দেয়, হিসেব লেখে, টাকা গোনে, খুচরো মেলায়? কখনো আপনার মনে হয় নি আসল কথাটা? অপেক্ষা করে তারা, অপেক্ষা ক'রে থাকে: ঐ তাদের কাজ, তাদের বৃত্তি।

যখন এক খদ্দের চ'লে গেছে, অন্য জন এখনো আসে নি, তখন আমি দেখেছি তাদের— কাউণ্টারে কনুই রাখা, হাতের গর্তে থুৎনি, তাকিয়ে আছে পথের দিকে, দূরের দিকে, এক অস্পষ্ট ভবিষ্যতের ছায়ার মধ্যে যেন।

তখন মনে হয় তাদের চোখে বিষাদ, যেন স্থির জলে মাছের মতো ভেসে উঠলো। যেন মাছের মতোই বোবা তাদের দৃষ্টি।

সুভদ্র পাঠক, ঐ চোখে কোনো চিত্রকল্প কি দেখতে পান না? আপনি, আমি— প্রত্যেক আমরা যে যার মতো দোকান খুলে বসেছি, অপেক্ষা দুলছে হৃৎপিণ্ডে। শীত এলে গ্রীষ্মের জন্য, গ্রীষ্ম এলে বর্ষার; স্ত্রীর জন্য অন্ধকার অপেক্ষা, সন্তানের জন্য কৌতূহলী: অর্থ, খ্যাতি, যাত্রা, ভ্রমণ, প্রত্যাগমন, হয়তো ভাগ্যের কোন ইঙ্গিতের জন্য— অন্ত নেই। চিঠি আসবে কার, সন্ধেবেলা ঘরে যখন আলো জ্বলে নি, হঠাৎ কার টোকা পড়বে দরজায়? ভরদুপুরে বৌবাজারের ট্রামে উঠে ফিরে পাবো কোন হারানো বন্ধুকে? এমনি, দুলছে আমাদের হৃৎপিণ্ড, দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু, অবিরাম...

মানুষ, মানুষ, মর্মাহত মানুষ, তুমি কি জানো তোমার অপেক্ষার শেষ লক্ষ্য কে? তুমি কি জানো তোমারই জন্য মৃত্যুর সৃষ্টি হয়েছিলো?

একদিন: চিরদিন (১৯৭১), দোকানিরা

ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে স্থাপিত সুশৃঙ্খল, যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যন্ত্রাদির সাহায্যে বাহ্য প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য ক'রে তাদের মধ্যে নিয়মের এবং ঐক্যের সন্ধান করে। বিজ্ঞানের এক-একটি নিয়ম বা 'ল' বহু বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে এক-একটি সাধারণ সূত্রে গাঁথার চেষ্টা। কিন্তু বিশেষ থেকে সামান্যে, অতীতের পরীক্ষিত থেকে ভবিষ্যতের অপরীক্ষিতে পৌঁছাবার জন্যে বিজ্ঞানকেও নানা প্রকার বিশ্বাস, কল্পনা ও অনুমানের সাহায্য নিতে হয়। অনেকবার নানা ক্ষেত্রে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এর থেকে সকল ক্ষেত্রেই চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে— এই সাধারণ নিয়ম স্থাপন করতে হলে মেনে নিতে হবে প্রকৃতিতে সদৃশ কারণে সদৃশ কার্য ঘটে। অনেক প্রকার পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল অক্সিজেন ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। ভবিষ্যতেও সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটবে মেনে নিতে হলে বিশ্বাস করতে হবে বিনা কারণে প্রকৃতিতে কোনো কার্য হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় এবং কারণ-কার্য শৃঙ্খলায় বিশ্বাস ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই অসম্ভব হত। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নির্বিচারে বিশ্বাস করি খেলে ক্ষুধা দূর হবে, জলে পিপাসা যাবে, হাঁটলে পৃথিবী আমাদের ভার বহন করবে, কথা বললে অন্য মানুষ শুনবে, ঘুমালে আবার জাগব। এরূপ বিশ্বাস ছাড়া খাওয়া, হাঁটা, কথা বলা, ঘুমানো আমাদের সম্ভব হত না। প্রকৃতির আকস্মিক পরিবর্তনের ভয়ে প্রতি পদে জীবন শঙ্কাগ্রস্ত ও অসম্ভব হয় উঠত। প্রকৃতির সম্বন্ধে আমাদের এরূপ সাধারণ বিশ্বাসগুলি অবলম্বন ক'রেই বিজ্ঞানে প্রথমতঃ নানা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ আরম্ভ হয়। তার ফলে কতকগুলি সমর্থিত ও দৃঢ়তর হয়। প্রত্যেক ঘটনার একটি কারণ আছে, অথবা বিনা কারণে কোনো ঘটনা বা কার্য ঘটে না, এবং কোনো ঘটনা ঘটলে তার থেকেও কিছু কার্য হয়— এই প্রকার কার্যকারণ নিয়মে বিশ্বাস আমাদের সকল ব্যবহারের মূলে থাকে এবং বিশ্বাসের মূলে রয়েছে আরও ব্যাপককতর বিশ্বাস— প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায়। এই সব মেনে নিয়েই বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে। নতুবা অন্য কোনো বিশেষ নূতন নিয়ম আবিষ্কারের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টাই শঙ্কাগ্রস্ত ও নিরস্ত হত।

ধর্ম-সমীক্ষা, দ্বিতীয় ব্যাখ্যান, প্রথম প্রসঙ্গ: বিজ্ঞানের স্বরূপ

আনোয়ার পাশা

বাঙলাদেশে নামল ভোর। ভোরেই ঘুম ভাঙে সুদীপ্তর। আজো তার ব্যতিক্রম হল না। হতে পারত। কতো রাত অবধি ঘুম হয় নি। আজো তো সারারাতেই মাঝে মাঝেই গুলির আওয়াজ শোনা গেছে। আর ভয় হয়েছে। মৃত্যু-ভয় নয়। মৃত্যুকে ভয় আর লাগে না। তবে যদি বেঁচে থাকতে হয়, তখন? এমনি আগুন আর গুলি-গোলা নিয়ে কি মানুষ বাঁচে? অতএব এলোমেলো নানা চিন্তা হয়েছিল মনে, ঘুম এসেছিল অনেক দেরিতে। ঘুমের আর দোষ কি? শুধুই কি আগুন আর গুলি-গোলা আর আতঙ্ক? এর কোনোটা না থাকলেও তো নতুন জায়গায় সহসা ঘুম আসার কথা নয়। তবু সুদীপ্তর ঘুমের ব্যাঘাত যেটুকু হয়েছিল, তা ঐ গুলি-গোলার জন্যই। নতুন জায়গার কথা মনেই ছিল না। সে-কথা মনে হল এখন, ঘুম ভাঙার পর। তেইশ নম্বরের ঘুমের ব্যাঘাত যেটুকু হয়েছিল, তা ঐ গুলি-গোলার জন্যই। নতুন জায়গার কথা মনেই ছিল না। সে-কথা মনে হল এখন, ঘুম ভাঙার পর। তেইশ নম্বরের সেই পরিচিত মুখ চোখে পড়ল না। সেই সাজানো বইয়ের শেলফ্‌গুলি, সেই টেবিল-চেয়ার-আলনা— কেউ একটি নতুন দিনের সূচনায় সুদীপ্তকে অভ্যর্থনা জানাল না। অবশ্যই তাদের মুখ মনে পড়ল সুদীপ্তর। এবং মনে পড়ল ফিরোজের কথা। তিনি এখন ফিরোজের বাড়িতে। মহীউদ্দিন ফিরোজ। এক কালে পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় নামটি চালু ছিল। কবিতা লিখতেন।

এই প্রথম রাত্রি তাঁর কাটল বন্ধুর বাড়িতে। উনিশ শো একাত্তর খৃষ্টাব্দের সাতাশে মার্চের দিনগত রাত্রি বার হয়ে আটাশে মার্চের ভোরে এসে পৌঁছলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন। কি এর আগের দুটো রাত? পঁচিশ ও ছাব্বিশ তারিখের দিন পেরিয়ে যে-দুই রাতের সূচনা হয়েছিল, তাদের কথা সুদীপ্ত স্মরণ করলেন। সে কি মাত্র দুটো রাত? দুটো যুগ যেন। পাকিস্তানের দুই যুগের সারমর্ম। বাঙলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানীদের বিগত দুই যুগের মনোভাবের সংহত প্রকাশ-মূর্তি— শাসন ও শোষণ। যে-কোন প্রকারে বাঙলাকে শাসনে রাখ, শোষণ কর। শোষণে অসুবিধা হলে? শাসন তীব্র কর। আরো তীব্র শাসন। আইনের শাসন যদি না চলে? চালাও রাইফেলের শাসন, কামান-মেশিনগানের শাসন। কামান-মেশিনগানের সেই প্রচণ্ড শাসনের রাতেও তিনি বেঁচে ছিলেন।

আশ্চর্য, এখনো তিনি বেঁচে আছেন।

রাইফেল, রোটি, আওরাত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলা দেশ জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে, এর অস্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্তা কইছি, লিখছি, এর জীবন্ত মূর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার রূপ কিন্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশ পায়; কাজেই যত মানুষ, তত বিচিত্ররূপে একই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষা-ই একটী বহুরূপী বস্তু— সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদলায়, আবার কাল-ভেদেও তেমনি বদলায়। আবার অবস্থা-গতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এক পূরাতন সাহিত্যিক রূপ। তারপর আছে চলতি ভাষা— যেটা হচ্ছে শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরথী-তীরের ভদ্রসমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে-ভাষা আজকালকার বাঙলা সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে; আর যে-ধারা এখন সাহিত্যে চলেছে, সে-ধারা বাধা না পেয়ে চলতে থাকবে, যে-ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়াবে— এখনকার সাধু-ভাষাকে একেবারে হঠিয়ে দিয়ে। বাঙালার এই দুই সর্বজন-পরিচিত মূর্তি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূর্তিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্য মূর্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্তি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন এই সব মূর্তিকেই সমানভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলা-ত্ব' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলেরই আছে, অথচ এরা স্বতন্ত্র। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব। এই সকল শাখা-ই স্ব-স্ব-প্রধান, কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্যমূল্য। তবে একটা বিশেষ শাখা, অনুকূল অবস্থায় প'ড়ে যখন শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়— কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয়স্থান হয়ে, ভাব আর চিন্তার সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যায়— তখন স্বভাবতঃ অন্য শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্য শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রাদেশিক সাহিত্য-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টিপাত করে না।

বাঙলা ভাষা-আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা (১৯২৬)

বর্ণানুক্রমিক সূচী